দাম ঃ ৪০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৬

২১ সেপ্টেম্বর - ২০০৯

স্বস্তিকা • পূজা সংখ্যা - ১৪১৬ • দাম ঃ ৪০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৬, (যুগাব্দ ঃ ৫১১১)

৬২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

সূচীপত্র

দেবী বন্দনা ❒ শ্রীগুরুজী ❒ ৪

মহাদেবীর মহাপূজা ❒ স্বামী অশোকানন্দ ❒ ৫

উপন্যাস

এ পরবাসে
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

❒ ৫৬

নকল ডান তর্জনী
দীপঙ্কর দাস

❒ ১০৭

সুরবালার সংসার
সুমিত্রা ঘোষ

❒ ১৫৪

গড়মণ্ডলের হারানো ইতিবৃত্ত
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

❒ ২১৩

গল্প

নীলনদের তীরে ❒ এষা দে ❒ ১৩

দিদি ❒ জিষ্ণু বসু ❒ ২৩

ইতিহাসের শিক্ষা ❒ শেখর বসু ❒ ৪১

শেষ নয়, শুরু ❒ রমানাথ রায় ❒ ৫১

লাল ফিতে ❒ গোপালকৃষ্ণ রায় ❒ ১৪২

স্বপ্নের বাড়ী ❒ ডঃ দীপক চন্দ্র ❒ ১৯৫

রম্য রচনা

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ❒ চণ্ডী লাহিড়ী ❒ ১৯১

ছড়া কাহিনী

গফুর মিঞার স্বপ্ন পূরণ ❒ শিবাশিস দণ্ড ❒ ১০১

প্রবন্ধ

সুখের সন্ধানে মানুষ ❒ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ❒ ৭

নব বিশ্ববিধান ও সভ্যতার সংকট — হান্টিংটন তত্ত্ব ❒ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ❒ ৩৬

ভাষা উপভাষা অপভাষা ❒ তথাগত রায় ❒ ৩৯

নোবেল পাওয়া সহজ ছিল না আইনস্টাইনের ❒ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় ❒ ৪৭

মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যালীলা ❒ ডঃ বলরাম চক্রবর্তী ❒ ৯২

সংবিধান ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ ❒ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য ❒ ৯৭

মন্দির গড়ার 'বিশ্বকর্মা' সূত্রধর সম্প্রদায় ❒ প্রণব রায় ❒ ১৪৭

পদার্থবিদ্যা— জড় থেকে চৈতন্যে ❒ সুমিত চক্রবর্তী ❒ ২০৩

স্মৃতি কথা

অসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ❒ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ❒ ১৮২

ভ্রমণ কথা

ধোলাবিরা ❒ সৌমেন নিয়োগী ❒ ১৭৮

প্রচ্ছদ ও চিত্র ঃ সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। দাম ৪০ টাকা।।

Registered No.-SSRM/Kol.RMS/W.B/RNP-048/2007-09

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. - SSRM-KOL.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫, টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : vijoy.adya@gmail.com
: swastika5915@bsnl.in
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। বিজয় আঢ্য
সহযোগী ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য।

'মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনী সর্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে!' — মহাযোগী অরবিন্দ এই ভূমিকে জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনিই জগন্মাতা, আদিশক্তি, মহামায়া ও মহাদুর্গা এই মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছেন যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি ও তাঁর পূজা করিতে পারি।

— এই ভূমিকেই আমাদের দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে বন্দনা করেছেন —

"অয়ি ভুবন মনমোহিনী .....

নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল"

— এই ভূমিকেই আমাদের স্বাধীনতার ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর সংগীত 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রণাম জানিয়েছেন —

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিনীম্।"

— এই ভূমিকেই আমাদের সকল দ্রষ্টা, ঋষি-মুনিগণ 'মাতৃভূমি', 'ধর্মভূমি', 'কর্মভূমি' ও 'পুণ্যভূমি' এবং বাস্তবিক 'দেবভূমি' ও 'মোক্ষভূমি' বলে অভিহিত করেছেন।

— এই ভূমি সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের পরমপ্রিয় ও পবিত্র ভারতমাতা, যার পুণ্য নাম শুনলেই আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি অসীম ভক্তিতে ভরে ওঠে।

হ্যাঁ, ইনিই আমাদের সকলের জননী, আমাদের সুমহান মাতৃভূমি।

— বস্তুত 'ভারত' এই নামটুকু থেকেই জানা যায় যে, ইনি আমাদের মা। 'ভরত' আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি আমাদের জন্মের বহু বহু বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক মহৎ, ধার্মিক ও বিজয়ী রাজা এবং হিন্দু পুরুষত্বের এক উজ্জ্বল আদর্শ। এক নারীর একাধিক সন্তান থাকলে, তাকে তার জ্যেষ্ঠ অথবা সবচেয়ে সুপরিচিত সন্তানের মা বলে অভিহিত করা হয়। 'ভরত' ছিলেন অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ এবং সেই কারণে এই ভূমিকে বলা হোত তাঁর মা, 'ভারত' যিনি সকল হিন্দুর জননী।

— শ্রী গুরুজী (চিন্তাচয়ন, ১ম খন্ড)

মহাদেবীর মহাপূজা

স্বামী অশোকানন্দ গিরি

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।"

ভগবৎ জগৎ ও মানব জগৎ। অর্থাৎ দেবতা এবং মানুষ— এদের মধ্যে ভেদ বহু বিধাতার মধ্যে হল দিন ও রাতের পরিমাপ। মানুষের দিন সাধারণত ১২ ঘন্টায়— রাত্রি ১২ ঘন্টায়। কিন্তু দেবলোকের দিবস হল ৬ মাস ও রাত্রি ৬ মাস। আমাদের পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ ১ মাঘ হতে আষাঢ় মাসের শেষ দিন পর্যন্ত দেবলোকে দিন— আর ১ শ্রাবণ হতে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত দেবলোকের রাত্রি। দেবতাদের দিনকে উত্তরায়ণ এবং রাত্রিকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। অর্থাৎ উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত এবং দক্ষিণায়নে তাঁহারা নিদ্রিত।

শরৎকাল দক্ষিণায়নের মধ্যে, এই সময় দেবী ভগবতী নিদ্রিতা। এই কারণে দেবীর পূজা করতে হলে, দেবীকে জাগরিত করতে হয়। দেবীর নিদ্রার সময় তাঁকে জাগরিত করার জন্য এই সময় অকাল। কিন্তু বসন্তকালে দেবী জাগরিতা থাকেন। ওই সময় উত্তরায়ণ— তখন দেবলোকের দিন।

শারদীয়া পূজা অকালে হয়, এই জন্য এই পূজাকে অকালবোধন বলা হয়। বাসন্তী পূজা কাল-বোধিত পূজা। দেবলোকের রাত্রি হওয়ায় দেবীকে জাগরিত করতে হয়। আমাদের সংসারে যেমন কোনও হঠাৎ বিপদ-আপদ হলে, আমরা বাড়িতে নিজ মা'কে জাগরিত করি, একই ভাবে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল-বোধন করে জগন্মাতার পূজা করেছিলেন। সেই জন্য শারদীয়া পূজা বাংলা তথা জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া পূজা দক্ষিণায়নে অনুষ্ঠিত হলেও রামায়ণে এই পূজার কোনও উল্লেখ আমরা পাই না। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে শ্রীরামের পূজার কথা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মহারাজ সুরথ যে বাসন্তী পূজা করেছিলেন, সে বিষয় বর্ণিত আছে। চৈত্রমাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে

সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি মতে মেধস মুনির নির্দেশে সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য দু'জনে একত্রিত হয়ে এই পূজা করেছিলেন। মুনিবর বলেছিলেন — 'হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও, যিনি আরাধিতা হইলে, মানুষকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।' — মায়ের অর্চনা করে সুরথ রাজা ভোগ ও স্বর্গ লাভ করেছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে দেবতারা শ্রীরামের মঙ্গল চিন্তায় মহাভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁরা সকলে স্থির করলেন, শ্রীরামের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করবেন। তাঁরা সকলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, আদ্যাশক্তির কৃপাদৃষ্টি ছাড়া রাবণ বধ অসম্ভব। কিন্তু এখন দেবলোকে রাত্রিকাল অর্থাৎ দক্ষিণায়ন। দেবী তো এখন নিদ্রিতা। দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবীর কৌমারী মূর্তি আবির্ভূতা হন। কৌমারীদেবী কুমার কার্তিকেয়ের শক্তি। তিনি ময়ূরের ওপর সমাসীনা। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, আগামীকালই বিল্ববৃক্ষ মূলে জননীর বোধন করতে। আপনার প্রার্থনায় তিনি বোধিতা হবেন। জগন্মাতাকে জাগরিত করে যথাবিধি অর্চনা করলে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি হবে। এই বলে কৌমারী অন্তর্হিতা হলেন।

ব্রহ্মা মর্তে এসে একটি নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষ প্রাপ্ত হলেন। ওই বৃক্ষের ঘন সবুজ পত্ররাশির মধ্যে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি মনোহারিণী বালিকাকে দর্শন করলেন। ইনি জগজ্জননী। এরূপ বিশেষ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ব্রহ্মা দেবগণসহ নতজানু হয়ে দেবীর বোধনস্তব আরম্ভ করলেন।

এই স্তবটিতে আটটি মন্ত্র আছে। 'হে মহাদেবী! তুমিই যে মহেশ্বরী আমি তা নিশ্চিতরূপে অবজ্ঞাত আছি। ভূতল তোমার ক্রীড়াভূমি, তাই তুমি এখানে আগমন করেছ। তুমি শত্রুরূপাও বটে, মিত্ররূপাও বটে। বন্ধনকারিণী রূপে তুমি শত্রু; বন্ধন-মোচনকারিণী রূপে তুমি মিত্র। মহাযোগীগণ ধ্যানযোগে অন্তরে তোমাকে ধরতে পারেন না।'

'যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার। আমি ব্রহ্মা, আমার শক্তিও তোমার। রুদ্র দেবতা, ইন্দ্র দেবতা সকলের শক্তিই তোমার— তুমি সর্বশক্তিরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, রাবণের শক্তিও তোমার। আমি সকল দেবগণ সহ কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি সকল শক্তি নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রে আবির্ভূতা— প্রবর্তিতা হও। তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য কর। জননী, তুমি জাগরিতা হও।'

ব্রহ্মার স্তবে মহাদেবী প্রবুদ্ধ হলেন। তিনি বালিকা রূপ পরিত্যাগ করে চণ্ডিকা রূপে ব্যক্ত হলেন।

সদ্য প্রবুদ্ধা দেবী বললেন, 'আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করব। অষ্টমীতে রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা মাটিতে লুটাবে। দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করবেন।' — এইরূপ আশ্বাসবাক্য মহাদেবী ব্রহ্মাকে দিলেন। ব্রহ্মা বললেন, দেবী, আজ থেকে আমরা তোমার অর্চনা করব, যতদিন না রাবণের বধ হয়। আমরা যেভাবে বোধন করে তোমার অর্চনায় ব্রতী, একইভাবে যাবৎকাল সৃষ্টি থাকবে তাবৎকাল সমস্ত নরনারী যুগ যুগ ধরে তোমার পূজা করবে।

বোধন হতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত পূজাবিধি দেবী নিজেই জানিয়ে দিলেন। সকল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গই প্রধানত একরকম। পূজায় যদি মহাস্নান, বলি-হোম থাকে সে পূজাকে মহাপূজা বলা হয়। মহাস্নানে পঞ্চ গব্য, পঞ্চ কষায়, পঞ্চ শস্যসহ আনুমানিক ২১ প্রকার জল দ্বারা স্নান করানো হয়। স্নানের আগে তেল হরিদ্রা দ্বারা মায়ের গাত্র মার্জন করার প্রয়োজন। মহাষ্টমীতে যে কোনও স্নানই মহাস্নান। এরপর মৃত্তিকা নির্মিত অষ্টকলস জলে স্নান করানো হয়। এই সময় অষ্টবিধ বাদ্য বাজবে, অষ্টবিধ রাগিণী গীত হয়।

স্নানান্তে মা'কে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করতে হয়। মায়ের নয়টি অঙ্গ যথা — চরণ, কটি, বক্ষ, হস্ত, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্ত। নূপুর হতে সমস্ত আভরণই ভক্ত সামর্থ্য অনুসারে মা'কে প্রদান করবে। সামর্থ্য না থাকলে মানসে ওই সমস্ত অঙ্গ সুসজ্জিতা জননীকে দর্শন করবেন।

পূজার বাহ্য ও অন্তর দুটি দিক। উভয়েরই মূল্য ও মর্যাদা সমান। মোটের উপর বাহ্যপূজায় অক্ষম— অসমর্থ ব্যক্তিকেই মানস পূজা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পূজান্তে ভোগ, বলি ও হোম থাকে। ষোড়শোপচারে পূজা, মহাস্নানসহ যদি বলি ও হোম থাকে, সেই পূজা মহাপূজা হয়।

এখানে মনে রাখতে হবে— বলি শব্দের অর্থ উপহার। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, বহু কষ্টার্জিত বস্তু মা'কে দিতে হয়। সুরথ রাজা নিজের গায়ের রক্তমাখা সব দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ মা'কে দিয়েছিলেন।

বলির অর্থ সাধারণত যাঁরা রাজসিক বা তামসিক পূজা করেন— তাঁরা বলির দ্রব্য বলতে একটা নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী বোঝেন এবং মাতৃসকাশে বলি প্রদান করেন। কিন্তু যাঁরা সাত্ত্বিক তাঁরাও একটি চতুষ্পদ প্রাণী আনেন। ওই প্রাণীটির পা হল— মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। অর্থাৎ এই চতুষ্পদ বিশিষ্ট নিজ অন্তঃকরণটি তথা অন্তরের পশুত্ব বলি স্বরূপ মাতৃ সকাশে প্রদান করেন।

মোটের ওপর জগজ্জননীকে মাতৃভাবে গ্রহণ করা ও মায়ের আপামর সকল সন্তান, মানুষ, পশু, বৃক্ষ লতাদিকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করাই মাতৃপূজার মহাপূজা জীবন্ত আকার ধারণ করুক— এই একমাত্র মাতৃচরণে প্রার্থনা। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

ফিলিপিন্স-এর সুখী শিশুরা।

সুখের সন্ধানে মানুষ

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

বিগত ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে পৃথিবীর নামকরা দুই জন মনোবিজ্ঞানী মেক্সিকোর বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত আকুমল (Akumal) শহরে মিলিত হন। এরা হলেন আমেরিকার ইলিনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ এডোয়ার্ড ডিনার (Edward Diener) এবং পেনসিলভেনিয়া (Pennsylvania) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী মার্টিন সেলিগমান (Martin Seligman)। পরে তাঁরা আরো তিন জন মনোবিজ্ঞানীকে ডেকে নেন। এঁরা হলেন রে ফাউলার (Ray Fowler), নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ডেনিয়েল কানেম্যান (Daniel Kahneman) এবং হাঙ্গেরির মনোবিজ্ঞানী মিহালি চিকসেন্টমিহাই (Mihali Csikszentmihalye)।

তাঁরা মনে করলেন যে, এত দিন তাঁরা মানব মনের খারাপ বা অন্ধকার দিকটা, অর্থাৎ বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির বিষয়েই কাজ করেছেন। তাই এবার তাঁরা মানব মনের সুস্থ দিকটা, যেমন কিসে মানুষ সুখী হয়, কি হলে মানুষ বেশি সুখ-শান্তি পায় এবং কি করলে মানুষ সুস্থ দেহে আরও বেশি দিন বাঁচতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন। এই জন্য তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association or APA) নামে নতুন একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে সেই নতুন সংস্থা গঠিত হল এবং কাজ শুরু করে দিল। প্রাথমিক কাজ হিসাবে তাঁরা বে-ছ নিলেন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও তার ওপর মানসিক সুখ কতটা নির্ভরশীল, সেই ব্যাপারে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। বি-শষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষের আয় কতটা বেড়েছে এবং সেই অনুপাতে তাদের মানসিক সুখ শান্তি বেড়েছে কি না সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক সুখের সম্পর্ক:

প্রথমেই তাঁরা বেছে নিলেন জাপানকে। যদি দ্বিতীয় বিশ্বয-দ্ধর পরবর্তী কালের জাপানের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, অর্থ ও অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু যোগাড় করা যায় তার উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে রকেটের মত। ১৯৬০ ও ১৯৮০ সা-লর ম-ধ্য জাপানের গড় জাতীয় উৎপাদন (GDP) বেড়ে-ছ পাঁচ গুণ, যা সমগ্র পৃথিবীর ম-ধ্য সর্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নয়নের সর্বকালের রেকর্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানকে ধূলোয় শুইয়ে দিয়েছিল, আজ সেই জাপান এত ধনী হয়ে-ছ যে, গড়ে প্রত্যেক পরিবারের দু খানা করে গাড়ী আ-ছ। প্রত্যেক জাপানী প্রতি বছর বিদেশে বেড়াবার জন্য গড়ে ১০০০ ডলার (বা ৪৫,০০০ টাকা) খরচ করে। উন্নত ধরনের বিলাসবহুল গাড়ী, মূল্যবান ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসপত্র, ৫০ বছর আগে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আজ তা ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। লোকের আয়ও যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে খরচ। অথচ এই জাপানীদের মধ্যে কতজন সুখী, তার যদি -খাঁজ করা যায়, তবে দেখা যা-ব যে, গত ৫০ বছ-র সেই সংখ্যা তেমন বা-ড়নি। গত ১৯৯০ এর দশকে জাপানের সমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন জাপানীদের ম-ধ্য একটা সমীক্ষা চালানো হয়, তাদের মধ্যে কত জন সুখী তার মতামত নেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় যে, সুখী লোকের সংখ্যা ৫০ বছর আগেও যা ছিল, আজও তাই আ-ছ।

শুধু জাপানই নয়, বিগত ৫০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়াও প্রভূত আর্থিক উন্নতি করেছে। সেখানেও লোকের মতামত নিয়ে দেখা যায় যে, জাতীয় আয় ও মাথা পিছু আয় অনেক বেড়ে-ছ বটে, কিন্তু সুখী লোকের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি। বিগত ১৯৫০ সালে ন্যাশনাল **ওপিনিয়ন রিসার্চ সেন্টার** (National Opinion Research Center) নামে একটি সংস্থা সেই দেশের মানষের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায় যে, ''আমি খুব সুখী'', এমন লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। এর পরেও ওই সংস্থাটি কয়েক বছর পর পর একই সমীক্ষা চালাতে থা-ক। তাতে দেখা যায় যে, লোকের আয় দ্বিগুণ হলেও ''আমি খুব সুখী'' এমন কথা বলার মত লো-কর সংখ্যা মো-টও বাড়-ছ না।

ইংল্যান্ড ও ই-য়া-রা-পর ক্ষে-ত্রও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বিগত ৫০ বছ-র বৃ-ট-নর গড় জাতীয় উৎপাদন (বা জি ডি পি) ৩৪০ কোটি ডলার -থ-ক -ব-ড় ২০০০ কোটি ডলার হ-য়-ছ। কিন্তু সমীক্ষার ফ-ল দেখা যায় যে ''আমি খুব সুখী'' এমন কথা বলার মত লো-কর সংখ্যা ৭০-এর দশ-কও যা ছিল, আজও তাই আ-ছ। জার্মানী-ত **এ-লনবাক** (Allenbach) না-ম একটি সংস্থা মানু-ষর মতামত নি-য় দেখ-ত পায় যে, প্রায় ৫৭ শতাংশ মানুষ যা আ-ছ তা-তই সন্তুষ্ট। ৫০ বছর প-র ২০০১ সা-ল ওই সংস্থা আবার জনমত নি-য় দেখ-ত পায় -য, সুখী মানু-ষর সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ বে-ড় ৫৯ শতাংশ হ-য়-ছ। কা-জই বলা যায় যে, মানু-ষর প-ক-ট পয়সার ঝনঝনানি যত বাড়-ছ, মানু-ষর সু-খর মাত্রা তত বাড়-ছ না।

এ ব্যাপা-র মন্তব্য কর-ত গি-য় ডঃ এ-ডায়ার্ড ডিনার ব-লন, ''কথায় ব-ল, পয়সা দি-য় সুখ কেনা যায় কিন্তু শান্তি কেনা যায় না। কিন্তু আমরা কোটি কোটি মানুষ সেই সব কথায় কান না দি-য় শুধু টাকার পিছ-ন ছুটছি। বেশি টাকা রোজগা-রর জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করছি। কিন্ত যা কর-ল শান্তি পাওয়া যে-ত পা-র, প্রকৃত সুখ পাওয়া -য-ত পা-র, তার দি-ক নজর দিচ্ছি না। মানু-ষর স-ঙ্গ আত্মীয়তা করার, মানু-ষর জন্য কাজ করার, প-রর উপকার করার চেষ্টা করছি না। বিপ-দ আপ-দ মানুষ-ক সাহায্য করার অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করছি না।''

দারিদ্র্য মানু-ষর দুঃ-খর কারণ হয়, এটাই আমরা সর্বদা শু-ন আসছি। কিন্তু প্র-ফসর রাট ভিন-হা-ভন (Ruut Veenhoven) তাঁর গ-বষণার দ্বারা বিপরীত সিদ্ধা-ন্ত উপনীত হ-য়-ছন। Rotterdan-এ অবস্থিত **এরাসমাস** (Erasmus) বিশ্ববিদ্যাল-য়র এই অধ্যাপক দে-খ-ছন যে, যে গরিব দে-শ মানু-ষর আয় বছ-র ১০,০০০ ডলা-রর কম, তারা অসুখী। যে সব দে-শ মানু-ষর গড় আয় ১০,০০০ ডলা-রর বেশি, সেখা-ন মানু-ষর উপার্জন ও মানসিক শান্তির ম-ধ্য কোন সম্পর্ক নেই। সেই স-ঙ্গ স-ঙ্গ প্র-ফসর ভিন-হা-ভন এটাও লক্ষ্য ক-র-ছন যে, যে সব দে-শর মানুষ সম্প্রতি ধনী হ-য়-ছ, সেখা-ন চিত্রটা একটু অন্য রক-মর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, গত ২০০০ সা-ল তাইওয়া-ন একটা সমীক্ষা চালি-য় দেখা যায় সেখা-ন টাকা রোজগার ও মানসিক সুখ শান্তির একটা নিবিড় সম্পর্ক র-য়-ছ।

যাই হোক, সমাজ বিজ্ঞানী ও মনস্তাত্বিক বি-শষজ্ঞরা বিগত দু দশক ধ-র গ-বষণা চালি-য় এই সিদ্ধা-ন্ত উপনীত হ-য়-ছন যে, এক জন মানুষ কত টাকা উপার্জন ক-র এবং সেই ব্যক্তি নি-জ-ক কতটা সুখী ম-ন ক-র, তার ম-ধ্য তেমন কোন দৃঢ় সম্পর্ক নেই। গত ২০০৪ সা-ল আ-মরিকার **টাইম** (TIME) পত্রিকার তরফ থে-ক একটা সমীক্ষা চালা-না হয়। তা-ত দেখা যায় যে, বার্ষিক আয় ৫০,০০০ ডলার না হওয়া পর্যন্ত টাকা রোজগা-রর স-ঙ্গ স-ঙ্গ মানু-ষর সুখ বাড়-ত থা-ক। কিন্তু আয় তার থে-কও বেশি হ-ল সেই সম্পর্ক আর থা-ক না। আ-মরিকার **ইলিনয়** (Illinois) **বিশ্ববিদ্যাল-য়র** মনস্তত্ত্ববিদ

এ-ডায়ার্ড ডিনার (Edward Diener) বিখ্যাত **ফোর্বস** (FORBES) পত্রিকায় প্রকাশিত ৪০০ জন অতিশয় ধনী ব্যক্তির স-ঙ্গ কথাবার্তা ব-লন। এই কথাবার্তার মধ্য দি-য় তিনি দেখ-ত পান যে, ওই ৪০০ জ-নর ম-ধ্য অতি অল্প ক-য়ক জনই নি-জ-ক সুখী ব-ল ম-ন ক-রন। ইংল্যা-ন্ডর ব্রিস্ট-ল অবস্থিত **ও-য়স্ট ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যাল-য়র** অধ্যাপক ডাইলান এ-ভন্স (Dylan Evans) এব্যাপা-র মন্তব্য কর-ত গি-য় ব-লন, "We pursued economic development and we got it. But there is much more to happiness than financial security", অর্থাৎ এককা-ল আমরা আর্থিক উন্নতির পি-ছ ধাওয়া ক-রছি এবং তা করছিও। কিন্তু প্রকৃত সু-খর জন্য আর্থিক নিশ্চয়তা ছাড়াও অ-নক কিছুর প্র-য়াজন।

আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা:

যদিও এ কথা ঠিক যে, টাকা পয়সা মানসিক সু-খর নিশ্চয়তা দি-ত পা-র না। ত-ব টাকা পয়সা যে মানসিক সুখ-ক অ-নকটাই প্রভাবিত ক-র, তা-তও কোন স-ন্দহ নেই। টাকা পয়সার স-ঙ্গ মানসিক সু-খর সম্বন্ধ কতটা তা পরিমাপ কর-ত মনস্তাত্বিক বিজ্ঞানীরা ***আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা*** (reference anxiety) ব-ল একটা বি-শষ শব্দ ব্যবহার ক-রন। এর ব্যাখ্যা হিসা-ব বলা যায় যে, মানুষ নি-জর যা আ-ছ, সব সময় তার তুলনা ক-র অ-ন্যর বিষয় সম্পত্তির স-ঙ্গ। এই কার-ণ -য সমা-জ ধনী ও দরি-দ্রর ম-ধ্য ব্যবধান যত বেশি, সেই সমা-জ উপরি উক্ত *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* -ও তত বেশি।

এ ব্যাপা-র আ-মরিকার কথা বলা যে-ত পা-র। এক কা-ল সেখা-ন বেশির ভাগ মানুষ বাস করত ছোট ছোট শহ-র, যেখা-ন বেশির ভাগ মানু-ষর উপার্জন ছিল প্রায় একই রকম। তাই সেখা-ন *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* -ও ছিল কম। কিন্তু বিগত ক-য়ক দশ-কর ম-ধ্য নব্য অর্থনীতি চিত্রটা-ক অ-নকটা পা-ল্ট দি-য়-ছ। স-র্বোচ্চ স্থা-ন ৫ শতাং-শর মত পরিবার অতিরিক্ত ধনী-ত পরিণত হ-য়-ছ। ফ-ল অন্যান্য বা মধ্যবিত্ত-দর থে-ক তা-দর তফাৎ অ-নক বে-ড় গি-য়-ছ। স-ঙ্গ স-ঙ্গ *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* ও অ-নক বে-ড় গি-য়-ছ।

এই মুষ্টি-ময় কিছু লো-করা বড় বড় বাড়ি-ত বসবাস, অ-নক প্রাচুর্য ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন, য-থচ্ছ খরচ করার প্রবৃত্তি, দামী দামী পোষাক-আশা-কর বাবুগিরি ইত্যাদি মধ্যবিত্ত-দর ম-ধ্য *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* বাড়ি-য় তুল-ছ, যদিও তা-দর জীবন যাত্রাও কম প্রাচুর্যপূর্ণ নয়। পক্ষান্ত-র স্ক্যান্ডি-নভিয়ার মত দেশ, যেখা-ন সক-লই অ-নক -বশি উপার্জন ক-র, সেখা-ন এই *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* অ-নক কম। এই কার-ণ সুখী লো-কর সংখ্যাও সেখা-ন অ-নক বেশি। কিন্তু আ-মরিকার মত যেখা-ন মানু-ষর আ-য়র প্র-ভদ বেশি, সেখা-ন *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* -ও বেশি এবং সুখী লো-কর সংখ্যাও কম।

ডঃ এডওয়ার্ড ডিনার

এখা-ন লক্ষ্য করার বিষয় হোল, যে অর্থ মানুষ-ক সুখী করার জন্য অপরিহার্য, সেই অর্থই আবার মানু-ষর ম-ধ্য অতৃপ্তি ও সুখহীনতার জন্ম দেয়। মানু-ষর রোজগার যত বাড়-ত থা-ক, সেই স-ঙ্গ স-ঙ্গ বাড়-ত থা-ক তার ভো-গর ইচ্ছা। মানুষ যখন আর্থিক সিঁড়ি বে-য় ওপ-র উঠ-ত থা-ক, তখন একটা পর্যা-য় উ-ঠ সে ভু-ল যায় যে, যাত্রা শুরু করার সময় সে কোন্ পর্যা-য় ছিল। পক্ষান্ত-র সে তখন ভাব-ত থা-ক যে, ক-ব সে আ-রা ওপ-র উঠ-ব। যখন মানুষ দুখানা ঘ-রর ফ্ল্যাট-এ থা-ক, তখন সে ভা-ব তিন কামরার ফ্ল্যাট-এ সে ক-ব যে-ত পার-ব। যেই সে তিন কামরার ফ্ল্যাট-এ থাকার সু-যাগ পেল, তখন সে ভা-ব না যে, এক কা-ল সে দু কামরার ফ্ল্যাট-এ ছিল। পক্ষান্ত-র সে তখন ভাব-ত থা-ক -য, ক-ব সে চার কামরার ফ্ল্যাট কিন-ত পার-ব।

ব্যাপারটা আ-রা ব্যাখ্যা কর-ত তিনি ব-লন, "আ-মরিকার গরিব-দর ম-ন আশা আ-ছ যে, এক দিন তারাও ধনী হ-য় যে-ত পা-র। কিন্তু ই-য়া-রা-পর গরিব-দর ম-ধ্য এ রকম চিন্তার কোন স্থান -নই। কারণ তারা জা-ন যে, তা-দর সাম-ন বড়-লাক হবার প-থ যে বাধা আ-ছ তা অতিক্রম করা অসাধ্য। তারা জা-ন যে, চিরকাল তারা নী-চর তলা-তই প-ড় থাক-ব। কোন দিনই তারা ওপর তলা-ত যে-ত পার-ব না।"

এশিয়ার গরিবরাও ভা-ব যে, এক দিন তারাও বড়-লাক ব-ন যে-ত পা-র, বা চেষ্টা কর-ল এক জন লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল হ-য় যে-ত পা-র। তাই তা-দর ম-ধ্য *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* -ও কম। এবং সেই কার-ণ তারা বেশি সুখী। এ সব ব্যাপা-র মন্তব্য কর-ত গি-য় **ওয়াশিংটন (ডি সি)**র **ব্রুকিংস্ ইনস্টিটিউশন** (Brookings Institution)-এর অর্থনীতির অধ্যাপক ক্যারল গ্রাহাম (Carol Graham) ব-লন, "মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবন নি-য় অ-নক বেশি চিন্তিত। তাই বর্তমান অবস্থার ওপর তার সুখ শান্তি বেশি নির্ভরশীল নয়। ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হ-ব, তার ওপর তার সুখশান্তি অ-নক বেশি নির্ভরশীল।" তিনি আরও ব-লন, "ধরা যাক, দু জন লো-কর ম-ধ্য এক জ-নর আয় বছ-র ৫০,০০০ ডলার এবং ভবিষ্য-ত তার আয় ১০ শতাংশ হা-র বাড়ার সম্ভাবনা আ-ছ। অন্য জ-নর আয় বছ-র ১,৫০,০০০ ডলার, কিন্তু আয় বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সক-লই স্বীকার কর-বন যে, আর্থিক দিক দি-য় দ্বিতীয় ব্যক্তি অ-নক বেশি সচ্ছল। কিন্তু প্রশ্ন কর-ল দেখা যা-ব যে, মানসিক দিক দি-য় প্রথম ব্যক্তি অ-নক বেশি সুখী।"

মানু-ষর আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তার মানসিকতা-ক কতটা প্রভাবিত ক-র, তা আরও এক ভা-ব দেখা চল-ত পা-র। আ-মরিকার মধ্যবিত্তরা এখন যা আয় ক-র তা আ-গ ছিল চিন্তার অতীত। কিন্তু ১৯৮৪ সা-লর পর -থ-ক আজ পর্যন্ত তা-দর আয় বে-ড়-ছ প্রায় ১৫ শতাংশ। তা ছাড়া ভবিষ্য-তও আয় বাড়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। তাই তারা সবাই অসুখী। কিন্তু ওই একই সম-য় জাপানী-দর আয় বে-ড়-ছ ক-য়ক গুণ। তাই আ-মরিকান-দর তুলনায় জাপানীরা বেশি সুখী।

পাশ্চা-ত্যর তথাকথিত উন্নত দেশগু-লা-ত দ্বিতীয় বিশ্বযু-দ্ধর পরবর্তী সম-য় জীবনযাত্রার ও শিক্ষার মান হঠাৎ এত বে-ড় গি-য়-ছ যে, সেখা-ন উন্নতির আর তেমন কোন সু-যাগ -নই। তারা -মাটামুটি ভা-ব একটা স্থিতাবস্থায় পৌঁ-ছ গি-য়-ছ। সাম-ন তেমন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত-নরও আশা নেই। তাই সেই উন্নতিই তা-দর মানসিক বিষণ্ণতার অন্যতম কারণ হিসা-ব দেখা দি-য়-ছ। প্রাচু-র্যর ম-ধ্য দারিদ্র্য আজ এক কঠিন বাস্তব। অতি দরিদ্র মানু-ষর ম-ধ্যও *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* তার কাজ ক-র চ-ল-ছ। কলকাতা ও ক্যালিফর্নিয়ার গৃহহীন-দর ম-ধ্য সমীক্ষা চালি-য় দেখা গি-য়-ছ যে, কলকাতার গৃহহীনরা আ-মরিকার গৃহহীন-দর থে-ক বেশি সুখী।

এ ব্যাপা-র মন্তব্য কর-ত গি-য় বৃ-ট-নর **নিউ ইকনমিক ফাউ-ন্ডশন** (New Economic Foundation)-এর প্রোগ্রাম ডি-রক্টর (Program Director) শ্রী হি-তন শাহ্ ব-লন আ-মরিকার গরিবরা নি-জ-দর তুলনা ক-র আ-মরিকার ধনকু-বর-দর স-ঙ্গ। তাই তা-দর ম-ধ্য *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* -র পরিমাণ অ-নক বেশি। তাই তারা বেশি অখুসী। পক্ষান্ত-র ভার-ত ধনী গরি-বর বৈষম্য তত বেশি নয় ব-ল ভার-তর গরিব-দর ম-ধ্য *আ-পক্ষিক-দুশ্চিন্তা* কম। সেই কার-ণ তা-দর ম-ধ্য হতাশাও কম।

যাই হোক, পাশ্চা-ত্যর ম-নাবিজ্ঞানী-দর উপরিউক্ত আ-লাচনা ও বিচার বি-শ্লষ-ণর মধ্য দি-য় যে সারমর্ম বেরি-য় এ-স-ছ তা হল এই যে, শুধু দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সু-খর প্রাচুর্য মানুষ-ক সুখী কর-ত পা-র না। মানুষ-ক সুখী কর-ত হ-ল দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সু-খর বহির্ভূত অন্য কিছুর প্র-য়াজন আ-ছ।

ব্যতিক্রমী ফিলিপাইনস:

কোন ব্যক্তিবি-শষ-ক জিজ্ঞাসাবাদ ক-র জানা সম্ভব যে তিনি কতটা সুখী। তেমনি কোন একটা দে-শর বিভিন্ন আর্থিক স্ত-রর লোকজন-ক বিচ্ছিন্নভা-ব জিজ্ঞাসাবাদ ক-র সেই দে-শর মানু-ষর গড় সু-খর মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব। আ-মরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যাল-য় (University of Michigan)-এর অন্তর্গত **বিশ্ব গুণমান সংস্থা** (Worid Values Survey) গত ২০০৪ সা-লর মে মা-স ৮২টা দে-শর ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। ওই বছ-রর ন-ভম্বর মা-স সেই সমীক্ষার রি-পার্ট প্রকাশিত হয়। ওই রি-পা-র্ট একটা অতিশয় আশ্চর্যজনক ফলাফল দেখা গি-য়-ছ। দেখা গি-য়-ছ যে, ফিলিপাইন-সর লো-করা অন্যান্য অ-নক দে-শর লো-কর চাই-ত অ-নক বেশি সুখী। তারা তাইওয়ান, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মত ধনী দেশগু-লার মানুষ-দর চাই-তও সুখী। গত ২০০৫ সা-ল হংকং-এর একটি বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষ থে-ক ওই একই সমীক্ষা চালা-না হয়। সেই সমীক্ষা-তও বলা হয় যে, ফিলিপাই-নর লো-করা চীন, জাপান, দঃ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মাল-য়শিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপু-রর মত অধিকতর সমৃদ্ধ দেশগু-লার লোক-দর ম-ধ্য সর্বা-পক্ষা সুখী।

অথচ ফিলিপাইনস-ক পৃথিবীর একটি দরিদ্র দেশ ব-লই সক-ল জা-ন। সেখা-ন যেমন র-য়-ছ দারিদ্র্য, তেমনি র-য়-ছ রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতা এবং পরি-বশ দূষণ। তা ছাড়া সেখা-ন ভূমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণী ঝড়, অতিবৃষ্টি ও বন্যা এবং আ-গ্নয়গিরির অগ্ন্যুৎপা-তর মত প্রাকৃতিক দু-র্যাগ লে-গই আ-ছ। তাই বেলজিয়া-মর ব্রা-সলস্ অবস্থিত **সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এপি-ড-মালজি অফ ডিসাস্টার্স** (Center for Research and Epidemiology of Disasters) নামক সংস্থার ম-ত ফিলিপাইন হল পৃথিবীর ম-ধ্য সর্বা-পক্ষা দু-র্যাগপ্রবণ দেশ। তা স-ত্ত্বও সেখানকার মানু-ষর মু-খ হাসি লে-গই আ-ছ এবং তারা জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মত ধনী দেশগু-লার মানুষ-দর চাই-তও অ-নক বেশি হাসিখুশী। গত ২০০৪ সা-লর ক্রিসমাস সেখা-ন খুবই দু-র্যাগপূর্ণ আবহাওয়ার ম-ধ্য কে-ট-ছ। তা স-ত্ত্বও, উপরিউক্ত সমীক্ষাকারী সংস্থার লোকজন যখন তা-দর স-ঙ্গ কথাবার্তা বল-ত গি-য়-ছ, তখন তারা হাসি মু-খই তা-দর প্র-শ্নর জবাব দি-য়-ছ। দশ জ-নর ম-ধ্য আট জনই ব-ল-ছ, এবার আনন্দ কর-ত পারিনি তা-ত

কি হ-য়-ছ। সাম-নর বার নিশ্চয়ই এত খারাপ আবহাওয়া থাক-ব না। তখন চুটি-য় আনন্দ কর-বা।

কোন বৈষয়িক সমৃদ্ধি ফিলিপিনবাসী-দর এই সু-খর ভিত্তি নয়। এটা তা-দর সমা-জর ম-ধ্যই নিহিত র-য়-ছ। বেশ ক-য়ক বছর আ-গ উপরিউক্ত সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এপি-ড-মালজি অফ ডিসাস্টার্স -এর এক জন কার্যকর্তা শ্রী এ সি -নলসন (A C Nielson) এ ব্যাপা-র কথাবার্তা বলার জন্য ফিলিপিন-স গি-য়ছি-লন। প্রথ-ম তারা তাঁ-ক তা-দর অ-নক দুঃ-খর কথা বলল। তা-দর নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য ও রোগব্যাধির কথা, সামাজিক বঞ্চনার কথা, ধনী দরি-দ্রর বৈষ-ম্যর কথা, সবই বলল। কিন্তু যখন তিনি তাঁর শেষ প্রশ্ন কর-লন, বল-লন যে তোমরা কেমন আছ ? তখন সক-ল সমস্ব-র ব-ল উঠল, আমরা সবাই ভাল আছি। ফিলিপি-নারা তা-দর নি-জ-দর ব-ল **মাবাবাওয়াং কালিগয়াহান** বা অ-ল্প তুষ্ট। কা-জই বুঝ-ত অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যারা অ-ল্প তুষ্ট তারা অবশ্যই সুখী। জগ-তর অন্যান্য দে-শর লো-ক-দর কা-ছ সুখ হল অন্তিম লক্ষ্য। কিন্তু ফিলিপি-না-দর কা-ছ শত দুঃ-খর ম-ধ্যও হাসিখুশী থাকা হল তা-দর জীবনধার-ণর অঙ্গ। হাসি তামাশা হল তা-দর জীবন সংগ্রা-মর একটা হাতিয়ার।

ডঃ মার্টিন সেলিগম্যান

সুখী হবার মার্কসীয় বিধান :

পাশ্চাত্য চিরকাল বৈষয়িক উন্নতি-কই সু-খর উৎস ব-ল চিহ্নিত ক-র এ-স-ছ। কা-জই জার্মানীর পন্ডিত মার্কস যে ওই একই প-থর পথিক হ-বন তা-ত আর আশ্চর্য কি ! মার্ক-সর ম-ত টাকা পয়সাই সব। টাকা পয়সাই মানুষ-ক নিয়ন্ত্রণ ক-র। মানু-ষর হা-ত য-থষ্ট টাকা পয়সার যোগান দি-ত পার-লই মানুষ সুখী হ-ব। মার্কসীয় ত-ত্ত্ব মানব ম-নর সূক্ষ্ম অনুভূতি বা হৃদয় বৃত্তির কোন মূল্য নেই। তাই এই তত্ত্ব অনুসা-র বাবা মা-য়র স্নেহ ভালবাসা, নর নারীর ম-ধ্য প্রেম ভালবাসা, ঈশ্বর চিন্তা বা ঈশ্বর প্রেম, ইত্যাদি সব কিছুই টাকা পয়সার ওপর নির্ভরশীল। মানুষ হল উৎপাদ-নর একটা যন্ত্র বি-শষ। মানুষ, তা কৃষি-তই হোক আর শি-ল্পই হোক, উৎপাদন কর-ব এবং তার পরিশ্র-মর ন্যায্য মজুরি পা-ব। সেই টাকা দি-য় -স খা-ব-দা-ব আর সু-খ থাক-ব।

কিন্তু মানুষ এখন সুখী হ-ত পার-ছ না কেন ? কারণ সমা-জর কিছু স্বার্থপর লোক তা-দর ন্যায্য মজুরি থে-ক বঞ্চিত কর-ছ। যারা উৎপাদন কর-ছ তা-দর ন্যায্য পাওনার মোটা অংশ ওই স্বার্থপর লো-করা আত্মসাৎ কর-ছ। যারা উৎপাদন কর-ছ তা-দর ঠকা-চ্ছ। এই ঠকা-নাটা যদি বন্ধ করা যায় এবং যারা উৎপাদন কর-ছ তা-দর হা-ত যদি তা-দর ন্যায্য মজুরি তু-ল দেওয়া যায়, তা হ-ল আর দুঃখ থাক-ব না। সব মানুষ সুখী হ-ব। এরই নাম হল মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। মার্ক-সর এই তত্ত্ব প্রকাশিত হ-ল পাশ্চা-ত্যর পন্ডিতরা লাফি-য় উঠ-লন, বল-লন এটাই মানব জাতির মুক্তির পথ।

কিন্তু আজ এটা সক-লরই জানা আ-ছ যে, এক শত বছর যে-ত না যে-ত এমন সা-ধর মার্কসবাদী তত্ত্ব কা-লর গ-র্ভ বিলীন হ-য় গেল। কারণ মানু-ষর বাক-স্বাধীনতা, মত প্রকা-শর স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ইত্যাদি সর্বপ্রকার স্বাধীনতা-ক হরণ ক-র, সমগ্র দেশ-ক জেলখানায় পরিণত ক-র যে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, মানুষই তা-ক ভে-ঙ ফেলল। ফ-ল এটাই প্রমাণিত হল যে, শুধু দৈহিক ও ইন্দ্রিয়-সুখ মানুষ-ক সুখী কর-ত পা-র না।

হিন্দু ঋষিরাই জান-তন মানুষ-ক সুখী করার উপায়:

যেসব পাশ্চাত্য পন্ডিত-দর দৃঢ় বিশ্বাস যে, শুধু দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সু-খর প্রাচুর্যই মানুষ-ক সুখী কর-ত সক্ষম, তাঁ-দর কা-ছ ফিলিপাইনবাসী-দর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যে অতীব বিস্ময়কর তা বলাই বাহুল্য। কারণ হল, এই ব্যতিক্র-মর উৎস কোথায় তা পাশ্চা-ত্যর শা-স্ত্র অনুপস্থিত। যদিও ফিলিপাইনবাসীরা ব-ল-ছ যে, তা-দর সু-খর উৎস হল **মাবাবাওয়াং কালিগয়াহান** বা অ-ল্প তুষ্টি, তবুও পাশ্চা-ত্যর পন্ডিতরা তা অনুধাবন কর-ত পে-র-ছন কি না, তা ঘোর স-ন্দ-হর বিষয়। কিন্তু যিনি ভার-তর হিন্দু শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন ক-র-ছন, তিনি ব-ল উঠ-বন যে, হ্যা এ-কই তো হিন্দু শা-স্ত্র ধৃতি বলা হ-য়-ছ। ধ-র্মর দশ লক্ষণ বর্ণনা কর-ত মনুসংহিতা বল-ছ -

ধৃতিঃ ক্ষমা দ-মাহ-স্তয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যম-ক্রো-ধা দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ (৬ : ৯২)

কা-জই, হিন্দু শা-স্ত্র ধ-র্মর যে দশটি লক্ষ-ণর কথা বলা হ-য়-ছ, তার প্রথম লক্ষণই হল ধৃতি বা স-ন্তোষ, বা অ-ল্প তুষ্টি।

কিন্তু এ সব কথা পাশ্চা-ত্যর পন্ডিতরা বুঝ-বন কেমন ক-র ! ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ হল দেহসর্বস্ব এবং দৈহিক সুখই (pleasure) সেখা-ন সু-খর পরাকাষ্ঠা। অ্যারিস্টট-লর ম-ত দৈহিক সুখই উত্তম, তাই সেই দৈহিক সুখই সব মানু-ষর অন্তিম লক্ষ্য। দার্শনিক Locke-এর ম-ত ভাল-মন্দ বিচার করার

মাপকাঠি হওয়া উচিত দৈহিক সুখ ও দৈহিক যন্ত্রণা। যা কিছু সুখ দেয় তাই উত্তম আর যা কিছু যন্ত্রণা বা কষ্ট দেয় তাই মন্দ। প্রকৃতপ-ক্ষ পাশ্চা-ত্যর এই সুখ ও যন্ত্রনার উৎস হল বাই-বল। কারণ তা-ত আ-ছ যারা যীশুর শরণ নে-ব তারা হল পুণ্যাত্মা। শেষ বিচা-রর দিন গড এই পুণ্যাত্মা-দর স্ব-র্গর সুখ-ভাগ দে-বন আর অ-খ্রিস্টান হি-দন-দর নর-কর যন্ত্রণা দে-বন। কা-জই ওই পবিত্র গ্রন্থানুসরণকারী কারও প-ক্ষই দৈহিক সু-খর উপ-র আর কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই দার্শনিক Bentham -এর মত হল, দৈহিক সুখই ভাল এবং দৈহিক সুখই মানুষ-ক ন্যা-য়র প-থ চালিত কর-ত সক্ষম এবং গণত-ন্ত্রর উ-দ্দশ্যই হল বেশি বেশি মানু-ষর জন্য বেশি বেশি দৈহিক সু-খর ব্যবস্থা করা।

ঠিক একই ভা-ব J S Mill-এর মত হল "Pleasure is the only thing desired: therefore pleasure is the only thing desirable" -অর্থাৎ, একমাত্র দৈহিক সুখই কাম্য, তাই একমাত্র দৈহিক সু-খরই কামনা কর-ত হ-ব। কিন্তু ম-ন অশান্তি ও উৎকণ্ঠা থাক-ল শুধু দৈহিক ভো-গর উপকরণ মানুষ-ক সুখ দি-ত পা-র কি ? একজন ফাঁসীর আসামী-ক যতই ভাল খাদ্য-বস্ত্র দেওয়া হোক না কেন, তা-ত সে সুখ পে-ত পা-র কি ? আ-গই বলা হ-য়-ছ যে, ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ সু-খর পরিমাপ ক-র কে কত টাকা উপার্জন ক-র তার ওপর। কিন্তু এটা সু-খর প্রকৃত মানদন্ড কি ? যদি তাই হয় ত-ব একজন আ-মরিকাবাসীর আয় আমা-দর থে-ক ৬৩ গুণ বেশি হওয়া স-ত্ত্বও সেখা-ন মানসিক রুগীর সংখ্যা সব থে-ক বেশি কেন ? সেখা-ন আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্র-চষ্টার ঘটনা সর্বাধিক কেন ? সেখানকার মানুষ সব -থ-ক বেশি ঘু-মর বড়ি খায় কেন ? গভীর নিদ্রা সেখা-ন দুর্লভ বস্তু কেন ? যে সত্য আবিষ্কার কর-ত পাশ্চা-ত্যর দার্শনিক-দর আ-রা ক-য়ক শত বা ক-য়ক হাজার বছর অন্ধকা-র পথ হাৎড়া-ত হ-ব, বহু আ-গ ভার-তর ঋষিরা সেই সত্য আবিষ্কার ক-র জগদ্বাসী-ক শুনি-য় গি-য়-ছন।

তাঁরা ব-ল গি-য়-ছন, দৈহিক সুখ হল ক্ষণস্থায়ী। আজ সুখ আ-ছ, কাল সুখ নেই। তাই তাঁরা নিরন্তর বা স্থায়ী সু-খর অ-ন্বষণ ক-র-ছন এবং তা আবিষ্কারও ক-র রে-খ গি-য়-ছন। তাঁরা ব-ল গি-য়-ছন যে, ভো-গর মধ্য দি-য় সেই স্থায়ী সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভো-গর দ্বারা কামনার তৃপ্তি হয় না। বরং ভো-গর দ্বারা সেই কামনা অগ্নি-ত ঘৃতাহুতির মতই বৃদ্ধি পে-ত থা-ক। তাই তাঁরা ব-ল গি-য়-ছন, ভোগ নয়, ত্যা-গর মধ্য দি-য়ই সেই সুখ লাভ করা সম্ভব। ভো-গ সুখ -নই, ত্যা-গই সুখ বা "**ত্যাগাৎ** সুখমনন্তরম্" অথবা "**তেন ত্য-ক্তন ভুঞ্জীথা**"।

নীলনদের তীরে

এষা দে

গগনচুম্বী বহুতল অট্টালিকায় একটি পায়রার খোপ ফ্ল্যাট। এটি কিনতেই উপার্জনশীল দুই বোন এবং মায়ের জিভ বেরিয়ে গেছে। কায়রোয় এমন দাম বাড়িঘরের। ভাগ্যে গ্রীষ্মে ট্যুরিস্ট আগমনে ভাঁটা। ফতিমা খানিকটা অবসর পায়। বি এ পাশ করে আর্কিওলজিতে ডিপ্লোমা করায় একটা পর্যটন সংস্থায় চাকরি জুটেছে। মিশরে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা ট্যুরিজম। সব বিদেশী ট্যুরিস্ট।

তারা দেখতে আসে পুরাকালের অর্থাৎ ফারাও যুগের অতিকায় সব কীর্তি। নির্মাতারাও ছিলেন অতিমানব। কী সব অদ্ভুত নাম— রামেসিস, তুথমোসিস। রাণীদেরও — নেফের টিটি, হাটশেপসুট। আরবী নাম তো নয়। এ মাটির নিজস্ব। যেমন নিজস্ব তাদের ধর্ম, দেব-দেবী— অসিরিস আইসিস, আমুন, রা আরও কত। খুব ভালো লাগে ফতিমার, যদিও জানে ইসলামে এঁরা অপাংক্তেয়। মাথা থেকে হিজাবটা, গায়ের পুরোহাতা ব্লাউজ, ওপরে হাতকাটা টিউনিক, তলার জিন্‌স— সব খুলে ফেলে চেলো কাফতান গলিয়ে ফতিমা লিখতে বসে। এটা তার বড় শখের কাজ। কয়েক মুহূর্তে সে চলে যায় অন্য এক সময়ে। বিচিত্র এক সভ্যতায়।

★ ★ ★

নীল নদের তীরে সবুজের সমারোহ। সুরম্য এমোদের সংলগ্ন উদ্যানে। কত ছায়াতরু, ফলন্ত বৃক্ষ, জলাশয়, লতাবিতান। পুষ্পিত রক্তকরবীর ঝোপের মধ্যে একটি নধরকান্তি সিংহশাবককে নিয়ে আধশোওয়া এক কিশোরী। শাবকটির গলায় এক হাত জড়ানো। অন্য হাতে তার কানের পাশে পেটের তলায় সুড়সুড়ি দেওয়া চলছে। আদরে আরামে চোখ বন্ধ খুদে সিংহের।

— 'হাটশেপসুট, আবার তুমি খাঁচা থেকে এটাকে বের করে এনেছ! কতবার বারণ করা হয়েছে। হিংস্র জানোয়ার নিয়ে খেলবে না।'

শাবকটি কোলে নিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। মাতার ক্রুদ্ধ তিরস্কার যেন শোনেইনি এমন ভাব। পাশে দাঁড়ানো পুরুষটির কাছে গিয়ে শুরু করে— 'দেখুন পিতা, কেমন ঘন লোম, চোখদুটি কী সুন্দর পিঙ্গলবর্ণ।'

— 'হিংস্র জন্তুকে ভয় করে না তোমার?' স্মিতমুখ পিতার প্রশ্ন।

— 'ভয় করবে কেন? ও তো আমার পোষা।'

— 'সিংহ কি কখনও মানুষের পোষ মানে? এখনই ওর দাঁত-নখে যথেষ্ট ধার। যদি আক্রমণ করত?'

— 'তাহলে এটা দিয়ে শাসন করতাম, বিদ্যুৎগতিতে ঝোপের পাশে রাখা মুষলটি হাতে তুলে নিয়ে কিশোরীর উত্তর।

— 'দেখুন, দেব আপনি নিজেই দেখুন। একেবারে পুরুষের মতো স্বভাব।' মায়ের অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। ভ্রাতাদের সঙ্গেই শুধু খেলাধুলা, মন সারাক্ষণ পুরুষোচিত কাজকর্মে, নারীর শিক্ষণীয় আচার-আচরণ, সাজসজ্জা, নৃত্যগীতে একেবারে আগ্রহ নেই। সকালে যে নতুন হাঁসুলিটি পরিয়ে দেওয়া হল, সেটি কই! আবার হারিয়েছে।

— 'মোটেই হারাইনি। এই তো আছে।' সিংহশাবকটির গলার তলা থেকে হাত সরিয়ে দেখায় ঝুলছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রত্নখচিত স্বর্ণালংকার। পশুটির ঘাড়ের লোমে ঢাকা তার সরু সোনার চেনটি।

— 'হা হা হা। সিংহের গলায় মণিহার! ফারাওকন্যা ছাড়া এমন শখ আর কার!' পিতার হাসিতে উৎসাহিত হাটশেপসুট সিংহশাবকটিকে দু'হাতে তুলে ধরে দোলাতে থাকে। এর মধ্যে এসে গেছে তার ধাত্রী দামী সহচরীরা। সঙ্গে বর্মরমুহাতে পশুরক্ষী।

— 'রাজকুমারী, আমাদের কিছু না বলে ওকে নিয়ে আপনি বাগানে! একি করেছেন জামাকাপড়ে চুলে মাটি ঘাস সব লেগে গেছে। চলুন চলুন বেশভূষা বদলাবেন। আজ না সন্ধ্যায় পিতামাতাকে আপনার নতুন শেখা নাচটি দেখাবার কথা! নিন হারটা ওর গলা থেকে খুলুন।'

পশুটিকে সরিয়ে নিয়ে যায় তার রক্ষী। পিতার দিকে এক ঝলক অভিমানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাটশেপসুটের প্রস্থান। সদলে।

উদ্যানে বিচরণ করছেন পট্টমহিষীর সঙ্গে ১৮শ রাজবংশের কীর্তিমান ফারাও ১ম তুথমোসিস। মহারানীর মুখ অপ্রসন্ন।

— 'দেব! আপনার প্রশ্রয়েই এমন নারীধর্মবিরোধী হয়ে উঠছে রাজকুমারী।'

— 'ও যদি কন্যা না হয়ে পুত্র হত! এত সাহস এত তেজ সব বৃথা যাবে!'

মহারানী বিস্মিত। — 'সেকি কথা প্রভু! কন্যা ফারাও পরিবারে পরম আদরণীয়া। তারই গর্ভে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্ম। বিশ্বে অতুলনীয় আমাদের সভ্যতা। যার জনক দেব অসিরিস। তাঁর ভগিনী ও পত্নী দেবী আইসিস নারীদের আদর্শ। বহু হাজার বছরের বিশেষ প্রথা ভ্রাতা-ভগিনী বিবাহ।'

— 'সে তো ঠিক। কিন্তু আমার হাটশেপসুটের যোগ্য কোন ভ্রাতা? এই ১৩ বছর বয়সে তার দেবদেবীদের মাহাত্ম্য সব জানা। দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ। আর রাজকুমাররা? জ্যেষ্ঠ কাব্য নিয়ে ব্যস্ত, মধ্যম বন্যজন্তু শিকারে আর কনিষ্ঠের কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই। শুধু বিলাসব্যসন। এখন সংকটের সময়। এই তো এশিয়া থেকে বিদেশী বর্বরেরা নীলনদের পুরো ব-দ্বীপ দখল করে লোকালয় দেবালয় সব ছারখার করে দিয়েছিল। বহু কষ্টে তাদের বিতাড়িত করে স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পট্টদেবী, তুমি কি জানো না, দেশে এখন শক্তিশালী শাসক একান্ত প্রয়োজন?'

নীলনদের পশ্চিমে দূরে মরুভূমিতে এখন সূর্যাস্ত। প্রভাত থেকে সারাদিন আকাশে যাত্রা করে এবারে পাতালে প্রবেশ করবেন সূর্যদেব। এমন সময় তাঁর কানে এল তাঁরই দেবাংশে জাত কৃষ্ণভূমির রাজস্থিতি ফারাও-এর

খেদোক্তি। অতঃপর অতি দ্রুত সংঘঠিত অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী। মস্তিষ্কের প্রদাহে অকস্মাৎ জীবনাবসান জ্যেষ্ঠ কুমারের। মধ্যমের বনে দুর্ঘটনায়। অতএব সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কনিষ্ঠ, যাঁর নাম হল ২য় তুথমোসিস। তাঁরই সঙ্গে বিবাহ পিতার আদরিণী কন্যা হাটশেপসুটের যথাকালে ফারাও হলেন ২য় তুথমোসিস। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর রাজত্বের পরই তাঁরও মৃত্যু। বিধবা পট্টমহিষী হাটশেপসুট একটি মাত্র কন্যাসন্তানের জননী। স্বামীর অপ্রধান এক পত্নীর গর্ভজাত শিশুপুত্রকে ৩য় তুথমোসিস ঘোষণা করলেন।

★ ★ ★

— 'তুমি তো দফতর থেকে ফিরেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলে। আজকে বাজারের দিন, খেয়াল আছে?' আর্থারাইটিসে মায়ের চলাফেরা কষ্টকর। কোনওমতে রান্নাবান্না সংসার করেন।

— 'আজকে বাজার তো হাসিনার করার কথা। এসে যাবে।'

— 'তিনি তো আবার মিটিং-মিছিল করা সংগ্রামী। স্কুলের শেষে কত কাজ তাঁর। এদিকে আজ মাংস আনার দিন। কখন রাঁধব?'

— 'মাছ বললেই পারতে। তাড়াতাড়ি হত। তোমারও পরিশ্রম কম।'

— 'মাছের দাম খেয়াল আছে? দেশটা তো শুধু বড়লোক আর ট্যুরিস্টদের। যা দর সব জিনিসপত্রের! তোদের দু'জনের রোজগার আমার পেনশন, তাতেও টায়েটোয়ে চলে। আর এদিকে তোদের বাপ, বুড়ি বিবিকে তালাক দিয়ে মেয়ের বয়সী একটাকে নিয়ে ঘর বেঁধে ফূর্তি করছে। আল্লাহ এত অবিচার—'

— 'সেসব কথা থাক না। অনেক তো বলেছ।'

শিক্ষিকা মা অনেক কষ্টে তাদের দুই বোনকে মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী বাবা ভালোবেসে মাকে বিয়ে করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন আধুনিক। বিয়ের পর মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন। ফতিমা ভাবে মিশরে মেয়েদের নিয়তি এই। যতই লেখাপড়া শেখো, রোজগারে বেরোও, ক্ষমতা শুধু পুরুষদের। তাই সে এ মাটির প্রাচীন ইতিহাস খোঁজে— 'কখনও কী নারী ক্ষমতাময়ী ছিলেন না?'

★ ★ ★

এই নাটকের এবারে যবনিকা উত্তোলন এক প্রভাতে। স্নানাদি সেরে হাটশেপসুট প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র সভাকক্ষে। সামনে সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রবীণ মহামাত্য। যথাবিহিত সম্মান নিবেদনের পর বললেন— 'মহাদেবী, লোকান্তরিত ২য় তুথমোসিসের সাধারণ এক পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে আপনি অগ্রণী হয়ে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপনার বিচক্ষণতায় রাজ্যে গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা দূরীভূত। আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অধিকারিণী।'

উত্তরে হাটশেপসুটের সামান্য মস্তক হেলন। মহামাত্য আবার শুরু করেন— 'কতগুলি জরুরি কাজ আটকে আছে। আপনার অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রথমবার, তাই একটু স্বাক্ষর চাই।' একখণ্ড প্যাপিরাস কাগজ মেলে ধরেন।— 'এইখানে সই লাগবে।' হাত তুলে মহামাত্যকে অগ্রসর হতে বারণ করেন হাটশেপসুট। তাঁর মুখ গম্ভীর।

— 'হঠাৎ করে কোনও বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া যায় না। আপনি সময় নিয়ে এসে আগে বিশদ আলোচনা করুন।'

মহামাত্য হতচকিত। কিঞ্চিত বিরক্ত। — 'অপরাধ নেবেন না মহাদেবী। আপনার প্রয়াত স্বামী রাজ্য শাসনের নীতি নির্ধারণ থেকে প্রতিদিনের কার্যনির্বাহের দায়িত্ব, সবই আমাদের মতো অভিজ্ঞ বয়স্কদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ৩য় তুথমোসিস নাবালক। বিধবা পট্টমহিষী আপনি তাঁর অভিভাবকমাত্র। আপনার প্রশাসনের শুষ্ক দায়িত্বে থাকা নিষ্প্রয়োজন।'

অপলক নেত্রে চেয়ে হাটশেপসুট— 'মহামাত্য বোধহয় ভুলে গেছেন, আমি শুধু ফারাওপত্নী নই, আমি ফারাওকন্যা। অমৃতলোক-বাসী ১ম তুথমোসিসের একমাত্র বংশধর। রাজ্যশাসন আমার জন্মগত প্রবৃত্তি। আপনি এখন আসতে পারেন।'

থমথমে মুখে মহামাত্য বিদায় নেন। উঠে গিয়ে অলিন্দে পায়চারি করতে থাকেন হাটশেপসুট। কিছু একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর অস্থিরতা যাবে না। অবশেষে দেবতা আমুনের প্রধান মন্দির কারনাকের মুখ্য পূজারিকে অবিলম্বে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দেন।

পুরোহিত এসে প্রথাসিদ্ধ আশীর্বচন করে বলতে শুরু করেন— 'পট্টদেবী, জানি আপনি স্বামী শোকাতুরা। কিন্তু আমাদের ধর্মে মৃত্যু দুঃখের ঘটনা নয়। অনন্তলোকের প্রবেশদ্বার মাত্র। হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস, অনন্তলোকে অনন্ত সুখ। তাই সমাধিতে এ জগতের সব ভোগ্য উপকরণ দেওয়া হয়। তাই প্রাণহীন দেহকে চমৎকারী বিদ্যায় মমি করে রাখা, দেহাশ্রিত আত্মা অবিনাশী। পরলোক ইহলোকের চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়। অতএব—'

— 'এ সবই আমার জানা, আচার্য। আপনাকে আমি শাস্ত্রালোচনার জন্য ডাকিনি। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। একটি নিবেদন আছে আপনার কাছে।'

অপ্রতিভ পুরোহিত শশব্যস্ত। — 'নিবেদন কেন মহারাণী, বলুন আদেশ।'

মাথা নাড়ে হাটশেপসুট — 'না, অনুরোধ। আপনি জানেন, আমুন আমাদের কুলদেবতা। আমি চাই তাঁর আরাধনা শুধু রাজপরিবারে আবদ্ধ না থেকে সমস্ত রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। শুভসূচনা হিসেবে স্থির করেছি— কিছু উর্বর জমি, ফলবাগিচা, বণিকদের থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ দেবতার চরণে নিবেদন করব। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি হন আমার এই যৎসামান্য দানের গ্রহীতা।'

পুরোহিত হতবাক। কোনওক্রমে সামলে নিয়ে বলেন— 'এ তো আমার স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য। আমি ধন্য। মহাদেবী।'

— 'দেবতার পদতলে রাখব দানের অঙ্গীকার। তিন দিনের মধ্যে আপনি পূজার সব আয়োজন করুন।'

প্রত্যুষে কারনাক মন্দিরের গর্ভগৃহে স্বর্ণাচ্ছাদিত বিগ্রহের সামনে অপেক্ষমান পূজারি। গর্ভগৃহের বাইরে বিশাল অঙ্গনে ভক্তদের আনীত ফুল, ফল, বস্ত্রালংকার, সুগন্ধী সুরা, জীবজন্তু প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী উৎসর্গদানের নির্দিষ্ট বেদী। পুরোহিত কান খাড়া করে আছেন। পারিবারিক সহচরী পরিবৃত মহারাণীর আগমন ও পুজোপচার যথাস্থানে স্থাপনের পর শুরু হবে ক্রিয়াকর্ম।

মৃদু সুগন্ধ ও পট্টবস্ত্রের খস্‌খস্‌ আওয়াজে পিছন ফিরে দেখেন, ঢুকছেন হাটশেপসুট। — 'এ কী, পট্টদেবী! আপনি এখানে, গর্ভগৃহে! আপনার স্থান বাইরে, অঙ্গনে। গর্ভগৃহে প্রবেশ ও পূজা নিবেদনের অধিকার পুরোহিত ছাড়া শুধুমাত্র ফারাও -এর।'

— 'জানি, আচার্য। মানবীর গর্ভে দেবাংশে জন্ম ফারাও-এর। তাই তিনি দেবপুত্র এবং গর্ভগৃহে প্রবেশের অধিকারী। বংশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে ফারাও ১ম তুথমোসিসের পট্টমহিষী স্বামীর মাধ্যমে কুলদেবতা আমুনের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। দেবাংশে জন্ম আমার। ফারাও-এর সব অধিকার আমার ওপর বর্তায়। সব কর্তব্যও।'

— 'কী সাংঘাতিক! এ তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শুধুমাত্র পুরুষই ফারাও হতে পারেন। তাই তাঁর বাধ্যতামূলক বিশেষ সজ্জা। মস্তকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের উপকেশ, গ্রীবায় পৌরুষব্যঞ্জক কৃত্রিম বস্ত্র। তাঁর সমস্ত প্রতিকৃতিতে পর্যন্ত। এমনকি মৃত্যুর পর শবাধারে তাঁর মমির সোনার মুখাবরণেও।'

— 'শুনুন। পরচুলা, নকল দাড়ি, মুখোশ ধারণের জন্য কোনও লিঙ্গ লাগে না। ও সব নিয়ে ভাববেন না। আপনার কাজ একটি। সভাসদ ও প্রজাবৃন্দকে জানানো এদেশের সিংহাসনে আমার জন্মগত এবং বৈধ অধিকার।'

— 'এত হাজার বছরের রীতি, বিশ্বাস, ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে আমার বাক্য তারা মানবে কেন?'

— 'তাদের মানানোর উদ্দেশ্যেই আপনি আমুনের প্রধান পুরোহিত রূপে এত ধনসম্পত্তির অধিকারী হতে চলেছেন। আসুন পূজা আরম্ভ করা যাক।'

★ ★ ★

ক্রিং....ক্রিং...ক্রিং। হ্যাঁ। — 'ফতিমা আমি আর পারছি না রে।' হাফিজার গলা। কান্না কান্না। — 'কেন, আবার কী হল?' সখীটির সর্বদা সমস্যা, ঘরে বাইরে।

— 'দেখ না, একটা ইতালিয়ান গ্রুপ হোটেল বুকিং চেয়েছে। সামারি বাজেট। এখন অফ সিজন্‌, প্রচুর ভেকেন্সি। ইব্রাহিমকে চার্জ দিয়েছিলাম। স্রেফ বদমায়েশি করে একটা বাজে হোটেল বুক করেছে। পার্টি এসে চেঁচামেচি। বস্‌ আমাকে তুলোধোনা করছে।'

— 'আরে তুই ইব্রাহিমকে তুলোধোনা করছিস না কেন? ও তো আগেও তোকে বহুবার এমন ফলস্‌ পজিশনে ফেলেছে। শাসন করতে পারিস না নিজে? সাব-অরডিনেটকে?'

— 'কী রকম ভয় ভয় করে রে! বাড়িতে উঠতে বসতে সাবিরের খোঁটা। চাকুরে বউয়ের রান্নাবান্না ঘর গেরস্থালির সব জিনিসে পদে পদে খুঁত ধরা। মায়ের ঘ্যানঘ্যানানি, বাচ্চাকে ওঁর কাছে রেখে আসি বলে। ভাব, নিজেরই তো নাতনী। সকাল থেকে রাত ননস্টপ কাজ। অথচ সকলের গালাগালি শুনি। আর পারছি না। বুঝলি।'

— 'একটু শক্ত হ, হাফিজা। সর্বদা মনে রাখবি তুই ঠিক কাজ করছিস।'

লাইন কেটে দেয় ফতিমা। এ ধরনের ডায়লগ কতবার হয়েছে। আচ্ছা, মেয়ে মাত্রেই কি হাফিজার মতো কোমল ভীরু সকলের পদাঘাতে পিষ্ট! শুধু সহ্য করাই কি এ মাটির কন্যাদের ভবিতব্য? ফতিমা ফিরে যায় অতীতে।

★ ★ ★

রাজসভায় আমন্ত্রিত রাজ্যের সব আমাত্য। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথম সারিতে বয়স্কদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। নাবালক ৩য় তুথমোসিসের অভিভাবক, সৎ মা বিধবা পট্টমহিষী রাজকার্যে নাক গলাচ্ছেন। একে নারী, তায় তরুণী। তাঁর ক্ষেত্র অন্তঃপুরে। কে যেন মৃদুস্বরে বললেন— 'দেব অসিরিস সভ্যতা বিস্তারে রাজ্যের বাইরে গেলে পত্নী আইসিস সিংহাসনে বসে দেশ শাসন করেছিলেন।'

— 'আরে ওসব দেবদেবীর পুরাকাহিনী রাখুন। বাস্তবে পুরুষই শুধু

শাসক।'

পিছনে যুবকদের মধ্যে চাপা খুশির হাওয়া। — 'শুনেছেন, বুড়ো-হাবড়াদের কোণঠাসা করতে চান মহাদেবী?'— 'খুবই বুদ্ধিমতী, বয়স অল্প হলে কী হবে।'

যথামর্যাদায় হাটশেপসুটের প্রবেশ। কর্ণভূষণহীন মুখমণ্ডল রমণীর কুণ্ডলশোভাবর্জিত। মস্তকের উপকেশ গলার দু'পাশ দিয়ে স্কন্ধ ছাড়িয়ে সামনে দু'ভাগে ন্যস্ত। ললাটে রাজ-চিহ্ন অলঙ্কার। কণ্ঠ থেকে বক্ষ জুড়ে বহু রত্নখচিত স্বর্ণাভরণ। বাহু, কর, কটি বেষ্টিত প্রশস্ত এক একটি অলঙ্কারে। প্রত্যেকটি সভাসদদের অতি পরিচিত। বরাবর দেখা, ফারাওদের সর্বাঙ্গে। যেমন দেখা সামনে স্বর্ণাচ্ছাদিত সিংহাসনটি। পৃষ্ঠশীর্ষে খোদিত বিস্তৃতপক্ষ শ্যেন পাখি যার দুটি ডানায় রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণের সংহতি চিহ্নিত। সনাতন যুগ্ম রাজমুকুটটি রয়েছে আসনের ওপর। স্বচ্ছন্দে সেটি কোলে তুলে নিয়ে হাটশেপসুটের উপবেশন। সমবেত বিস্মিত দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে শুভ সূচনার ইঙ্গিত দান। মাঙ্গলিক কৃত্যের পর স্পষ্ট কণ্ঠে নির্দ্বিধায় শুরু করেন তাঁর অভিভাষণ— যেন এমনটি স্বাভাবিক, বরাবর হয়ে এসেছে।

সভাসদগণ, আপনারা জানেন, পুণ্যসলিল নীল নদের দান আমাদের এই দেশ। আমাদের পূর্বে ও পশ্চিমে দুস্তর মরুভূমি। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে প্রস্তরাকীর্ণ নিষ্ফলা ভূখণ্ড। প্রকৃতির সুরক্ষিত সীমানার মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা বিশ্বে সভ্যতা সৃষ্টি করেছি। কৃষি, বাণিজ্য, লিখন-পঠন, পূজা-অর্চনা, সুশীল আচরণ, নৃত্য-গীত-বাদ্য, কাব্য-সাহিত্য, সর্বোপরি স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা— সব আমাদের সাধনার ফল। অত্যন্ত বেদনার কথা, এমন সমৃদ্ধ এবং অনন্য সভ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গত কয়েকশ বছর ধরে আমরা বর্বরদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত। অনেক সংগ্রাম করে অধীনতার অপমান থেকে মুক্তিলাভ হয়েছে। আমাদের কি কর্তব্য নয়, সর্বশক্তি দিয়ে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা? স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতা অস্তিত্ব কিছুই আমরা টিকিয়ে রাখতে পারব না। তাই প্রতিরক্ষায় চাই সর্বশক্তি নিয়োগ। চাই নতুন চিন্তা। বহির্জগতে একটি বার্তা পৌঁছানো আবশ্যক— আমরা শুধু সুসভ্য জাতি নই, আমরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

কিন্তু বিদেশীরা আদৌ আমাদের পদানত করতে পেরেছিল কেন? কারণ, আমাদের অভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য, বিশৃঙ্খলা, বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবোধ, রাষ্ট্রের প্রতি প্রজাদের ঔদাসীন্য। এগুলির প্রতিবিধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তার জন্য প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে। উত্তর-দক্ষিণে যোগাযোগ আদান-প্রদান চাই অবিরাম। চাই প্রজাকল্যাণে মনযোগ। আপনারা জানেন, বর্তমান রাজবংশের কুলদেবতা আমুন, যিনি সূর্যদেব 'রা'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আজ থেকে আমুন-রা রাষ্ট্রদেবতা। সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হোক তার পূজা। রাজা ও প্রজার একত্র ধর্মাচরণে গড়ে উঠবে অখণ্ড জাতিসত্তাবোধ।

এমন বিশাল কর্মসূচী রূপায়ণে প্রয়োজন প্রচুর ধন। কোথা থেকে আসবে বাড়তি অর্থের যোগান? প্রজাবৃন্দের ওপর করভার বৃদ্ধি করে নয়, অভিজাতদের সম্পত্তি দখল করে নয়, আমরা দূরদূরান্তে অভিযান পাঠাব। পর্বত-কন্দরে, মরুভূমিতে, বনে, জঙ্গলে। প্রকৃতি থেকে আহরণ করে আনবো মূল্যবান সব রসদ। এতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। পৃথিবীতে আমাদের সাহস ও বাহুবলের প্রচার এবং দেশের সমৃদ্ধি বর্ধন। আসুন, আমরা সমবেত ভাবে এই পবিত্র ভূমির গৌরববৃদ্ধিতে নিয়োজিত হই।'

ভাষণ সমাপ্ত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন হাটশেপসুট। একান্ত প্রকোষ্ঠে কতবার মহড়া দিয়েছেন বক্তৃতাটি। যাক, বিনা বাধায় উত্‌রে গেল। সভায় অখণ্ড নীরবতা। অপার বিস্ময়। সদ্য বিধবা তরুণী রাণী। সর্বসমক্ষে এমন সোচ্চার আবির্ভাব এতই অপ্রত্যাশিত। প্রথমে মুখ খোলেন মহামাত্য— 'মহাদেবীর পরিকল্পনা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এটি বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন কোনও সর্বশক্তিমান ফারাও। বর্তমানে কি আমাদের তেমন সৌভাগ্যময় অবস্থান?' প্রসন্ন মুখ হাটশেপসুটের। — 'মহামাত্যর পর্যবেক্ষণ অতি সঙ্গত। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে রাষ্ট্রদেবতা আমুনের প্রধান দেবস্থান কারনাকের মুখ্য পুরোহিতকে আহ্বান করছি।'

সভাসদরা এতক্ষণ খেয়ালই করেননি কারনাক মন্দিরের পূজারি এককোণে উপবিষ্ট। সম্মিলিত সচকিত দৃষ্টির সামনে এখন তিনি উঠে হাটশেপসুটের আসনের পাশে দাঁড়ান। একটু ইতঃস্তত করে মৃদু কণ্ঠে বলেন— 'আমি আমুনদেবের সেবক। পুরুষানুক্রমে কারনাকে দেবসেবা আমাদের বংশে অর্পিত। কয়েকদিন আগে ভোরে যথাবিহিত মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পুণ্য জলাশয়ে প্রক্ষালন সেরে গর্ভগৃহে পূজায় বসেছি। হঠাৎ বিগ্রহের মধ্যে থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি। দেবপুত্র ফারাও ১ম তুথমোসিসের মাধ্যমে আমার ঔরসে পট্টমহিষীর গর্ভে জন্ম কন্যা হাটশেপসুটের। সিংহাসনের সে বৈধ উত্তরাধিকারিণী। যাও তাঁকে ফারাও রূপে বরণ কর। তাঁর দ্বারা এ ভূমির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।'

পুরোহিত নীরব হলেন। সভাকক্ষে গুঞ্জরণ। মহামাত্য প্রশ্ন করেন— 'পুরোহিত প্রবর একাই বোধহয় দৈববাণীটি শ্রবণ করলেন?'

তাঁর বিদ্রূপের স্পর্শ সভাস্থ বয়স্কদের মুখের অভিব্যক্তিতে। গুঞ্জরণ আরও জোরালো। অস্বস্তি বোধ করছেন

পুরোহিত। হাটশেপসুট গম্ভীর। সহসা পিছন থেকে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা— 'দৈববাণীটি ওঁর একার শোনাই যথেষ্ট নয় কি?'

সকলে ঘাড় ঘোরান। সামনে এগিয়ে আসছেন ব্যক্তিত্বশালী এক তরুণ।

— 'পুরোহিত প্রধান, আপনি রাষ্ট্রদেবতা আমুন-রা-র আদেশ জানিয়েছেন মাত্র। এখনও পালন করেননি। আসুন, পালন করুন।'

কম্পিত হস্তে হাটশেপসুটের কোল থেকে যুগ্ম রাজমুকুটটি তুলে নিয়ে তাঁর মাথায় স্থাপন করেন পুরোহিত।

— 'এ কী অনাচার।— এ যে শাস্ত্রবিরোধিতা।' সম্মুখ সারির ক্ষুব্ধ অমাত্যদের তুমুল বিক্ষোভ। তাঁদের ধিক্কার নিন্দা আপত্তি ছাপিয়ে তরুণটির উচ্চস্বর সভাকক্ষে ধ্বনিত।

— 'মহামহিমান্বিত ফারাও হাটশেপসুট। আমি প্রশাসক-স্থপতি সেনেনমুট আপনার পদতলে প্রণত। আজ থেকে আমার কায়মনোবাক্যে আনুগত্যের অধিকারিণী আপনি। দেশের জন্য, জাতির জন্য, আপনার স্বপ্ন রূপায়ণে নিজেকে নিবেদনের সুযোগ প্রার্থনা করি।'

— 'আমরাও। আমরাও। আমরাও।' যুবক সভাসদদের সোৎসাহ সমস্বর।

রক্তিম মুখে মহামাত্য বলেন— 'পট্টদেবী, রাজকার্য থেকে অব্যাহতি চাই আমি।' পক্ককেশ সকলেই বললেন— 'আমরাও।'

স্মিত মুখে হাটশেপসুটের উত্তর— 'প্রবীণ নবীন উভয়পক্ষের অভীষ্ট পূর্ণ হোক।'

★ ★ ★

— 'চাকরি আর লেখালেখিতেই জিন্দগী গুজার। নিকাশাদি তো করলি না।' খেতে বসে মায়ের যথারীতি দীর্ঘশ্বাস।

— 'কেন, হাসিনার শাদি দাও না, কে বারণ করেছে?'

— 'আহা! নিজে ফ্রি থাকবে আর আমি পায়ে বেড়ি পরবো। এই তো মা তুমি শাদি করেছিলে। কষ্ট করে সংসার রোজগার সব করলে। কী হল? লাথিটি মেরে তালাক।'

— 'তোদের দু'জনকে তো পেলাম। তাছাড়া আমি আবার শাদিও করতে পারতাম।' মায়ের সাফাই।

— 'করলে না কেন?'

— 'তোদের তাহলে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিতে হত। ৭ বছর বয়সের বেশি বাচ্চাদের দায়িত্ব তো বাপের। সেই অভিভাবক। নেহাত তোরা মেয়ে বলে তার খুব উৎসাহ ছিল না। আর বিয়ে করিনি তাই রাখতে দিল।'

— 'দয়া! হুঁ! এর পরও তুমি আমাদের বিয়ে শাদির কথা ভাবো কী করে?'

হাসিনা কখনও মাকে ছেড়ে কথা কয় না। ছাড়ে না বড় বোনকেও। ফতিমা খাওয়া সেরে উঠে মাথায় হিজাব বাঁধছে, অফিসের টাইম হয়ে এল।

— 'ওই যে তোমার কোরাণ মেনে চলা ভালো মেয়ে। শাদি শৌহর আওলাদ ওকে মানায়। দেখ না কেমন হিজাব বাঁধে।'

— 'বাজে বকিস না হাসিনা। ফেমিনিজমের নাম করে তুই আপার ক্লাস ইজিপ্সিয়ানদের মতো ইউরোপিয়ান কথাবার্তা বলিস। আমি এ মাটির মেয়ে। তাই পশ্চিমের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখি।'

— 'ন্যাশনালিজমের বড়াই করছিস? প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে তোর কারবার আর্কিওলজিতে ডিপ্লোমা। বল তো, এ মাটির আমরা কে? যারা আরবি বলি ইসলাম মানি? যেসব পিরামিড মন্দির ট্যুরিস্টদের দেখিয়ে টাকা কামায় সেগুলোতে মেয়েদের কী বেশভূষা? হিজাব, নকাব, বোরখা পরা কোন রাণী বা দেবী পেয়েছিস? আরে এ মাটির নাম পর্যন্ত মুসলিম বিজেতারা পাল্টে দিয়েছে। কী সম্পর্ক আজ মাটির সঙ্গে যে ন্যাশনালিজমের বড়াই করিস?'

কথাটা বড় বেঁধে ফতিমাকে। যদিও নতুন নয়। দুই বোনের কথা কাটাকাটিতে সর্বদাই আধুনিকত্ব বা পশ্চিমায়ন বনাম জাতীয়তাবাদ বা ইসলামে দাঁড়িয়ে যায়। মা তাড়াতাড়ি বলেন— 'থাক থাক, এখন কাজে বেরুবার সময়, দুজনে আর ডিবেটে যাস না।' সত্যি ভাগ্যে কাজ ছিল। কাজ নিয়েই থাকে দুই বোন।

★ ★ ★

কাজ কাজ কাজ। এবং কাজ। পুরুষের আসনে নারীকে প্রতিনিয়ত পুরুষের দ্বিগুণ যোগ্যতা প্রমাণ প্রয়োজন। বিশেষত যখন তার মন্ত্র সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন। হাটশেপসুট ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজে। সেনেনমুট তাঁর মহামাত্য এবং দক্ষিণ হস্ত, যাঁর পরামর্শে একদল যোগ্য এবং অনুগত তরুণ প্রশাসকদের ওপর বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত। উৎসাহী অমাত্যদের সাহায্যে শাসন ব্যবস্থা সংস্কার। প্রতিরক্ষা ঢেলে সাজানো। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রদেবতা আমুনের মন্দির স্থাপিত, পূজার্চনায় উৎসাহী জনগণ। আর আমুনের আদিস্থানে কারনাক মন্দিরে যে বিশাল সংযোজন পিতা ১ম তুথমোসিস করে গেছেন। কন্যার আমলে হল তার বহুবিধ প্রসারণ। ইতিমধ্যে পরিকল্পিত বিজয় অভিযানও শুরু। প্রথমে লক্ষ্য রাজ্যের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ নীল নদের উৎসের দিকের নুবিয়া রাজ্যে। এল সোনা, গোলাপি গ্রানাইট, কত বিচিত্র শিলা। সেখানেই নীল নদের প্রথম

প্রপাতে আসোয়ান থেকে বার্ষিক বন্যার সময় ভাসিয়ে দেওয়া হল গ্রানাইটের বিশাল বিশাল চাঙড়। ২০ থেকে ৪০ ফুট উঁচু প্রবল জলস্রোতে ভেসে এসে পৌঁছাল রাজধানী 'টাপে' বা থিবসে। তৈরি হল ১০০ ফুট উঁচু চতুষ্কোণ দুটি স্তম্ভ বা ওবেদিস্ক— পিরামিডের মতো ছুঁচলো শীর্ষ সোনার পাতে মোড়া। সেই এক এক খণ্ড অতিকায় পাথরের নির্মাণে খোদিত চিত্র— স্বয়ং দেবতা আমুন ফারাও-এর মুকুট পরাচ্ছেন হাটশেপসুটকে। কারনাক মন্দিরের সামনে মহাসমারোহে স্থাপিত হল ফারাও রাণীর দুটি কীর্তি।

এখানেই শেষ নয়, হাটশেপসুটের অক্লান্ত কর্মোদ্যোগ। তাঁর নবসংগঠিত নৌবাহিনী লোহিত সাগর ধরে চলল দক্ষিণে সোমালিয়া তটে। কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আহরণ করল সোনা, আবলুশ কাঠ, গজদন্ত, পশুচর্ম, সে অঞ্চলের বিশেষ গাছগাছালি, সুগন্ধি বৃক্ষ, বেবুন ও জিরাফের মতো অভিনব জীবজন্তু। নীলনদ রাজ্যের খুশির প্লাবন। শিকারি কৃষিজীবী সূত্রধর চর্মকার স্বর্ণশিল্পী বণিক— সকলের কর্মের পরিধি বিস্তার। বিস্তার সমৃদ্ধি। সর্বশ্রেণীর প্রজাবৃন্দ সুখী।

আর হাটশেপসুট? তাঁর অন্তরে কি সুখ আছে? একান্ত কক্ষে সন্ধ্যায় দাসীরা তাঁর ফারাওসজ্জা এক এক করে খোলে। পরচুলা, ললাটভূষণ, সারা দেহের ভারি ভারি অলংকার। ঘরে ঢোকে রাজকুমারী নেফ্রুর, পিছনে তার ধাত্রী।

— 'তুমি একা যে? ভাই কোথায়? এখনও ফেরেনি অস্ত্রশিক্ষা সেরে?' সস্নেহে প্রশ্ন করেন হাটশেপসুট। নিজ গর্ভজাত কন্যা ও সপত্নী পুত্র ৩য় তুথমোসিসের মধ্যে তাঁর কাছে কোনও ভেদ নেই। ফারাওতন্ত্রের বহুপত্নীক দীর্ঘ অনুশাসনে পট্টমহিষীর অপত্যস্নেহ পক্ষপাতশূন্য।

ঘাড় নেড়ে 'না' জানায় নেফ্রুর। তার দৃষ্টি অন্যত্র। — 'মা, তোমার ওই হারটা আমি পরি? কী সুন্দর! আমি এসব রত্ন চিনি। এই দেখ প্রবাল, ফিরোজা, কর্ণেলিয়ান—'

— 'গয়নাগাটিতে তো খুব উৎসাহ। বলতো দেশের বৃহত্তম পিরামিড কোন ফারাও-এর তৈরি?'

— 'পুরনো রাজ্যপাটের কারও আর কি। তুমি সবসময় শিক্ষকের মতো পড়া ধর। এই হারটা আমি পরি?'

— 'না। ওটা শুধু ফারাও পরেন। তোমার জন্য কত অলংকার আছে। সেগুলো থেকে দু-চারটে এখন পর। বাকি সব বড় হলে পরবে।'

চঞ্চল নেফ্রুরের হাতে পায়ে নাচের মুদ্রা। — 'ও কী হচ্ছে! দিনরাত সাজসজ্জা আর নাচগান। স্থির হয়ে বস আমার কাছে। সকালে দেবমন্দিরে গিয়েছিলে?'

অশ্রুত তালে তেমনি নাচতে নাচতে হাসিমুখে নেফ্রুর ঘাড় নাড়ে, না।

— 'অথচ ভাই দেখ কেমন সুন্দর শাস্ত্রচর্চা করে। শিখেছে দণ্ডনীতি, সমরবিদ্যা।'

— 'ও তো পুরুষ। ওকে শিখতে হয়।' অনায়াস উত্তর নেফ্রুরের।

পরমবিষ্ণু সেনেনমুট নিজে নিয়েছেন রাণীর একমাত্র কন্যার শিক্ষার দায়িত্ব। তবু এই ফল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন হাটশেপসুট। কর্মান্তে অন্তঃপুরে তাঁর কপালে নিত্য হতাশা বাঁধা। এবং বাঁধা একাকীত্ব। অথচ তাঁর পূর্বজ ফারাওরা রাজকার্য সেরে যখন অন্তঃপুরে ফিরতেন, তাঁদের সংবর্ধনায় প্রস্তুত থাকতেন বস্ত্রালংকার ভূষিতা কত পত্নী, মনোরঞ্জনের জন্য অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতবাদ্য। বহু নারীগামী ফারাওদের প্রিয়ার সান্নিধ্যসুখে ছিল স্বাভাবিক অধিকার। আর হাটশেপসুটের? বহুপতি দূরস্থান, একমাত্র পতিও ছিলেন না প্রেমাস্পদ। বিবাহ কেবল কর্তব্য পালন।

আজ ফারাওত্ব তাঁর পক্ষে শুধু এক দুর্গম যাত্রা। অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে। পায়ের তলায় তপ্ত বালি, মাথার ওপর প্রখর রৌদ্র। সমস্ত বক্ষ জুড়ে তৃষ্ণা। কোথায় মরুদ্যান, একটু সুশীতল ছায়া।

দাসীর সবিনয় নিবেদনে আত্মসমীক্ষায় ছেদ পড়ে হাটশেপসুটের। মহামাত্য সেনেনমুট ক্ষুদ্র সভাকক্ষে অপেক্ষারত। এ সময়টি নির্দিষ্ট বিশেষ কর্মসূচী আলোচনার জন্য। সেনেনমুট শুধু দক্ষ প্রশাসক নন, প্রতিভাবান স্থপতি। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মহারাণীর আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের ভাণ্ডারী। তাঁরই উৎসাহে ফারাওদের করণীয় প্রথাগত কর্মে মন দিয়েছেন হাটশেপসুট। সিংহাসনে বসেই প্রতিটি ফারাও সর্বাগ্রে নিজের সমাধি নির্মাণে ব্রতী হন, যেখানে শবাধারে তাঁর মমিকৃত শব শায়িত হবে। সন্নিকটস্থ অন্ত্যেষ্টি মন্দিরে থাকবে তাঁর জীবৎকালের কীর্তির বিবরণ ও মূর্তি। পিরামিডের যুগ এখন অতিক্রান্ত। দেখা গেছে, পিরামিডের ভিতর ফারাও-এর পরলোকে ব্যবহার্য ধনরত্ন উপকরণ সামগ্রী ধর্মহীন তস্করের দল লুটেপুটে নিয়ে যায়। তাই বর্তমান রাজধানী থিবসের কাছে নতুন সমাধিক্ষেত্র নীল নদের ওপারে সূর্যাস্ত অর্থাৎ মৃত্যুর দিক পশ্চিমে। নিচু পাহাড়বেষ্টিত বালিময় রাজ উপত্যকায়। শুধু ফারাওদেরই স্থান এখানে। রাণীদের সমাধি অন্যত্র।

হাটশেপসুট প্রথমেই রাজ উপত্যকার একটি কোণ নিজের জন্য বেছেছেন। বালির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গা খুঁড়ে অন্য ফারাওদের মতো তাঁর সমাধি নির্মাণও চলেছে। পাহাড়টির অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে তাঁর অন্ত্যেষ্টি মন্দির।

তাঁকে দেখে সেনেনমুট উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করা মাত্র কথাটা পাড়েন হাটশেপসুট। — 'আমার মন্দিরের গাত্রে শুধু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য চিত্র থাকলে চলবে না। পিতার কথাও

সবিস্তারে থাকা চাই।'

— 'নিশ্চয়। আছে বৈকি! কে না জানে, আপনি কীর্তিমান পিতার সুযোগ্যা কন্যা! তবে তাঁর নিজের মন্দিরে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদায় বিরাজিত। এ মন্দিরটি আপনার, তাই না? সুতরাং আপনার কীর্তি বৃত্তান্তই মুখ্য। প্রস্তরে ধরা থাকবে আপনার রাজত্বের গৌরবময় ইতিহাস। মন্দিরের পরিকল্পনাটি কেমন লেগেছে মহাদেবীর? স্মিতমুখে হাটশেপসুট বলেন— 'অপূর্ব। চিরাচরিত মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতি থেকে একেবারে ব্যতিক্রম। আমার অভিনন্দন, স্থপতি সেনেনমুট।'

— 'দেবী, আমার সব প্রচেষ্টার পিছনে একটিই বাসনা। ব্যতিক্রমী ফারাও হাটশেপসুটের অমরত্ব।'

— 'ফারাও-এর কথা থাক। স্থপতির কথা হোক। মন্দির গাত্রে কোথাও আপনার কিছু যে রইল না। ভবিষ্যতে কেউ জানবে না এমন অনুপম কীর্তির স্রষ্টা কে?'

— 'তাই তো রীতি। বিশাল পিরামিডগুলির ক'টির স্থপতির নাম আমরা জানি? শিল্পী নামহীনই থাকেন।'

— 'আমি তা চাই না। অনেক রীতি, অনেক প্রথা আমি ভেঙেছি। আপনার প্রতিকৃতি মন্দিরের ভিতরে চিত্রণের ব্যবস্থা করুন। এটা আমার আদেশ।'

— 'যথা আজ্ঞা দেবী।'

দু'জনে মুখোমুখি বসে। হাটশেপসুট অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে। সেনেনমুট একটু নিচে। আগাগোড়া সময় দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের মুখে নিবদ্ধ। রাজা ও প্রজার নয়, তাঁদের চোখের ভাষা। সেকথা দুজনেরই মনে মনে জানা। দ্বারের প্রহরিণীর দিকে তাকিয়ে সেনেনমুট বলেন— 'এই ঘরটি একটু গরম। কৃত্রিম আলোর উত্তাপ হবেই। আমরা কি সামনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না?'

অলিন্দে এসে দাঁড়ান দুজনে। নীলনদ থেকে স্নিগ্ধ পবন বইছে। দূরে চন্দ্রিকায় শুভ্র মরুভূমির বালুকারাশি। দুজনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। অতঃপর হাটশেপসুট মৃদুস্বরে বলেন, 'মহামাত্য, এবারে আপনার আসল কথাটা বলুন। শুধু মন্দিরের চিত্র আলোচনার জন্য আপনি আসেননি, তাই না?'

— 'মহাদেবী, আমার আসল কথাটা অপ্রীতিকর। বলতে দ্বিধাবোধ করছি। পাছে অধীনকে ভুল বোঝেন।'

— 'আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে, সম্ভাবনা আদৌ নেই। নির্ভয়ে বলে ফেলুন।'

— 'কিছুদিন ধরে খবর পাচ্ছি, যাঁকে আপনি পুত্রবৎ পরম স্নেহে আদরে যত্নে লালনপালন করেছেন, সেই ৩য় তুথমোসিস আপনার ঘোর বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। প্রায়ই আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় বিষোদ্গার করেন সঙ্গীদের কাছে। তারা আবার ফলাও করে সেসব কথা প্রজাসাধারণের মধ্যে বলে বেড়ায়।'

হাটশেপসুটের মুখে অপরিসীম বিষাদ। — 'আমিও লক্ষ্য করেছি ওর পরিবর্তন। অথচ বাল্যকালে কত আমার অনুগত ছিল, নেফ্রুরের চেয়েও বেশী। কত আগ্রহে গ্রহণ করত আমার সব উপদেশ, সব শিক্ষা। আর আজকাল দেখাই করে না পারতপক্ষে। ডেকে পাঠালে গম্ভীর মুখে এসে বসে। আগের মতো খোলামেলা গল্প নেই, নেই আবদার। হঠাৎ কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে, আর বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র।'

— 'আমার বিনীত অনুরোধ, ওঁকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে দিন। রাজ্যশাসনে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান নিম্নদেশে, নীলনদের ব-দ্বীপে।'

— 'কিন্তু সে অঞ্চল জলাভূমি। অস্বাস্থ্যকর। কোথাও কোথাও জঙ্গল। হিংস্র জন্তু আছে। তার ওপর এশিয়া থেকে বর্বর জাতি ওই অঞ্চলেই হানা দেয়।'

— 'প্রতিকূল পরিবেশই তো শাসনকাজ শেখার উত্তম ক্ষেত্র।'

হাটশেপসুট মুখ ফেরাল। চোখে চোখ রাখেন সেনেনমুটের।

— 'মহামাত্য, আপনার অন্তরের অভিলাষ কি আমি বুঝি না? এক্ষেত্রে আপনি যা চান আমি তা চাই না। ৩য় তুথমোসিস আমার একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখবেন না।'

— 'কিন্তু উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আপনাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। এর মধ্যেই বাতিল প্রবীণ অমাত্যদের মধ্যে জীবিতদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছেন। তিনি আর বালক নন। দেবী, আপনার জীবন বিপন্ন। আমার মিনতি, আপনার পথ থেকে ওঁকে সরিয়ে দিতে দিন।'

— 'না, তা হয় না। ইহলোকে জীবন নশ্বর। মরতে একদিন হবেই। আমাকে বিনাশ করলেও তুথমোসিস রক্ষা করবে দেশকে। আমি নিজে তাকে সে শিক্ষা দিয়েছি। মাতৃভূমির গৌরব সে বৃদ্ধি করবে। এ বিশ্বাস আমার আছে।'

দিনের মতো ডিউটি শেষ। অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে। ফতিমা তার ব্যাগ গুছিয়ে উঠতে যাবে, ইন্টারকমের বদলে মোবাইলে ডাক এল এম ডি আজিজ আহমদের। এটা এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে— বেলা শেষে তাকে সামান্য কাজের কথা নিয়ে ডাকা। তারপর গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। রাস্তায় কফি পান এবং তাঁর দাম্পত্য জীবনের সব পাওয়া না-পাওয়ার ফিরিস্তি শোনানো। না, প্রথম দিনেই নয়, ধাপে ধাপে ক্রমশ এই পর্যায়ে এসে ঠেকা। সুদর্শন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই মালিক আজিজের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য না মনে হলেও আপত্তি করেনি বিশেষ ফতিমা। এটা তো সত্যি একজন সফল ক্ষমতাশালী পুরুষের

নজর ভালোই লাগে। তাছাড়া ওতো শুধু কথাই বলছে, জাস্ট বন্ধুত্ব। — 'তোকে কেন?' হাসিনার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে— 'হয়তো আর কাউকে পায় না।' মুখ ভেটকে ছোটবোন মন্তব্য করেছে— 'সব বুজরুকি। স্ত্রী বাড়ি গাড়ি গয়নাগাটি পোশাক নিয়ে খুশি। ছেলেমেয়ে দেখ গে যা আমেরিকায়, এখন ইনি উসখুস করছেন তোর মতো ২০ বছরের ছোট মেয়েকে পটাতে। বেটার টারগেট হচ্ছে বিছানা। সব পুরুষেরই তাই।' —'ছি! হাসিনা। তুই জানিস আমি কোরান পড়ি। কখনও ওর রক্ষিতা হব না।' — 'বেশ তো কোরান মেনে দু-নম্বর বিবি হোস। নয়তো বুড়িটাকে তালাক দিয়ে ছুঁড়ি ঘরে তোলাবি। আমাদের বাবা যেমন করেছে।'

এটাই হাসিনার অব্যর্থ অস্ত্র।

আগামী ৩ মাসের বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের কতদূর কী বুকিং হয়েছে সে সম্বন্ধে দু'বার কথার পর ফতিমা অফিস থেকে বেরোয়। যথারীতি আজিজের গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ উনি নিজে ড্রাইভ করছেন। সাধারণত ড্রাইভার ওঁকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় গৃহিণীর খিদ্‌মতে। বিকেলে আসে। আজ ব্যতিক্রম। একটা বহুতলের সামনে থামেন। — 'এখানে আমার একটা ছোট ফ্ল্যাট আছে। সেখান থেকে কিছু জিনিস বাড়ি নিয়ে যাব। চল হেল্প করবে।'

— 'নিশ্চয়।' চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকেন আজিজ। সুন্দর সাজানো। এসি অন করে দিয়ে বলেন— 'একটু বসে যাওয়া যাক।' সোফায় পাশে এসে বসেন।

— 'হিজাবটা খুলে ফেলো, কমফর্টেবল লাগবে। এসো আমি খুলে দিই।'

ফতিমার আপত্তি অগ্রাহ্য। বাঃ তোমার তো বেশ সুন্দর লম্বা চুল। অবশ্য তোমার অনেক কিছু সুন্দর। চোখ নাক ঠোঁট। সুন্দর তোমার এই পাতলা ছিপছিপে শরীর। তোমার বয়স।'

এক হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে আজিজ।

ফতিমা উঠে দাঁড়ায়— 'আমার আজ একটু তাড়া ছিল। ভেরি সরি। স্যার! আপনাকে একলা জিনিসগুলো নিতে হবে। আমি চলি। কিছু মনে করবেন না।'

— 'আই হোপ, ইউ নো হোয়াট ইউ আর ডুয়িং।' মুখের ভাব একেবারে পাল্টে গেছে আজিজের। ক্ষুধার্ত পশু, কব্জা করা শিকার ফস্কে গেছে।

বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বলে না। কাল থেকে নতুন চাকরি খুঁজবে। মনটা বিধবস্ত। লেখাটা নিয়ে বসে।

★ ★ ★

কন্যা নেফ্রুরের সঙ্গে সাড়ম্বরে ৩য় তুথমোসিসের বিবাহ দিলেন হাটশেপসুট। হাজার হাজার বছরের ফারাও বংশের আবহমান ঐতিহ্য— পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্থিতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত। এবং বিরূপ সপত্নীপুত্রের সঙ্গে সেতু বন্ধনের শেষ চেষ্টা। সুন্দরী মধুরস্বভাব নেফ্রুরের প্রতি ৩য় তুথমোসিস বরাবরই স্নেহশীল। তাকে বধূরূপে পেয়ে তাঁর উগ্রচরিত্রে পড়ে তৃপ্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। অসূয়া, বিরুদ্ধ তার জমাটবাঁধা কালো মেঘ কেটে প্রসন্ন সূর্যালোক। স্বস্তিতে হাটশেপসুট। নিশ্চিন্ত মনে একদিন আসেন তাঁর সদ্যসমাপ্ত অন্ত্যেষ্টি মন্দিরটি পরিদর্শনে। সঙ্গে সেনেনমুট। পাহাড় কেটে মন্দির। সামনে ঘোড়ার খুরের আকৃতি বিশাল মরুপ্রান্তরে নীলনদের বানভাসি পলিমাটি এনে উদ্যান সৃজন। সেই সোমালিয়া অভিযান লব্ধ গাছগাছালির চারা এখানে রোপিত। সুগন্ধি বৃক্ষের সরণী, কুসুমিত কত তরু। ঘুরে ঘুরে রাণীকে দেখান সেনেনমুট। মন্দিরের ভিতরে সব দেওয়াল চিরদিনের জন্য বিধৃত। হাটশেপসুটের রাজত্বকাহিনী— তাঁর অভিযানগুলি, এমনকী কারনাকে দুটি ওবেলিস্ক স্থাপনও বিস্তারিত। এছাড়া চিত্রে আছেন তাঁর পিতামাতা, কত দেবদেবী, আছে সাধারণ নরনারী। প্রতিদিনের মানব জীবনযাত্রা থেকে দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য। সেনেনমুট নিজে এক কোণে, তাঁকে যেন দেখাই যায় না।

— 'এমন নিভৃতে লুকিয়ে কেন মহামাত্য?'

— আপনি তো জানেন দেবী, আমি আত্মপ্রচার চাইনি। চাইনি ঐশ্বর্য, জাগতিক কোনও পুরস্কার। আমার সব শ্রম, সব সাধনা শুধু আপনার জন্য।'

মন্দিরের বাইরে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন। অপেক্ষমান দাসদাসী রক্ষী বাহন। ভিতরে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দু'জন। পরস্পরের দিকে চেয়ে।

— 'সেনেনমুট।'

— 'দেবী।'

— 'ইহলোকে আপনাকে ছাড়া আমি অচল। পরলোকে একা থাকব কী করে?'

— 'আপনার অজ্ঞাতে এবং বিনা অনুমতিতে আমি দুটি পদক্ষেপ নিয়েছি। অভূতপূর্ব এবং নিঃসন্দেহে অপরাধ। এই মন্দির আর পাহাড়ের ওদিকে আপনার সমাধির মধ্যে সংযোজক একটি ভূগর্ভস্থ গোপন পথ রেখেছি। আর মন্দিরের পার্শ্বভাগের তলায় রয়েছে আমার নিজের সমাধির আয়োজন। দেবী, অমৃতলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন হব না।'

— 'সনাতন ভাবনায় বিশ্বাস করেন? সূর্যদেব পূর্বে উদয় হন, অস্ত যান পশ্চিমে। রাত পোহালে আবার পূর্ব দিকে তাঁর উত্থান। কোনওদিন ব্যতিক্রম নেই। জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্ম চিরন্তন কালচক্র। মৃত্যুর পর

আমাদেরও কি পুনরুত্থান হবে না?'

ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে সুখশান্তি স্বস্তি। হঠাৎ জীবনাবসান নেফ্রুরের। দুর্দান্ত বিরোধীর সঙ্গে হাটশেপসুটের সযত্নে গ্রন্থিত যোগসূত্রটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। অতঃপর কী ঘটল? সিংহাসনচ্যুত হয়ে হাটশেপসুট আমৃত্যু রইলেন অন্তঃপুরে নির্বাসনে? না কি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত? হয়তো কন্যার মতো তাঁরও অকস্মাৎ স্বাভাবিক ভাবেই তিরোধান। কোনও প্যাপিরাসে, মন্দিরগাত্রে, প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ নেই অনন্যা নারীটির পরিণাম রহস্য। শুধু নিশ্চিত জানা, তাঁর দীর্ঘ ৭৫ বছর অতি গৌরবময় রাজত্বের পর ৩য় তুথমোসিস ফারাও-এর সিংহাসনে বসেই ধ্বংস করেন বিমাতার সমস্ত কীর্তি, মুছে দেন মন্দিরগাত্র থেকে তাঁর সমস্ত উল্লেখ। এমন কী কারনাকের দেবস্থানে তাঁর স্থাপিত ওবেলিস্ক দুটি ঢেকে দেন প্রাচীরে। নব্য ফারাও-এর উন্মত্ত সংহার থেকে নিস্তার পায় শুধু হাটশেপসুটের সমাধি ও অন্ত্যেষ্টি মন্দির। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনায় নবীন শাসক সর্বান্তকরণে অনুসরণ করেন ঘৃণিত পূর্বজাকে, গ্রহণ করেন তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি। শক্তিমান কেন্দ্র প্রশাসন এবং দেবতা আমুনের রাষ্ট্রীয় উপাসনা। পরবর্তী ফারাওরা একই পথে নিজেদের ও দেশের গৌরব, প্রতিপত্তি ও বৈভব বৃদ্ধি করে গেলেন। সার্থক হাটশেপসুটের স্বপ্ন। শুধু তিনি নিজে হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে।

★ ★ ★

— 'কেমন, হল তো? প্রতিভাময়ী নারীর কীর্তি ধ্বংস করে দিল পুরুষ। তবু তো ইসলাম আসার আগে বলে ১৫ বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। বোরখা, অবরোধ ছিল না। তাই পেয়েছেন শ্রদ্ধা ভালোবাসা।'

ফতিমার লেখালেখির প্রথম পাঠিকা হাসিনা টেবিলে ঘুসি মেরে যোগ করে, — 'সেই জন্য বলি রাস্তায় নেমে ঝাণ্ডা নিয়ে লড়াই চাই। মরদশাহির বিরুদ্ধে জেহাদ। প্রত্যেকটি মেয়ের ফর্‌জ। ফার্স্ট স্টেপ হিজাব বোরখা ত্যাগ, ত্যাগ ধর্মকর্ম।'

লেখা কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে ফতিমা আস্তে করে বলে— 'তোর আর আমার পথ আলাদা। তোর রাজনীতি, আমার সৃষ্টি।'

— 'হুঁ! বলিস না কেন আমি রিয়েলিস্ট, তুই এসকেপিস্ট।'

— 'না আমি পালাই না। রিয়েলিটিকে দূর থেকে দেখার চেষ্টা করি, যাতে একটা অর্থ বেরিয়ে আসে। জীবনে কিছুই অর্থহীন নয়। ধর্মের ওপরে পিতৃতন্ত্রের ওপরেও কিছু আছে।'

— 'থাক তোর সেন্টিমেন্টাল সান্ত্বনা নিয়ে'। হাসিনা উঠে পড়ে। লিখতে বসে ফতিমা।

★ ★ ★

কেটে যায় হাজার হাজার বছর। মহাকালের অনিবারণীয় নিয়মে লুপ্ত সেই পুণ্য নীলনদ ভূমির প্রাচীন সভ্যতা। লোলুপ মরুভূমির আগ্রাসী বালুকা গ্রাস করে কত সহস্রাব্দের কীর্তি। একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে পড়ে কারনাক মন্দিরের যুগ্ম ওবেলিস্কের একটি। খসে পড়ে তার চারিদিকের দেওয়াল। উদ্‌ঘাটিত এক চিত্র— হাটশেপসুটকে ফারাও-এর মুকুট পরাচ্ছেন স্বয়ং দেবতা আমুন। ৩য় তুথমোসিস কি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন এই দেওয়াল তুলেই পঞ্চ ভূতে অনাবরণের নিশ্চিত বিনাশ থেকে তিনি রক্ষা করলেন চিত্রদলিলে ধৃত বিমাতার গৌরবময় স্মৃতি! অমরত্ব লাভ করেছেন হাটশেপসুট। রাজ উপত্যকায় আবিষ্কৃত আজ বিশ নম্বর গুহাসমাধিতে তিনি

শায়িত। আর সেনেনমুট? তিনিও আছেন। বালি থেকে উদ্ধার করা অন্ত্যেষ্টি মন্দিরের পার্শ্বভাগে, ভূগর্ভে নির্দিষ্ট স্থানে সমাধিস্থ। হয়তো দুজনে পুনর্জীবন পেয়েছেন অমৃতলোকে।

★ ★ ★

লেখা শেষ ফতিমার। জানালা দিয়ে দেখে দূরে নীল নদ। এর তীরে কত সভ্যতার উত্থান-পতন। প্রাচীন ফারাও যুগের পরে এসেছে গ্রিক রোমান বাইজেনটাইন পর্ব। কিছুই স্থায়ী হয়নি। আরব মুসলিম যুগও একদিন সমাপ্ত হবে। হাসিনাদের লড়াইয়ের জন্য নয়, কালের নিয়মে। নীল নদের তীরে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা। অনিত্য পৃথিবীর ঊর্ধ্বে অনন্তলোকবাসিনী হাটশেপসুটের কাহিনী বেঁচে থাকবে চিরকাল।

দিদি

জিষ্ণু বসু

কাজটা যে এত সহজে হয়ে যাবে পিন্টুরা ভাবতেও পারেনি। একটা উপস্থিত বুদ্ধি পিন্টুকে একেবারে হিরো করে দিয়েছে। সকলের চোখে মুখে জয়ের উচ্ছ্বাস। লিটনদাকে দু-তিনবার ফোন করা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার প্রোগ্রামও পাক্কা, দলে টোটনের বয়সটাই সবচেয়ে কম, ওই 'গুরু'কে সন্ধ্যার আইটেম ঠিক করে দিয়েছে। চিকেন রেশমী কাবাব, ড্রাই রেওয়াজী খাসির কোনও একটা ঝাকাস্ আইটেম আর তিনটে অ্যান্টিকুইটির সেভেন ফিফ্‌টি। বলেই মনে হল পিন্টু তো হুইস্কি খাবে না। আর আজকে তো ওই হিরো। আবার ফোন— 'গুরু, তোমার দিল কা টুকড়া, বাঙ্গাল তো খাঁটি কমরেড। ভদ্‌কা ছাড়া খাবেন না। একটা ভোলগা সেভেন ফিফ্‌টিও আনিও, কী? ও একা কেন খাবে? আমরা কি একটু ভোলগার জল খাব না? আজ তুমি কিছুতেই না করতে পারবে না। সারা জীবনে শালা এত আনন্দ পাইনি, আর পাবও না। ওই বেজন্মার বাচ্চা, মাস্টারের থোবড়াটা যদি দেখতে, ফাটিয়ে পুরো ধুনে দিয়েছি। হ্যালো... হ্যালো... কেটে গেল...।'

টোটন মোবাইলটা পকেটে রেখে, পিন্টুর দিকে ফিরল। — 'আমার ভুল হবে না বস, কার কি পছন্দ..'। কি

গো চুপ মেরে গেলে কেন হঠাৎ? পিন্টু কোনও উত্তর দেয় না। টাটা সুমোটা ছুটে চলেছে বারুইপুরের দিকে। জানালা দিয়ে পেছনে ছুটে যাচ্ছে রাস্তার পাশের সবুজ ধানক্ষেত। ঝক্‌ঝকে শরতের আকশকে ছুঁয়েছে সবুজ। গাঢ়, হালকা, আরও হালকা সবুজের পরত মাঠ জুড়ে। মাঝে মাঝে সবুজ আর নীলের ক্যানভাসে উড়ে এসে আবার হারিয়ে যাচ্ছে সাদা সাদা বক আরও কী সব পাখি।

আমতলার মোড়ে এসে ওরা দাঁড় করালো গাড়িটা। চা খেতে হবে। হইহই করে নেমে পড়ল সকলে। পিন্টু নামেনি। সকলের জন্য চা আর ডবল ডিম দিয়ে পাঁউরুটির অর্ডার দিল সিরাজ। ও দলের সবচেয়ে সিনিয়র। লিটন এসব কাজে ওর উপরই সবচেয়ে বেশি ভরসা করে। সিরাজ খেয়াল করল, পিন্টু নামেনি। ও হাঁক দেয়— 'আরে বাঙাল নামবে না? এসো মানিক, একটু ডিম টোস্ট আর চা সাটিয়ে যাও।'

পিন্টুর নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু না নামলে সবাই ভাববে ওর ভাও বেড়ে গেছে। ও নেমে এসে চায়ের ভাঁড়টা নিল। একটা চুমুক দিয়ে টোটনের কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল— 'ইস্, দিদি বললাম কেন?'

টোটন গরম ডিম পাঁউরুটি মুখে দিয়ে দিয়েছিল। মুখ হা করে ঠাণ্ডা করছিল। কোনও মতে গিলে ফেলে বলল— 'দিদি বললাম কেন মানে? তোমার ওই ছকেই তো বিট হল। না হলে আজ পাবলিকে পেঁদিয়ে পুঁটকি পাট করে দিত। সত্যি তোমাদের বাঙালদের মাথায় শালা হেভি বুদ্ধি...'

সত্যি আজ পিন্টুর বুদ্ধি তেই বেঁচেছে ওরা। পরিস্থিতি একেবারে উল্টো দিকে ঘুরে গিয়েছিল। ঝিঙ্কির হাট চার মাথার মোড়ে ওরা আজ মার খেয়ে ফ্ল্যাট হয়ে যেত।

আগে থেকেই খবর ছিল যে মাস্টার পৌনে দশটা নাগাদ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে স্কুলের দিকে আসবে। রোজ এই সময়ই নামে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কয়েক পা এগোতেই ওরা চড়াও হয়।

'এই যে নাগর, মাধবীর সঙ্গে লটর-পটর কবে থেকে? শালা মুখখানা দেখ, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।'

শুভায়ু একেবারে হতচকিয়ে যায়, 'আপনারা, আপনারা কারা?'

'তোর বাবা! তার বাবাও বলতে পারিস।'

টোটন প্রথমেই একটা চড় মারে শুভায়ুর গালে— 'শুওরের বাচ্চা, লিটনদার সঙ্গে পেঁয়াজি। তোর প্রেম করার শখ আজ মিটিয়ে দেব।'

শুভায়ু ততক্ষণে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল কিসের জন্য এই হামলা। কিন্তু ও কিছু বলে ওঠার আগেই ওরা চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর। দু-তিন মিনিটের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে সে।

আর ঠিক সেই সময়ই এক অন্য মোড় নেয় ঘটনাটা। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা চায়ের দোকানে দু'জন প্রৌঢ় বসেছিলেন। ওরা চারজনে মাস্টারের উপর হামলা করছে দেখে দু'জনই এগিয়ে আসেন। 'আরে, আপনারা মাস্টারমশায়কে মারছেন কেন? আপনারা কারা?'

সিরাজ সহজ উত্তর দেয়— 'নিজের কাজে যান দাদু। এই মাস্টার মেয়েছেলে নিয়ে মস্তি করছিল। তাই একটু...'

'কি করেছেন মাস্টারমশাই, যে আপনারা....'

চাঁদু খুব কম কথা বলে। ও প্রৌঢ়ের হাতের দাবনাটা ধরে টেনে সরিয়ে দেয় একটু দূরে। 'ভাগ শালা।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক এর মধ্যেই মোবাইল ফোন বের করে কথা বলছিলেন। সম্ভবত, ওঁর ফোনেই চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে জনাদশেক লোক জায়গাটায় জড়ো হয়ে যায়। জনতার প্রশ্ন, 'হঠাৎ কি জন্য এভাবে মারা হল মাস্টারমশাইকে?'

ভিড়ের মধ্যে তিন-চারজন ওদের একদম কাছে চলে আসে, 'আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

টোটন সিরাজের কানে কানে বলে— মেসিন বের করবে নাকি?'

সিরাজ অনেক অভিজ্ঞ, ওকে একটু ধমক দেয়— 'চুপ কর!' তারপর ভিড়ের দিকে এগিয়ে বোঝাতে থাকে, 'দেখুন, এই লোকটা বহুদিন ধরে....'

কিন্তু আবহাওয়া ক্রমশ ওদের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। ভিড়ের মধ্যে কমবয়সী দু-একজন উৎসাহী চার জনের দিকে দু-একবার তেড়েও আসে।

এরমধ্যে একটি ছেলে এসে বলে, 'মাস্টারমশাইকে এরা খুব মেরেছে। ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। কি যেন বিড়বিড় করে বলছেন— এরা লিটন না কার লোক।'

ভিভের মধ্যে থেকে প্রশ্ন আসে, 'কি ভাই, কে পাঠিয়েছে তোমাদের, কে ওই লিটন?'

হঠাৎ পিন্টু চিৎকার শুরু করে, ওর আকস্মিক চিৎকারে সমবেত জনতা তো বটেই, ওর দলের বাকি তিনজনও হকচকিয়ে যায়। রাস্তার ধারে বসে পড়া প্রায় অচৈতন্য শুভায়ুকে দেখিয়ে বলে, 'আপনারা ওকে চেনেন? কতবড় শয়তান এটা। আমার দিদিটারে দিনের পর দিন বিরক্ত করছে। গত পরশু রাস্তার মাঝখানে দু-তিন জন বন্ধুরে নিয়ে এমন অসভ্যতা করেছে, যে ওই রাত্রেই দিদি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল।'

সমবেত জনতার উত্তেজিত স্বর যেন থমকে যায়, দু-একজন পরস্পর ফিসফিস শুরু করে। সুযোগ বুঝে পিন্টু একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। 'বিশ্বাস না হয়, আমার দিদির সঙ্গে যে কেউ কথা বলুন। আর লিটন কে জিজ্ঞাসা করছেন? উনিই আমার জামাইবাবু হবেন। আমাদের এলাকার একজন নামকরা সমাজসেবী লিটনদা,

বছরে দুটো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, ফাংশান, কত যে সমাজসেবার কাজ করেন। আর এই হারামজাদা খালি আমার দিদির পিছনে লেগে আছে। দাঁড়ান, বিশ্বাস না হয় আমি ফোন করতেসি দিদিকে।'

পিন্টু পকেট থেকে মোবাইল বার করে মাধবীর নম্বর লাগায়। 'দিদি আমি বলছি, আচ্ছা পরশু যে মাস্টার তোমার সঙ্গে ... হ্যাঁ কি নাম মাস্টারের, শুভায়ু না? শুভায়ু দাস। এই মেসোমশাই, প্রথমে আসা দু'জন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজনের হাতে মোবাইলটা দেয় পিন্টু— জিজ্ঞাসা করুন দিদিকে...'

প্রৌঢ় স্পষ্টত অপ্রস্তুত, 'কি কি জিজ্ঞাসা করব আমি?'

পিন্টু এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে— 'জিজ্ঞাসা করুন এই মাস্টারই কি না?'

প্রৌঢ় বলেন, 'আপনি ঝিঙ্কিহাট হাইস্কুলের মাস্টার মশাই, শুভায়ুবাবুর কথা বলছেন?'

উল্টোদিকে সম্মতি সূচক উত্তর পেয়ে গলা একেবারে নরম হয় ভদ্রলোকের, 'না, মানে আমরা তো ওনাকে খুব ভদ্র বলেই...'

কথাটা শেষ হতে দেয় না পিন্টু। ভদ্রলোকের হাত থেকে প্রায় ছো-মেরে কেড়ে নেয় ফোনটা। 'ঠিক আছে, দিদি পরে কথা বলতাসি। এখন রাখি।'

কথা বলতে বলতে পিন্টু গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। বাঁ হাতে সিরাজের হাতটা ধরে টেনে ইঙ্গিত দেয়। সিরাজ সকলকে নিয়ে গাড়িতে বসে। সবশেষে ওঠে পিন্টু। সমবেত জনতার হতভম্ব ভাব তখনও কাটেনি।

পিন্টু গাড়িতে ওঠার আগে, মাটিতে বসে পড়া শুভায়ুকে আবার সজোরে লাথি মারে। 'আর যদি কখনও দিদির পিছনে লেগেছিস, তো তোরে কেটে টুকরো করে না... কেটে টুকরা করে করে কুকুররে খাওয়াব রে হারামজাদা।'

গাড়িতে উঠেও চেঁচাচ্ছে পিন্টু। 'যদি আপনাদের কারও কোনও প্রশ্ন থাকে তো ক্যানিং বাসস্ট্যাণ্ডে চলে আসবেন। আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে গেলাম। লিখে নেন, নাইন টু থিরি এইট...। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে প্রায় কিছুই শোনা যাচ্ছে না। 'ফাইভ টু....' গাড়ি ঝট করে চলতে শুরু করে, পিন্টু মুখ বাড়িয়ে ওইসব বলছিল। আচমকা ঝট্‌কায় ধপ্ করে বসে পড়ে সিটে, বসেই স্বগোতোক্তি করে, 'হালা, পুঙ্গির ভাই।' গাড়ি কয়েক সেকেণ্ডে পিক্ আপ নিয়ে নেয়।

তারপর গাড়ির স্পীড আর সত্তরের নিচে নামেনি। প্রথম থামল পনের কিলোমিটার পরে। আমতলায়। চা খেতে।

চা খাওয়া শেষ। অনেক অনুরোধেও পিন্টু চা ছাড়া কিছু খায়নি। চায়ের দোকানদার সবার জন্য ডিম টোস্ট করে ফেলেছিল। পিন্টুর ভাগেরটাও টোটনই খেল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। পিন্টু বাইরেই তাকিয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে সকলের উল্লাস, হুল্লোড় চিৎকার কিছুই তার যেন কানে আসছে না। জানলার বাইরে ছুটে যাওয়া আদিগন্ত মাঠের সঙ্গে তার মনও অনেক দূরে ছুটে চলেছে।

নববই সালের পর থেকেই পিন্টু ইণ্ডিয়াতে এক পা বাড়িয়ে আছে। ডকঘাটের কাছে ছোট একটা দোকান নিয়েছিল দেশ থেকে আনা টাকায়। ওর মাথাটা বরাবরই পরিষ্কার। প্রথমবার পিন্টু আর ওর জ্যাঠতুতো দাদা রঘুনাথ দুজনে এদেশে এসেছিল ব্যানাপোল বর্ডার দিয়ে। গোবরডাঙ্গা স্টেশনে বেমক্কা ধরা পড়ে গেল রঘু। রাত তখন আটটা। রঘুর সব কিছুতেই খুব আগ্রহ। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এখান দিয়ে কি সারা রাতই ট্রেন যায়?' ভদ্রলোক কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশ এগিয়ে এল, 'বাড়ি কোথা তোমার?'

রঘু চমকে গিয়ে দ্যাখে সামনে পুলিশ। কি বলবে, বাড়ি কোথায়? একটু ইতস্তত করে বলে— 'কেন, ইণ্ডিয়ায়।'

ব্যাস, ওই পুলিশকর্মী ডেকে আনল আরও দুজন পুলিশের পোশাক পরা লোককে। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। ছোট্ট পিন্টুর মাথায় তখনই খেলে গেছে, এরপর ভাল কিছু হবে না। পিন্টু এক পা দু-পা করে সরে যেতে থাকে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকে গেছে। পিন্টু ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে, ট্রেনে উঠে পড়ে। ওঠার সময় রঘুর গলা শুনতে পায়— 'ভাই, ভাই, আমার ভাই চলে গেল।'

তখন কতই বা বয়স পিন্টুর! কিন্তু ওই আসল কথাটা ঠিক মনে ছিল। যেতে হবে ক্যানিং, ক্যানিং স্টেশনের ডানদিকে হেঁটে দশ মিনিট গেলেই ফুলকাকার মিস্টির দোকান। ফুলকাকা, পিন্টুর বাবার এক তুতো ভাই। শেষবার যখন ফুলকাকা বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, তখন মা-বাপ মরা পিন্টুকে উনিই বলেছিলেন, ইণ্ডিয়ায় চলে আসতে। রঘুর কিছু উপায় হচ্ছে না, তাই পিন্টুকে দিতে আসার নাম করে সে সঙ্গ নিয়েছিল।

শুনেছে ফুলকাকার মোটামুটি চালু মিষ্টির দোকান। নিজের ঘরের লোক থাকলে সুবিধাই হবে। যাই হোক, পিন্টু ট্রেনের টিকিট ছাড়া, হাতে পয়সা ছাড়াই ঠিকঠাক পৌঁছেছিল ক্যানিংয়ের কাকার দোকানে।

মাসখানেক পরে খবর আসে, রঘুনাথ বাড়ি ফিরে গেছে। ফুলকাকার দোকানে প্রথম দু-বছর খুব মন দিয়ে কাজ করেছিল পিন্টু। খুব খাটত। ভোরে উঠে সিঙ্গাড়ার আলু সেদ্ধ দিয়ে দিত। সারাদিন কি কাউন্টারে, কি ভিয়েনে যখন যেখানে দরকার ছুটে গিয়ে

দাঁড়াত। আবার বিকেলে ট্রেনে করে গিয়ে শিয়ালদা থেকে ছানা নিয়ে রাত্রে ফিরত। বছর কয়েক পরে পিন্টু আবার দেশে গেল। দেশ থেকে ফিরে আর কাকার দোকানে বসেনি। ডকঘাটে একটা দোকান কিনে নিজেই বসে গেল। ততদিনে অনেক লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে ওর। ধীরে ধীরে পার্টিরও খুব সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠল পিন্টু। লিটনের সবসময়ের সঙ্গী। পার্টির মধ্যে তখন বেশ টানাপোড়েন। হাওয়াই শার্ট গায়ে, চোখে বোতলের নিচের মতো মোটা কাঁচের চশমা পরা, ষাট-বাষট্টি বছরের লোকগুলো তখনও আসত পার্টি অফিসে। এসে শুধু জ্ঞানের কথা বলত। কিসব বাহাত্তর সাল, খাদ্য আন্দোলন, এসব নিয়ে কপ্‌চাতো। অন্যদিকে লিটন এই বন্দর বাজারের রূপোর খনিগুলোর কাছাকাছি ঘুরতো। পার্টির কোনও প্রোগ্রামের খরচ তুলতে লিটনই ভরসা। প্রথমে জেলা নেতারা, তারপর জেলা থেকে ওঠা মন্ত্রীরাও চিনে গেল লিটনকে। পার্টি অফিস থেকে আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকল মোটা কাঁচের চশমা আর খক্ খক্ কাশি। পিন্টুর মতো লতাগুল্ম লিটনকে জাপ্টে ধরে উঠতে চাইল ওপরে।

সেই সময়ই মাধবীর আবির্ভাব। লিটন তখনও প্রোমোটারি করে। বড় বড় কাজগুলো নিজে করে, আর ছোটগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় চেলাদের। আবার কোনও কোনও কেসে শুধু পার্টির অভয়হস্তই ঠিকেদারের মাথায় ঠেকিয়ে দেয়, নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে।

মাধবীদের বাড়িটা প্রায় বড় রাস্তার উপরেই। চল্লিশ ফুট রাস্তার পাশেই আট কাঠা জমির ওপর বাড়ি। স্বাভাবিক কারণেই দালালদের জিভ লক্‌লক্ করবে। মাধবীর বাবারা ছিল দুই ভাই। বড় ভাই প্রাদের এক ছেলে। ছেলে লেখাপড়ায় আহামরি কিছু না হলেও, কোথাও না ঠেকে বিএ পর্যন্ত পাশ করেছিল। প্রাদ ব্যাঙ্কের পিওনের চাকরি করত। সাহেবদের বলে কয়ে বি-এ পাশ ছেলেকে ঢুকিয়ে দিতে খুব অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হল পোস্টিং নিয়ে। ভিক্ষের চালের কাড়া-আকাড়া বাছলে তো চলে না। ছেলের প্রথম সতের বছর পোস্টিং হল আন্দামানে, তারপর আরও কয়েক বছর এদিক-ওদিক করে বছর পঁচিশেক পরে যখন বিপ্লব বাংলায় ফিরল,তখন তার নিজের মেয়েই ম্যানেজমেন্টে বিবিএ করে ফেলেছে। বিবিএ করা মেয়ে বা তার মা কারোরই ক্যানিংয়ে থাকার প্রশ্ন নেই। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে পাকাপাকি ভাবে থেকে গেছে বিপ্লব।

মাধবীর বাবা মেঘনাদ ক্যানিং বিডিও অফিসে কাজ করতেন। ওদের ক্যানিংয়ের বাড়িঘর সব মেঘনাদের হাতে বানানো। বড় ভাই প্রাদ কলকাতায় চাকরি করতেন, সকালে বেরিয়ে ফিরতেন অনেক রাত্রে। তাই মেঘনাদই বাস্তু সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রাদের ছেলে বিপ্লবের বয়স যখন মাত্র দশ কি বারো, ওর মা মারা গেলেন। মেঘনাদের স্ত্রী সরলাই ভাসুর আর ভাসুরের ছেলের সেবাযত্নের দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই সেবা তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নিষ্ঠা ভরে করে গেছে। সরলার নিজের ছেলে ছিল না। শুধু মেয়ে, মাধবী। বাড়ির একমাত্র ছেলে বিপ্লবের যত্নের তাই কখনও কোনও ত্রুটি রাখেনি সে। মাছের মাথা কি ক্ষীর করা দুধ, বেশিটাই ভাসুরের ছেলেকেই দিত। তাছাড়া মাধবী হল অনেক পরে। সরলার একটা সমস্যা ছিল, অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে, ওর যখন চল্লিশ পেরিয়ে একচল্লিশ, তখন পেটে এল এই মেয়ে। ততদিনে বিপ্লব স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজে। তারপর যখন বিপ্লব চাকরি নিয়ে বাইরে গেল, তখনও একলা বৃদ্ধ ভাসুরকে কোনও কষ্ট পেতে দেয়নি সরলা।

সেদিনটা ছিল মাঘ মাসেরই একটা সকাল। আগের দু-তিন দিন ধরেই চলছিল অসময়ের বৃষ্টি। ঘটনার দিনেও সকালে রেডিও খুলেছিল সরলা। রেডিওতে সকালে ভক্তিমূলক গানের একটা অনুষ্ঠান হত, 'সুভাষিত' না কি একটা নামের প্রোগ্রাম। সরলা সকালের কাজ শুরু করতে করতে শুনত সেটা। মেয়ে মাধবীর সেবার মাধ্যমিক। বার দুয়েক ডেকে এসেছে উঠে পড়তে বসার জন্য। 'কিরে মাধু, উঠবি না? সকালে উঠে কোথাকার লোক কোথায় চলে গেল। আর তুই সেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস।' মাধবী লেপের ভেতর থেকে সাড়া দিল, 'হুঁ।'

'হুঁ কিরে? ওঠ! রেডিওতে বলল, নিম্নচাপ আরও এক দু-দিন চলবে।'

'ওরে বাবা, তাই!' বলে মাধবী লেপটাকে টেনে নিয়ে আবার গুঁড়িশুড়ি দিয়ে শুল। এমন সময় দোতলার উপর থেকে চিৎকার এল— 'বৌমা, আমার গরম জলটা কি পাব না?'

ভাসুরের চিৎকার শুনে, সন্ত্রস্ত সরলার উত্তর, 'হ্যাঁ, দিয়ে আসছি।'

সকালে উঠে কবোষ্ণ জলে গারগেল করা প্রাদের বহুদিনের অভ্যাস। ঠিক সময়ে জল গরমও বসিয়েছে সরলা, এই মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে ভুলে গেছে। গরম জলের পাত্র সাঁড়াশি দিয়ে ধরে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিল সরলা, বাঁ হাতে ধরা শুকনো গামছা। ভাসুরের গারগেল করতে দুটোই লাগবে। সেই সময়ই হল বিপত্তি। পিছল সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল সরলা। হার্ট, হিমোগ্লোবিন, লাঙ্স অনেক কিছুই অনেকদিন ধরে আপত্তি জানাচ্ছিল, সরলা সংসারের চাপে সেসব গা করেনি। সংসারকে দিয়ে যাবার কর্তব্যটা সরলার মাথায় ছিল, উদয় অস্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছে যে মহিলা তার বাঁচার ন্যূনতম ওষুধ বা পথ্য সময়মত

আনাটাও যে সংসারটার কর্তব্য সেটা আর কারও মাথায় ছিল না। ক্যানিং হাসপাতাল সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাঙ্গুরে রেফার করেছিল সরলাকে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করে শহরে পাঠাতে পাঠাতে একটু দেরিই হল। রাস্তাতেই মাধবীর কোলে মাথা রেখে চলে গেল মা।

প্রকৃতির জল হাওয়া আলো যেমন স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যায়, মায়ের সব সেবা এতকাল মাধবী সেভাবেই পেয়েছে। সূর্য আলো দেওয়ার জন্য, নদী হাওয়া দেওয়ার জন্য বা মাটি জল দেবার জন্য কেউ তাদের ধন্যবাদ দেয় নাকি? তাই মাকে এতদিন বোঝেনি মাধবী। মা চলে যাবার পর সংসারের হাঁড়ি ঠেলার অনেকটা দায়িত্বই ওর উপর পড়ল। এত কিছুর পরও মাধবী মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। রেজাল্ট পেয়েই দাদা বিপ্লবকে ফোনে জানিয়েছিল মাধবী। এস টি ডি বুথের লোকটা যখন দাদার নম্বরটা ধরিয়ে দিল, মাধবী তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। নম্বর আর ডিভিশন শুনে বিপ্লব বলেছিল, 'আজকাল তো সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পায়। এখন বোর্ডের সেকেণ্ড ডিভিশনের স্ট্যাম্পটা টয়লেটে পড়ে হারিয়ে গেছে। যাক, তুই পাশ করেছিস আর কি'। মাধবী ভেবেছিল বাড়ি ফেরার পথে বাবা আর জ্যাঠার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবে। সে মিষ্টি আনতে আর ইচ্ছে করল না। আর কিই হবে মিষ্টি এনে! কেই বা খাবে! মা চলে যাবার পর বাবা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যে মানুষটা শুধু দিয়েই গেছে, তার বেঁচে থাকার জন্য সামান্য যেটুকু করা উচিত ছিল, সেটা মাধবীদের পরিবারের কেউ করেনি। এটা মাধবীর মনে ঘুরেফিরেই আসে। বোধহয় বাবার মনকেও সেটাই কুরে কুরে খেত। মা'র মৃত্যুর পর বাবা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। যদিও ও বাড়ির কাছেই ডেভিড শেশুন স্কুলে সায়েন্সও পেয়ে যেত, কিন্তু সাহস হয়নি ওর। উচ্চমাধ্যমিকে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর দর্শন কম্বিনেশন ছিল মাধবীর। বাড়ির কাজ আর লেখাপড়ার চাপ যখন প্রায় আয়ত্তে এনে ফেলেছিল মাধবী, তখনই বাবা মারা গেলেন। মা মারা যাওয়ার এক বছরও তখন পূর্ণ হয়নি। ক্যানিং বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা ছুটন্ত অটোরিক্সা ধাক্কা মেরেছিল মেঘনাদকে। হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে চলার জন্যই এই দুর্ঘটনা। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে ভর্তির পরে বোঝা গেল অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মা'কে চোখের সামনে মারা যেতে দেখেছে মাধবী, বাবাকে বাঁচাতে ও তখন ব্যাকুল। প্রতিবেশীরা পরামর্শ দিল, সরকারি হাসপাতালে না দিয়ে, কোনও নার্সিংহোমে দিলে হয়তো বাঁচানো যাবে বাবাকে। ঘরে বা ব্যাঙ্কে বিশেষ টাকা নেই। মাধবী ছোট থেকে শিখে এসেছিল, এই বাড়িতে কাজ করার দায়িত্ব মাধবীর বাবা বা মায়ের আর সিদ্ধান্ত নেওয়াটা জেঠুদের। জেঠু বড়, কলকাতায় যায় আসে, অনেক দেখেছে, অনেক বোঝে, তার সিদ্ধান্তই ঠিক হবে। মাধবী জেঠুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওর বাবাকে নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে কোনও নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে কিনা। জেঠু একটু ভেবে বলেছিলেন— 'একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।'

দাদা বিপ্লব তখন কলকাতায় ফেরার মুখে। ফ্ল্যাটের অ্যাডভান্স কলকাতায় দাদার শালাবাবুর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। খুড়তুতো বোন মাধবীর মুখে কাকাকে নার্সিংহোমে ভর্তির কথা শুনেই বলল— 'কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলো বেশ ভালোই হয়েছে। শুধু শুধু...'

মাধবীর মা মারা যাওয়ার পরে বিপ্লব আসতে পারেনি, মেঘনাদের আঁশপান্নার দিন এল ক্যানিংয়ের বাড়িতে। সেদিনই বলে গিয়েছিল কলকাতায় এসেই নিজের বাবাকে আর খুড়তুতো বোন মাধবীকে নিয়ে যাবে কলকাতায়। দাদা কলকাতার ফ্ল্যাটে উঠে এল ঠিকই, কিন্তু দু'জনের কাউকেই নিয়ে যায়নি। নিজের রান্না, জ্যাঠামশাইয়ের সেবাযত্ন সবকিছু সামলে কোনওক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যায় মেয়েটা। উচ্চমাধ্যমিকে সেকেণ্ড ডিভিশন। ইতিহাস নিয়ে শিয়ালদার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হল মাধবী। দাদা বিপ্লবের ফ্ল্যাট কাঁকুড়গাছিতে। কলেজে ভর্তি হয়ে বেশ কয়েকবার গিয়েছিল দাদার ফ্ল্যাটে। বেশিরভাগই জেঠামশাইয়ের অসুস্থতার খবর দিতে। জেঠামশাইয়ের শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছিল। মাধবীর বাবার জমানো কিছু টাকা, জ্যাঠামশাইয়ের পেনসন আর বাড়ির আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছ থেকে সামান্য আয় থেকে কোনওমতে চলত ওদের। দাদার বাড়িতে এসে খুব লোভ হত, ইস্ যদি কাঁকুড়গাছি থেকে কলেজ করতে পারত। সেই ক্যানিং থেকে এই ভিড় ট্রেনে ঠেলে রোজ আর এতদূরে আসতে হত না।

বিপ্লব মন দিয়ে মাধবীর রিপোর্টিং শুনত, ঘাড় নাড়ত। কখনও কখনও কিছু কিছু টাকাও দিত। তবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবাকে কলকাতা ফ্ল্যাটে আনেনি। প্রাদ কলকাতায় এলেন অ্যাম্বুলেন্সে করে, ছেলের ফ্ল্যাট নয়, নার্সিংহোমে। কলকাতার বড় নার্সিংহোমে দিন পাঁচেক থেকে চিরদিনের মতো চলে গেলেন মাধবীর জ্যাঠামশায়। জ্যাঠামশায়ের দাহ শেষে দাদার বাড়িতে রাত্রে ছিল মাধবী। সেই প্রথম আর সেই শেষ থাকা ওখানে। আর কখনও কোনও রাত্রে ওর দাদার

কলকাতার ফ্লাটে থাকা হয়নি। জ্যাঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ ও ক্যানিংয়েই করা হল। সেই ক'দিন ক্যানিংয়ের বাড়িতে ছিল বিপ্লব। শ্রাদ্ধাদি কাজ মিটে যাওয়ার দু-দিনের মধ্যেই বাড়ি এল জমির দালালরা। দোতলার যে ঘরটাতে জ্যাঠামশায় থাকতেন, সেই ঘরেরই দরজা বন্ধ করে আলোচনা হল বিপ্লব আর জমির প্রোমোটারদের। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে গেল বিপ্লব।

জ্যাঠামশায়ের শ্রাদ্ধ শান্তির পাঠ চুকে গেলে বাড়িটা একদম খালি হয়ে গেল। মাধবীর থেকে থেকে বুকের মধ্যেটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। এই পৃথিবীতে তার নিজের বলে কেউ রইল না, কোথাও না। পাড়ায় কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকেন গীতা মাসি। গীতা মাসি সন্ধ্যা থেকে এসে মাধবীর সঙ্গে গল্প করে। সেই পুরনো সব গল্প। মাধবীর বাবা যেদিন বিয়ে করে ফিরল। বাবা, জ্যাঠা, মা, জেঠিমাকে নিয়ে ভরাট সংসারের গল্প। মাধবীর সেবার বি এ পরীক্ষার ফাইনাল। সন্ধ্যাবেলা ও পড়তে বসে। সেই সময়েই আসে গীতা মাসি, আর পড়ার থেকে মাসির গল্প শুনতেই যেন বেশি ভালো লাগে। গীতা মাসি যেন গুমোট ঘরে মাতলা নদীর এক দমক হাওয়া। গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়।

একদিন কলেজে যাওয়ার জন্য মাধবী তৈরি হয়ে বার হয়েছে। দেখল কয়েকজন লোক ফিতে, দড়ি এসব নিয়ে ওদের জমিই মাপছে। একটু অবাকই হল সে। জিজ্ঞাসা করতেই লোকগুলো বলল, এই জমি প্লটিং করে বিক্রি হবে, তাই মাপা হচ্ছে। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাধবীর। কলেজের ব্যাগ বই ঘরে রেখে গীতা মাসির বাড়িতে গেল ছুটে। গীতা মাসির ছেলে রবিদা খবর নিয়ে এল, মাধবীর দাদা বিপ্লব নাকি ইতিমধ্যেই বায়নার টাকা নিয়ে ফেলেছে। তখনই দাদাকে ফোন, দাদা তখন অফিসে। বৌদি বলল, ঘটনাটা সত্যি, বিপ্লবই ক্যানিংয়ে আসত কয়েক দিনের মধ্যে। তখনই মাধবীকে বলবে ঠিক করেছিল বিষয়টা। তাছাড়া মাধবীর সইটাও বাকি আছে।

'আমার সই মানে? আমার মতামত না নিয়ে দাদা, আমাদের বাপ-জ্যাঠার জমি....'

বৌদি কখনওই মাধবীদের মতো নট-আপ-টু-দা মার্ক লোকেদের কথা পুরো শোনার ধৈর্য থাকে না। আর ফোনে এসব ঘ্যানঘ্যানানি শোনার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিনা বাক্যব্যয়ে ফোনটা রেখে দিল।

ফোনের বুথ থেকে বের হয়ে মাধবী ভাবতে বসল কি করবে? সারাদিন একে ওকে ধরাধরি, অনুরোধ করল। সবশেষে একটা নামই উঠে এল, লিটন। ওর লোকই জমি নিয়েছে, ওকে হাতে-পায়ে ধরলে যদি কিছু হয়।

গীতা মাসির ছেলে রবিদাই লিটনের সঙ্গে মাধবীর কথা বলার ব্যবস্থা করে দিল। মাধবীদের বাড়িতেই এল

লিটন। সঙ্গে দু'জন সাগরেদ। তার একজন ছিল পিন্টু। প্রথমে এসেই পিন্টুরা খুব হম্বিতম্বি করেছিল। কবে উঠে যাবেন, সই কবে করবেন, এসব কথা। মাধবী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। লিটনের কি মনে হল, সাগরেদদের থামিয়ে দিয়ে, মাধবীকে খুব আস্তে আস্তে বলল— 'আপনি কি চাইছেন?'

মাধবী তখনও ফোঁপাচ্ছে— 'আমি কি চাইছি মানে? আমি, আমি এখানে থাকতে চাই।'

লিটন ধীর-স্থির, 'এত বড় বাড়ি, এতটা জমি সম্পত্তি আপনি একা থাকবেন? বিক্রি করলে তো আপনিও টাকা পাবেন। আপনার অংশ যাতে আপনি ঠিকঠাক পান, সেটা না হয় আমরা দেখব।'

'টাকা নিয়ে কি করব, কোথায় যাব আমি একা, একজন মেয়ে?'

'দেখুন, আপনি যে টাকা পাবেন, তাতে একটু শহরের কাছাকাছি কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারেন, ছোটখাট ফ্ল্যাটও হয় তো পেয়ে যাবেন।'

'আমি এখানে থাকব, এখানে তবু সকলে আমায় চেনে, অন্য জায়গায় আমি...'

গীতা মাসি, রবিদা আরও দু-চারজন প্রতিবেশীও সেদিন হাজির ছিল সেখানে। মাধবী আবার কাঁদছে।

পিন্টু বা অন্য ছেলেটা দু-একবার খেঁকিয়ে উঠেছিল। লিটন হাতের ইঙ্গিতে চুপ করেতে বলেছে।

লিটনের পরে প্রস্তাব, 'তাছাড়া আমরা হয় তো জমির সামনেটায় একটা মার্কেট কমপ্লেক্স বানাব। তার তিনতলায় কয়েকটা ফ্ল্যাটও হবে। তার একটা আপনি পেতে পারেন। আর এর মধ্যের বছর কয়েক কোথাও ভাড়া থাকুন।'

'না, আমার বাবার হাতে তৈরি বাড়ি, আমাদের নিজেদের বাড়ি ভাঙ্গতে দেব না। কিছুতেই না।'

পিন্টু চিরকালই একটু বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'আচ্ছা দিদি, নমস্কার, আমরা জমি, বাড়ি সবই নেব। আপনি কোর্টে গিয়ে আমাদের আটকান, চলে এসো লিটনদা।'

সেদিন সত্যিই চলে গিয়েছিল ওরা। ওরা যাবার পরে পাড়ার যেকজন হিতাকাঙ্খী সেদিন এসেছিলেন, তারা আলোচনায় বসেছিলেন। বহু রাত পর্যন্ত মাধবীকে সকলে বোঝায়, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারি করে কোনও কিছু লাভ হবে না। সেই লোকবলও নেই, অর্থবলও নেই। আর পার্টি যেখানে লিটনদের হাতের মুঠোয়, মাধবীর ওই আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সেদিন প্রায় সারারাত ঠাকুরের আসনের সামনে কেঁদেছিল মাধবী। তারপর দিনও কলেজে যেতে পারেনি সে। অথচ আর ক'টা দিন ক্লাস হয়েই ছুটি পড়বে, ছুটির পরেই পরীক্ষা। কিছুই ভাবতে পারছিল না ও। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে গীতা মাসি ভাত, ডাল বা কিছু খাবার করে এনে জোর করে খাওয়াতেন, না হলে শুধু বসেই থাকত।

দু-তিন দিন পরে পিন্টু এল, বাইকটা বাড়ির সামনে স্ট্যাণ্ড করে চোখের রোদচশমাটা ফিল্মের নায়কদের মতো খুলে, সেটা জামায় মুছতে মুছতে ঢুকল।

'দিদি, মাধবীদি বাড়ি আছেন?'

মাধবী ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

'আজ কি সারাদিন আপনি বাড়ি থাকবেন? লিটনদা আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

মাধবী কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। লিটনই বা কি ধান্ধায় আসবে! আজই উঠে যেতে বলবে না তো! ও শুধু বলল, 'আমি, আমি আবার কোথায় যাব?'

'না, আপনি কলেজে যান না। পরীক্ষাও তো সামনে। যাই হোক আজ যায়েন না। কাল থেকে যাবেন।'

মাধবী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে— 'আর পড়াশুনা..'

পিন্টু খানিকটা মাস্টারমশায়ের মতো সুরে বলল— 'সে কি কথা? পড়ালেখার কোনও বিকল্প আছে? আজকে দিনটা থাক, কাল থেকে আবার কলেজ যাবেন।'

মাধবী আকাশ থেকে পড়ল, এরা এত খবর রাখে? ওর কলেজ, পরীক্ষা সব পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আছে এদের কাছে।

একটু বেলার দিকে সত্যিই লিটন এল। মাধবীকে অবাক করে দিয়ে প্রথমেই বলল, 'ঠিক আছে, আপনি এই বাড়িতেই থাকবেন। যেমন আছেন। যেভাবে আছেন, আপনার দাদার সঙ্গে ও কথা হয়ে গেছে। বাড়ির সঙ্গে দু-কাঠা জমি বাদ দিয়ে বাকিটা আমরা নিয়ে নেব। তাতেও আপনি কিছু টাকা পাবেন। আপনি রাজি আছেন?

মাধবী ঠিক তখনই কিছু বলেনি। ওরা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর, ছুটে গেছে গীতা মাসিদের বাড়িতে। পাড়া হিতাকাঙ্খীরা সকলে একমত হয়ে রায় দিল, ভাবনা-চিন্তার কোনও জায়গাই নেই। বিনা দ্বিধায় মাধবীর রাজি হওয়া উচিত। কি কারণে দয়াপরবশ হয়ে লিটনরা এই সুযোগ দিয়েছে, এর থেকে ভাল কিছু ভাবাই যায় না। দু-একজন বলল, মাধবীর বাবা মেঘনাদ চিরকাল পার্টির সমর্থকই ছিল, মিটিং মিছিলেও যাতায়াত ছিল। তাই পার্টির কারও হস্তক্ষেপেই হয়তো লিটনের এই বদান্যতা।

মাধবী বিকেলেই খবর পাঠিয়ে দিল, ও রাজি। সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও আবার হাপুস নয়নে কেঁদেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় কোনও দেব-দেবীর ছবি তার মনে আসছিলই না, চোখ বন্ধ করলে একটা মুখই

বারবার আসছিল, সেটা লিটনের মুখ।

সত্যি, সত্যিই পরদিন থেকে কলেজে যেতে পেরেছিল মাধবী। সকালেই আমিন, মজুর, দড়ি ফিতে নিয়ে হাজির পিন্টু। বড় রাস্তা থেকে মাধবীর ভাগের যে জমি আর বাড়ি তা পর্যন্ত টানা দশ ফুটের রাস্তা দেওয়া হবে। সেইমতো মাধবীকে বুঝিয়ে দিয়ে, জমির সীমানার 'পেগ' করতে বলল পিন্টু। বোঝানো হয়ে গেলে, পিন্টু আবার মাস্টারমশায়ের সুরে বলল, 'ব্যাস, দিদি বুঝে নিয়েছেন? আর তো কিছু কাজ নেই। আপনি কলেজে চলে যান এবার।'

'ঠিক আছে, কাল থেকে যাব না হয়... ' মাধবী বলার চেষ্টা করে।

'কাল থেকে কেন? আজ যাবেন না কেন শুনি? আর একটা কথা, কোনও কিছু দরকার হলেই আমাদের খবর দেবেন।'

সত্যিই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। লিটনও এক-দুবার জিজ্ঞাসা করল, কোনও অসুবিধা আছে কিনা, পরীক্ষা কবে ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হল, পরের রবিবার, যখন মাধবীর দাদা বিপ্লব কথা বলতে এসেছিল। লিটনদের সঙ্গে একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল। বিপ্লব ওদের বাড়ির নিচের ঘর খুলে বসেছিল ওদের অপেক্ষায়। লিটন, পিন্টু ওরা এল কিছুক্ষণ পরে। এসে ঘরের মধ্যে বিপ্লবকে দেখে, পিন্টু নাটক শুরু করে দিল— 'একি দাদা আপনি এই বাড়িতে ঢুকে গেছেন, বাড়ির ওনারের পারমিশন নিয়েছেন।'

বিপ্লব হতবাক— 'না, মানে পারমিশন....'

লিটন মিটিমিটি হাসছে। পিন্টু নাটুকে গলায় বলে চলে, 'কালই তো রেজিস্ট্রি অফিসে, সব বুঝে শুনে সই করলেন। এ বাড়ি আর দু'কাঠা জমি বিক্রি হবে না, এর মালিক শ্রীমতি মাধবী মিত্র, পিতা ঈশ্বর ম্যাঘনাদ মিত্র, বাকি জমি বিক্রি করা হবে। আর আজই ভুলে গেলেন এ বাড়ির মালিক কে?'

এবার মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলে— 'কি দিদি পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকেছেন তো উনি?'

বিপ্লব চরম অপ্রস্তুত— 'ওর কাছে পারমিশন, মানে, ও তো আমার বোন...'

'হ্যাঁ, বোন, আর আপনি হলেন দাদা। একেবারে সুভদ্রার ভাই বলরামের মতো দাদা।' পিন্টুর কথায় লিটনরা হো হো করে হেসে ওঠে।

এরপর বিপ্লব আর ও বাড়িতে ঢোকেনি। একদিন শুধু জেঠুর ঘরের কিছু দামি আসবাব, বাসন এসব নিতে এসেছিল। মাধবী বিনা বাক্য ব্যয়ে ঘর খুলে দিয়েছে। জেঠিমার গহনা, আর দামী অন্যান্য জিনিস জেঠু মারা যাবার পরেই দাদা, বৌদি হিসেব করে বুঝে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিনও নিজেদের বাকি জিনিসপত্র গাড়িতে চাপিয়ে বিপ্লব চলে গেল। দাদা যাওয়ার সময় মাধবী নীচে নেমে এসে কথাও বলেনি।

লিটনদের দল সকাল-সন্ধ্যা ওদের জমির প্লটিং ডেভেলপিংয়ের কাজে আসত। লিটন মাঝে মধ্যেই আসত। প্রথম প্রথম ওরা মাধবীকে চা বানিয়ে দিতে বলত। তারপর লিটন এলে মাধবী নিজেই চা বানিয়ে দিয়ে যেত।

পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। লিটন মাধবীর জন্য একজন কাজের লোকও ঠিক করে দিয়েছিল। একদিন এসে বলল, 'তুমি শুধু পড়াশুনা করবে, ভাল রেজাল্ট করা চাই।'

সেদিন মাধবীর মনে একটু খটকা লেগেছিল বটে, লিটন ওকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ওই সামান্য খটকা অনেকটা ভালোলাগার স্রোত ভেসে গিয়েছিল।

মাধবী একদিন দেখল তার জন্য দুধ রোজ করে দেওয়া হয়েছে, দু-তিন দিন পরপরই ফল-সব্জী দিয়ে যায় লিটনের পাঠানো কোনও লোক। আর লিটনের হয়ে এসবে তদারকি করত পিন্টু। এসে সারা ঘরে ঘুর ঘুর বক্ বক্ করে মাধবীর মাথা খারাপ করে দিত। পিন্টুর বাঙাল ভাষার টান তখনও সম্পূর্ণ যায়নি। যায়নি ছেলেমানুষীও। মাধবীর খুব খারাপ লাগত না, আর সে সময়টা বাবার জমানো টাকাও প্রায় শেষ। এদের অনুগ্রহ ভাল লাগুক আর খারাপ লাগুক, নিতেই হত মাধবীকে।

মাধবী পরীক্ষা দিল, পাশও করে গেল। নম্বর একটু কমই হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে চান্স পেল না মাধবী। অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো এম এ-তে ভর্তি হতে পারত। কিন্তু ও এম-এ-তে আর ভর্তি হল না।

ততদিনে মাধবীদের বাড়ির সামনে লিটনদের মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি শুরু হয়েছে। লিটন প্রায় সব সময়ই সেখানেই থাকে। লিটন মাঝে মধ্যে মাধবীদের বাড়িতেও আসে। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরেও। মাধবীর ভাগে পাওয়া টাকা তখনও পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারেনি লিটনরা। মাধবীর জমির গাছ, পুকুর থেকে আয়টুকুও তখন আর নেই। তাই নিজের খরচ চালানোটাও হয়ে যেত বেশ শক্ত। এর মধ্যেই লিটন আসে, কিছু কিছু টাকাও দিয়ে যায়।

লিটনের আসাটাতে গীতা মাসীরা মৃদু প্রতিবাদ হয় তো করেছিল। কিন্তু লিটনের তুলনায় তারা এত দুর্বল প্রতিপক্ষ যে সব প্রতিবাদ খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। মাধবীরও নিজের জীবনের ওপর এতগুলো ঝড় পরপর গেছে, যে ওর কাছে তখন বেঁচে থাকাটাই ছিল প্রধান পাওয়া। তাছাড়া মেয়েটা ভালো করে পল্লবিত হওয়ার আগেই নিষেধ করার মানুষগুলো কোথায় চলে গেল। নিজের আপনজনেরা ওকে কেউ শিখিয়ে যায়নি, যে কতটুকু অনুগ্রহের

বদলে ঠিক কতটুকু দিয়ে তা শোধ করতে হয়।

লিটন বিবাহিত। দুই ছেলে মেয়ের বাবা। কিন্তু পৃথিবীর কাছ থেকে, পরিবারের আপন মানুষের কাছ থেকে, নিজের ভাগ্যবিধাতার কাছ থেকে মাধবী যা পেয়েছে, তাতে ওর জীবন আরও ভালো কিছু হবে এ বিশ্বাস বোধহয় ছিল না। ঝড়ের ঝাপটায় ঝরে পড়া গাছের পাতা, বর্ষার জলের তোড়ে যেমন ভেসে যায়, কোথায় যাচ্ছে, কতদূর যাবে, কতদিনে কোন নোংরা নালায় গিয়ে পড়বে মাধবীরও নিজের জীবন সম্পর্কে অনেকটাই এমন ভাব এসে গিয়েছিল। হয়তো সেই ঝরা পাতাটা কখনও আর সূর্যের মুখ দেখতই না। ক্রমে তলিয়ে যেত নালার জলের গভীরে।

হঠাৎ মাধবীর জীবনের এই শেষ হয়ে যাওয়া গল্পটায় নতুন মোড় এল। গ্র্যাজুয়েশনের দু-বছর পরে মাধবী বি-এড পড়তে গেল। যেদিন ডায়মণ্ডহারবারের ফকিরচাঁদ কলেজে বি এড-এর ফর্ম ভর্তি করে এল, তখনও মাধবী লিটনের সম্পত্তি। লিটনের অনুমতি নিয়েই ভর্তি হতে গিয়েছিল। জমি বিক্রির টাকা পুরোপুরি মাধবীরা পায়নি লিটনের কাছ থেকে। মাধবীকে তবু দু-তিনবার একটু বড়সড় টাকা দিয়েছিল ওরা, ওর দাদা বিপ্লবকে ভুগিয়েছে আরও বেশি। মাধবী বহুদিন দেখেছে, বিপ্লব ক্যানিং বাসস্ট্যাণ্ডে চায়ের দোকানে বসে আছে। লিটনের চ্যালচামুণ্ডা কাউকে ধরে পাওনা টাকার জন্য হত্যে দিচ্ছে। দাদার এই অবস্থা দেখে মাধবীর মাঝেমধ্যে বেশ কষ্ট হত। কিন্তু দাদা গাড়ি করে জ্যাঠার ঘরের মালপত্র নিয়ে যাবার পর থেকে ওদের আর কখনও কথা হয়নি। ও এগিয়ে কথা বলতে গেলে বিপ্লব যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার ভাবে, দাদার তো টাকার অভাব নেই, নাই বা পেল ক'টা টাকা। দাদার মেয়ে, সুচেতনার বিয়েতেও মাধবীকে বলেনি। বিপ্লব ওর ক্যানিং-এর কয়কজন বন্ধু আর পরিচিতকে বলেছিল। ওদেরই একজনকে নাকি বলেছে, একটা মস্তানের রক্ষিতাকে সুচেতনা পিসি বলে শ্বশুর বাড়ির লোকের কাছে পরিচয় দেবে কোন্ মুখে? কথাটা যেদিন শুনেছিল, মাধবী সেদিন ওর মা সরলার ছবির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ওর গায়ের রং খুব ফরসা ছিল বলে ওকে আদর করে শ্বেতকমল বলে ডাকত। মা ঠাকুরের বাসন মাজত, আর মাধবী পিঠে ঝুলে ঝুলে বলত, 'শ্বেতকমল কি মা, কোথায় থাকে?'

মা বলত— 'শ্বেতকমল হল সাদা পদ্ম, পবিত্র ফুল, ঠাকুরের পায়ে থাকে।'

বি এড পড়তে এসে মাধবী যেন অনেকটা খোলা আকাশ পেল। ডায়মণ্ডহারবারের নদীর কাছেই ফকিরচাঁদ কলেজ। অফ পিরিয়ডে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। বঙ্গবাসী কলেজের আণ্ডরগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের বন্ধুরা ছিল সকলেই সদ্য কৈশোর পেরোনো। আর বি এড-এ বিভিন্ন বয়সের বন্ধু। এরা পৃথিবীটাকে, সংসার, সমাজকে অনেক দেখেছে। ক্লাসের মেয়েরা মাধবীর সঙ্গে অনেক খোলামেলা বাস্তব নিয়ে আলোচনা করে। ওরাই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল, ডায়মণ্ডহারবারে মেস করে থাকতে। ক্যানিং থেকে ডায়মণ্ডহারবার, জেলাটা এক হলেও যেতে আসতে একবেলা লেগে যায়। ক্লাসের দূর থেকে আসা তিনটে মেয়ে একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, পরিষ্কার ঘর ঠিক করল। জমির শেষ কিস্তির টাকাটা তার কিছুদিন আগেই পেয়েছে মাধবী। ঘরভাড়ার অ্যাডভান্সের জন্য দু-মাসের টাকা মাধবীই ঝট্ করে বের করে দিল। এই প্রথম মাধবীর মনে হল ওর জীবনের সব সিদ্ধান্ত লিটনকে জানিয়েই নিতে হবে, তার ঠিক মানে নেই। আরও একটা জিনিস মাধবী বুঝল, লিটন যতই শক্তিশালী হোক, সেই শক্তিরও একটা সীমা আছে, গণ্ডী আছে। ডায়মণ্ডহারবারের মেসে থাকার খবর শুনে লিটন খুব হম্বিতম্বি করেছিল, 'কালই বেডিং নিয়ে ফিরে এস।' উত্তরে মাধবী ঠাণ্ডা চোখে শুধু তাকিয়ে থেকেছে। পাখি খাঁচার কাঠি কাটতে শিখে গেছে। লিটন ঢোক গিলে নেয়, 'বেশ যাচ্ছ যাও। ক্যাচাল হলে বুঝবে। কতদিন থাকবে?' মাধবী একইরকম শান্ত, 'বি এড কমিপ্লট হওয়া পর্যন্ত।'

ক্লাসের যেসব ছেলেরা খুব কথা বলে, মেয়েদের সঙ্গে একটু ঘুরতে পারলে বেশ খুশি হয়। এরকম ম্যাচো ইমেজের ছেলে ছিল না শুভায়ু।

লম্বা, কালো, সুঠাম চেহারা। কথা প্রায় বলেই না, শুধু টানাটানা চোখগুলো দেখলে মনে হয়, মনের অনেকটা গভীর পর্যন্ত পড়ে নিতে পারে। নদীর দামাল হাওয়া শুভায়ুর চওড়া বুকে ধাক্কা খেয়ে যেন দ্বিগুণ বেগে আছড়ে পড়ল মাধবীর জীবনে। বন্ধ, অন্ধকার, স্যাঁতস্যাতে একটা ঘরের সবগুলো জানালা যেন একসঙ্গে খুলে গেল সেই দাপটে।

সেদিন পুজোর ছুটির আগের শেষ ক্লাসের দিন। একটাও ক্লাস হল না সেদিন। বত্রিশ কপাটের উপরে বাঁধানো সীটে এসে বসেছিল দুজনে। ঠিক দুজনে নয়, অনেক ছেলে মেয়েই সঙ্গে ছিল। একে একে সকলে চলে গেল। পরের দিন থেকে পুজোর ছুটি পড়ছে। মেক আপের ফাইনাল টাচের জন্য কনসিলার বা ব্লাশার কিনতে কলকাতায় চলল অনেক বান্ধবী।

নদীর ধারে কাশবনে ঢেউ তুলে আসছে নদীর হাওয়া। জলের ঢেউতে ঝিলমিল করছে শরতের রোদ্দুর।

'তোমার পুজোর সাজের কিছু কেনার নেই?' বেশ অনেকক্ষণ থেকেই কেবল দুজনে বসে ছিল। শুভায়ু আর

মাধবী। মাধবী কোনও উত্তর দিল না। কিই বা উত্তর দেবে? দুর্গাপুজোর ছুটিতে ফিরে আবার ক্যানিং-এ যেতে হবে। যেটা ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পুজোর সাজ, প্রসাধন করে কাকে দেখাবে সে?

সেদিন দুজনে দুজনকে সব কথা বলেছিল। শুভায়ুর কথা খুব অল্প। বাবা হাইস্কুলের মাস্টারমশায় ছিলেন। ক্যান্সারে মারা গেছেন বছর সাতেক আগে। বাড়িতে মা আর বোন। বোনের সবেমাত্র ক্লাস টেন।

মাধবীও সব বলেছিল। কিছু লুকোয়নি, কিচ্ছু না। শেষের দিকে ওর গলা শক্ত হয়ে আসছিল। নদীর ওধারে, হলদিয়া নগরে তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পরে বত্রিশ কপাটের কাছে এভাবে বসাটাও ঠিক নয়। শুভায়ু মাধবীর হাতটা ধরে, মৃদু চাপ দিল, 'ওঠ, উঠে পড়।'

উঠে এসে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে শুভায়ু বলল, 'আজ এত রাত্রে তুমি নিশ্চয়ই ক্যানিং ফিরবে না। মেসেই থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মাধবী।

'কাল সকালে আমাদের বাড়িতে এসো না। কাল তো সপ্তমী, আমাদের গ্রামে একটা ছোট্ট আটচালায় ঠাকুর ওঠে'।

'তোমার বাড়ি, মানে মগরাহাটে?'

'হ্যাঁ, সকালে ডায়মণ্ড থেকে আটটা চারের ট্রেনে উঠবে, আমি মগরাহাট স্টেশনে তোমায় নিতে আসব।'

'কিন্তু, কাল তো আমি বাড়ি যাব। অনেক বইপত্র, নোট থাকবে। অতবড় ব্যাগ নিয়ে....। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাও তো এসে গেল।'

'ঠিক আছে বাবা, একদিন কম পড়লে তুমি এস এস সি-তে সেকেণ্ড হয়ে যাবে না। কাল আমাদের বাড়িতে সারাদিন থাকবে। আমাদের পাড়ার ছোট্ট দুর্গা ঠাকুরটা খুব ভাল। যে যা চায় তাই দিয়ে দেয়। কাল ওখানে অঞ্জলি দেবে সকালে। ব্যাস, একদম....'

সেবার এস এস সি-তে মাধবী জেলায় ফার্স্ট হয়নি ঠিকই, তবে ভাল রেজাল্ট করেই পাশ করল। শুভায়ুও দারুণ স্কোর করল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাউন্সিলিং-এর দিন সকালে দুজনেই উপস্থিত। মাধবীর নাম একটু পরে, শুভায়ুর একদম প্রথম দিকেই ছিল। পরিপাটি করে ইস্ত্রি করা অফ হোয়াইট জামা, প্রুসিয়ান ব্লু রংয়ের ট্রাউজার্স, ঝক্‌ঝকে পালিশ করা জুতো, শুভায়ুকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। সেদিনও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল মাধবীর। ভগবান হয় তো অনেকদিন ভুল করে ওকে কিছু দেননি বলে একসঙ্গে এতকিছু দিচ্ছেন ওকে সান্ত্বনা দিতে।

বাড়ির খুব কাছে ক্যানিংয়ে একটা স্কুলেও সিট খালি ছিল, কিন্তু মাধবী বারুইপুর গার্লস স্কুলের অপশনটাই নিল ইচ্ছে করে। বারুইপুর থেকে ট্রেনে যেমন মগরাহাটে যাওয়া যাবে, তেমন ৪০-৫০ মিনিটে বাসে বা অটোয় ক্যানিংয়েও আসা যাবে।

ডায়মণ্ডহারবারে মেস বাড়িতে থাকার সময় থেকেই লিটনের সঙ্গে সম্পর্ক একটু একটু করে কমাতে শুরু করেছিল মাধবী। এমনকি ওর সঙ্গে একান্তে বসে কথাও বলত না শেষ দিকে। লিটন পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে লক্ষ্য রাখছিল। একদিন মাধবী ক্যানিংয়ের বাড়িতে এসেছে। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। লিটন এসে বসল ওর সামনে। কয়েকটা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার পর লিটন একটু থেমে, ধীরে ধীরে বলল— 'পার্বতীকে ডিভোর্স দেব ঠিক করেছি। কাগজপত্রও রেডি করতে বলে এলাম উকিলকে।'

পার্বতী লিটনের বউ, দুটো বাচ্চার মা। বড় ছেলেটা ফোর থেকে ফাইভে উঠবে।

সেদিন বহু রাত পর্যন্ত চলেছিল সেই আলোচনা। লিটন নিজের নখ-দাঁত সব এক এক করে বের করেছিল। একটা সময় মাধবী নিরুপায় হয়ে বলল, 'যতই তোমার পার্টির ক্ষমতা থাকুক, দেশের আইন-শৃঙ্খলা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তোমরা জানো, খবরের কাগজ, প্রচার মাধ্যম এরা সব কিছু মুখ বুজে শোনে আর টাকা ছড়িয়ে দিলে চুপ করে যায়। সেটা সবসময় নাও তো হতে পারে। আমিও একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাকে খুন করে ফেললেও তুমি নিস্তার পাবে না। তোমার টাকা-পয়সা, প্রভাব প্রতিপত্তি সব ছেড়ে তোমার এলাকা ছাড়তে হবে। ভেবে দেখ, একটা মেয়ের জন্য তুমি এই সাজানো বাগান ছেড়ে ফেরার হয়ে ঘুরবে কিনা?'

লিটন পাগলের মতো চিৎকার করতে আরম্ভ করল। পারলে তখনই মাধবীকে খুন করে ফেলে। পিন্টুরা বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ যেন অন্ধকারের থেকে ফুঁড়ে বের হয়ে পিন্টু ধরে ফেলল লিটনকে, 'এই লিটনদা হচ্ছে কি? আরে দিদি আপনিও ঘরে যান, ঘরে যান বলছি না।'

পিন্টুর ওপর মাধবীর সবসময় একটা দুর্বলতা আছে। মাধবীর যে সময় পৃথিবীতে কোনও আশ্রয় ছিল না, গীতা মাসির মতো দু-একজনই ছিল ওর বাঁচার সাহারা। সে সময় ওর কাছে কাছে থাকত পিন্টু। খানিকটা ভাইয়ের মতোই। ওর পূর্ববাংলা ঘেঁষা উচ্চারণ, পাকামো ভরা কিন্তু ছেলেমানুষি কথা সব নিয়ে একটা মিষ্টি অনুভূতি আছে ওকে ঘিরে। তাছাড়া পিন্টু ওকে কখনও অসম্মান করে না। মাধবী বা পিন্টু দুজনে জানে ওদের একের উপর অন্যের বেশ একটু অধিকার বোধ আছে।

পিন্টু এবার একটু ধমকই দেয়, 'কি হল, দিদি? বলছি না আপনি ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন।'

মাধবী দরজা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ দরজায় একটা সজোরে লাথি মারে লিটন। ওর শেষ আস্ফালন শোনে মাধবী— 'দেখে নেব। ওই শুওরের বাচ্চা মাস্টার। তোমার নান্নে-মুন্নে আশিক। ওর শিরদাঁড়া ছিঁড়ে ফেলব...।'

সেদিনের পরে আর লিটনের সঙ্গে কথা হয়নি মাধবীর। মাধবীর মোবাইল ফোন নম্বর পিন্টু জানে। লিটনও জানে। মাধবী আশঙ্কা করেছিল লিটন ফোনে ওকে উত্যক্ত করবে। কিন্তু করেনি। মাধবীর মনে আশা দানা বাঁধল। লিটন হয়তো ভুলে যেতে চাইছে বিষয়টা। পিন্টু অবশ্য দু-একবার ফোন করেছিল। মামুলি কথাবার্তা। কেমন আছো? ভালো থেকো, এই ধরনের কথা। শুভায়ুর ব্যাপারেও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল। কোথায় থাকে, কোন স্কুলে এইসব। মাধবী ঠিকঠাক উত্তরই দিয়েছিল, ওর মনে কোনও সন্দেহই হয়নি।

শেষবার ফোন যখন করেছিল পিন্টু, মাধবী তখন ক্লাসে যাচ্ছে। 'আমি ক্লাসে যাচ্ছি পিন্টু, পরে ফোন করো।'

পিন্টু ওদিক থেকে বলেছিল— 'ঠিক আছে দিদি, ভালো করে পড়ান। ভালো থাকবেন, কখনও প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

কথাগুলো বারবার মনে হচ্ছে পিন্টুর। ক্যানিং বাসস্ট্যাণ্ডে থামল টাটাসুমো। সকলের চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস। হাঁকডাক করে নামল সকলে। সবশেষে পিন্টু। সামনেই বিজন বৈরাগীর পরোটা-মিষ্টির দোকান। ওখানে ওদের একটা ঠেক আছে। পিন্টুর পেয়ারের দু-একটা কুকুরও আছে ওখানে। ওকে আসতে দেখে দুটো কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে এলো ওর দিকে। একটা ছেলে কুকুর একটা মেয়ে। হঠাৎ কি মনে হলো, পিন্টু ছেলে কুকুরটার পেটে সজোরে লাথি মারল। অপ্রত্যাশিত এই আঘাতে বেচারা 'কেঁউ' করে চিৎকার করে ছিটকে গেল। খানিকটা নিজে নিজেই বলল পিন্টু— 'শালার ব্যাটাছেলে জাতটাই কুত্তার জাত। একদম কুত্তার জাত শালা....।' সিরাজ দোকানের বেঞ্চে বসতে বসতে বলল— 'বাঙ্গালের কি হয়েছে আজ? তুই স্নানটান করে তাড়াতাড়ি চলে আয়। দাদা ফোন করেছিল, একটা মিউচুয়ালে গেছে হেরোডাঙ্গায়। সন্ধ্যে পাঁচটায় এসে জয়েন করবে আমাদের মেহফিলে।'

পিন্টু ধীর পায়ে হেঁটে আসছিল, গৌরাঙ্গর খৈনীর দোকানের সামনে দাঁড়াল একটু।

গৌরাঙ্গের দোকানের এই তিন ফুট বাই চার ফুটের জায়গাটা পিন্টুই ওকে দখল করে দিয়েছে। এখানে একজন টুপিওয়ালা বসত। ওকে উঠিয়ে গৌরাঙ্গকে বসিয়েছে। খৈনীর কারবারটাও চলছে ভীষণ ভালো। জায়গাটা বাস, ট্রেন, ফেরিঘাটের একেবারে সংযোগস্থল। এখন বাঙালীদের মধ্যে খৈনীর প্রচলনটা বেশে বেড়েছে। গৌরাঙ্গর বাড়ি বাসন্তী ব্লকের অনেক ভেতরের গ্রামে, সপ্তাহে একদিনই বাড়ি যায়।

পিন্টু গৌরাঙ্গের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে করে একটা ডাক দেয়, 'কিরে, গৌরা।'

গৌরাঙ্গ মাথা নীচু করে খৈনী কাটছিল। ও শুনতে পায়নি পিন্টুর ডাক।

তখনই ঘটল ঘটনাটা। একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে স্ট্যাণ্ডে। বাস থেকে লোক নামছে। সকলেরই তাড়া, তাড়াতাড়ি ঘাটে না পৌঁছালে ফেরি পাবে না। এই ফেরি না পেলে ভাটা পড়ে যাবে। তখন হাঁটু পর্যন্ত কাদায় হেঁটে মাতলা নদী পার হতে হবে।

ঘাটের দিকে যাওয়া ওই ভিড়ের দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিল পিন্টু। হঠাৎ দেখল একজন মহিলা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। মহিলার দিকে চোখে চোখ পড়তেই, পিন্টুর শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল, ও আঁত্‌কে উঠে বলল, 'কে, কে ও।' আরও দুটো বাস এক সঙ্গে ঢুকে পড়েছে। প্রবল জনস্রোতে ধেয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। মানুষের ভিড়ে কয়েক পলকে হারিয়ে গেল সেই মহিলা।

পিন্টু বেশ জোরেই আর্তনাদ করে উঠেছিল। গৌরাঙ্গ মুখ তুলে দেখল, পিন্টু দাঁড়িয়ে আছে। তখনও কিছু বলে যাচ্ছে। ও দোকানের বস্তার গতি থেকে উঠে এসে ধরল পিন্টুকে, 'দাদা, ও দাদা, কি হয়েছে তোমার?'

গৌরাঙ্গ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল যে, সাংঘাতিক ভাবে মানসিক ধাক্কা পেয়েছে পিন্টু। সম্ভবত কাউকে দেখে। অনেক অনুরোধেও পিন্টু কোথাও বসতে চাইছে না। ঠিকঠাক কিছুই বলছে না। ভালো করে গৌরাঙ্গের কথা শুনছেও না। গৌরাঙ্গ ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, রাজি হল না। শেষে বলল, পুরনো হাভেলীর ঘাটে নিয়ে যেতে। পুরনো হাভেলীর ঘাটটা, সেই ইংরেজ আমলের। নদীর ধারে ইঁট বার হওয়া পুরনো ভেঙে যাওয়া ঘাট। এদিকটায় লোকজনও কম আসে। সন্ধ্যের পর অনেক সময় কেউ কেউ আসে গাঁজা খেতে। কাছেই ছিদামের চুল্লুর ঠেক। বাংলা, চোলাই, গাঁজা সবই পাওয়া যায়। স্টেশন, বাসস্ট্যাণ্ড, নদীর ঘাট সব জায়গার লোকেরাই একটু হেঁটে এসে সস্তায় নেশা করে যায়।

হাভেলীর ঘাটে এসে সটান শুয়ে পড়ল পিন্টু। পাশে হতভম্ব হয়ে বসেছিল গৌরাঙ্গ। একটু পরে ওকে দিয়ে দুটো বাংলার বোতল আনাল পিন্টু। গৌরাঙ্গ বুদ্ধি করে একটু মুরগীর ছাটের চাটও এনেছিল। সারাদিন

হয়তো খাওয়া হয়নি গুরুর। তবে চাটটার বেশিরভাগ গৌরাঙ্গকেই জোর করে খাইয়ে দিল পিন্টু। 'তুমি খালি পেটে দুটো বাংলা খাবে?' গৌরাঙ্গ আপত্তি করেছিল। ওকে খিস্তি মেরে উঠেছিল পিন্টু। গৌরাঙ্গের খৈনীর দোকানটা এতক্ষণ খোলা পড়ে আছে। একবার গিয়ে বন্ধ করে আশা দরকার। পিন্টু কোনও আপত্তি করল না। বলল, 'তুই চলে যা, আর আসতে হবে না।' ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

গৌরাঙ্গ কিন্তু দোকানটা বন্ধ করেই ফিরে এসেছিল। রাস্তাতেই শুনল কি একটা কারণে লিটনদার নতুন বিল্ডিংয়ের দোতলায় বড় মেহেফিল হচ্ছে। অনেক রকম মাংস, বিলিতি পাঁইট সবই এসেছে, টোটন নাকি এদিকে একবার খুঁজতেও এসেছিল পিন্টুকে।

গৌরাঙ্গ ফিরে এসে দেখল, পিন্টু একটা বাংলার বোতল শেষ করে ফেলেছে। 'কি হোল, লিটনদার পার্টিতে তুমি যাবে না? টোটনদারা তোমায় খুঁজছিল।'

পিন্টু সেকথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আরেকটা বোতল খোল না। ওপেনারটা পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিল? শালা...'।

গৌরাঙ্গ গজগজ করতে করতে বলে, 'পকেটে করে নেব কেন? এখানেই তো আছে। তোমার তার আছে যে দেখবে....'

পিন্টু ওর চিবুকটা ধরে একটু আদর করে বলল— 'রাগছিস কেন?' তারপর আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বেজন্মার বাচ্চা শালা, তখন দিদি কেন বললাম?'

'এই একটা কথা কম করে পঞ্চাশবার তো বললে। কি হয়েছে? কাকে দিদি বলেছ?'

পিন্টু বাবু হয়ে বসল, 'শুনবি?' হাতের গ্লাসটা বাড়িয়ে বলল, 'জল মারবি না, একটু একটু খানি লেবু মার, হ্যাঁ... ঠিক আছে। তবে শোন, এখানে ইণ্ডিয়ার যেমন মহকুমা, এই যেমন ক্যানিং মহকুমা তো, তা বাংলাদেশে তেমন উপজেলা। তেমন ভোলা একটা জেলা। ভোলার উপজেলা লালমোহন। লাহমোহন উপজেলা তো? একটা উপজেলা লালমোহন, সেই লালমোহনের একটা গ্রাম অন্নদাপ্রসাদ। কি সুন্দর গ্রাম। আমবাগান, কাঁঠাল বাগান, বাঁশ ঝাড়, কি বড় দীঘি...।'

রাস্তা থেকে নামলেই সামনে হরিতলা, তার পাশেই আমবাগান, কি মিষ্টি সেই সব আম, কি

সুন্দর সব নাম, মধুমালতী, ক্ষীরপাইত্যা, টুকুইর‍্যা...'

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়, 'ধুর, আমগাছের নাম কে শুনতে চাইছে? কেসটা কি সেটা তো বলবে।'

পিন্টু একটু সম্বিৎ ফিরে বলে, 'হ্যাঁ, সেটাই তো বলছি। সেই যে জেলার নাম ভোলা। ভোলা জেলার একটা উপজেলা হল লালমোহন। এই ২৪ পরগণার যেমন ক্যানিং। তেমন ভোলা জেলার লালমোহন। আর একটা গ্রাম অন্নদাপ্রসাদ। .... সেই আম বাগানের মধ্যেকার রাস্তা ধরে হাঁটলে...।'

'কি গো, কি বলেছিলে, শেষ করলে না তো, তুমি উঠে যেতে পারবে?'

'না, না, তোকে শুনতেই হবে, সেই আমবাগানের মধ্যে দিয়ে, সেই আমবাগানের মধ্যে দিয়ে উফ্ সেই চোখ। এখানেও এসেছে, সেই চোখ।'

অনেক চেষ্টা করেও পিন্টু আমবাগান আর চোখের বেশি কিছু বলতে পারেনি। রাত তখন এগারোটা। গৌরাঙ্গ একটা সাইকেল ভ্যান ডেকে কোনওমতে ওঠালো সংজ্ঞাহীন পিন্টুকে। ভ্যানে করে এনে, পিন্টুর নিজের দোকানেরই শাটার খুলিয়ে কোনওমতে দোকানের মেঝেতে চট্ পেতে শুইয়ে দিল।

অনেক কষ্ট করেও যেকথা সেদিন পিন্টু বলতে পারেনি, সে কথাটা ওর নিজের দিদির কথা। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে একটা পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল দিদির। পিন্টুকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিল ওর মা। বাজারের উপর বাবার সোনার দোকান ছিল। ওর দিদি রাণী যখন একা বড় হল, খোঁড়া পায়েই জল এনে, খাবার বেড়ে দিত বাবাকে, ভাইকে। একদিন দোকান থেকে ফিরেই জ্বরে পড়ল বাবা। তিনদিনের জ্বরে বাবাও ওদের রেখে কোথায় চলে গেল। পাড়ার দু-একজন হিতাকাঙ্খীর উদ্যোগে বাবার সোনার দোকানটা একজন ভাড়া নেয়। এভাবেই চলছিল। দেশ গাঁয়ের সংসার, দুটো ছোট পেট চলে যাচ্ছিল কোনওমতে। ফুলকাকা যখন ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তখন পিন্টুর বয়স বারো-তের। গ্রামে কুয়ো থেকে জলের কলসী কাঁখে একটা অদ্ভুত কায়দায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসত রানী। বহুদিনের অভ্যাসে খুব একটা কষ্ট হত না। জল এনে দেখল বাড়িতে কুটুম এসেছে। ফুলকাকা, ফুলকাকীকে রানীই অনেক করে অনুরোধ করেছিল পিন্টুর জন্য কিছু দেখতে। দিদিকে ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে এলো পিন্টু। ফিরল প্রায় দশ বছর বাদে। সালটা ২০০১। সে বছর ভীষণ গণ্ডগোল। ভোটে জিতে নতুন সরকারের শরিকরা হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিন্টু প্রথমে বলেছিল, দিদিকে সেবার ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এরপরেই অন্য একটা সুযোগ এসে গেল। যে রথীন কাকা পিন্টুদের সোনার দোকানটা ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছিল, সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে ঠিক করে ফেলেছে। পাশের গ্রামের ইসমাইলকে পিন্টু একটু আধটু চিনত। ইসমাইল একদিন পিন্টুকে চুপিসারে ডেকে প্রস্তাব দিল। পিন্টুর মাথায় তখন ঘুরছে ক্যানিং-এ নিজের দোকান করতে হবে, আর ফুলকাকার দোকানে খাটলে চলবে না। রাজি হয়ে গেল পিন্টু ইসমাইলের প্রস্তাবে। কায়দা করে দিদিকে সইটাও করিয়ে নিয়েছিল। সেদিনটা পরিষ্কার মনে আছে পিন্টুর। ইসমাইল টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় অপারেটরের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। পরের দিন সকাল দশটার মধ্যে ঢাকা পৌঁছাতে পারলে টাকাটা হুণ্ডিতে সে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার জন্য সেদিন রাতেই ঢাকায় পৌঁছাতে হবে পিন্টুর। বিকেলে সেই একই কায়দায় জল নিয়ে ফিরছিল রানী।

পিন্টু ওকে বলল, 'একটু বাজারে যাব, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব।' কথাটা শুনে দিদি একবার তাকালো ওর দিকে। সেই তাকানোটা দেখে ওর কেমন গা শিউরে উঠল। যেন রানী সব বুঝতে পেরেছে, সব জেনে গেছে। কিন্তু কিছুই বলল না রানী। শুধু বলল, 'বাই, সাবধানে যাইস।'

খবরটা পরদিন বিকালেই পেয়েছিল পিন্টু। সে রাত্রেই গ্রাম আক্রমণ হল। মেয়েরা অনেকে খবর পেয়ে ছুটে পালিয়ে বেঁচেছে। রানীও ক্র্যাচ নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল পালাতে। তারপর পাশের পানাপুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। জোঁকের কামড়ে প্রাণ বেরিয়ে আসছিল রানীর। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ওকে পুকুর থেকে তুলে এনে, ওর বাড়ির দাওয়াতেই....।

কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ডের ভিড়ে পিন্টু আজ কি দেখল? সেই খোঁড়া পায়ের হাঁটুনি, সেই চোখ, সেই চাউনি। কি করে কি করে তা সম্ভব?

নব বিশ্ববিধান ও সভ্যতার সংঘাত —হান্টিংটন তত্ত্ব

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৯১ সালের কমিউনিস্ট শাসনের দুর্গ নামে পরিচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটে। এর সূত্র ধরে প্রায় পাঁচ দশক ব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতির অবসান হয়। মার্কিন ঐতিহাসিক ফুকুয়ামা সানন্দে ঘোষণা করলেন, ইতিহাস শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য হল, ইতিহাসের রথচক্র শেষবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। কেননা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, তারপর সমাজবাদ— এইসব পর্ব পেরিয়ে আবার পুঁজিবাদ ফিরে এসেছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষ কথা। পুঁজিবাদের বিধানেই ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হবে।

কিন্তু সত্যিই কি ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে? শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? স্বয়ং লেনিনও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইতিহাস ছলনাময়ী। আমাদের নিজস্ব রাজ্য রাজনীতিতে সম্প্রতি একথা প্রমাণিত হল। যারা বলতেন সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট রাজ্য রাজনীতির শেষ কথা, তাঁরা পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। শাসক দলের ছোট বড় মাঝারি নেতারা প্রলাপ বকছেন। মিথ্যা, অসত্য, অনৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নির্মম যান্ত্রিক শাসন কুপোকাৎ হয়ে পড়তে বাধ্য। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় এমনটাই ঘটেছিল ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সালের ঘটনার স্রোতে। ধর্ম বনাম অধর্ম, সত্য বনাম মিথ্যা, শুভ বনাম অশুভ — এই সংঘাত চিরন্তন। শেষ পর্যন্ত সত্য, ধর্ম ও শুভ শক্তি জয়যুক্ত হয়। 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান পছন্দ করি বা না করি, মানুষের মনকে তা নাড়া দিয়েছে।

এবার আসল কথায় আসি। সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়ের পর বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বি-মেরুকরণ-এর বুনিয়াদ ধসে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্ব ভাগ্যবিধাতা বলে জাহির করতে লাগল। ঘোষিত হল নব বিশ্ব বিধানের তত্ত্ব। মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বললেন, বিশ্বশান্তি ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে 'এক নতুন বিশ্ব বিধান' (এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) নির্মাণ করতে হবে। নব বিশ্ববিধান বলতে কি বোঝায় তা জর্জ বুশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেননি। এরপর ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা এন্টনি লেক 'ক্লিনটন ঘোষণা' ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় বাজার কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয় এবং এখন সেই বিপদ কেটে গেছে। এখন মুক্ত অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিধি প্রসারিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, নব বিশ্ববিধান হলো বাজার কেন্দ্রিক মুক্ত অর্থনীতির আধিপত্য স্থাপন আর তার নিয়ন্ত্রক হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন মুলুকে অন্যরকম ভাবনা-চিন্তার আভাষ মিলল। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে সুবিখ্যাত 'ফরেন অ্যাফেয়ারস্' পত্রিকায় "The Clash of Civilization" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারপর ১৯৯৬ সালে ওই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির চালচিত্র

ব্যাখ্যা করার জন্য হান্টিংটন সভ্যতা কেন্দ্রিক রাজনীতির একটি বিকল্প মডেল চয়ন করলেন। এই মডেলের ভিত্তিতে ১৯৯০ সালের পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির পালাবদল ব্যাখ্যা করেছেন। এক কেন্দ্রিক যান্ত্রিক বিশ্ব নয়, ভঙ্গুর এই বিশ্বের সংঘাতের মূল সূত্র কি তার আনুপুঙ্খিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যাপক হান্টিংটন তাঁর গ্রন্থে বিশ্বের মোট নয়টি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বলয়ের কথা বিধৃত করেছেন। এগুলি হল— পাশ্চাত্য জগত, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইসলামীয়, কনফুসিয়ান, হিন্দু, পূর্ব ইউরোপের রক্ষণশীল খৃস্টান অঞ্চল, বৌদ্ধ ও জাপানী। তাঁর মতে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্ব রাজনীতি এই সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই সাম্প্রতিক বিশ্বের রাজনীতি আগের মতো দ্বি-কেন্দ্রিক নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এক-কেন্দ্রিক নয়। আসলে বিশ্ব রাজনীতির চরিত্র বহুমাত্রিক। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি। (Global politics has become multi-polar and multi-civilizational)।

হান্টিংটন দেখিয়েছেন, এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতির কথা বলে অনেকেই সাংস্কৃতিক বিভাজনের মূল বিষয়টি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে চাইছেন। প্রচলিত ধারণা হল, পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদ সমগ্র জগৎকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সূত্রে গ্রোথিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। যদি ভারতের কথা বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে দুশো বছরের বৃটিশ শাসনে এক ভাষা, এক প্রশাসন ও সর্বভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল। এর ফলে কিন্তু ভারতের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় আত্মপরিচয় লঙ্ঘিত হয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমরা প্রথমে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। তারপর সুপ্তিমগ্ন অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা আত্মস্থ হলাম। নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা সচেতন হলাম, আত্মপরিচয় ও আত্মশক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলাম। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ একই ধরনের ভাবধারা প্রচার করেছেন। আধুনিকীকরণ নিছক পাশ্চাত্যকরণ নয়, ঐতিহ্যের আলোকে আধুনিকীকরণের নতুন পরীক্ষায় ভারতের বৌদ্ধিক জগত উদ্ভাসিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় আত্মপরিচয়ের প্রবাহ বহমান হয়। অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চবর্গীয় শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।

হান্টিংটন সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে ক্ষমতার রাজনীতি সংস্কৃতির ওপর একাত্মভাবে জড়িত। তাঁর ভাষায় "The distribution of cultures in the world reflects the distribution of power. Trade may or may not follow the flag, but culture almost always follows power"। একথা সত্য, আঠারো-উনিশ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ও বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজনীন প্রভাব প্রতিপত্তি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিগত, ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের শক্তি খর্ব হয়নি। পক্ষান্তরে অ-পাশ্চাত্য জাতি ও সংস্কৃতির ক্রম-অগ্রগতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হান্টিংটনের মতে "The Crosion of Western culture follows, as indigenous, misterically rooted mores, languages, beliefs and institutions reassert themselves. The growing power of modernization is generating the revival of non-western cultures throughout the world"(পৃ ৯১-৯২)। জোসেফ নী নামক একজন বিশিষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আপাতদৃষ্টিতে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হল প্রবল শক্তি, সে তুলনায় সাংস্কৃতিক শক্তি অনেক নমনীয়। অধ্যাপক নী মনে করেন, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটলেই সাংস্কৃতিক শক্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি লিখেছেন, "If a state's culture and ideology are attractive, others will be more willing to follow"। একটি দেশের বহিরঙ্গ শক্তি বৃদ্ধি পেলে অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দূরদৃষ্টিতে একশ বছর আগেই উপলব্ধি করেছিলেন, দেশ ও জাতি প্রকৃত শক্তি অর্জন করলেই প্রতিপক্ষ বিদেশী শাসন কোণঠাসা হয়ে পড়বে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "The strength is moral strength, the strength of manhood, the strength of patriotism, the strength that enables us both to act and to suffer"। শ্রীঅরবিন্দ একশ বছর আগে এশিয়ার নব জাগৃতির কথা বলেছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতের বিরুদ্ধে এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ভারত এশিয়ার ভাগ্য নির্মাণের কেন্দ্রস্থল। দুঃখের কথা, স্বাধীনতার পর ভারতের শাসককুল কখনও পাশ্চাত্য মডেল, কখনও সোভিয়েত মডেল অনুসরণ করে দেশকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করে তুলতে পারেননি। এন ডি এ সরকারের সময় ১৯৯৮ সালে যখন পোখরান বিস্ফোরণ ঘটে, সেসময় দেশ- বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। ভারতকে কোণঠাসা করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপিত হয়েছিল। ভারত নিজস্ব শক্তিতে সেই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠে। তারপরই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ২০০০ সালে ভারতে এসে বোঝাপড়া করতে চাইলেন। এর আগে ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা হয়েছিল। ভারতের আত্মপরিচয়ের তা ছিল গৌরবজনক অধ্যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বিগত কয়েক বছর ধরে ভারত ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদী তাণ্ডবের বিক্ষণাগার হলেও ভারত সরকার নিছক কূটনৈতিক দর কষাকষিতে ব্যস্ত, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাদাগিরির আঁচলে আশ্রয় নিয়েছে।

অধ্যাপক হান্টিংটন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বের অন্যত্র আধুনিকীকরণের দুটি বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বাঁধন

সুদৃঢ় হয়েছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বহির্ভূত জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে। ব্যক্তিগত স্তরে আধুনিকীকরণের অভিঘাতে নিঃসঙ্গতাবোধ জাগ্রত হয়েছে। সাবেকী সামাজিক রীতিনীতি ও বন্ধন শিথিল হওয়ায় মানুষের মনে আত্মপরিচয়ের সংকট উদ্ভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে মানুষ নিজস্ব ধর্মের মধ্যে নিজের হারানো সত্তাকে ফিরে পেতে চায়। তাঁর মতে, পুরাতন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীগুলি অন্যান্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজের সভ্যতার বাঁধনকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়। বাংলার নবজাগরণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এইভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নিজেদের জাতীয় সত্তার ঐকান্তিক অনুসন্ধানে প্রবৃষ্ট হয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চায় পারঙ্গম হয়ে অনুশীলন ধর্মের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে দেশমাতৃকাকে আবাহন করেছিলেন। আধুনিকীকরণ ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পারস্পরিক যোগসূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে হান্টিংটন বিষয়টিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

।। ইসলামীয় মৌলবাদ ঃ বিশ্বের বিপদসংকেত।।

অধ্যাপক হান্টিংটন ইসলামি মৌলবাদ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। ইসলমি মৌলবাদের প্রসার প্রথমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে প্রতিফলিত হয়। পরে তা রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ইসলামি মৌলবাদে দীক্ষিত হয়। তাঁর ভাষায় "While students and intellectuals formed the militant cadres and shock troops of Islamist movements, urban middle-class people made up the bulk of the active membership"। ভারতে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গি সংগঠনগুলির যথা— সিমি, হুজি আর পাকিস্তানের লস্কর-এ-তৈবার সাংগঠনিক কাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হান্টিংটনের ব্যাখ্যা কতটা সঠিক।

১৯৯০ -এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামি মৌলবাদ রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। ইরান ও সুদানে ইসলামীয় শাসন বলবৎ হয়। এদিকে আশির দশক ধরে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আফগানিস্তানে তালিবান গোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কাশ্মীরে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি তথাকথিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়। জম্মু ও কাশ্মীর মুক্তি ফ্রন্ট (জে কে এল এফ) নামে গঠিত মঞ্চ ব্যাপক হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। কাশ্মীরে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরাসরি কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন জানিয়েছে এবং পাশাপাশি অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য জুগিয়েছে। ১৯৯৫ সাল নাগাদ প্রায় ১২০০ মুজাহিদিন যোদ্ধা আফগানিস্তান, সুদান ও তাজিকিস্তান থেকে কাশ্মীরে নিয়োজিত হয়। ইসলামী জঙ্গি কার্যকলাপ থেকে রাশিয়াও রেহাই পায়নি। আফগানিস্তানে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন তালিবান জঙ্গিদের সঙ্গে এক দশক ব্যাপী রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এরপর ১৯৯২ সালে চেচনিয়াতে ইসলামীয় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে সংশ্লিষ্ট হয়। সম্প্রতি চীনকেও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইসলামীয় প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

অবশ্য ইসলামীয় জগতে একাধারে সংহতি ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান, মরক্কো, ইরান, টিউনিশিয়া, তুরস্ক মিলে ইসলামীয় সঙ্ঘ (অর্গানাইজেশন অফ দি ইসলামিক কনফারেন্স) স্থাপন করে। এছাড়া বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ নামে দুটি বেসরকারি সংস্থা বেসরকারি স্তরে ইসলামীয় সমাজের মধ্যে সংহতি সাধনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। হান্টিংটন লিখেছেন, ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনও মূল শক্তি গড়ে ওঠেনি। ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক সকলেই কোনও একটি দেশের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি নয়।

হান্টিংটন যে সভ্যতার সংঘাতের কথা বলেছেন, তা একুশ শতকের শুরু থেকে বেপরোয়া আকার ধারণ করেছে। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর ধ্বংসলীলা হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হয়। আর ভারতে শুধু কাশ্মীর নয়, অন্যত্র বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক ভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা চলতে থাকে। গত ২৬ নভেম্বর (২০০৮) মুম্বাইতে তাজ হোটেলে ও অন্যত্র যে বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ড চলে, তাতে সমগ্র বিশ্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ যে কতটা ভয়ঙ্কর তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। হান্টিংটন তত্ত্বকে যারা নস্যাৎ করতে দিয়েছিলেন তারা বুঝতে পারছেন যে, তাঁর বক্তব্য কতটা প্রাসঙ্গিক। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ মানবতার পক্ষে বিপজ্জনক। হান্টিংটন এ বছরের গোড়াতে প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব এখনকার বিশ্ব রাজনীতির একটি মূলসূত্র তাতে সন্দেহ নেই। ●

ভাষা উপভাষা অপভাষা

তথাগত রায়

মানুষের মুখের ভাষার প্রতি মানুষের মমতা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু এই মমতা সব ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে সমান নয়। তাছাড়া এই মমতার একাধিক মাত্রা আছে। কিছু ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেই ভাষার প্রতি ভাষাভাষীদের অপরিসীম মমতা, কিন্তু সেই ভাষার বিকৃতি ঘটে চলেছে ক্রমাগত। সে বিষয়ে ভাষাভাষীদের হুঁশ নেই। আবার কিছু ভাষার ক্ষেত্রে এই মমতা এত কম যে সেই ভাষার বিলুপ্তি ঘটলেও ভাষাভাষীরা খুব বিচলিত হন না। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এই ধরনের বিভিন্ন ভাষার কিছু তুলনামূলক আলোচনা হবে। এই তুলনার মধ্যে কিছু রাজনীতিও আসবে। কারণ ভাষার উপর আশ্রিত রাজনীতির স্থান লড়াইয়ের নিরীখে ধর্মের উপর আশ্রিত রাজনীতির পরেই।

প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ ভাষা ছাড়া একরকম ভাষা আছে যা পূর্বোক্ত ভাষার থেকে খুব ভিন্ন নয় এবং অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত। ভাষাকে ইংরাজিতে Language বলা হয় এবং এই ধরনের উপভাষাকে বলা হয় Dialect। ভাষা এবং উপভাষার এই প্রভেদের ব্যাপারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রচুর সংঘাতের কারণ। যেটি একজনের কাছে উপভাষা সেটিই সেই ভাষাভাষী আর একজন মানুষের কাছে পূর্ণাঙ্গ ভাষা এবং তার জন্য হয়তো সেই ভাষাভাষী প্রাণ দিতেও রাজি।

এই যদি ভাষা ও উপভাষা হয় তবে অপভাষা কি? অপভাষা হচ্ছে সেই জিনিস যার বিলুপ্তিই প্রত্যাশিত, যা ভাষার অবৈধ সন্তান, যা কোনও সাহিত্য বা কোনও শুভ প্রচেষ্টার বাহক কখনো হতে পারে না। অশ্লীল বা বাজারী ভাষা অবশ্যই এরকম অপভাষা, কিন্তু অন্য ধরনের অপভাষাও আছে, তারও বিচার এই নিবন্ধে হবে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা দিয়েই আরম্ভ করা যাক। বাংলা একটি পূর্ণাঙ্গ এবং পরিণত ভাষা এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে ভাষাভাষীর হিসেবে বাংলা ভাষাকে চতুর্থ ধরা হয়, কিন্তু সেটা ভাষার পক্ষে কোনও গৌরবের ব্যাপার নয়। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশীদের প্রজনন ক্ষমতার অপ্রতিরোধ্য পরিণতি মাত্র। বাংলা ভাষা আমাদের কাছে অত্যন্ত আদরের— ভারতবর্ষে ভাষার প্রতি এইরকম মমতা তামিলভাষী ছাড়া আর কারও আছে বলে জানা নেই। পাঞ্জাবীরাও তাঁদের ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সেই মমতার মধ্যে ধর্মের মিশেল আছে। কারণ গুরুগ্রন্থসাহেব— শিখদের পবিত্র গ্রন্থ— পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা এবং সেই কারণে গুরুমুখী লিপিতে লেখা পাঞ্জাবী শিখদের কাছে পবিত্র। তা না হলে স্বাধীনতার আগে পাঞ্জাবী একটা কথ্য ভাষা ছিল মাত্র। লেখাপড়া সমস্ত উর্দুতে হত। আজও পাকিস্তানী পাঞ্জাবে লেখ্য ভাষা উর্দু, কথ্য ভাষা পাঞ্জাবী।

বাংলা ভাষার ভিত্তিতে একটি দেশ (পাকিস্তান) ভাগ হয়েছে এবং একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে— একথা বাংলাভাষীদের পক্ষে নিঃসন্দেহে শ্লাঘার। বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ হয়েছিল এবং এশীয় ভাষার মধ্যে বাঙালী বিশ্বকবিই প্রথম নোবেল প্রাইজের মর্যাদা পেয়েছেন— এও শ্লাঘার। কিন্তু এই ভাষার গর্বে অন্ধ হয়ে একটা সময়ে আমাদের ভদ্রসমাজ অন্য ভাষাকে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন— এটা তো শ্লাঘার নয়। আজও বাঙালি ভদ্রসমাজে ইংরাজির প্রতি এক অন্ধ আনুগত্য আছে (যদিও সেইসব অনুগতজন অনেকেই ওই ইংরাজি লিখতে বা বলতে পারেন না) এবং হিন্দির প্রতি এক উপেক্ষা আছে। এতে হিন্দির কোনও ক্ষতি হয়নি। হয়েছে বাঙালির।

কিন্তু ভাষাগর্বে অন্ধ এই বাঙালির নিজের ভাষার মাধুর্য বা বিশুদ্ধতা রক্ষা করার কোনও চেষ্টা তো দেখা যায় না। শিক্ষিত বাঙালি সাধারণত বাংলা বলবার সময় যে পরিমাণ ইংরাজি কথা ব্যবহার করেন, তাতে তো গর্বিত হবার কিছু নেই। আমরা সাধারণ 'কনভারসেশনের' মধ্যে কত যে ইংরাজি শব্দ 'ইউজ' করি, এবং নিজের ভাষাকে কতরকম ভাবে 'অ্যাবিউজ' করি, তার তো লেখাজোখা নেই। এই 'অ্যাবিউজ'-টাই আমরা কতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি তা বোঝা যাবে যদি একটা ভদ্রজনের দু'ঘন্টার আড্ডায় এক একটা ইংরাজি শব্দ ব্যবহারের জন্য পঞ্চাশ পয়সা করে জরিমানা ধার্য করা হয়। বেশিরভাগ আড্ডাধারীই যে ফতুর হয়ে আড্ডা ছাড়বেন তাতে সন্দেহ নেই।

অথচ বিবেচনা করুন, হিন্দিভাষীরা ভাষা নিয়ে বাংলাভাষীদের মতো উচ্ছ্বাস করেন না। কিন্তু ভাষার এই রকম বিকৃতিকে তো প্রশ্রয় দেন না। আমরা 'চেয়ারে' বসি, 'টেবিলে' কাজ করি, ওঁরা 'কুর্সি'-তে বসে 'মেজ'-এর উপর কাজ করেন। আমরা 'ইউজ' করি, ওঁরা 'উপযোগ' করেন, আমরা পয়সা 'পকেটে' রাখি, ওঁরা 'জেব'-এ রাখেন, আমরা 'ওয়েট' করে করে 'টায়ার্ড' হয়ে যাই, ওঁরা 'প্রতীক্ষা' বা 'ইন্তেজার' করে করে 'থকা হুয়া' হয়ে যান। বাঙালি ভদ্রজনের এই ইংরাজি মিশ্রিত ভাষা ইতরজনে নকল করতে চেষ্টা করেন এবং তার ফল হয় অত্যন্ত করুণ। সুবোধ ঘোষের একটি ছোট গল্পে ছিল, একটি সাধারণ কাজ করা লোক তার অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন বন্ধুকে 'ইমপ্রেস' করার জন্য (এই দেখুন, আমিও পারছি না) বলছে 'একটু ডিসট্যান্সে আয় ভাই, তোর সঙ্গে একটা প্রাইভেট টক ছিল।'

বাংলা ভাষার মধ্যে নানা জেলার নানা ভাষা আছে, সেগুলো বেশিরভাগ বলতে না পারলেও শিক্ষিত বাঙালি বুঝতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের কথ্য ভাষা বোঝা পশ্চিমবঙ্গের কেন,

বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। সিলেটের ভাষা আমি বুঝতে পারি, কারণ আমি সিলেটিদের মধ্যে বড় হয়েছি, আমাদের দেশও সিলেটের খুব কাছে— কিন্তু নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা আমি একবর্ণ বুঝতে পারি না। এগুলো উপভাষা— যেমন পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়ার ভাষা বা উত্তরবঙ্গের ভাষাও উপভাষা। কামতাপুরী ভাষা কি উপভাষা? বলা মুস্কিল, কারণ বহু শব্দের সঙ্গে বাংলার কোনও মিল নেই। কিন্তু এত কম মানুষ ওই ভাষায় কথা বলেন যে, একে পূর্ণাঙ্গ ভাষা বলা কঠিন।

অর্থাৎ ভাষা এবং উপভাষায় অন্তর করার সময় সেই উপভাষা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কি তার সঙ্গে কত মানুষ সেই ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষার আলাদা ব্যাকরণ আছে কিনা, আলাদা সাহিত্য আছে কিনা, তাও ভাবতে হবে। সেজন্যই বাংলাদেশীরা ভারতীয় বাঙালিদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরী বাংলাকেই চলিত বাংলার যথার্থ রূপ বলে ধরে নিয়েছেন, ঢাকাইয়া বা হ্যাপাইরা (ফরিদপুরের ভাষা) ভাষাকে নেননি। আমার জানার মধ্যে পুরো ঢাকাই বাংলায় একটা বইয়ের বেশিরভাগ লিখেছেন এই বাংলার লেখক মনীশ ঘটক — বইয়ের নাম 'মান্ধাতার বাবার আমল।'

কিন্তু যে সব ভাষাভাষীদের নিজের ভাষার প্রতি সেরকম মমতা নেই সেই সব ভাষা কোনও বড় ভাষার মধ্যে ঢুকে বা না-ঢুকে স্বল্পচলিত উপভাষায় পরিণত হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। যেমন উত্তর বিহারের মৈথিল ভাষা। এই ভাষায় কবিকোকিল বিদ্যাপতি লিখেছেন, কিন্তু আজ এই ভাষা একটি কথ্য উপভাষা মাত্র— হিন্দির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে এর সত্তা। তেমনি বিহারের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষারও একই অবস্থা। এর মধ্যে একমাত্র ভোজপুরী ভাষার কিছু কিছু প্রকাশ সময় সময় দেখা গেছে, বিশেষত ছায়াচিত্রে।

স্বদেশ ছেড়ে যদি বিদেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, সেখানেও এই ধরনের ভাষা থেকে উপভাষায় পরিবর্তন এবং বিলুপ্তির 'পথে চলা' ঘটে গেছে। বৃটেনে ওয়েলস্ অঞ্চলের ভাষা ছিল ওয়েলস্ (নিজেদের ভাষায় যার নাম Cymru) এবং স্কটল্যাণ্ডের ভাষা ছিল Scots (নিজেদের ভাষায় Lallaus) এবং আয়ারল্যাণ্ডের ভাষা Gaelic। এর মধ্যে ওয়েল্স ও স্কটল্যাণ্ডের ভাষা খুব কম লোকই বলতে পারে, এখন উপভাষায় পরিণত। আয়ারল্যাণ্ড (আইরিশ রিপাবলিক) যেহেতু স্বাধীন দেশ, বৃটেনের অংশ নয়, তাই সেখানে গেলিক ভাষায় শিখতে উৎসাহ দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের তিন শতাংশ মানুষের বেশি মানুষের মাতৃভাষা গেলিক নয়, ইংরাজিই। এর মূল কারণ ভাষার সম্বন্ধে মমতার অভাব এবং ইংরাজির বিশ্বময় প্রচলন।

এর বিপরীতে, ফরাসীরা নিজের ভাষা সম্বন্ধে অসম্ভব স্পর্শকাতর। ইংরাজি ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দে অন্য ভাষা থেকে শব্দ আত্মসাৎ করে (যেমন করেছে হিন্দি থেকে Bazaar, Loot, Jungle, ওড়িয়া থেকে Juggernaut ইত্যাদি) ফরাসীতে সেরকম করতে দেওয়া হয় না। ফ্রান্সে চল্লিশ জন জ্ঞানীগুণীর একটি সংস্থা আছে, সেই সংস্থার সদস্যরা সারাজীবনের জন্য সদস্য থাকেন এবং এই সংস্থা ছাড়পত্র দিলে তবেই কোনও শব্দ ফরাসীতে ঢুকতে পারে। ইংরাজী ভাষা পৃথিবীজোড়া প্রাধান্য পেয়ে গেছে বলে ফরাসীদের বেজায় রাগ, বেশিরভাগ ফরাসী (এমনকী ফরাসীভাষী ক্যানাডিয়ানরাও) ইংরাজি জানলেও কিছুতেই বলে না।

ভাষা ও উপভাষা তো হলো, অপভাষা কি? অপভাষা— অর্থাৎ চলিত বাংলায় যাকে খিস্তিখেউড় বলে— তা নিয়ে আমরা মাথাই বা ঘামাবো কেন? কিন্তু মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে— কারণ এই অপভাষাকে স্বাভাবিক ভাষার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার একটা অপচেষ্টা ইদানীং দেখা যাচ্ছে। এই চেষ্টা যারা করছে, তাদের উদ্দেশ্য সস্তা চমক সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এর ফলে ভাষার যে বিকৃতি ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

অল্প কিছুদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেল আমাকে একটা আলোচনার জন্য ডেকেছিল। চ্যানেলে গিয়ে জানা গেল, আলোচনার বিষয়বস্তু একটি বাংলা ছায়াচিত্র বা সিনেমা, যার নাম— চমকে উঠবেন না— 'চ্যালেঞ্জ নিবি না, শালা'! গৃহিণীর ভাইয়ের প্রতি এই যুদ্ধ ঘোষণা কেন, এবং সেই ভাই যদি যুদ্ধ করতে না চায় তাহলেই বা কি ক্ষতি। সেকথা নাম থেকে বোধগম্য হয় না— কিন্তু এটা অপভাষাই, সেন্সর বোর্ডের উচিত হয়নি এই নামটা অনুমোদন করা। যদি প্রথমবারে শ-কার অনুমোদন করা হয়, তাহলে পরেরবার ব-কার দিয়ে একটা সিনেমার নাম হবে একথা নিশ্চিত। কিন্তু অপভাষার ভাষায় প্রবেশ নিন্দার যোগ্য, আটকাতে হবেই। সিনেমাটির মধ্যে আবার একটি গান আছে, ...'কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে বিলা?' সিনেমার পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে কথা হল। তিনি জানালেন, যখন সেন্সর তাঁর ছবি অনুমোদন করেছে, তখন আমার মতামতের তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। আমি তাঁকে সবিনয়ে জানালাম, যে আমার মতামতের জন্য চিন্তা করার দরকার নেই, কিন্তু আমরা এই অপ-সিনেমাটিকে আটকাবার জন্য সমস্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি। পরে অবশ্য আমাদের কিছু করার দরকার হয়নি, ইসকন কর্তৃপক্ষ মামলা করে ছবির কিছু আপত্তিকর জায়গা আটকেছেন।

আজকের অল্পবয়সী ছেলেদের, বিশেষ করে সমাজের কিছু কিছু স্তর থেকে— কথোপকথনের মধ্যে, পুরুষাঙ্গের দ্যোতক অশ্লীল শব্দ কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করছে শোনা যায়। যেমন 'কিরে 'ব', তোকে বললাম না গাছের তলায় একঘন্টা অপেক্ষা করতে, তুই 'ব' না বসে চলে এলি কেন 'ব'? বাক্যটিতে 'ব' শব্দটির ব্যবহারের কোনও প্রয়োজনই নেই। অনেকে যেমন কথা মাঝখানে 'কি বলে', 'ইয়ে', 'ইসে', 'কচু' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করে সেইরকম। তফাতের মধ্যে শেষোক্ত শব্দগুলো অশ্লীল নয়।

ভাষার মধ্যে এই অপভাষার অনুপ্রবেশ দেশে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঠেকানোর মতোই জরুরি। এই ব্যাপারে আমরা যত সজাগ হই ততই মঙ্গল।

ইতিহাসের শিক্ষা

শেখর বসু

অতনু বলল, 'আজ তোমাকে আঠারো নম্বর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কথা বলব।

কাঁধ ঝাঁকালো রমা— 'থাক, আর শোনার দরকার নেই।'

'কেন দরকার নেই?'

'শুনলাম তো। এক এক করে সতেরটা ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন। খারাপ ব্যাপারগুলো এত শুনতে ভালো লাগে না।'

অতনু হাসল, বেশ প্রসন্ন হাসি। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'ওই সতেরোটা গল্পের একটাও কিন্তু গালগপ্প নয়। ঐতিহাসিক না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয়।'

রমা আর একবার কাঁধ ঝাঁকালো। — 'একই গল্প তো..।'

'এক কোথায়! পাত্র-পাত্রী আলাদা আলাদা। তবে হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর এবং অটুট রাখতে হলে দাম্পত্য জীবন নষ্ট হওয়ার ওই কারণগুলো সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে।'

'তুমি তো সতর্ক ছিলে। কী লাভ হল?' রমার গলার স্বর চাপা হলেও কোথায় যেন একটা হুল ফোটানোর ব্যাপার ছিল।

অতনুর প্রসন্ন মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। হাসার চেষ্টা করে বলল, 'না, আমি খুব একটা সতর্ক ছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ইতিহাস থেকে খুব একটা শিক্ষা নিইনি আগে।'

'তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?

'দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করতে হলে স্বামী-স্ত্রী দু-জনকেই এগিয়ে আসতে হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ, বাতিক, জেদ ইত্যাদি কিছুটা ছাড়তে হয়। পৃথিবীতে কোনও মানুষই ষোলো আনা খাঁটি নয়। আমি যা বলব যা করব— সেটাই ঠিক, অন্যেরটা বেঠিক। এর মতো ভুল চিন্তা কিছু হতে পারে না। দোষ কারও বেশি, কারও কম। কিন্তু সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে স্বার্থত্যাগ করতে হয়। কেউ একটু বেশি করে, কেউ কম, কিন্তু দায়িত্ব দু-জনেরই।

'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছিলে?' রমার স্বর আর একটু ঝাঁঝালো।

অতনু হাসলো। এবারের হাসিটা আবার সেই আগের মতো প্রসন্ন। বলল, 'হ্যাঁ, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছিলাম অনেকখানিই। হয়তো পুরোটা পারিনি। তবে ইতিহাসের শিক্ষা নিলে আর একটু বেশি পারতাম। জয়তী কিন্তু আমার সমস্যা আমার দিক থেকে একবারের জন্যও ভাবার চেষ্টা করেনি।'

'নবনীতা?'

'না, নবনীতাও নয়, শুভ্রাও নয়।'

'তিনজনেরই দোষ!'

এবার অতনুর হাসি একটু ম্লান হল। 'শুধুমাত্র অন্য মানুষের দোষ দেখাটা ঠিক নয়। দোষ আমারও ছিল নিশ্চয়ই। তবে সত্যি কথা বলার একটা দায় তো থেকেই যায়। সেই দায় থেকে বলছি— আমার দোষ অনেক কম ছিল। আর মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুধুমাত্র আমিই করেছিলাম। তবে শেষরক্ষা হয়নি। তার কারণ, ওই সময় ইতিহাসের শিক্ষা আমি নিইনি।'

'এখন নিয়েছ?'

'অবশ্যই নিয়েছি। ইতিহাসের শিক্ষা যদি কেউ মনেপ্রাণে নেয়, সে কখনও ব্যর্থ হয় না। আমি তোমাকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সতেরো জনের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কাহিনী শুনিয়েছি। আর তিনটে শুনলেই তোমার এই পর্যায়ের ইতিহাস শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্ববিখ্যাত লেখক লিও টলস্টয়ের কথা জানো!'

'সবাই জানে।'

'ওঁর বিখ্যাত দু-একটা বইয়ের নাম মনে পড়ছে এই মুহূর্তে?'

'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস, আনা কারেনিনা।'

উত্তর শুনে খুশি হল অতনু। 'আজকালকার মেয়েরা এইসব ক্লাসিকের পাতাও উল্টে দেখে না। তুমি সত্যি অ্যাকম্প্লিশড!'

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রমা। ছাই অ্যাকম্প্লিশড। এক সময়ে ক্যুইজে নাম দেওয়ার খুব ঝোঁক ছিল। তখন ওই ধরনের গাদা-গাদা নাম-ধাম, সাল, তারিখ মুখস্থ করেছিলাম। ওই বই দুটো আমি চোখের দেখাও দেখিনি।'

একটু বুঝি আহত দেখাল অতনুকে। তারপর চটপট্ মনোভাব পাল্টে নিয়ে বলল— 'দেখোনি, দেখবে। একবার পড়তে শুরু করলে আর থামতে পারবে না। সারা জীবনটাই তো তোমার সামনে পড়ে আছে। এখন মোটে সাতাশ।'

'শুধু শুধু এক বছর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমার বয়স ঠিক ছাব্বিশ। বয়সের হিসেবটা আমি এখন প্রায়ই করি। তোমার বয়েস আমার বয়েসের দ্বিগুণ প্লাস পাঁচ— সাতান্ন।'

কাঁধ ঝাঁকালো অতনু। বয়সের ব্যবধানটা কোনও ব্যাপারই নয়। এই যেমন—।'

'থাক থাক, তোমাকে আর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে না। সেদিনই তো বলছিলে— পিকাসো, চার্লি চ্যাপলিন, আরও কত কত নাম। এইসব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান তিরিশ-চল্লিশ। তুমি বরং তোমার এই ইতিহাসের শিক্ষাটাই সম্পূর্ণ কর। টলস্টয়ের দাম্পত্য জীবন কি সুখের হয়নি?'

'সুখের হয়নি বললে কিছুই বলা

হয় না, ভয়াবহ ছিল। টলস্টয় তখন খ্যাতির তুঙ্গে। জগৎজোড়া খ্যাতি। অর্থ সম্পদের কোনও লেখাজোকা ছিল না। কিন্তু ওঁর বউ ছিল অসম্ভব ন্যাগিং টাইপের। প্রতিটি কাজেই খুঁত ধরত। মুখে সবসময় সমালোচনার ঝড়। গালমন্দ একবার শুরু করলে আর থামতে পারত না। পুরো হিস্টিরিয়া রুগীর মতো আচার-আচরণ। একবার আফিমের শিশি মুখের কাছে তুলে ধরে টলস্টয়কে বলেছিল— তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার মরা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাড়ির কুয়োর মধ্যে লাফ মেরে আত্মহত্যা করার হুমকিও দিয়েছিল।'

বিশ্ববরেণ্য মানুষটির অন্তরঙ্গ জীবনের এই কাহিনীর কথা জানা ছিল না রমার। শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করল, 'টলস্টয়ের বউ কি পাগল ছিল?'

'পাগল হলে তো কোনও সমস্যাই ছিল না। পাগলা গারদে চিকিৎসা চলত। বেঁচে যেতেন টলস্টয়। এমনিতে দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক। আর পাঁচজনের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু স্বামীকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। সবসময় ঘ্যানঘ্যান করত। টলস্টয়কে ঋষি বলা হয়। গোটা পৃথিবী ওঁর কথা শুনত শ্রদ্ধার সঙ্গে। অত বড় মানুষ, কিন্তু স্ত্রীকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলে উল্টো ফল হত। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো বউ। চুপ করে থাকলেও শান্তি নেই। শূন্য থেকে বিদ্‌ঘুটে বিষয় টেনে এনে তারস্বরে গালাগাল চালিয়ে যেত। টলস্টয়কে ওই বউই মেরেছিল।'

'মেরেছিল!'

'মেরেছিল। মানে খুন। এক রকমের খুন ছাড়া আর কি হতে পারে! অক্টোবর মাস। রাশিয়ার হাড়কাঁপানো শীত। কোথাও কোথাও বরফও পড়ছিল। স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে এক রাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন টলস্টয়। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়া, কোনও গন্তব্যস্থল ভেবে বেরোননি। টলস্টয়ের বয়স তখন বিরাশি।'

'বিরাশি!'

'হ্যাঁ, বৃদ্ধ মানুষ। তবে যৌবনে পেটানো স্বাস্থ্য ছিল। ওই বয়সেও শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতনে মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। নিজের জীবনের ওপর হয়তো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ওই বরফ-পড়া রাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে। গায়ে উপযুক্ত পোশাকও ছিল না। কিন্তু জেদি মানুষ। ঠিক করলেন আর কখনোই বাড়ি ফিরবেন না। কয়েকটা দিন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরির পর এক রেল স্টেশনে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে তো সবাই চেনে, রেল স্টেশনের সবাই ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিতেই উনি ফুঁসে উঠে বললেন— যেখানে খুশি তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু কখনোই আমার নিজের বাড়িতে নয়। আর একটা কথা, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার শেষশয্যায় আমার স্ত্রী যেন কখনও না আসে। এটা আমার অন্তিম নির্দেশ। অত বড় মাপের মানুষ, তাঁর শেষ নির্দেশ মানা হয়েছিল। নিউমোনিয়া হয়েছিল লেখকের। সামান্য রোগভোগের পর মারা গেলেন তিনি।

অতবড় একজন লেখকের মৃত্যুর কাহিনী শুনে একটু বুঝি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল রমা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল— 'ওঁর স্ত্রী শেষ সময় ওঁর পাশে যাননি?'

'যাবে কী করে? টলস্টয়ের তো নিষেধ ছিল। তবে স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী মেয়েদের বলেছিল— তাঁর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমিই তোমাদের বাবাকে মেরেছি। মেয়েরাও কাঁদছিল। কিন্তু মায়ের ওই কথার জবাবে একটি কথাও বলেনি। ইতিহাস সাক্ষী, টলস্টয়ের মৃত্যুর জন্য ওঁর রাম-ঝগড়ুটে স্ত্রীই দায়ী। স্ত্রী প্রায়ই আফসোস করত, কিন্তু আপসোস করে আর কী হবে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। নিজেকে সংশোধন করার হাজার একটা প্রতিজ্ঞা করলেও তো মৃত মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না।'

রমার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। এক ঝটকায় এ-কাঁধের চুল ও-কাঁধে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ? ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলে টলস্টয়ের বউ এই ভুলটা করত না?'

'না, কখনোই না। স্বামী মারা যাওয়ার পরে হায়-হায় করার কোনও মানে হয়? আগে যদি একটু বুঝত, তবে খানিকটা অন্তত মানিয়ে চলার চেষ্টা করত। দিনরাত্তির গালমন্দ করলে তার মন পাওয়া যায় না কখনও। এব্রাহাম লিংকন অত বড় মানুষ, কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবনটা ছিল কাঁটা-বেছানো। একটা দিনের জন্যও দাম্পত্য সুখের মুখ দেখেননি।'

গল্পের বড়শি গেঁথে গিয়েছিল রমার গলায়। কৌতূহলী মানুষের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'লিংকন তো মহান নেতা, গোটা আমেরিকার মানুষজন তাঁকে মাথায় করে রাখত। কিন্তু স্ত্রীর মন পেলেন না কেন?

'কপাল। মানে কপালে যারা বিশ্বাস করে তারা তাই বলবে। আসলে স্বামীর প্রতিটি ব্যাপারে খুঁত ধরত বউ। শুধু খুঁত ধরা নয়, বিদ্রূপ করত উঠতে বসতে। বলত— ঢ্যাঙা, তোমার কানদুটো কুলোর মতো। শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট, হাঁটার ভঙ্গি কদাকার। তোমাকে দেখলে গা জ্বলে যায় আমার। এক আধদিনের সমালোচনা নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এসব ছিল প্রতিদিনের ব্যাপার। একবার মানে দাম্পত্য

জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে, স্বামীর মুখের ওপর কাপভর্তি গরম কফি ছুঁড়ে মেরেছিল বউ।'

'সেকি!' কেমন যেন আঁতকে উঠেছিল রমা। একটু কাঁধ ঝাঁকালো অতনু। 'তাহলে আর কী বলছি। তখন এক বিধবা মহিলার বাড়িতে বোর্ডার হিসেবে থাকত লিংকনরা। একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আছে সবাই। লিংকনের সামান্য একটা কথার উত্তরে হঠাৎই ক্ষেপে উঠে ওঁর বউ এক কাপ গরম কফি ছুঁড়ে দিয়েছিল স্বামীর মুখে। বিব্রত লিংকন চুপ করে বসে থাকলেন ওইভাবে। টেবিলের সবাই হতভম্ব। ওই বিধবা ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ মুছে দিয়েছিলেন লিংকনের। বউ স্থান-কাল-পাত্র দেখত না। তারস্বরে গালাগাল করত। সেইসব গালাগালি আশপাশের বাড়ির লোকজনেরাও শুনতে পেত।'

লিংকনের দুঃখে একটু যেন দুঃখ পেয়েছিল রমা, কিন্তু তর্ক তোলার জন্য বলল, 'গালাগাল, ভায়োলেন্স— লিংকন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে সহ্য করলেন কেন? ওদের দেশে তো ডিভোর্স পাওয়া সোজা, ডিভোর্স কেন নিলেন না লিংকন?'

'মহান মানুষ বলে স্ত্রীকে নানাভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওই চেষ্টা আর ভস্মে ঘি ঢালার মধ্যে কোনও তফাত ছিল না। বউয়ের ওই স্বভাব-চরিত্র একটা দিনের জন্য শোধরায়নি। লিংকনের জীবনীকাররা বলেন—আততায়ীর গুলিতে মারা গিয়েছিলেন লিংকন, কিন্তু সেই মৃত্যুর কষ্ট ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্তের। আসল মৃত্যুযন্ত্রণা উনি ভোগ করেছিলেন গোটা দাম্পত্য জীবন ধরে। ওঁর বউ শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। আসলে ওই মহিলা যদি লিংকনের কথা একটু বোঝার চেষ্টা করতেন। একটু যদি ইতিহাসের শিক্ষা নিতেন—'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ধারালো গলায় রমা বলল, 'তোমার উনিশ নম্বর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনলাম। এবার বিশ নম্বরটা চটপট বলে ফেল। আর ভাল লাগছে না।'

অতনুর মুখের হাসি আবার প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। 'ব্যর্থতার গল্প শুনতে কারোরই ভাল লাগে না। মানুষ মাত্রেই সাফল্যের গল্প শুনতে চায়। সেই জন্যই সাকসেস স্টোরির এত বাজারদর। ঠিক আছে, আমি আমার বিশ নম্বর কাহিনী শোনাচ্ছি। এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা। কাহিনীর নায়কের নাম নেপোলিয়ান।'

'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট?'

' না-না, বোনাপার্ট নয়, ওর ভাইপো— নেপোলিয়ান থার্ড, ফ্রান্সের সম্রাট। এই সম্রাট অপরূপ এক সুন্দরীকে দেখে মজে গিয়েছিলেন। সুন্দরীর নাম ইউজিন। নেপোলিয়ান ঠিক করলেন ওকেই বিয়ে করবেন। রাজার বিয়ে বলে কথা। রাজা তো আর যাকে তাকে বিয়ে করতে পারেন না। বংশমর্যাদা রক্ষা করতে হবে। সম্রাটের উপদেষ্টারা বলল— ইউজিন নগণ্য এক স্প্যানিশ কাউন্টের মেয়ে, ওকে বিয়ে করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। রাজপরিবারের মর্যাদার দিকটা তো আপনাকে ভাবতে হবে। নেপোলিয়ান তখন ওই রূপসীর প্রেমে পাগল। জোর দিয়ে বলল— অমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর একজনও নেই, আমি ওকেই বিয়ে করব।'

'করল?'

'হ্যাঁ, সম্রাটের গোঁ বলে কথা। নেপোলিয়ান বিয়ে করল ওই ইউজিনকে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল ওদের ভয়ঙ্কর রকমের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন। অতবড় সম্রাট কিন্তু সম্রাজ্ঞী ওকে একদিনের জন্যও শান্তি দেয়নি। একটি মেয়ে তার বিবাহিত জীবনে যা-যা কল্পনা করতে পারে, ইউজিনের প্রাপ্তি ছিল তার বহুগুণ বেশি। দেশের সম্রাট তার স্বামী, সম্রাট সুদর্শন। অর্থ, খ্যাতি, শক্তি, সম্পদের চূড়ায় বসে আছে। কিন্তু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ইউজিন ভেবে বসল— সম্রাট আড়ালে নির্ঘাত অন্য সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়। ইউজিনের এই সন্দেহবাতিকই দুর্বিষহ করে তুলেছিল নেপোলিয়ানের জীবন। ইউজিন সদাসর্বদা ওকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করে দিল। গুরুতর রাজকার্য পরিচালনা করছেন নেপোলিয়ান, ইউজিন হঠাৎই সেখানে ঢুকে পড়ে হৈচৈ শুরু করে দিত। দেশ শাসনের ব্যাপারে মন্ত্রীদের সঙ্গে হয়তো জরুরি বৈঠকে বসেছেন রাজা, ইউজিন সেখানে ঢুকে পড়ে বিদ্‌ঘুটে সব প্রশ্নের ঝড় তুলত। সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঝগড়াঝাঁটি, অভিযোগের কোনও অন্ত ছিল না। সম্রাটের অনেকগুলো বিশাল প্রাসাদ ছিল, কিন্তু কোনও প্রাসাদেই এমন কোনও ঘর ছিল না যেখানে সম্রাট দু-দণ্ড নিশ্চিন্তে শান্তি পেতে পারেন। ওই বিশ্বসুন্দরী স্ত্রী রাজার জীবনে মস্ত এক অভিশাপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইউজিন যদি ইতিহাসের কাছ থেকে একটু শিক্ষা নিত, তাহলে দাম্পত্য জীবনের এই বিপর্যয়ের হাত থেকে অবশ্যই বাঁচতে পারত। আসলে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে রাজার জীবন আর চাষার জীবনের মধ্যে কোনও তফাত নেই। ইউজিন যদি একটু ছাড়তে পারত, একটু মানিয়ে চলতে পারত, স্বামীকে একটু বিশ্বাস করতে পারত, তাহলে—'

'তাহলে ওদের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারত, তাই তো?'

'ঠিক তাই। আচ্ছা, আমাদের অতুলপ্রসাদের দাম্পত্য জীবনের কথা তুমি জানো?'

'না, জানি না, জানতেও চাই না।'

'কেন?'

'তুমি কুড়িটা ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের গল্প শোনাতে চেয়েছিলে, তোমার কোটা শেষ। অমি আর একটাও এধরনের গল্প শুনব না।'

রমার ঝাঁজালো কথার জবাবে অতনু একটু মজার হাসি হাসার চেষ্টা করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আর বলব না। আমার কোর্স কমপ্লিট। আমার মনে হয়, তুমি চেষ্টা করলেই ইতিহাসের অমূল্য এই শিক্ষাটুকু নিতে পারবে।'

'কী শিক্ষা? অন্যের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কাহিনী শুনে তোমার আমার দাম্পত্য জীবনকে মধুর করার চেষ্টা করা?'

রমার কণ্ঠস্বর এবার আগের চাইতেও ঝাঁজালো। কিন্তু ওই ঝাঁজকে একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে অতনু বলল, 'ঠিক তাই। দাম্পত্য জীবন নষ্ট হওয়ার কারণগুলো জানা থাকলে প্রত্যেকেই সতর্ক হতে পারে। এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসটা রপ্ত করে নিতে পারলে দাম্পত্য জীবনের অনেক সংকটই এড়ানো যেতে পারে। একেই বলে ইতিহাসের শিক্ষা।'

'দরকার নেই আমার ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়ার।' রমার কণ্ঠস্বর এবার শুধু ঝাঁজালোই নয়, ওর ফর্সা মুখে বেশ একটা লালচে আভাও ছড়িয়ে পড়েছিল। 'কেন, কেন? একথা বলছ কেন?' রীতিমতো অবাক হয়েই প্রশ্ন করল অতনু।

রমা চেয়ারের পিঠ থেকে নিজের পিঠ ছাড়িয়ে নিয়ে টানটান হয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে পাঁচ মাস— খুব একটা কম সময় নয়, এবার আমার সত্যি কথাটা তোমাকে বলে ফেলা দরকার।'

'সত্যি কথা!'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা। সত্যি কথা বলতে আমি সব সময়ই ভালবাসি।'

অতনুর মুখে চাপা একটা হাসি ফুটে উঠেছিল।

'কী সত্যি কথা?'

'তোমাকে আমি কেন বিয়ে করেছি জানো?'

'কেন?'

'টাকার জন্য।'

'মানে!'

'টাকার জন্য মানে টাকার জন্য। কলকাতার ওপর তোমার তিনখানা বাড়ি, আর একটা বড় ফ্ল্যাট আছে। মোটা একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও আছে তোমার। যা ছিল না, তা হল উত্তরাধিকারী। বিয়ের সূত্রে এবার তোমার সব টাকা-পয়সা সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হব আমি।'

একটু হাসার চেষ্টা করল অতনু। 'সে তো পরের ব্যাপার। এখন তো আমি আছি।'

'এখন আছ, কিন্তু....।'

'কিন্তু কী?'

'দেখ, আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল। যেটা অন্যের কাছে কঠিন কথা বলে মনে হতে পারে, আমার কাছে সেটা সহজ। পৃথিবীতে কেউই অমর নয়। তোমার বয়স সাতান্ন— যাকে বলে শেষ জীবন। অথচ আমার মাত্র ছাব্বিশ। তুমি এর আগে তিনটে বিয়ে করেছিলে, আমার এই প্রথম। আমি লেখাপড়া শিখেছি। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। অল্প বয়স। এই বয়সে তোমার বিয়ের প্রস্তাবে কেন রাজি হয়েছিলাম— তুমি বুঝতে পারোনি?'

রমার স্পষ্ট, কাটাকাটা কথার জবাবে খোলামেলা গলায় হাসল অতনু। তারপর প্রসন্ন মেজাজে বলল, 'আমি বোকা নই। তারপর বয়েসের সুবাদে বাড়তি অনেক কিছু দেখেছি, শুনেছি। তুমি আমার বিয়ের প্রস্তাবে একটু দোনামনা করার পরে কেন রাজি হয়েছিলে— আমি বুঝতে পেরেছি।'

'বুঝতে পেরেও বিয়ে করলে?'

'করলাম। তার কারণ, তুমি এখন যা ভাবছ কাল তা আর ভাববে না।'

অতনুর কথায় রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল রমা। 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

আর এক দফা হাসল অতনু, উদ্বেগহীন হাসি। তারপর বলল, 'এর পেছনেও ইতিহাসের শিক্ষা আছে। তুমি মস্ত বড় নেতা ডিজরায়েলির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। এই ডিজরায়েলির গভীর একটা বিশ্বাস ছিল। প্রায়ই বলতেন— আমি অনেক কিছু ভুল করতে পারি, কিন্তু মধুর দাম্পত্য জীবনের কথা কল্পনা করে নিয়ে কখনও বিয়ে করতে যাব না। এটা হল গিয়ে সোনার পাথরবাটি। এই ডিজরায়েলি ওঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এক ধনী বিধবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন। ওই বিধবার বয়স তখন পঞ্চাশ। ডিজরায়েলির চেয়ে পনের বছরের বড়। মহিলা দেখতে শুনতে অত্যন্ত সাধারণ, মাথার চুলে ভাল রকমের পাক ধরে গিয়েছে। লেখাপড়াও খুব একটা শেখেনি। অত্যন্ত সুশিক্ষিত বড় বাগ্মী, বিখ্যাত জননেতা ডিজরায়েলির বউ হওয়ার কোনও যোগ্যতাই ছিল না ওই মহিলার। প্রস্তাব শুনে মহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন— আপনার মতো একজন বিখ্যাত মানুষ হঠাৎ আমার মতো একজন সাধারণকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন? ডিজরায়েলি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। ওই প্রশ্নের উত্তরে চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছিলেন— আপনাকে বিয়ে করতে চাইছি শুধুমাত্র আপনার টাকা-পয়সার দিকে তাকিয়ে। আর কোনও কারণ নেই। উত্তরটা ওই মহিলার পক্ষে ছিল অত্যন্ত শকিং। কিন্তু কিছুদিন পরে উনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে হয়ে গেল ডিজলায়েলির আর ওই মহিলার। মহিলার নাম সম্ভবত অ্যান মারি। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ওঁরা মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। কেন বলো

তো?'

কৌতূহলী শ্রোতার গলায় প্রশ্ন করল রমা, 'কেন?'

'কারণ একটাই। দু-জনের কেউই গভীর কোনও প্রত্যাশা নিয়ে ঘরসংসার শুরু করেনি। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিখ্যাত জননেতা নিজের কাজকর্ম নিজের মতো করে করতেন। অতি সাধারণ অ্যান নিজের মতো করে ঘরগেরস্থালি সামলাতেন। কেউ কারও কাজে নাক গলাতেন না কখনও। সংসার জীবন তাই দু-জনের কাছেই খুব সুখের হয়ে উঠেছিল। অবসর সময়ে ওঁরা ছোটখাটো নানান বিষয়ে মনের সুখে গল্প করতেন। ওঁদের মধ্যে একটা বাঁধা রসিকতা ছিল। একই ধরনের প্রশ্ন আর উত্তর।'

'কী প্রশ্ন? উত্তরটাই বা কী?' রমার কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছিল।

প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল অতনুর চোখেমুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল— 'অ্যান জিজ্ঞেস করতেন— অনেকদিন তো সংসার করলাম আমরা। এখন যদি আমাদের আবার বিয়ে হত, তুমি কি শুধুমাত্র টাকা-পয়সার জন্য বিয়ে করতে আমাকে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন ডিজরায়েলি— 'না, কখনও না। বিয়ে করতে চাইতাম তোমাকে ভালবাসি বলে।'

'বাঁধা রসিকতা। কিন্তু মাঝেমধ্যেই ওঁরা এটা করতেন। এইভাবে লম্বা তিরিশটা বছর দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছিলেন দু-জনে। এটা কেন সম্ভব হয়েছিল বল তো?'

'কেন?'

'দু-জনেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন।'

রমা এবার আর কোনও প্রশ্ন করল না। একটু বাদে ওর চোখমুখে বেশ একটা সহজ ভাব ফুটে উঠেছিল।

●●●

রমা আর অতনুর সেই পাঁচ মাসের দাম্পত্য জীবন দিব্যি গড়াতে গড়াতে এখন পাঁচ বছরে এসে ঠেকেছে। রমা মাঝে মাঝেই বলত, 'ইতিহাসের দশ-বিশটা ঘটনা জানা মানেই কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়া নয়। এসব কাহিনী তুমি হয়তো আমার চাইতে বেশি জানো। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়া বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু তোমার চাইতে আমি ঢের বেশি নিয়েছি। সত্যি কি না বলো?'

অতনু তখন হাসতে হাসতে উত্তর দিত— 'ঠিক, একশো ভাগ ঠিক।'প্ত

নোবেল পাওয়া সহজ ছিল না আইনস্টাইনের

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়

শিরোনামেই কথা উঠতে পারে, আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী আর নোবেল পুরস্কার— এতো স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে সাধারণ মানুষ অনেকেই মনে করে। সুতরাং এই নোবেল পুরস্কার পাওয়া সহজ ছিল না আইনস্টাইনের, তা কি ভাবা যায়? কিন্তু সত্যিই এই তথ্যটা জানা দরকার এবং সেজন্যই এর উপর আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা জানি, গত ২০০৫ সাল আইনস্টাইনের যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি উপস্থাপনার শতবর্ষ হিসেবে 'আইনস্টাইন বর্ষ' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই বর্ষের উদ্বোধন হয়েছিল নিউজার্সি প্রিন্সটনের আকাশে অভূতপূর্ব এক লেসার আলোর খেলা দিয়ে। সে আলো আমেরিকার আকাশ পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে চলে যায় জাপান-চীন, তারপর দুটি ধারায় উত্তর ও দক্ষিণ এশিয়ার আকাশ অতিক্রম করে অস্ট্রিয়া, ইউরোপ হয়ে ফিরে আসে প্রিন্সটনে। শতবর্ষ আগে ১৯০৫ সালে জার্মানির Annalen der Physik- পত্রিকাতে আইনস্টাইনের মূল তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার ১৭তম অধ্যায়ে, পৃষ্ঠা ১৩২-এ আছে আলোক-তড়িৎ অভিক্রিয়াকে ব্যাখ্যার জন্য সূত্র, ৫৯৪ পৃষ্ঠায় আছে ব্রাউনীয় গতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ এবং পৃষ্ঠা ৮৯১-তে ধরে রেখেছে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন মোট ৬টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন— (১) আলোক কোয়ান্টাম ও আলোক তড়িৎ অভিক্রিয়া - ১৭ মার্চ। (২) আণবিক পরিমাপগুলির নতুনভাবে নির্ধারণ - ৩০ এপ্রিল, যা পরে তাঁর ডক্টরেট থিসিসের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৩) ব্রাউনীয় গতিতত্ত্ব - ১৯ মে, ডক্টরেট থিসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪) বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব - ৩০ জুন। (৫) E=mc2 সূত্র - ২৭ সেপ্টেম্বর। (৬) ব্রাউনীয় নীতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় আর একটি গবেষণাপত্র - ২৭ ডিসেম্বর।

প্রথম পত্রটি ম্যাক্স প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে প্রয়োগিক সাফল্য এনে দেয় আলোক কণিকা বা ফোটন তত্ত্বের উদ্ভাবনে। দ্বিতীয়টি তাঁকে এনে দেয় ডক্টরেট ডিগ্রী এবং তৃতীয়টি আলোর

LONDON TIMES

REVOLUTION IN SCIENCE.

NEW THEORY OF THE UNIVERSE.

NEWTONIAN IDEAS OVERTHROWN.

Yesterday afternoon in the rooms of the Royal Society, at a joint session of the Royal and Astronomical Societies, the results obtained by British observers of the total solar eclipse of May 29 were discussed.

The greatest possible interest had been aroused in scientific circles by the hope that rival theories of a fundamental physical problem would be put to the test, and there was a very large attendance of astronomers and physicists. It was generally accepted that the observations were decisive in the verifying of the prediction of the famous physicist, Einstein, stated by the President of the Royal Society as being the most remarkable scientific event since the discovery of the predicted existence of the planet Neptune. But there was difference of opinion as to whether science had to face merely a new and unexplained fact, or to reckon with a theory that would completely revolutionize the accepted fundamentals of physics.

'লণ্ডন টাইমস্'-এ আইনস্টাইন তত্ত্বের স্বীকৃতি।

গতিবেগকে নির্দেশতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে ধ্রুবক হিসেবে প্রতিপন্ন করে অবশেষে ভর-শক্তির তুল্যমূল্যতা প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুবিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে আইনস্টাইন এই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বকে উন্নীত করেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এবং মহাকর্ষ ও দেশ ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে নতুন মহাবিশ্ব ধারণার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

বহুবর্ষ ব্যাপী নিউটনীয় ধারণার অবসান ঘটিয়ে আইনস্টাইন

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে তুলে ধরেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা প্রত্যয়িত হয়। ফলে আইনস্টাইন ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পরস্পরের পরিপূরক শব্দ হয়ে ওঠে। আর ঠিক এজন্যই বহু মানুষের ধারণা আছে যে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন যুগান্তকারী ওই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্য। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

১৯২২ সালের ১০ নভেম্বর আইনস্টাইনের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি গেল বার্লিনে, তাঁর ঠিকানায়। পত্রলেখক সুইডিশ একাডেমী অফ সায়েন্সেস-এর সম্পাদক ক্রিস্টোফার অরিভিলিয়াস। "আমি তোমাকে ইতিপূর্বেই এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানিয়েছি যে, রয়্যাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর গতকালের সভায় তোমাকে গত বছরের (১৯২১) জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় তোমার কাজের বিবেচনায় এবং আলোক-তড়িৎ অভিক্রিয়ার সূত্র উদ্ভাবনের জন্য। তোমার আপেক্ষিকতাবাদ ও মহাকর্ষ তত্ত্বের যুক্তিযুক্ততা ভবিষ্যতে আরও প্রমাণ সহ নিশ্চিতকরণের জন্য ওগুলির উৎকর্ষতাকে বিবেচনায় না এনে।" এই চিঠি ১ এবং টেলিগ্রাম আইনস্টাইন পাননি। কারণ তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এলসা তখন জাপান যাত্রী ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসেই ভন লাও একটি চিঠিতে ২ এর আভাস দিয়েছিলেন— "According to information I received yesterday and which is certain, events may occur in November which might make it desirable for you to be present in Europe in December. Consider whether you will nevertheless go to Japan."

আইনস্টাইন অবশ্য চলে গিয়েছিলেন এবং ১৯২৩ সালের মার্চের আগে বার্লিন ফিরতে পারেননি। জাপান যাত্রাপথে কোথায় তিনি ওই চিঠি পেয়েছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁর যাত্রা ডায়েরীতে কোথাও কোনও উল্লেখ নেই। যাই হোক, ১৫ ডিসেম্বর ১৯২২, সুইডেনস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডলফ নাডোলনি আইনস্টাইনের পক্ষে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং স্টকহোল্মের সেদিনের সন্ধ্যায় হর্ষ প্রকাশ করেন ৩ ê"The joy of my people that once again one of them has been able to achieve something for all mankind." বার্লিনের বৈদেশিক দপ্তরে পৌঁছানো নাডোলনির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক জটিলতা মাথা তুলেছিল আইনস্টাইনের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার পদ্ধতিতে। নভেম্বর মাসে নাডোলনিকে সুইডিশ একাডেমি আইনস্টাইনের প্রতিনিধিত্ব করতে বলেছিল। সুইডিশ রাষ্ট্রদূত কিন্তু ব্যাপারটার স্পষ্টীকরণ চান। কারণ তাঁর ধারণা মতো আইনস্টাইন তখন সুইডিশ নাগরিক। ১ ডিসেম্বর নাডোলনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যাপারটি জানান কেব্‌ল করে। ডিসেম্বরের ১১ তারিখে বৈদেশিক দপ্তর আইনস্টাইনের সুইডিশ নাগরিকত্ব সমর্থন করে। কিন্তু জানুয়ারির ১৩ তারিখে (১৯২৩) প্রুশিয়ান একাডেমি জানায় যে গত ৪ মে, ১৯২০ তারিখে আইনস্টাইন শপথ নেন রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী এবং সেজন্য তিনি একজন জার্মান। কারণ শুধুমাত্র জার্মানরাই রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী হতে পারে। ১৮ জানুয়ারি প্রুশিয়ান একাডেমি আইনগত ভিত্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, আইনস্টাইন একজন জার্মান নাগরিক ছিলেন, তবে তাঁর সুইডিশ নাগরিকত্ব তার জন্য খারিজ হয় না। প্রুশিয়ান একাডেমি আইনস্টাইনকে এই রুলিং জানান ১৫ ফেব্রুয়ারি। মার্চ ২৪ তারিখে আইনস্টাইন একাডেমিকে জানান যে, তাঁর বার্লিনে অবস্থানের জন্য নাগরিকত্ব পরিবর্তন করেননি। এপ্রিল ৬, ১৯২৩ তারিখে এল্‌সা৪ আইনস্টাইন স্টকহোল্‌ম-এর 'নোবেল' সংসদকে জানান যে, প্রফেসর আইনস্টাইন পছন্দ করেন যেন তাঁর পদক এবং শংসাপত্র বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আরও জানান, যদি কূটনৈতিক পথে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে যেন সুইডিশ একাডেমির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। কারণ তিনি সুইডিশ নাগরিক। সমস্ত ব্যাপারটি তারপর মিটে গেল যখন জার্মানিতে থাকা সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ব্যারেন র‍্যামেল বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু তাঁকে হস্তান্তর করেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে নোবেল কমিটির একজন সদস্য সাভান্তে আরহেনিয়াস আইনস্টাইনকে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি জুলাই মাসেই গোটেবর্গ শহরের ৩০০ বছর পূর্তি উৎসবে আয়োজিত 'স্ক্যানডেনেভিয়ান সোসাইটি অফ সায়েন্স'-এর অধিবেশনে আসেন। সেইমতো গোটেবর্গের জুবিলি হলে দু'হাজার শ্রোতার সামনে আইনস্টাইন প্রত্যাশামত "Basic ideas and problems of the theory of Relativity"-এর ওপর বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দেন চাল্‌মার টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের পঞ্চাশজন সোসাইটি সদস্যদের উপস্থিতিতে।

কিন্তু নোবেল পুরস্কারের জন্য নোবেল কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ আসতে লেগেছিল প্রায় ১০ বছর — ১৯১০-১৯২২। মাঝে ১৯১১ ও ১৯১৫ সাল কোনও সুপারিশ ছিল না। এই দশ বছর ধরে মনোনয়ন প্রাপ্তদের বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল যাতে প্রত্যেক শ্রেণী থেকে প্রধান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে তুলনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়। ১৯১০ সালে আইনস্টাইনের নাম প্রথম প্রস্তাব করেন ভৌত রসায়ণবিদ উইলহেল্‌ম অস্টওয়াল্ড। ইনি ১৯০৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর কাছেই একদা ১৯০১ সালে সহকারী পদের জন্য দরখাস্ত দিয়ে অসফল হয়েছিলেন আইনস্টাইন। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালেই ইনি আইনস্টাইনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ভিত্তি ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব। তাঁর মতে, শক্তি-নীতি আবিষ্কারের পর সবচাইতে সুদূরপ্রসারী নতুন ধারণা ছিল আপেক্ষিকতাবাদ। দ্বিতীয়বার প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, এই যুক্তিতে যে হাজার হাজার বছরের চিন্তা-ভাবনার বাধ্যবাধকতা থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। তৃতীয়বার তিনি আইনস্টাইনের অবদানকে কোপার্নিকাস ও ডারউইনের অবদানের মতো মনে করেন। ১৯১২ সালে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ই প্রিংসহাইম, সি স্কেফার এবং ডব্লিউ উইন। ১৯১৩ সালে আবার সমর্থন করেন উইন এবং জার্মান মেডিসিন প্রফেসার বার্নহার্ড নাওনাইন যিনি আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বেও আইনস্টাইনের অবদানের কথা বলেন। প্রিংসহাইম ৬ এই সূত্রে লিখেছিলেন "I believe that the Nobel Committee will rarely have the op-

portunity of awarding a prize for works of similar significance".¼

উইনের দুবার মনোনয়নেই যুক্তভাবে লরেন্টজ্-এর সঙ্গে ছিল। তবুও না হওয়ার কারণ সম্ভবত তখনও অবধি আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিধাহীন গ্রহণীয়তার জন্য উপযুক্ত এবং যথেষ্ট প্রমাণের অভাব। লরেন্টজ-এর মতো বিজ্ঞানীও আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্য নাম সুপারিশে মত দেননি।

১৯১৪ সালে কমিটি প্রতিবেদনে বলেছে, আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে শেষ কথা বলার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইনের নামই ওঠেনি। ১৯১৬ সালে আপেক্ষিকতাবাদ ও ব্রাউনীয় গতি ব্যাখ্যায় অবদানের জন্য এরেনহ্যাস্ট আইনস্টাইনের নাম প্রস্তাব করেন। নাম গৃহীত হয়নি কমিটিতে।

১৯১৭ সালের পর থেকে আইনস্টাইনের পক্ষে পাল্লা ভারী হতে থাকে। ১৯০৭ সালেই আইনস্টাইন বুঝতে পারছিলেন মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছে বেঁকে যাবে। আইনস্টাইনের আগের হিসাব মতো এই বেঁকে যাওয়াটার পরিমাণ ০.৮৭ সেঃ। পূর্ণ গ্রহণের সময় সূর্যের কাছে আলোর এই বেঁকে যাওয়াটা মাপা যায়। এরপর আইনস্টাইন দেশের বক্রতা-ধারণার উদ্ভব ঘটান, যার ধর্ম হিসাবেই মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দেশের একটা ধর্ম বলে পরিগণিত হয়। ১৯১২ সালে দেশের বক্রতা-ধর্ম জানার পর এর প্রভাবে বেঁকে যাওয়ার মাপ বেড়ে আইনস্টাইনের মতে হল ১.৭৪ সেঃ, অর্থাৎ আগের ধারণা (যা নিউটনীয় মতানুযায়ী ছিল) মতো বাঁকের দ্বিগুণ। নিউটনীয় এবং আইনস্টাইন মতের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হল। ১৯১৪ সালে নিজের মতে স্থির নিশ্চিত হয়ে তিনি (Besso) বেসো-কে লিখলেন, "I do not doubt any more the correctness of the whole system, whether the observation of the solar celipse succeeds or not." ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এডিংটন রয়াল এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিকে জানালেন, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বানুযায়ী আলোর গঠনের বিচ্যুতির গুরুত্বের কথা। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে জ্যোতির্বিদ স্যার ফ্রাংক ওয়াটসন ডাইসন আসন্ন ১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখে মহাকাশে নক্ষত্র বিন্যাসের এক বিশেষ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যখন আর একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটবে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল বিজ্ঞানী মহলে। দুটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ঠিক করা হল। একটি ব্রাজিলের সব্রালে এবং অন্যটি স্পেন গায়নার উপকূলের কাছে প্রিনস্ইপ দ্বীপে। প্রথমটিতে থাকবেন গ্রীনিচ মানমন্দিরের এন্ড্রু ক্রোমেলিন এবং অপরটিতে এডিংটন স্বয়ং। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে রওনা হওয়ার আগে এডিংটন৭ অভিমত দিলেন, "The present eclipse expeditions may for the first time demonstrate the weight of the light (ie the Newtanian Value) or they may confirm Einstein's weird theory of non-Euclidean space; or they may lead to a result of yet far reaching consequeneces -- no deflection."

Berliner Illustrirte-এর প্রচ্ছদে আইনস্টাইন (১৪.১২.১৯১৯)।

এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল আইনস্টাইনের অনুকূলে গেল এবং রাতারাতি আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এক কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত হলেন। 'লণ্ডন টাইমস্'এ সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশ করল। Berliner Illustrate -এর প্রচ্ছদও উল্লেখযোগ্য। এরপর আইনস্টাইনের মনোনয়নের ব্যাপারে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই দ্বিধামুক্ত হলেন। ১৯১৯ সালে ওয়ারবার্গ, ভন লাউ, ই মিয়ার তাঁদের পুরনো সমর্থন পুনরায় প্রকাশ করলেন। ম্যাক্স প্ল্যাংক সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্যই মনোনয়ন দিলেন। আরহেনিয়াস দিলেন ব্রাউনীয় গতি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। ১৯২০ সালে পুরনো মনোনয়নকারীদের সঙ্গে আইনস্টাইনের সমর্থনে যোগ দিলেন ওয়ারবার্গ, বার্লিনের ওয়ালডিয়ার হাট্ন, ডেট্রয়েট থেকে এল এস ওরেনস্টাইন, এডিংটন (কেমব্রিজ), ওয়ালকট (ওয়াশিংটন) ও উইনার (লিপজিগ), জে হাডমার্ড (প্যারিস) প্রমুখেরা। আলোক-তড়িৎ অভিক্রিয়ার জন্য মনোনয়ন দিলেন কাল উইলজেল্ম ওসিন, লরেন্টজ, জুলিয়াস, জিমান, কামারলিঙ ওন্স্ স্বাক্ষরিত পত্রে মনোনয়ন দিলেন মহাকর্ষ তত্ত্বর জন্য। ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের ফলাফল উল্লেখ করে এরেনফেস্টকে লিখলেন লরেন্টজ ৮— ê"One of the most brilliant confirmations of a theory ever achieved".

তবুও লোহিত অপসারণ (Red Shift) মান ভিন্ন প্রতিভাত হতে বাধা দিয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপথ্যালমোলজির অধ্যাপক গুলস্ট্র্যাণ্ড, ৯ দীর্ঘকালীন নোবেল কমিটির সদস্য (১৯১১-১৯২৯), নোবেল কমিটি সিদ্ধান্ত

নিতে বাধ্য হল আপেক্ষিকতাবাদকেই ভিত্তি করে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যাবে না আইনস্টাইনকে। ১৯২১ সালে আবার ব্যাপক সমর্থন দিলেন আইনস্টাইনকে, প্ল্যাংক, হাস,, এডিংটন প্রমুখরা। এডিংটন মত প্রকাশ করলেন, "Einstein stands above his contemporaries even as Newton did".

ওদিকে আলোক-তড়িৎ অভিক্রিয়া নিয়ে বিচার বিবেচনার চূড়ান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আরহেনিয়াসও সিদ্ধান্ত দিতে পারলেন না। ফলে ১৯২১ সালের পুরস্কার স্থগিত থেকে গেল। ১৯২২ সালে আরও অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞানীরা এলেন আইনস্টাইনের সমর্থনে। সামারফিল্ড ১০ এম ব্রিলোয়িন লিখেছেন, "Imagine for a moment what the general opinion will be fifty years from now if the name of Einstein does not appear on the list of Nobel Laureates." ১৯২২ সালে প্ল্যাংক প্রস্তাব দিলেন, ১৯২১ সালের জন্য আইনস্টাইনকে এবং ১৯২২ সালের জন্য নীল্‌সবোরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক। কার্ল ওসিন পুনরায় আলোক-তড়িৎ অভিক্রিয়ার জন্য যুক্তি সহ আইনস্টাইনের নাম প্রস্তাব করেন। কমিটি তাকে দ্বিধাগ্রস্ততা থেকে স্বস্তির পথ স্বীকার করেই আইনস্টাইনের নাম চূড়ান্ত করেন ১৯২১ সালের জন্য। এবং এভাবেই নোবেল পেলেন আইনস্টাইন।

এ আলোচনার হয়তো এখানেই শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আইনস্টাইন নিজেই নোবেল মনোনয়ন দেবার জন্য নোবেল কমিটি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি মনোনয়ন পাঠাতেন ১৯১৮ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি সেজন্য এই আলোচনা একটু সম্প্রসারিত করছি ভারতীয় হিসাবে কয়েকজন ভারতীয়র প্রতি অবহেলার কথা জানিয়ে।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার 'সাহা আয়নন সূত্র' জ্যোতিঃপদার্থ - বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। আর্থার এডিংটনের মতে, গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের পর থেকে জ্যোতির্বিদ্যার দশটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে সাহার আয়নন সূত্র আবিষ্কার অন্যতম। তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন এনরিকো ফার্মি, ই ও লরেন্স, জে ডি করস্ট, জে কুরি, হাইসেনবার্গ, অটো হান, আর ওপেনহাইমার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দ্বারা। এঁরা সবাই নোবেল লরিয়েট হয়েছিলেন আগে পরে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এইচ কম্পটন সাহার নাম সুপারিশ করেছিলেন। আমরা ছাত্রাবস্থা থেকে এরকম শুনে আসছিলাম। পরে প্রমাণ পাওয়া গেল, রবার্ট এন্ডারসনের একটি লেখাতে— "...However the permanent secretary to the Royal Academy of Sciences in Sweden answered my quary thus ê"Considering the fact that the invitations to nominate candidate for the Nobel Prize go to a number of prominent scientists spread all over the world each year, that Saha and Bhaba are both names in physics which are linked to very important work, that these two men and their work are held in high esteem for their contributions I think that it would not be unreasonable for you to take it for rather certain that they have been nominated for receiving Nobel Prizes on several occasions and by several scientists."

সাহাকে কিন্তু নোবেল পুরস্কারের জন্য পছন্দ করেনি কমিটি। হোমি ভাবারও অন্যান্য কাজের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, উনিও পাননি।

সবচাইতে ক্ষোভের বিষয়, আচার্য সত্যেন বসুর নাম বিবেচনায় আনার লোকের অভাব। কিন্তু আইনস্টাইন তো জানতেন, তাঁর কাজের গুরুত্ব এবং মূল্য। তিনি মনোনয়নের আহ্বান পেলেও কখনো বসুর নাম করেননি। অথচ মৌল কণার 'স্কিন' বা ঘূর্ণন ধারণার তিনিই প্রবক্তা ছিলেন। প্লাংকের বিকিরণ সূত্র যুক্তিযুক্ত ভাবে পেতে যে বিশেষ গণনা পদ্ধতি বসু আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে বিস্মিত আইনস্টাইন। বার্লিনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই জানতে চেয়েছিলেন (বসুর কথানুযায়ী) "...how I had hit the idea of deriving Plank'sh way law in this way?"

পরবর্তীকালে তরঙ্গবল বিদ্যার ভ্রূণ ছিল বসুর সংখ্যায়নের প্রথম পত্রে। একথা নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন ম্যাক্স বর্ণ। মৌল কণাগুলি বসু সংখ্যায়ন দ্বারা শাসিত। তাঁর গবেষণার সূত্র ধরেই অন্তত পাঁচজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তবুও বসুর নাম বিবেচনায় আসেনি কেন? তার বিশ্লেষণ অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা যায়, তথ্যাদি আছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ পি ডিরাককে কখনো মনোনয়ন দেননি আইনস্টাইন। তাঁর ভাবনার অনুরূপ সীমাবদ্ধতাই কি বসুর নাম মনোনয়নে বাধা হয়েছিল? প্রাপ্ত তথ্যাদি, এনিয়ে আলোচনার সাহসকে ধৃষ্টতা মনে করায় না।

সূত্রাবলী ঃ — (1) C Aurivillius, Letter to A. Einstain, Nov, 10, 1922, (2) M. Von Laue, Letter to A. Einstein, Sept. 18, 1922, (3) Les Prix Nobel PP 101-2 Imprimeric Royale, Stockholm, 1923, (4) Ilse Einstein, Letter to Prof Sederholm, April 6, 1923, (5) A Einstein, Grundgedonken and Probleme der Relativitatstneorie Imprimeric Royale, Stockholm, 1923, (6) E Pringsheim, Letter to SAS , Jan, 19, 1919, (7) A. S. Eddington, Observatory 42 119 (1919), (8) H A Lorents, Letter to P. Ehrenfest, Sep, 22, 1919, (9) A Gullstrand, Ark. Mat. Astr Fys 16, No8 (1921), 17 No3 (1922), (10) M Brilbuin, Letter to SAS Nov12 (1921).

শেষ নয়, শুরু

রমানাথ রায়

একদিন নিখিল হাসতে হাসতে ভারতীকে বলল, সব ঠিক হয়ে গেল।

ভারতী কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল— কী ঠিক হল?

— আমেরিকা যাওয়া।

ভারতী এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমেরিকা যাচ্ছ?

— হ্যাঁ। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। তবে তার আগে আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার।

ভারতী বলল, আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাব না।

নিখিল ক্ষুণ্ণ হয়ে জানতে চাইল, কেন?

— আমার মা অসুস্থ। আমি মাকে ফেলে কোথায় যাব!

— তোমার মাও সঙ্গে যাবেন।

— না, তা হয় না। এছাড়া....

— এছাড়া কী?

— আমার বাবা মাকে ফেলে আমেরিকা গিয়েছিল। আর ফেরেনি। ওখানেই মারা যায়। আমি এটা ভুলতে পারি না। তাই আমেরিকার ওপর আমার কোনও মোহ নেই।

নিখিল তা শুনে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল— তার মানে তুমি আমার সঙ্গে আমেরিকা যাবে না?

ভারতী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না। আমি মাকে ছেড়ে এই কলকাতা ছেড়ে

কোথাও যাব না। আমি এখানে জন্মেছি, এখানেই মরতে চাই।

নিখিল জিজ্ঞেস করল, আমাদের বিয়ের কী হবে?

— বিয়ে হবে না। আর তুমি যদি সত্যি আমাকে চাও, তাহলে তোমার আমেরিকা যাওয়া হবে না।

— আমাকে একটু ভাবতে দাও। — বলে নিখিল তার ফ্ল্যাটে চলে গেল। নিখিল ভাবতে লাগল, ভাবতে লাগল কী করা যায়। তার একদিকে আমেরিকা, আর একদিকে ভারতী। কিন্তু সমস্যা হল আমেরিকা গেলে ভারতীকে হারাতে হবে। আবার ভারতীকে পেতে হলে আমেরিকা যাওয়া হবে না। কী করবে সে? শেষে অনেক ভেবেচিন্তে দেখল, এক ভারতী গেলে আর এক ভারতী আসবে। তার জীবনে ভারতীদের অভাব হবে না। কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ তার জীবনে দ্বিতীয়বার নাও আসতে পারে। অতএব ভারতীকে ত্যাগ করে আমেরিকা যাওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া এখানে কে আছে তার? বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোনও নেই। সে একেবারে এখানে একা। কার জন্য এখানে থাকবে? ভারতীর জন্য? ফুঃ!

●●●

ভারতীর মা-র বয়স সত্তর। দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগছেন। অনেক চিকিৎসা হয়েছে। ডাক্তারদের আর কিছু করার নেই। তারা একরকম জবাব দিয়ে দিয়েছেন। মা-র ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর আগে ভারতীর বিয়েটা দেখে যাবেন। কিন্তু নিখিল যে ভারতীকে এভাবে ছেড়ে চলে যাবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। ফলে সবসময় তিনি চিন্তায় রইলেন। কেবলই ভাবতে লাগলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কী হবে ভারতীর! ভারতী যে একেবারে একা হয়ে যাবে। তাঁর চোখ দিয়ে কেবলই গড়িয়ে পড়তে লাগল জল।

একদিন তিনি ভারতীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

ভারতী মা-র কপালে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল, কী কথা?

— নিখিল তোকে ফোন করে?

— মাঝে মাঝে করে।

— নিখিল কি আর দেশে ফিরবে?

— ফিরবে বলে মনে হয় না।

— তাহলে তুই দেখেশুনে অন্য কাউকে বিয়ে কর।

— আমি বিয়ে করব না।

— কেন?

— দিব্যি আছি। কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাব?

— তুই একা থাকতে পারবি?

— পারব। — বলে একটু থেমে ভারতী বলল,— আজকাল কত মেয়ে বিয়ে না করে একা আছে। আমি কেন পারব না?

মা তা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, — নিখিল কাজটা ভালো করল না। তোকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারত।

ভারতী বলল,— নিখিলের দোষ নেই। নিখিল আমাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমিই যাইনি।

মা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,— কেন?

— তোমাকে দেখবে কে?

— আমি একটা আয়া রেখে দিতাম। সেই দেখাশুনা করত। তুই খুব ভুল করেছিস। আমার সঙ্গে এ নিয়ে তোর আলোচনা করা উচিত ছিল।

— আলোচনা করার কী আছে! তুমি যেতে বললেও আমি যেতাম না। আমি কলকাতা ছেড়ে চাকরি ছেড়ে কোথাও যাব না। তাছাড়া আমেরিকা গিয়ে কী হবে? দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটানোর ইচ্ছে আমার নেই। আর....

— আর কী?

— বাবা তো তোমাকেও আমেরিকা নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তুমি তো যাওনি।

— আমি ভুল করেছি। — বলে মা চুপ করে গেলেন।

●●●

এরপর ভারতীর মা একদিন মারা গেলেন। ভারতীর কাছে চারদিক কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। একদিন অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে তার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। সারা ফ্ল্যাট মা-র অভাবে খাঁ খাঁ করতে লাগল। বারবার মা-র কথা মনে পড়তে লাগল। কেবই মনে হতে লাগল, এই সময় তার পাশে কেউ থাকলে ভালো হত। তার সঙ্গে দুটো কথা বলে মনটাকে হাল্কা করতে পারত। কিন্তু তার পাশে কেউ নেই। নিখিল ছিল। সেও থাকল না। নিখিলের জন্য হঠাৎই মন খারাপ করতে লাগল। নিখিলের ফোন নম্বর তার কাছে আছে। ইচ্ছে করলেই সে নিখিলকে ফোন করতে পারে। কিন্তু সে করল না। হাজার কষ্ট হলেও সে নিখিলকে কোনওদিন ফোন করবে না। নিখিলকে এখন ভুলতে হবে। ভোলা যাবে না জেনেও ভোলার চেষ্টা করতে হবে।

নিখিলও ভারতীকে ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না। একদিন সে ভারতীকে ফোন করল।

— কেমন আছ?

— ভালো।

— তোমার মা কেমন আছেন?

— মা গত মাসে মারা গেছে।

— সে কী! আমাকে জানাওনি তো?

— জানিয়ে কী হত?

— তবু....

এবার প্রসঙ্গ বদল করে ভারতী জিজ্ঞেস করল— বিয়ে করেছ?

— না।

— করে ফেলো। দেরি করো না। — বলেই ভারতী ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

একটু পরে আবার ফোন বেজে উঠল। ভারতী আবার রিসিভার তুলল।

নিখিল জিজ্ঞেস করল— ফোনটা নামিয়ে রাখলে কেন?

ভারতী বলল, — আমার কিছু বলার নেই, তাই।

— আমার তো বলার আছে।

— কী বলতে চাও?

— মাসিমা নেই। এবার তোমার আমেরিকা আসতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

— আমি যাব না।

— কেন?

— আমার চাকরির কী হবে?

— আমি যা মাইনে পাই, তাতে তোমার চাকরি করার দরকার হবে না। আর যদি চাকরি করতে চাও, আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

— আমি কারও অনুগ্রহ চাই না।

— এসব কথা শুনতে ভালো লাগে না। তোমাকে যা বলছি শোনো। তুমি চলে এসো।

— আমি যাব না। দরকার হলে তুমি এখানে এসো। এখানে তোমার চাকরির অভাব হবে না।

— আমি আমেরিকা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারব না।

— আমিও কলকাতা ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে থাকতে পারব না।

— কী বলছ তুমি?

— ঠিক বলছি। — বলে ভারতী আবার রিসিভার নামিয়ে রাখল। রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। আবার হয়ত ফোন বেজে উঠবে। কিন্তু ফোন আর বাজল না। তবু সে ফোনের পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকল। একবার তার মনে হল সে যা বলেছে তা না বললেই পারত। কিন্তু নিখিলও কম জেদি নয়। সে কেন আমেরিকা ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারছে না? সে যদি না পারে, তাহলে ভারতীই বা কেন কলকাতা ছেড়ে আমেরিকা যাবে? নিখিলের মধ্যে জেদ আছে, স্বপ্নও আছে। ভারতীর মধ্যেও জেদ আছে। কিন্তু স্বপ্ন? একসময় তার মধ্যেও স্বপ্ন ছিল। এখন আর তার মধ্যে কোনও স্বপ্ন নেই। নিখিল তার সব স্বপ্ন গুঁড়ো করে দিয়ে চলে গেছে। এখন তার শুধু বেঁচে থাকা। শুধু একটু একটু করে বুড়িয়ে যাওয়া।

ভারতীর চোখে জল চলে এল।

●●●

আস্তে আস্তে একদিন ভারতীর চোখের সব জল শুকিয়ে গেল। নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখল। দু-একজন তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিল। ভারতী সেকথা হেসে উড়িয়ে দিল। দু-একজন তার প্রেমে পড়ার চেষ্টা করল। সে তাদের আমল দিল না। এমনকী নিখিল ফোন করলেও সে নিরুত্তাপ থেকে গেল। আস্তে আস্তে নিখিলও আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। সেও একসময় ফোন করা বন্ধ করে দিল। তাকেও অনেকে বিয়ে করার পরামর্শ দিল। অনেকে তার প্রেমে পড়ারও চেষ্টা করল। সে উদাসীন থেকে গেল। এই ভাবে দেখতে দেখতে বহু বছর পার হল। নিখিল একসময় বুড়ো হল। তার মাথার চুল পাকল। একটা একটা করে দাঁত খসতে লাগল। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে লাগল। দরকার হল চশমার। তারপর একদিন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ভাবতে লাগল, জীবনে যা কিছু চাওয়ার থাকে সবই সে পেয়েছে। কিছু আর পাওয়ার বাকি নেই। এবার সে কী করবে? সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে? চাকরির সূত্রে সেটাও তো বহুবার হয়েছে। তাহলে এখন কী করবে সে? কী করার আছে? এইসব ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ কলকাতার কথা মনে পড়ল। ভারতীর কথা মনে পড়ল। এই ভারতীকে একদিন সে চেয়েছিল। অথচ তাকে পায়নি। তার ভারতীকে একবার দেখতে ইচ্ছে হল। জানতে ইচ্ছে হল, কেমন আছে ভারতী? বেঁচে আছে তো? কলকাতায় গেলে তার সঙ্গে কি দেখা হবে? দেখা হোক বা না হোক, সে কলকাতায় যাবে বলে ঠিক করল।

●●●

নিখিল তারপর একদিন আবার কলকাতায় ফিরে এল। ফিরে এল বহু বছর পর। এসে দেখল, কলকাতা বদলে গেছে। কলকাতায় অনেক ফ্লাইওভার হয়েছে, অনেক শপিং মল হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক ভিড় বেড়েছে। অনেক নোংরা হয়েছে। নিখিল ভয় পেয়ে গেল। তার ভারতীও কি এমনই বদলে গেছে? নাকি এখনও বজায় রেখেছে তার সেই চুল, সেই চোখ, নাক, সেই চিবুক!

নিখিল কলকাতায় এসে এক হোটেলে উঠেছিল। সেখান থেকে এক সকালে ভারতীর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় এখনও সেই ডোরবেল।

নিখিল ডোরবেল টিপল।

একজন মহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল— কাকে চাই?

নিখিল এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল, আপনি কে?

— আমি কাজের লোক।

— ভারতী আছে?

— আছে, কিন্তু আপনি কে?

— আমি ভারতীর বিশেষ বন্ধু। ভারতীকে গিয়ে বলুন, নিখিল এসেছে।

— আপনি একটু দাঁড়ান। — বলে মহিলা ভিতরে ঢুকে গেল।

একটু পরে মহিলা ফিরে এসে

বলল— ভিতরে আসুন।

নিখিল ভিতরে ঢুকে দেখল, সেই পুরনো সোফা সেট, আলমারি, টিভিসেট। নিখিল সোফায় বসতে যাচ্ছিল, মহিলা বলল, আপনি ঘরে আসুন।— বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

নিখিল ভারতীর ঘরে ঢুকল। ঢুকে দেখল, এক বৃদ্ধা বিছানায় শুয়ে আছে। মাথায় চুল নেই। বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখ। নিখিল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কার কাছে এসেছে সে? একী সেই ভারতী? এ তো ভারতী নয়, এতো ভারতীর ছায়া!

নিখিল ভারতীর পাশে এসে বসল। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার?

ভারতী ম্লান মুখে বলল— ক্যান্সার।

সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ভয় নেই। আমি এসেছি।

ভারতী অভিমানভরা গলায় বলল— কেন এলে? কে আসতে বলেছিল? তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ। আমি শেষ হয়ে গেছি। তুমি আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। দয়া করে তুমি চলে যাও, চলে যাও।

নিখিল মমতার সঙ্গে ভারতীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল— আমি চলে যেতে আসিনি। আমি আজ থেকে এখানে থাকব।

— কিন্তু সব যে শেষ হয়ে গেল।

— কিছুই শেষ হয়নি। আমি এসেছি। আবার তুমি ভালো হয়ে উঠবে। আমরা এবার একসঙ্গে বাঁচব, ঘুরে বেড়াব। সিনেমা দেখব, রেস্তোঁরায় যাব। নতুন করে আবার সব কিছু শুরু হবে। তুমি কিছু ভেবো না। বলতে বলতে নিখিলের গলা কান্নায় জড়িয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি ভুল করেছি, ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। আমি আর কোনওদিন.....। ●

সামাজিক উপন্যাস

এ পরবাসে

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

অবশেষে দিনটা শুধু এলো না, পারও হয়ে গেল। ৩১শে অক্টোবর, ২০০৮। ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের চাকরি থেকে অবসর নিলেন রণদেব। এখন ফেয়ারওয়েলের বন্যা চলেছে। প্রথমে ফেয়ারওয়েল দিল স্টীল প্ল্যান্ট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। তারপর, এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। ভিলাইয়ের বেঙ্গলি ক্লাব। আরও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন রণদেব। তারাও ফেয়ারওয়েল দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কালকেই ব্রততী এসব নিয়ে হাসাহাসি করছিল। বলছিল— 'তুমি তো এখন ভি আই পি।'

দেখতে দেখতে এই প্রবাসে জীবনের চল্লিশটা বছর কেটে গেল। যখন এসেছিলেন, তখন বয়েস মাত্র কুড়ি। সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। বাবা চাপ দিচ্ছেন, বলছেন — 'এবার ল'টা পড়। আমার জুনিয়র করে নেব। কাজ শিখবি।'

কিন্তু রণদেবের একদম মন নেই। উকিল হিসেবে বাবার বিশাল পসার, প্রতিপত্তি দেখেও তাঁর মন ভোলেনি। সেটা উনিশশো আটষট্টি সাল। ছাত্রসমাজ তখন নকশাল রাজনীতির প্রভাবে উদ্বেলিত, অশান্ত। রণদেবের প্রেসিডেন্সী কলেজ তখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রের শিরোনামে। কিন্তু তাতেও রণদেবের মন নেই। আশ্চর্যভাবে তাঁর মন পড়ে আছে অন্যত্র। থিয়েটারে। চলে যাচ্ছেন সে সময়ের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অমিতেশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁকে প্রণাম করে বলছেন— 'রেডিওতে আপনার নাটক শুনে আপনাকেই গুরু বলে মেনেছি। আপনি আমাকে অভিনয় শেখান। আপনার দলে অভিনয় করব।'

আশ্চর্য, অমিতেশবাবু কিন্তু তাড়িয়ে দেননি রণদেবকে। উল্টে বলেছিলেন— 'রেডিও থেকে কিরকম শিখেছ, একটু নমুনা দাও।' সঙ্গে সঙ্গে 'মঞ্জরী, ফুলের মঞ্জরী' নাটক থেকে রামমোহনের ভূমিকায় অমিতেশবাবুর অভিনয় প্রায় কপি করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন কুড়ি বছরের রণদেব। শুনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হো হো করে হেসে উঠে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন অমিতেশবাবু। বলেছিলেন— 'তুমি তো দেখছি এযুগের একলব্য। ঠিক আছে, এখন কিছুদিন আমি একটা বাংলা সিনেমার শুটিং-এ ব্যস্ত আছি, তুমি ঠিক দু-মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি তোমাকে শেখাব।'

চল্লিশ বছর পরে জীবনের এতরকম ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েও সেদিনের সেই কথা আজও ভুলতে পারেন না রণদেব। আজও বেঙ্গলি ক্লাবের থিয়েটারে উজ্জ্বলতম নামটি রণদেবের। আজও তাঁর বসার ঘরে অমিতেশবাবুর বিশাল একটি বাঁধানো ছবি। কলকাতার এক বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো। এখনও মাঝে-মাঝে কর্মজীবনের সাফল্যের প্রায় শেষ বিন্দুতে পৌঁছেও, পরিষ্কার যেন শুনতে পান, অমিতেশবাবুর সেই প্রাণখোলা হাসি আর সস্নেহ প্রতিশ্রুতি— 'আমি তোমাকে শেখাব।'

না, দু-মাস পরের সেই দিনটা কোনওদিনই আসেনি রণদেবের জীবনে। বরং সেই দু-মাসের মধ্যেই আকস্মিক ভূ-কম্পনে ওলোটপালট হয়ে গিয়েছিল রণদেবের জীবন। বাবা মারা গেলেন হঠাৎ-ই। কোর্টে সওয়াল করতে করতেই হঠাৎ স্ট্রোক। অথচ সেদিনের শুরুটা ছিল অন্যরকম। খুব সকালে কলেজ স্কোয়ারে রণদেবকে দেখা করতে বলেছিল নীলা। প্রেসিডেন্সীতে ফিজিক্স অনার্সে রণদেবের ক্লাসমেট। নীলা দত্ত। সেই সময়ের ছাত্র রাজনীতিতে একটি পরিচিত নাম। রণদেব রাজনীতি এড়িয়ে চলতেন। অথচ সেই এড়িয়ে চলা ছেলেটিকেই কেন যে মন দিয়ে ফেলেছিল বিদ্রোহিনী নীলা দত্ত! বাংলা সংবাদপত্রে এখনও নীলার নামটা দেখতে পান রণদেব। সে এখন নীলা সামন্ত। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের এম এল এ। ব্রততী একটু আধটু জানে ব্যাপারটা। ঠাট্টা করে বলে— 'তোমার গার্লফ্রেন্ড।'

বিকেলে কলেজের ক্যান্টিনে বসেই দুঃসংবাদটা পেয়েছিলেন রণদেব। তখন তো আর এত টেলিফোন মোবাইলের যুগ ছিল না। পাশেই মেডিকেল কলেজে বাবাকে ভর্তি করে ছুটতে ছুটতে এসে রণদেবকে খবরটা দিয়েছিল বাবারই এক জুনিয়র— সুবিমলকাকু। সঙ্গে সঙ্গেই গিয়েছিলেন রণদেব। কিন্তু ততক্ষণে বাবা সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। দৌড়ে এসেছিল নীলা আর অন্য বন্ধু-বান্ধবরাও। রণদেবকে বাদ দিলে এদের অনেকেই পুলিশের পরিচিত মুখ। এই দলে রণদেবও আছে ধরে নিয়ে পুলিশেরই ভেতর থেকে কারা যেন রব তুলে দিয়েছিল, আনন্যাচারাল ডেথ, পোস্ট-মর্টেম করতে হবে। রুখে দাঁড়িয়েছিল নীলা। বলেছিল, 'ও মোটেই পার্টি করে না। আমরা ওর বন্ধু বলে ওকে হ্যারাস করতে পারেন না।' তবুও কিছুক্ষণ টালবাহানা চলেছিল। বন্ধুদের নিয়ে হাসপাতালের সুপারকে ঘেরাও করে ফেলেছিল নীলা। এখনও চোখ বুজলে নীলার সেই অগ্নিমূর্তি যেন দেখতে পান রণদেব। মুখ-চোখ লাল করে নীলা চিৎকার করে যাচ্ছিল— 'এ অন্যায়! ভয়ঙ্কর অন্যায়।' শেষপর্যন্ত অবশ্য বার অ্যাসোসিয়েশনের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে যায়।

রাত্রে নিমতলা ঘাটে বাবার শেষকৃত্যের সময়ও রণদেবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নীলা। চাপা গলায় বলেছিল— 'কেঁদো না। পুরুষ মানুষ না তুমি?'

সেই শেষ দেখা। তার পরদিন থেকেই পার্টির কাজে নীলা চলে যায় জলপাইগুড়ি। যখন ফেরত এসেছিল, তখন রণদেব আর কলকাতায় নেই। ভিলাইতে চলে আসতে হয়েছে। সেখানে পায়ের তলায় একটু মাটি পেতেই কেটে গিয়েছে অন্তত ছ'টা মাস। তারপর চিঠি দিয়েছেন নীলার বাড়ির ঠিকানায়। কোনও উত্তর আসেনি। কানাঘুষোয় নানারকম কথা শুনেছেন রণদেব। কখনও শুনেছেন নীলা হাজতে, কখনও শুনেছেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, ঠিক কোথায় কেউ জানে না।

এক-এক করে কেটে গিয়েছে বছরগুলো। একটু একটু করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জীবনে রণদেব। সেই সাফল্যের হাত ধরে এসেছে ব্রততী, ছেলে মুকুট আর মেয়ে টুপুর। সংসার আর কর্মজগতের চক্রে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়লেও দু'জনকে কোনওদিনই ভুলতে পারেননি রণদেব। একজন, অমিতেশ চট্টোপাধ্যায়, আর অন্যজন নীলা। বসার ঘরে প্রথমজনের ছবি আছে, কিন্তু নীলার কোনও ফটো নেই। অমিতেশবাবু চলে গেছেন আজ প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল। তাঁকে আর কোনওদিনই দেখা যাবে না। তবে নীলাকে প্রায়ই দেখা যায়। খবরের কাগজে, কিংবা দূরদর্শনের বাংলা চ্যানেলে। নীলা সামন্ত। এম এল এ। কিন্তু এ যেন সেই পুরনো নীলা নয়। অচেনা, অন্যরকম। সংযত, সতর্ক, হিসেবি। এখনও সে গলা চড়িয়ে বলতে পারে— 'এ অন্যায়! ভয়ঙ্কর অন্যায়'? রণদেব জানেন না।

বাবার পসার ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মৃত্যুর পরে দেখা গেল সঞ্চয় খুব একটা কিছু নেই। অনেকটা চলে গেছে বছর খানেক আগে দিদির বিয়ে দিতে। তখনই অনেকে বলেছিল, অত এলাহি খরচা করার কিছু ছিল না। তার ওপর শোভাবাজারের পৈতৃক বাড়িটা ভেঙেচুরে প্রাসাদ বানানোর কোনও দরকার ছিল না। তাও অর্ধেকটা করে অকালে চোখ বুজতে হল। মিস্তিরিদের পাওনা-গন্ডা মেটাতেই চলে গেল অনেকটা টাকা। পসার যতই থাক, চল্লিশ বছর আগে সঞ্চয়ের রাস্তাও এত প্রশস্ত ছিল না। তখনও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়নি। লোকে ব্যাঙ্কে বেশি টাকা রাখতে ভয় পেত। আর পসার থাকলেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি কিছুই তো নেই। ইনসিওরেন্স অবশ্য ছিল, কিন্তু সব ক'টা পলিসিই তখনও পর্যন্ত মাঝরাস্তায়। প্রিমিয়াম যুগিয়ে যাওয়াও খুব সোজা কাজ নয়। মেজভাই বিশ্বদেবের বয়স তখন ষোল, সবে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে, ছোটভাই সত্যদেব নেহাতই ছোট, মাত্র আট।

ফলে যা স্বপ্নেও ভাবেননি, তাই ভাবতে হল। পড়ে রইল অনিচ্ছার ল' পড়া, প্রবল ইচ্ছার থিয়েটার, আর নীলার দেওয়া মন। চলে আসতে হল ভিলাইতে। মায়ের পিসতুতো ভাই রাঙামামার হাত ধরে। ভেবেছিলেন, সুযোগ সুবিধা পেলে কলকাতায় আবার ফিরে যাবেন। হয়নি। সবসময় হয়ও না। আস্তে আস্তে চল্লিশ বছর ধরে প্রবাসী হয়ে উঠেছেন। বিশ্বদেব- সত্যদেবেদের কাছে তিনি 'ভিলাইয়ের দাদা', ওদের সন্তানদের কাছে 'ভিলাইয়ের জেঠু'।

এত বছর পর সেই তক্‌মাটা কি খুলে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে রণদেবের?

ব্রততীর ইচ্ছে নেই। যতদূর শুনেছেন, ইচ্ছে নেই মেয়ে টুপুরেরও।

সত্যি বলতে কি, রণদেবের নিজেরই বা কি খুব কিছু আছে? বাবা তো চলেই গেছেন সেই কবে, বছর পাঁচেক হল, মা-ও মারা গিয়েছেন। ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কও ঢিলে হয়ে গিয়েছে। মূলত তাদের কথা ভেবেই যে নিজের শখ, সাধ, প্রেম পিছনে ফেলে রেখে একদিন চাকরির চেষ্টায় তাঁকে পরবাসী হতে হয়েছিল, এসব কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না। তাছাড়া একটা সময়ের পর সত্যিই আর রণদেবকে খুব একটা কিছু করতে হয়নি। মা নিজেই হাল ধরেছিলেন। বাবা বাড়িটা তিনতলা পর্যন্ত হাঁকিয়ে শেষ করে যেতে পারেননি। চাকরিতে ঢুকে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে রণদেব বাড়ির অসমাপ্ত কাজটা সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু, তারপরেই মা চিঠিতে লেখেন— 'আর তোমাকে টাকা পাঠাতে হবে না। এবার থেকে নিজের জন্য কিছু জমাও। বাড়ির দোতলা আর একতলায় আমি ভাড়া বসাচ্ছি। ভালোই টাকা পাওয়া যাবে। নিজের দু-চারখানা ভারি গয়নাও বিক্রি করে দেব ভেবেছি। তোমার বাবা যখন অকালে চলেই গেলেন, তখন ওসব রেখে আর কি লাভ? এছাড়া তোমার বাবা যেটুকু টাকা রেখে যেতে পেরেছেন, তাও নেড়েচেড়ে দেখলাম। আমাদের চলে যাবে। বরং তুমি কিছু জমাও। বিদেশে একা পড়ে আছো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমি তোমার বিয়ে দেব।'

মা-র লেখা সেই চিঠিটা এখনও বোধহয় খুঁজলে পাওয়া যাবে। এরকম আরও কিছু চিঠিপত্র রণদেবের কাছে আছে। কিন্তু একটা সময়ের পর মা হঠাৎই যেন চুপ করে যান। কেন, সেটা রণদেবের কাছে খুব পরিষ্কার নয়। ছেলে-মেয়েরা ততদিনে বড় হয়ে উঠেছে। ছেলে মুকুট কানপুর চলে গেল ওখানকার আই আই টি-তে সুযোগ পেয়ে। টুপুরের তখন ক্লাস টেন। চাকরিতে রণদেবের বেশ বড়সড় একটা প্রোমোশান হল। বড় কোয়ার্টারও পেলেন। কলকাতার বাড়ির সঙ্গে যোগযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। মা-র মনে কি সেজন্য কোনও অভিমান ছিল? রণদেব জানেন না। ওপর ওপর যা শুনতেন, মা নাকি তখন চোখেও কম দেখেন, কানেও কম শোনেন। ফলে চিঠিও লিখতে পারেন না, ফোনেও কথা বলতে পারেন না।

কিন্তু সেটাই কি পুরো সত্যি? আরও একটা কথা তখন কানে এসেছিল রণদেবের। কিভাবে কোন সূত্রে, সেটা আজ আর মনে পড়ে না। মা নাকি পুরো বাড়িটাই বিশ্বদেব আর সত্যদেবের নামে লিখে দিয়েছেন। ওতে নাকি রণদেবের আর কোনও অধিকারই নেই।

ব্রততী বলেছিল, — 'আমাদের কিন্তু ব্যাপারটা জেনে নেওয়া দরকার। এসব হচ্ছেটা কি?'

বছর পাঁচেক আগে টুপুরের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে কলকাতায় গিয়েও নিজের বাড়িতে ওঠেননি রণদেব। ব্রততীর আপত্তি ছিল। বলেছিল, 'তিনতলায় সবাই মিলে ঠাসাঠাসি করে আমি থাকতে পারবো না বাপু। তুমি ভালো হোটেল দ্যাখো।'

সত্যিই, বহু বছর প্রবাসে থেকে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশই ফিকে হয়ে এসেছে। রণদেবেরও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল নিজের বাড়িতে উঠতে। তবে সেই সময় বড় জামাইবাবু একটা কথা বলেছিলেন, 'বাড়ির হক একেবারে ছেড়ে দিও না হে। তোমার ছোটভাই তো গোটা বাড়িটাই প্রোমোটারকে বেচে ফ্ল্যাট তোলার মতলব আঁটছে।'

কিন্তু হক কি সত্যিই আছে? সেটাও তো রহস্য। মা কি শেষটায় চাপে পড়ে প্রবাসী ছেলেটিকে বঞ্চিত করে গিয়েছেন? মেয়ের বিয়ে দিতে এসে এসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ তোলা যায় না। তাছাড়া যতই হোক, প্রবাসে দীর্ঘকাল থাকার ফলে মনের অগোচরে গভীর অবচেতনে কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধও জেগে থাকে। সত্যিই হয়তো আরও কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করার দরকার ছিল, করা হয়ে উঠল না। মা শেষ দু-তিন বছর স্ট্রোকে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন, একবারের বেশি দেখে যেতে পারেননি। ব্রততীকে জীবনে কোনওদিনই শাশুড়ির সেবা করতে হয়নি, যা করার করেছে বিশ্বদেবের বউ সীমা আর সত্যর বউ কেয়া। দু'দিনের জন্য অতিথির মতো এসেছেন, চলে

গেছেন। টাকা দিয়ে গেছেন অবশ্য। তবে সেটাই তো সব নয়। যেদিন চলে আসছেন, ট্যাক্সিতে উঠেই ব্রততী বলেছে— 'বাববা, বাঁচলাম। সারা বাড়িতেই কিরকম একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ।' কথাটা ঠিকই, তবু শুনতে ভাল লাগেনি রণদেবের।

চল্লিশ বছর পর শরীরে যখন প্রবাসীর তক্‌মা বেশ ভালোভাবেই এঁটে-সেঁটে বসে গেছে, তখন কি আর ওই বাড়িতে ফেরা সম্ভব?

কাল নাকি শিকাগো থেকে ডোরা ফোন করেছিল, মুকুটের বউ। ও ভিলাইয়েরই মেয়ে। বেঙ্গলি ক্লাবের সেক্রেটারি রজত মিত্রর একমাত্র কন্যা। এখনও রণদেব-ব্রততীকে পুরনো অভ্যাসমতো 'আঙ্কল-আন্টি' বলে ডাকে। ওদের চার বছরের ছেলেটার নাম ডিক্। ব্যাটা একটা সফেদ হাতি।

ব্রততী বলেছিল, ডোরাও নাকি ওঁদের কলকাতায় ফেরার বিপক্ষে। ওর বাবা রজত মিত্র সামনের বছর রিটায়ার করে ভিলাইতেই একটা বড়সড় বাংলো কিনে থেকে যাবেন। সুতরাং, আঙ্কল-আন্টিরও ভিলাইতে থাকলেই তো ভালো। এক ঢিলে বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি দুটোই ঘুরে ফেলা যাবে। 'জানোই তো মুকুটের ছুটি কত কম', ডোরা নাকি তার আন্টিকে বলেছে, 'সাতদিনের জন্য হয়তো ইণ্ডিয়ায় যাব। তার মধ্যে আবার ভিলাই টু ক্যালকাটা— উফস্।'

তার মানে, কারোরই মত নেই। কিন্তু তাহলেও এত বছর পর কলকাতা রণদেবকে টানছে কেন? সে কি একসময়ের স্বপ্নের শহর বলে? থিয়েটার! অমিতেশ চট্টোপাধ্যায়!

নাকি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলেজ স্কোয়ার আর নীলা? বাবা মারা যাবার দিন সকালেও সে রণদেবকে কলেজ স্কোয়ারে ডেকে বলেছিল— 'রণো, রাজনীতি করো আর না-ই করো, আমি তোমাকেই বিয়ে করব। তুমি বলো, পুলিশ যদি আমাকে জেলে পুরেও রাখে, তাহলেও তুমি ওয়েট করবে? কিংবা মেরে যদি আমাকে পঙ্গু করেও দেয়....'

সেই নীলা দত্ত আজ নীলা সামন্ত। এম এল এ। তবুও এত বছর পর একবার কি তারও মুখোমুখি হতে ইচ্ছে হয়?

মানুষের মন বড় বিচিত্র। যা কিছু নিয়ে এতদিন ভাবেননি, হয়তো সময়ও পাননি, অবসর নেবার পর সেসবই যে মনের দখল কিভাবে নিয়ে নেয়!

আর বাকি থাকে একটা রহস্য। সত্যিই কি মা তাঁকে বাড়ির ভাগ দেননি? একরকম ত্যাজ্যই করেছেন প্রবাসী ছেলেকে? এই রহস্যের ভেদ করতে হলেও কলকাতায় যেতেই হয়।

তিনমাস পর এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। বারান্দার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রণদেব। আর অমনিই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আশ্চর্য! মাঝেমাঝেই আজকাল এমন হচ্ছে। অথচ প্রেসার তো ঠিকই আছে। .... তাহলে?

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রবীন্দ্র সরোবরের ধারে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন জ্যোতির্ময়। করবী তখনও ঘুমে। সকাল সাতটার আগে তার ঘুম ভাঙতেই চায় না। চল্লিশ পার হয়ে একচল্লিশ ছুঁই ছুঁই বিবাহিত জীবনে এরকমই দেখে আসছেন জ্যোতির্ময়। একসময় নতুন বউমার এরকম বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো নিয়ে তাঁদের জোড়াসাঁকোর যৌথ পরিবারে অশান্তিও হোত, হাসাহাসিও হোত। কিন্তু তাতেও করবীর অভ্যাস ছাড়ানো যায়নি। বেশি কিছু বললে, পাল্টা বলত— 'আমি তোমাদের বাড়ির আর সবার মতো দিনেদুপুরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোই না। রাতের ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হতেই পারে।'

এজন্য মিতুলকে মর্নিং স্কুলে দিলই না। শাশুড়ি, মানে জ্যোতির্ময়ের মা গজগজ করে বলতেন— 'যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে। নবাবনন্দিনী।'

এই তক্‌মাটা অবশ্য করবীর বরাতে বেশিদিন জোটেনি। বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হঠাৎই মারা গেলেন শ্বশুরমশাই। আদালতে সওয়াল করতে করতে এক স্ট্রোকেই শেষ। রোজগার করতেন ভালোই, তবে জমানোর মানসিকতা ছিল না। কোনও দরকারও ছিল না অত এলাহি খরচা করে করবীর বিয়ে দেবার। যেমন কোনও দরকার ছিল না সেই খরচা সামলাতে না সামলাতেই শোভাবাজারের বাড়িটাকে রাজপ্রাসাদ করে তোলার চেষ্টার।

তিন শ্যালকের মধ্যে একমাত্র বড় রণদেবই তখন সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। কি করবে তার ঠিক নেই, এদিকে আবার থিয়েটার-পাগল। তা থিয়েটারটা অবশ্য মন্দ করত না ছোকরা। কিন্তু বাপের অকাল মৃত্যুতে চোখে অন্ধকার দেখল। জ্যোতির্ময়ের তখন নতুন চাকরি, যৌথ পরিবারের দায় সামলে শ্বশুরবাড়িতে যে অর্থ সাহায্য করবেন, সেটা সম্ভব ছিল না। বাপের মৃত্যুতে অবশ্য খুবই ভেঙে পড়েছিল করবী। তবুও তারই মধ্যে জ্যোতির্ময়কে বলেছিল— 'খবরদার, তুমি মা-র হাতে কোনও টাকা পয়সা দিতে যাবে না।' জ্যোতির্ময়ও আর কিছু বলেনি। এই না হলে 'নবাবনন্দিনী।'

তবে টাকা-পয়সার দায় না নিলেও, শ্বশুরবাড়ির দায় এড়াতেও পারেননি জ্যোতির্ময়। সে স্বভাবও অবশ্য তাঁর নয়। বড় শ্যালক রণদেব ভিলাইতে চলে গেল চাকরির খোঁজে। মেজ বিশ্বদেবের বয়েস তখন পনের। ছোট সত্যদেব তো নেহাতই নাবালক। সেসময় শাশুড়ি অনেকটাই নির্ভর করেছেন জ্যোতির্ময়ের ওপর। জামাইও সাধ্যমত সু-পরামর্শ দিয়েছে শাশুড়িকে। বাড়ির কাজ শেষ করে যেতে পারেননি শ্বশুরমশাই। সেই কাজও নিজে তদারকি করে শেষ করিয়েছেন জ্যোতির্ময়।

শাশুড়ির মত অনুযায়ী খুঁজে দিয়েছেন একতলা আর দোতলার জন্য নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে।

কিন্তু গত প্রায় বছর দশেক ধরেই শাশুড়ি জীবিত থাকতেই একটু একটু করে ওবাড়ির ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন জ্যোতির্ময়। তার সবটাই শোভাবাজার আর টালিগঞ্জের চারু মার্কেটের মধ্যে দূরত্বের কারণে নয়। মেট্রো রেলের কল্যাণে ওটা এমন কিছু দূরত্বও নয়। জোড়াসাঁকোর যৌথ পরিবার ছেড়ে চারু মার্কেটে চলে এসেছেন, তাও আজ কমদিন নয়। বছর পঁচিশেক তো বটেই। কোম্পানি থেকে সস্তায় ওনারশিপ ফ্ল্যাট দিচ্ছিল। সুযোগটা ছাড়েননি জ্যোতির্ময়। মিতুল তখন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ছে। ওর স্কুলটাও কাছে হলো।

এই আটষট্টি বছরের জীবনে যখনই পেছনে ফিরে তাকান, জ্যোতির্ময়ের মনে হয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে টাকা-পয়সা কোনও বিশেষ কিছু নয়। এমনকি রক্তের সম্পর্কও নয়। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনও জামাইয়েরই রক্তের সম্পর্ক থাকে না, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ওবাড়ির কোনও টাকা-পয়সার সম্পর্কও নেই। তবুও অন্য কোনও কোনও ভাবে ও-বাড়ির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে গেছেন। অর্থ না দিলেও দিয়েছেন তাঁর শ্রম, বুদ্ধি ও সময়। বিনিময়ে যে কিছুই পাননি তাও নয়। শাশুড়ি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন, স্নেহও করেছেন যথেষ্ট। আবার এই শাশুড়ির সামনেই তাঁকে প্রায় পুত্রসম শ্যালক সত্যদেবের হুঙ্কার শুনতে হয়েছে— 'আপনি বাড়ির জামাই, জামাইয়ের মতোই থাকুন। আমাদের মা-ছেলের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না।' শাশুড়ি কিন্তু তখন নীরব থেকে ছোটছেলের ঔদ্ধত্যকেই পরোক্ষে সমর্থন করেছেন। অথচ তিনি ভালোই জানতেন, জ্যোতির্ময় কোনও অন্যায় কথা বলছেন না। শুধুমাত্র প্রবাসে থাকে, এই অপরাধে রণদেবকে এই বাড়ির অংশ থেকে বাদ দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, পাপ। এই বাড়ির জন্য সেও টাকা ঢেলেছে। ভিলাইতে এক কামরার মেস-এ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থের প্রায় সবটাই নিয়মিত মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে গেছে। সত্যদেবের কাছে হয়তো সেসব শোনা কথা। জ্যোতির্ময় তো সব জানেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী।

সেই শেষ। আর কখনও ওই বাড়িমুখো হননি জ্যোতির্ময়। শাশুড়ি অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তারপর বেশ কয়েকবার ফোনে সাধাসাধি করেছেন জ্যোতির্ময়কে। কিন্তু না। জ্যোতির্ময় স্পষ্টই বলেছেন, 'আর আমাকে ডাকবেন না, মা। আপনাদের বৈষয়িক ব্যাপারে আর আমি নেই।'

আশ্চর্য, করবীও কিন্তু দাঁড়ায়নি তাঁর পাশে। বলেছিল, 'ব্রততীর বড্ড ডাঁট। মিতুল, ওদের একটাই ভাগ্নী, তার বিয়েতে এলোই না।'

রণদেবের ওপরেও করবী প্রসন্ন নয়। অথচ, যতবার ভিলাইতে বেড়াতে গিয়েছেন, আদর-যত্ন কিছু কম করেনি ওরা। কিন্তু করবীর ওই এক কথা। 'নীলুটা স্বার্থপর। শুধু টাকা পাঠিয়ে খালাস।' জ্যোতির্ময় বলেছেন, 'তা কি করবে? অত দূরে চাকরি, ছুটিছাটাও কম।' অমনিই করবী বলেছে— 'থামো তো! ব্রততী নিজে আমাকে বলেছে, কলকাতায় ওদের হেড অফিসে বদলি হয়। নীলু নিজেই নিজেই আসতে চায় না। দূরে আছে, দিব্যি আছে। কলকাতায় এলে দ্যাখো না, দেব-দেবী দু'জনেরই কেমন গেস্ট-গেস্ট ভাব!'

মেজভাই বিশ্বদেব সম্বন্ধে অবশ্য করবীর অভিযোগ, মোটামুটি একটাই।— 'দুলুটা মিনমিনে। বউটা নেকী। ফোন করলেই দিদিভাই, আজ আমার কি মাথাব্যথা করছে! কাল আমার জ্বর হয়েছিল। তবে আমিও ছাড়ি না। বলে দিই, আর পরশু কি হয়েছিল? অম্বল? এদিকে সাজগোজের তো কিছু কমতি দেখিনা। সেদিন এসেছিল আমার বুটিকে, বাববা! যেন ফিল্মস্টার।'

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। দুলুটা মিনমিনে বলেই বিলু, মানে সত্যদেব এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। খুব কম বয়েসে বাবাকে হারানোয় মায়ের প্রশ্রয়ও সে বেশিই পেয়েছে, একথাও ঠিক। এপর্যন্ত 'ব্যবসা-করব' বলে বেশ কয়েক হাজার টাকাও সে নষ্ট করেছে। করবী টাকা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলেও, নীলু, অর্থাৎ রণদেব তাকে বেশ কয়েকবার টাকা পাঠিয়েছে, এটা কিন্তু জ্যোতির্ময় জানেন। তবে কোনও ব্যবসাই সে দাঁড় করাতে পারেনি। ওষুধের ব্যবসা থেকে ডেকরেটারের ব্যবসা পর্যন্ত, যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই ফেল।

সবচেয়ে ব্যর্থ বলে সেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কোনও ন্যায়-নীতির ধার ধারে না। অনায়াসে বড় ভাইকে ভিটেছাড়া করার প্ল্যান করে। শাশুড়িও চুপ করে যান। হয়তো ব্যর্থ ছোট ছেলের জন্য তাঁর মনেও একটু বেশিই করুণা আছে।

♠♠♠

আস্তে আস্তে রবীন্দ্র সরোবরের ধারে প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড় বাড়ছে। জ্যোতির্ময়ের পরিচিত মুখগুলির আবির্ভাব ঘটছে। শেয়ালদার দিক থেকে বজবজের একটা লোকাল ট্রেন টালিগঞ্জ স্টেশনে এসে দাঁড়াল। জ্যোতির্ময়ের পরিচিত বোস-সেন-রায়বাবুদের কেউ কেউ জগিং শুরু করেছেন। কেউ করছেন ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ। একটু পরে সবাই গোল হয়ে ঘাসের ওপর বসবেন। আড্ডা হবে, বাঙালীর আড্ডায় রাজনীতি কখনও বাদ থাকে না। রাজনীতি-চর্চাও হবে একটু-আধটু।

মোটামুটি সাড়ে-ছটা নাগাদ উঠে পড়েন জ্যোতির্ময়। বাড়ি ফিরে নিজেই এক কাপ চা করে খান। আর এক কাপ করেন তাঁর একচল্লিশ বছরের সহধর্মিনী, একসময়ের 'নবাবনন্দিনী'র জন্য।

সেদিন অবশ্য বাড়িতে ঢুকে একটু অবাকই হলেন জ্যোতির্ময়। বিছানা না ছাড়লেও ঘুম ভেঙে গিয়েছে করবীর। এপাশ ওপাশ করছেন। 'কি হল?' জিজ্ঞেস করতেই জবাব এলো— 'সকালবেলা মোবাইলটা নিয়ে যাওনা কেন বলো তো?'

— কেন? কার ফোন এসেছিল? মিতুলের?

— না, না। মুম্বাই থেকে নয়।

— তাহলে?

— তোমার বড় শালাবাবুর। ভিলাই থেকে।

— এত সকালে?

— তার আমি কি জানি?

চায়ে চুমুক দিয়ে একচল্লিশ বছরের সহধর্মিনীর দিকে আড়চোখে তাকালেন জ্যোতির্ময়। তাঁর আটষট্টি চলছে মানে করবীর বাষট্টি হল। শরীর মোটামুটি ঠিকই আছে করবীর। নিয়মিত যোগাসন, প্রাণায়াম করে। পার্লারে যায়। চুল-টুলও তেমন পাকেনি। ম্যাসাজ, ফেসিয়াল এসবেরও একটা গুণ আছে। গায়ের চামড়া, মুখের চামড়া এখনও বেশ সতেজ, টানটান। তুলনায় জ্যোতির্ময়েরই মাথা প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। শরীর অবশ্য মোটের ওপর ঠিকই আছে। সামান্য প্রেসার আছে, এই পর্যন্ত। সুগার নেই, নেই হার্ট বা বাতের সমস্যাও।

চায়ে চুমুক দিয়ে করবী জিজ্ঞেস করল— 'ফোন করেছিলে নীলুকে?'

— না। দেখি, একটু পরে করব।

— কাল ও-বাড়ি থেকে নেকী ফোন করেছিল।

'নেকী' মানে মেজশ্যালক দুলুর বউ! আসল নাম অবশ্য সীমা। তবে করবী ওকে এই নামেই ডাকে।

— কেন? কি ব্যাপার?

— ওরা তো বাড়ি সেল করে দিচ্ছে।

— ওঃ।

— কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, নীলু রিটায়ার করে চলে আসছে। দু-একদিন আগে ও বড়িতে ফোন করেছিল। বলছে, ওখানেই থাকবে।

— বাড়ি ভেঙে ওরা কি করবে?

— সবাই যা করে তাই। হাই-রাইজ ফ্ল্যাট তুলবে।

— নীলুকে সেটা জানানো হয়েছে?

— কে জানাবে? তাহলে তো আসল কথাটাও জানাতে হয়।

— মানে?

— আঃ। তুমি আজকাল সব কিছু ভুলে যাও। ও-বাড়িতে যে ওর শেয়ার নেই।

— তোমার মা-ই কথাটা জানিয়ে দিলে পারতেন।

— মা'র কথা ছাড়ো। মা'র ভীমরতি হয়েছিল। নয়তো মা'র সামনেই বিলু তোমাকে গলা তুলে কথা বলে, আর মা চুপ করে থাকে?

— যা হবার হয়েছে। কিন্তু এখন তাহলে কি হবে?

— আমি আর কি জানি! — করবী ভুরু কুঁচকে চায়ের কাপ সামনের বেতের টেবিলে নামিয়ে রাখল। — 'আমি এসবের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। মা তোমাকেই ডেকে পরামর্শ করতেন, আমাকে তো নয়।... আর নীলুকেও বলি বাপু, অনেক তো পয়সা কামিয়েছিস, যা না রাজারহাটে গিয়ে ফ্ল্যাট কিনে থাক না। এত বছর বিদেশে থেকে এখন একেবারে ভিটের জন্য দরদ উথ্‌লে উঠেছে! যত সব কমপ্লিকেশান।'

— বিদেশে তো ও আর সাধ করে যায়নি— জ্যোতির্ময়ও চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন,— 'বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। ভালো থিয়েটার করত ছেলেটা। কে জানে, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে ওর জীবন হয়তো একদম অন্যরকম হত।'

— যাই বলো, নীলু আমার নিজের ভাই, ওকে আমি তাও ছাড় দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওর ওই ডাঁটিয়াল বউটাকে আমার একদম সহ্য হয় না। বড্ড নাক-উঁচু ওটার। মা'র অসুখের সময় এসে সবসময় নাকে রুমাল চেপে বসে রইল। আরে, তুই না বড় বউ? পটের বিবিটি হয়ে রইলেন! যেন শ্বশুরবাড়িতে নয়, হোটেলে এসে উঠেছেন।

— কি আর করবে? নার্স-টার্স সবই তো রাখা ছিল। নীলু তো টাকাপয়সাও দিল বিস্তর।

— থামো তো!— করবী ঝাম্‌টে উঠল। —'শুধু টাকাপয়সা ঢাললেই হয় না। দায়দায়িত্ব নেওয়া একটা অন্য জিনিস। কোনওদিন, কোনও দায় নিয়েছে ওরা? পড়ে গিয়ে মা'র পা ভাঙল, ছ-মাস বিছানায়, একবারও এসেছে? বিলু, যেমনই হোক, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে মরতে বসেছিল, এসেছে? আমার মেয়ে, ওদের একটাই ভাগ্নী, তার বিয়েতে.... এসেছে?'

না, আসেনি। তবে এত বছর ধরেও বলি-বলি করেও একটা কথা করবীকে বলা হয়ে ওঠেনি জ্যোতির্ময়ের। করবী নিজেই বা কতটা কি করেছে নিজের বাপের বাড়ির জন্য? যা করেছেন, সবটাই তো জ্যোতির্ময়ই করেছেন। তাতে করবীর তেমন কিছু না-করাটা পুষিয়ে গেছে। তাছাড়া, কলকাতায় কাছাকাছি থেকে যতটা করা যায়, প্রবাসে থেকে সবসময় কি সেটা করা সম্ভব?

আসলে, পরবাসে থাকা মানেই পর হয়ে যাওয়া। পারিবারিক গ্রন্থিগুলো আল্‌গা হয়ে যাবেই। অধিকার দুর্বল হয়ে আসবে।

এরপরেও কেন নীলু এ-বাড়িতে ফিরতে চাইছে? সে কি কিছুই বুঝছে না? ব্রততীই বা মত দিচ্ছে কি করে? কিংবা, হয়তো ব্রততীর মত নেই, মত নেই ওদের মেয়ে টুপুরের, ছেলে মুকুটেরও।

— তুমি আবার যেন নীলুকে উস্কে-টুস্কে দিও না।— করবীর কথায় ঘোর ভাঙল জ্যোতির্ময়ের। — 'ওর বউ-ছেলে মেয়ের মত আছে কিনা, তার ঠিক নেই।'

— সে তো বটেই।

— শুধু শুধু ছোটভাইদের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে লাভ কি? পয়সা আছে, যেখানে পারে ফ্ল্যাট কিনে নিক।

সব কথাই ঠিক। তবুও, তারপরেও কিছু কথা বাকি থাকে। যা কেউ জানে না। করবীও না। আজকাল এসব সম্পত্তি-টম্পত্তি নিয়ে যা খুশি তা-ই হচ্ছে। এর মধ্যে রাজনীতিও ঢুকে পড়েছে

বলে শোনা যায়। ওরা যে নীলুকে থাকতে দেবে না শুধু তাই নয়, বাড়ি বেচার ভাগটা পর্যন্ত দেবে না। প্রমাণ করবে, ও-বাড়িতে বড় ছেলে হয়েও, নিজের রোজগারের টাকা ঢাললেও নীলুর কোনও হক নেই। উল্টে বলবে— 'তোমার তো অনেক আছে, ছেলে বিদেশে, জামাই ব্যাঙ্কের অফিসার, ভাইদের এই কটা টাকাও ছাড়তে পারছ না? সারা জীবন বাইরে কাটিয়ে এখন হিস্যা চাইতে এসেছ?'

জ্যোতির্ময়ের স্বভাবে হয়তো একটা দোষ আছে। তিনি অপমান কখনও ভোলেন না। বিলুর করা অপমানও তিনি ভোলেননি। করবী ভাবছে, তাঁর হাতের অস্ত্র নীলু, নীলুকে তিনি উস্কে দেবেন। কিন্তু শুধু নীলুই নয়। আরও কিছু আছে তাঁর হাতে।

উঠে পড়লেন জ্যোতির্ময়। মোবাইলে নয়, একদম ভেতরের ঘরে গিয়ে ল্যাণ্ডফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। না, নীলুকে নয়। ডায়াল করলেন কলকাতারই একটা নাম্বার। তারপর বললেন— 'হ্যালো, অভিজিত আছে?'

করবী তখন স্নানে ঢুকেছে। কিছু শুনতে পেল না।

টুপুর বরের কানে নিজের শাড়ির আঁচলের কোণা দিয়ে সুড়সুড়ি মেরে ডাকল— 'এ্যা-ই।'

আদিত্যর ঘুম অবশ্য ভাঙল না। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল— 'উঃ'।

টুপুর বলল— 'ওঠো তো! ন'টা বাজতে গেল।'

রবিবারের সকালটা এরকমই কাটে। আদিত্য এখন ব্যাঙ্কের দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে র অফিসার। শনিবার রাতের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরেই ঘুমোনোর তোড়জোড় করতে থাকে। রবিবার ন'টা-সাড়ে ন'টার আগে বিছানাই ছাড়ে না। তারপর মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে আলস্য করে। দুপুরে খেয়ে আবারও ঘুম। উঠবে সেই বিকেল কাবার করে। কোনওক্রমে সন্ধ্যেবেলা যদি একটু বেরোনো হল তো ন'টার মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া লাগাবে। পরদিন ভোর পাঁচটায় আবার বেরিয়ে যাবে। সোমবার সকালের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরে আবারও কর্মস্থলে ছুটবে।

বিয়ের পর পাঁচটা বছরও পুরো কাটেনি। এরই মধ্যে জীবনটা কেমন যেন একঘেয়ে, পান্‌সে হয়ে গেছে টুপুরের। ভাগ্যিস তাও একরকম জোর করেই পার্ক স্ট্রীটের একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরিটা নিয়েছিল টুপুর। আর ভাগ্যিস মেয়ে তিতলিটা হয়েছে। নয়তো সময় বোধহয় আর কাটত না। কাঁহাতক আর টিভি দেখা যায়?

কিন্তু শুধু এসবের জন্য নয়। ক'দিন থেকেই টুপুরের মনটা অন্য কারণে খারাপ। কালও মা ভিলাই থেকে ফোন করেছিল। বাপি আর ওখানে থাকতে চাইছে না। কলকাতায় শোভাবাজারে নিজেদের বাড়িতে চলে আসতে চাইছে।

শুনে আদিত্য বলেছিল, — 'ভালোই তো হল। মেট্রো রেলে উঠবে, আর বোঁ করে বাপের বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

টুপুর ঝাম্‌টে বলেছিল— 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না তো।'

আদিত্য হাত উল্টে বলেছিল, — 'যা ববাবাঃ! বাপের বাড়ি কাছে হলেই তো মেয়েরা খুশি হয়, এদ্দিন তো তাই জানতাম।'

টুপুরের চোখে জল এসে যায়। তার মানে, ভিলাইয়ের পাট উঠে যাবে? কলকাতায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে সারা জীবন?

আদিত্য বলে— 'দূর! বেড়াতে কি যাচ্ছ না নাকি? এই তো গতবারই ঘুরে এলে লাভা-লোলেগাঁও-শিলং।'

কিন্তু বছরে অন্তত একবার ভিলাই যাওয়া? সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

আদিত্য টুপুরকে রাগানোর জন্য বলেছিল— 'খরচা বাঁচবে।'

টুপুরও রেগে গিয়ে বলেছিল— 'থামো তো।'

এই কলকাতা তার ভাল লাগে না। সারা বছর বড্ড প্যাচপ্যাচে গরম, ঘাম। সারা শহর জুড়ে বড্ড চেঁচামেচি।

আড়মোড়া ভেঙে অবশেষে আদিত্য বিছানায় উঠে বসল। বলল— 'খবরের কাগজটা নিয়ে এসো তো।'

টুপুর বলল— 'উঁহু! আগে যাও, মুখ ধুয়ে এসো।'

অমনিই আদিত্য টুক্ করে একটা চুমো খেয়ে বসল টুপুরের গালে।

নাক-মুখ কুঁচকে, টুপুর বলল— 'ভ্যাট্! ন্যাস্টি!'

আদিত্য বলল— 'তিতলি কোথায়?'

— মা'র কাছে। ...শোনো, এবার থেকে রোববারটা অন্তত একটু বাজারে-টাজারে যাও, সারাটা সপ্তাহ তো দোকান-বাজার বাবাই ঠেলছেন।

আদিত্য আবারও আড়মোড়া ভেঙে বলল— 'দূর!'

— দূর কি! মা তিতলিকে সামলাচ্ছেন, বাবা সামলাচ্ছেন দোকান-বাজার, আর মধ্যে থেকে তুমি-আমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

— মানে?— আদিত্য সামান্য গরম হল। —'সারা সপ্তাহ খেটে জান হালুয়া হয়ে যাচ্ছে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছি মানে?'

— তুমি হয়তো খাটছ, তোমার ব্যাঙ্কের চাকরি— টুপুর কাঠ-কাঠ মুখ করে বলল— 'আমার তো স্কুলের চাকরি, অত খাটুনি নেই।'

— যাই হোক, রোজ বেরোতে তো হচ্ছে।

— তা হচ্ছে। আর সেইজন্যই ভাবছি, তিতলিকে একটা ক্রেশে টেশে ভর্তি করে দেব।

— কেন ফালতু বকছ? সারাদিন আরও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে।

— এখানেও ভ্যাঁ ভ্যাঁ কিছু কম করছে না। মধ্যে থেকে তোমার মা'র বচন শুনতে হচ্ছে আমাকে।

— ওইজন্যেই তো বলেছিলাম, চাকরি নেবার দরকার নেই। চলো, আমার সঙ্গে ঘুরবে।

— কি কথা! ওইটুকু একটা বাচ্চাকে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আজ দুর্গাপুর, কাল বাঁকুড়া, পরশু কি যেন তোমার সেই জায়গা, বর্ধমান না বোলপুরে, সর্বত্র চরে বেড়াই আর কি!

— তা, তুমিই তো বলো, কলকাতায় বন্দী হয়ে থাকতে তোমার ভালো লাগে না।

— তা তো লাগেই না।— আদিত্যকে জড়িয়ে ধরল টুপুর। বলল— 'তুমি কবে কলকাতায় পোস্টিং পাবে?'

— আরে, সে দেরি আছে এখনও। তবে তার আগে তো তোমার মা-বাবাই কলকাতায় চলে আসছেন।

— বাবার মাথাটা গেছে। নয়তো এত বছর বাইরে থেকে কেউ কলকাতায় ফিরে আসতে চায়?

— কেন রে বাবা, কলকাতা কি এতই অচ্ছুৎ? যতই হোক, এটাই তো ওঁর জন্মস্থান।

— আর আমার জন্মস্থান যে ভিলাই! সেটা কেন ভুলে যাওয়া হবে?

আদিত্য মাথা নাড়ল। কোন্‌টা যে 'প্রবাস' আর কোন্‌টা যে 'নিবাস' তার নিজেরই গুলিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ভিলাইয়ের কর্মস্থল প্রবাস হলেও টুপুরের কাছে তা নয়। ওর কাছে আবার এই কলকাতাই প্রবাস। শ্যালক মুকুট আছে শিকাগোয়— প্রবাস। আবার ওর ছেলে ডিকের জন্ম ওখানেই। তার কাছে হয়তো আমেরিকাই স্বদেশ, ভিলাই বা কলকাতা, দুই-ই প্রবাস।

— মাথা নাড়ছ কি?— টুপুর জিজ্ঞেস করল।

— না, ভাবছিলাম যে, তোমার মা কি বলছেন?

— মা'র তো মোটেই ইচ্ছে নেই। কোনওকালে এসে থেকেছে নাকি শোভাবাজারের ওই বাড়িতে? খুব বেশি হলে দু-চারদিন। আমি আর দাদা তো ছোটবেলা থেকে জানি, ওটা আমাদের বেড়ানোর জায়গা!

আদিত্য আঁতকে ওঠার ভান করে বলল— 'নিজেদের বাড়ি হয়ে গেল বেড়ানোর জায়গা!'

— আরে ছোড়ো নিজেদের বাড়ি!— টুপুরের কথায় মাঝে মাঝে হিন্দি টান এসে যায়।— 'ওখানে তো শুনি থাকারই জায়গা নেই। সাধে কি বলছি, বাপির মাথাটা বিগড়েছে।'

যেখানে টুপুরের সঙ্গেই তেমন খুব একটা সম্পর্ক নেই, সেখানে আদিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে আদিত্যও বলে— 'তাহলে, তোমার বাবাকে কলকাতায় বা কাছাকাছি কোথাও একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট কিনে নিতে বলো না, ওখানে থাকার দরকারই বা কি?'

টুপুর মুখ গোমড়া করে বলল— 'জানি না। তুমি বোঝাও

বাপিকে।'

— আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। — বলে আদিত্য মুখ ধুতে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে গেল।

বেরিয়ে এসে আদিত্য বলল— 'চলো, আজ নন্দন থেকে একটা সিনেমা দেখে আসি।'

বরের দিকে সরু চোখে তাকাল টুপুর। তারপর বলল— 'বাবাঃ! ফূর্তির প্রাণ, ইয়ের মাঠ! আজ হবে-টবে না।'

— কেন?

— চুলে শ্যাম্পু করতে হবে। বড্ড চিটচিট করছে।

— ধুস্! এটা একটা কারণ হল নাকি?

— তাহলে আরও একটা কারণ আছে।

— আবার কি?

— তিতলিকে রেখে অতক্ষণ সিনেমা-টিনেমা দেখা যাবে না।

— কেন? ওকে বাড়িতে মা-বাবার কাছে রেখে যাও।

— দ্যাখো, সব কিছুর একটা লিমিট আছে। সারাটা সপ্তাহ ও তোমাকে পায় না। আমারও, শনিবার বাদে, রোজ স্কুল থাকে। তখন তো ওকে মা-ই সামলান। আবার ছুটির দিনেও দু-জনে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরতে যাব ওকে ফেলে?

— ধুস! — আদিত্য সামান্য বিরক্ত হল। তারপর বলল— 'ঠিক আছে, ওকে নিয়েই নাও। ইস্... ভাল সিনেমাটা...।'

বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল আদিত্য। তবে নন্দনে আর গেল না। বলল— 'চলো মেমোরিয়ালের সামনে ময়দানে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

রবিবারের রাস্তা কিছুটা ফাঁকা। দেখতে দেখতে ট্যাক্সি টালিগঞ্জ থেকে হাজরা ছাড়িয়ে ভবানীপুরে এসে পড়ল। টুপুর বলল— 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। বাপির শরীরটা নাকি একটু খারাপ যাচ্ছে।'

— কি হয়েছে?

— মাঝে-মাঝেই মাথাটা নাকি ঘুরে উঠছে।

— স্পণ্ডিলোসিস আছে নাকি?

— সে তো একটু-আধটু আছেই। কিন্তু দু-এক সেকেণ্ডের জন্য চোখে নাকি অন্ধকার দেখছে।

— সেকি! তাহলে ডাক্তার দেখাতে বলো।

— দেখিয়েছে। প্রেসার-টেসার নাকি ঠিকই আছে। তাহলে এরকম কেন হচ্ছে বলো তো?

— টেনশান টেনশান! আরে বাবা, চাকরিতে থাকলেও টেনশান, চাকরি গেলেও টেনশান।

— এসবের মধ্যে কেন যে বাপি কলকাতা-কলকাতা শুরু করল! কোনও মানে হয় না।

— আরে, সে যদি ওঁর ইচ্ছে হয়, এতদিন পরে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান হবেন...

— ইয়ার্কি মেরো না তো। অনেকদিন আগে পিসাই আমাকে একটা কথা বলেছিল....

— কি কথা?

— শোভাবাজারের বাড়িতে নাকি বাপির কোনও শেয়ার নেই।

— সে আবার কি! বাড়ির বড় ছেলে.... তারই শেয়ার নেই!

— কি জানি! আমি তখন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। নেই তো নেই। ... কিন্তু, বাপি যে আবার রিটায়ার করে ওখানেই ফিরে আসতে চাইবে...

— শেয়ার নেই, এটা কি উনি জানেন না?

— জানি না। ও-বাড়ির ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। মাঝে-মাঝে কলকাতায় এলে বেড়াতে যেতাম, এই পর্যন্ত।

— ওই মেন্টালিটিই তোমাদের কাল হয়েছে। কোনও খবরই রাখোনি, এখন দলছুট হয়ে গেছ।

টুপুর চুপ করে রইল। তিতলি আশপাশের গাড়িগুলোর দিকে হাত নাড়ছে। আদিত্য বোধহয় খুব ভুল কিছু বলেনি। একমাত্র পিসাই ছাড়া আর কেউ বাপির সাপোর্টে আছে বলে মনে হয় না। পিসি তো সেই কবে থেকে ওদের ওপর খাপ্পা। লীনাদিদির মানে মিতুলের বিয়েতে ওরা কেউই আসতে পারেনি। অথচ টুপুর সাক্ষী, বাপি ছুটির জন্য বহু চেষ্টা করেছিল। শেষপর্যন্ত মা আর টুপুরের জন্য ট্রেনের টিকিটও কেটে দিয়েছিল। কিন্ত কপাল মন্দ। জার্নির দিনই বুঝে-সুঝে ভারত বন্‌ধ। সমস্ত ট্রেন বন্ধ। বাপি টেলিফোনে পিসিকে অনেক করে বুঝিয়েছিল। পিসি বোঝেনি।

এভাবেই বোধহয় একটু একটু করে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সবার থেকে। প্রবাসীর বন্ধু বোধহয় নিকট আত্মীয়স্বজন নয়। বরং প্রবাসের বন্ধুরাই আত্মীয়-স্বজন হয়ে ওঠে। সেন-কাকু, দত্ত-কাকুদের ছেড়ে বাপি কি করে কলকাতায় আসতে চাইছে? এখানে কি বাপির কোনও বন্ধু-বান্ধব আছে?

ট্যাক্সি প্রায় মেমোরিয়ালের কাছে চলে এসেছে। টুপুর বলল— 'তোমাদের ব্যাঙ্কে হাউজ লোনে এখন কত ইন্টারেস্ট নিচ্ছে?'

— যা ছিল তাই আছে। বরং কমবে, কিন্তু বাড়বে না।

—কেন?

— না, ভাবছি, বাপিকে বলব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং আলাদা ফ্ল্যাট কিনে নাও।

— উনি যত টাকা নিয়েই রিটায়ার করুন, খাস কলকাতায় এখন যা ফ্ল্যাটের দাম, তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে যাবে। তবে আমার বন্ধু সুকান্ত আছে উত্তরপাড়া ব্রাঞ্চে । ওখানে ফ্ল্যাটের দাম এখনও অনেকটা কম।

— সাবার্বে?— টুপুর নাক কুঁচকে ফেলল।

— অত নাক কুঁচকানোর কিছু নেই। যথেষ্ট বড় জায়গা। বালি ব্রিজ পার হলে দক্ষিণেশ্বর থেকেই তো কলকাতা। লোকাল

ট্রেনে দমদমে এসে মেট্রোতে চাপলেই কলকাতা।

টুপুর চুপ করে রইল। ট্যাক্সি মেমোরিয়ালে পৌঁছে গেছে। খোলা মাঠ পেয়ে তিতলি খুব দৌড়াচ্ছে।

আদিত্য বলল— 'সেরকম অসুবিধা হলে আমাদের বাড়িতে এসেও ওঁরা উঠতে পারেন।'

টুপুর চোখ পাকিয়ে বলল— 'একদম না।'

— কেন? গোলমাল মিটলে না হয় শোভাবাজারে চলে যাবেন।

— তেমন কোনও গোলমাল থাকলে সহজে মিটবে না। শেষটায় তোমাদের বাড়িতেও সব জানাজানি হয়ে যাবে। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।

— তাহলে?

— দেখি, মা'র সঙ্গে ফোনে কথা বলে। ... তুমি না হয় আশপাশে ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায় কিনা দ্যাখো।

— ঠিক আছে। দেখব। .... এখন একটু মেয়ের সঙ্গে দৌড়াও। মন ভাল হয়ে যাবে।

হেসে ফেলল টুপুর। বলল— 'তুমিও দৌড়াও। ভুঁড়ি কমে যাবে।'

মেয়েকে নিয়ে খেলতে শুরু করল ওরা।

কাল রাতে অদ্ভুত একটা ফোন এসেছিল। চিনতেই পারেননি নীলা সামন্ত। এম এল এ। ২০০৮ শেষ হতে চলেছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সামনের বছর এপ্রিল-মে'র মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন। এখন থেকেই একটু একটু করে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।

পার্টি অফিস থেকে ফিরতে কাল একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। এবারের ক্যান্ডিডেট কে হবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। যিনি ছিলেন, তিনি আর দাঁড়াতে চাইছেন না। অনেক বয়স হয়েছে। দলের একটা পক্ষ নীলাকেও চাপ দিচ্ছে। নীলার অবশ্য নিজের এলাকা ছাড়ার ইচ্ছে নেই। এবার নিয়ে পর-পর তিনবার তিনি এই এলাকার এম এল এ। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরটা বছর হতে চলল। তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ানো মানে অনেক খাটুনি। প্রেসারটা কিছুদিন ধরেই একটু হাই আছে। সুগারটা সামান্য হলেও বেড়েছে। ষাট বছর বয়স তো হল।

চেহারায় অবশ্য তেমন খুব একটা ছাপ পড়েনি। চুলটা পেকেছে ইতি-উতি। না, কলপ করান না নীলা সামন্ত। জননেত্রীকে একটু আধটু পাকা চুলেই মানায়।

স্বামী রঞ্জিতও পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। এখন সেক্রেটারি পদমর্যাদার মানুষ। একমাত্র মেয়ে দীপালিকার বিয়ে হয়ে গেছে দিল্লীতে, সে আজ প্রায় বছর পাঁচেক হল। জামাই রাজর্ষি ইঞ্জিনিয়ার। ওদের কারো সঙ্গেই অবশ্য রাজনীতির কোনও সংস্রব নেই। নাতনি দিয়ার বয়স তিন।

বয়স এবং নানারকম অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক পাল্টে দেয়। মনের ভেতরে নতুন-নতুন নাম সংযোজিত হতে থাকে, পুরনো অনেক নাম হারিয়ে যায়, কিংবা ধূসর হয়ে যায়।

কালকের টেলিফোনে বলা নামটা কি হারিয়ে গিয়েছিল, না ধূসর হয়ে গিয়েছিল? নয়তো প্রথমটায় নীলা চিনতে পারছিলেন না, কেন?

রাতের খাওয়া সেরে একটু টিভি দেখেন নীলা। রঞ্জিত অবশ্য শুতে চলে যান। কাল টিভি দেখার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। নিজেকেই নিজে দেখছিলেন নীলা। এই চ্যানেলে 'খোলা মনে' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। তাতে কিছুদিন আগে নীলার একটা ইন্টারভিউ রেকর্ড করা হয়েছিল। কাল রাতে সেটাই দেখছিলেন নীলা। অনুষ্ঠানের শেষে যোগাযোগের জন্য নেতা-নেত্রীদের মোবাইল নম্বর দেখানো হয়। তাহলেও অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই নিজের মোবাইল সেটটা বেজে ওঠাতে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলেন নীলা। এত কুইক রেসপন্স?

— আমি রণদেব বলছি, ভিলাই থেকে। চিনতে পারছ?

— স্যরি?

— আমি রণদেব বলছি, ভিলাই থেকে। চিনতে পারছ?

— র-ণ-দে-ব! ভিলাই থেকে! আপনার রং নাম্বার হচ্ছে না তো?

— না। আমি নীলা দত্ত এখন নীলা সামন্ত, এম এল এ-র সঙ্গেই কথা বলতে চাইছি।

একটু অবাকই হয়েছিলেন নীলা। তাঁর পুরনো পদবীটা অনেক বছরই আর কেউ ব্যবহার করে না। অনেকে জানেই না নীলা সামন্ত কোনওকালে নীলা দত্ত ছিলেন। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরেই তিনি নীলা সামন্ত।

— কি ব্যাপার বলুন। আপনার কি কোনও কমপ্লেন আছে?

— আছে, একটাই। তুমি দেখছি আমাকে একেবারেই ভুলে গেছ।

— আপনি... মানে... আমি ঠিক...

— আমি রণদেব। প্রেসিডেন্সী কলেজ, উনিশশো আটষট্টি।

নীলা সামন্তর মতো ঝানু নেত্রীর হাত থেকেও মোবাইল সেটটা পড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। ... রণদেব! মানে রণু! এত বছর পর!

বয়সটা যেন এক ধাক্কায় পিছিয়ে গেল চল্লিশটা বছর। প্রেসিডেন্সী কলেজ! উত্তাল আটষট্টি, ঊনসত্তর। ধরপাকড়, জেল, পুলিশের নির্যাতন। তারই মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একটা সম্পর্ক।

— এত বছর পর, হঠাৎ!

গলাটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল নীলা সামন্তর? কারণটা

কি? বুকের গভীর অতলে জমে থাকা কোনও অভিমান?

— ঠিক কোনও কারণ নেই। টিভিতে মাঝেমাঝেই তোমাকে দেখি। আজ হঠাৎ কনট্যাক্ট নাম্বারটা পেয়ে গেলাম।

— ও এই! আর কিছু না?

অপরপক্ষ একটু থমকে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল— 'স্যরি। ডিস্টার্ব করলাম?'

— না। ডিস্টার্ব করার কি আছে?

— তা তো বটেই। ... তুমি এখন জননেত্রী।

কথাটা শুনতে ভাল লাগল না নীলা সামন্তর। বললেন— 'এত বছর পর তোমার যোগাযোগ করাটাই খুব আশ্চর্যের।'

অপরপক্ষ সামান্য চুপ করে থেকে বলল— 'আসলে রিটায়ার করলাম। হাতে অনেক সময়। তাই পুরনোদের কথা খুব মনে পড়ছে।'

— তার মধ্যে আমিও আছি জেনে ভালো লাগল। জননেত্রীকে দরকার ছাড়া তো কেউ ফোন করে না। জানি না, তোমার কোন দরকারে লাগব।

— আমি কলকাতায় ফিরে আসছি।

— তোমাদের সেই বাগবাজারের বাড়িতে?

— বাগবাজার নয়, শোভাবাজার।

— ও, হ্যাঁ। ... তা ভালো। আবার কি থিয়েটার শুরু করবে?

অপরপক্ষ একটু হাসল। বলল— 'দেখি, যদি বন্ধু-বান্ধবদের পুরনো দলটাকে আবার জড়ো করতে পারি।'

আরও কিছুটা ব্যক্তিগত খবর আদান-প্রদানের পর 'ঠিক আছে, গুড নাইট' বলে লাইনটা কেটে দিয়েছিলেন নীলা সামন্ত।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেও মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। কালকের অভিজ্ঞতার অভিঘাতেই কি? এদিকে একগাদা কাজ।

স্নান করে একটু হেভি ব্রেকফাস্টই করলেন। দুপুরে খাবার সময় হবে কিনা ঠিক নেই। প্রেসারের বড়িটা খেলেন। গাড়িতে উঠে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলেন। ড্রাইভার রহমান জানে, এখন কোথায় যেতে হবে।

সেই রণু! এত বছর পরে... হঠাৎ!

কলকাতা থেকে এক ফুঁয়ে যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। আজকের নীলা সামন্ত, সেদিনের নীলা দত্ত তখন আলিপুর জেলে। যে অ্যাসেম্বলি হাউসের তিনি আজ সম্মানিত সদস্যা, সেদিন সেই হাউসেই অতর্কিতে জঙ্গি হানা চালানোর দায়ে অভিযুক্ত। স্বীকারোক্তির জন্য পুলিশের পিটুনি। বাঁ-হাতের কব্জির হাড়, পিঠের হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

রণুর ফোনটা আসার পর থেকেই পুরনো অনেক নাম, অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার অলিন্দে প্রায় পনেরটা বছর পার করে দিয়ে মনেই পড়ত না যাদের কথা। কল্লোল, তাপস, সুবোধ! পুলিশ মেরেই ফেলল ওদের। সুবোধের তো বডিই খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব ভাল ছাত্র ছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো খুব বড় সায়েনটিস্ট হত।

জেল থেকে বেরিয়ে ভাঙা হাত আর ভাঙা পিঠের হাড় নিয়ে বাড়িতেই শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে অনেকদিন। রণু আর আসেনি। তাকে খুঁজে বের করার সামর্থ্যও ছিল না। কেউ কেউ মরেছে, কাউকে তাদের বাবা-মায়েরা জোর করে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছে, কেউ কেউ ছেড়েই দিয়েছে উগ্র রাজনীতি। ছেড়ে দিয়েছেন নীলাও। তখনই রঞ্জিত সামন্তর সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা। খুনের রাজনীতি ছেড়ে নীলা মিশে গিয়েছেন ভোটের রাজনীতির স্রোতে।

এক-এক করে কেটে গিয়েছে চল্লিশটা বছর। রাজনীতির নেশা অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ভুলে গেছেন পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের, কে জানে হয়তো রণুকেও।

বিকেলে পার্টি অফিসের মিটিংয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। প্রসঙ্গটার উত্থাপন করেছিলেন ক্ষিতীশদাই। তিনিও একজন এম এল এ। বললেন— 'বার-বার বলা সত্ত্বেও আমাদের ছেলেরা প্রোমোটারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কেন? দেখুন তো, আজকের 'তাজা খবর' পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে কি খবর বেরিয়েছে।'

দিলীপদা মিটিং পরিচালনা করছিলেন। বললেন— 'খবরটা দেখেছি। পার্টি অফিসেরই লাগোয়া জমি আমাদেরই দুজন মেম্বার প্রোমোটারের কাছে বেচে দিয়েছে।'

বরুণদা বললেন— 'খবরটা কি ঠিক? তাজা খবর তো সবসময় আমাদের বিরুদ্ধে লেখে!'

দিলীপদা বললেন— 'না, খবরটা ঠিকই। নয়তো ফ্রন্ট পেজে ছাপত না। আমি নিজেও খবর নিয়েছি। নামদুটোও ঠিকই দিয়েছে। কেষ্ট আর দুলে— এই দুজনেরই কীর্তি।'

নীলা বললেন— 'তাহলে ওদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিন।'

দিলীপদা বললেন— 'শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টের ওপরে তো আর আমরা অ্যাকশান নিতে পারি না। আমাদের নিজেদের তদন্ত করে দেখতে হবে।'

অপেক্ষাকৃত কমবয়সী এম এল এ নিশীথ বলল— 'আমাদের পার্টি সম্বন্ধে একটা অভিযোগ কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে আছে দিলীপদা। আমরা লোকের ঘর-বাড়ি, জমিজমা নিয়ে বড্ড মাথা ঘামাই।'

দিলীপদা বললেন— 'সেজন্যই তো আমরা বারবার বলছি, এইসব কাজিয়ায় আপনারা কেউ নিজেদের জড়াবেন না। এমনকি, ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ বাধলেও নাক একদম গলাবেন না। ওদের আদালতে যেতে দিন।'

প্রশান্ত ফস্ করে বলে বসল— 'তার আগে প্রোমোটারদের কাছ থেকে পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা নেওয়া বন্ধ করুন।'

দিলীপদা সাধারণত মাথা গরম করেন না। কিন্তু হঠাৎই একটু চটে গিয়ে বললেন— 'তুমি প্রমাণ করতে পারবে, আমার

সেক্রেটারিশিপে ওদের কারও কাছ থেকে একটা টাকাও চাঁদা নেওয়া হয়েছে?'

প্রশান্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল— 'ওদের কাছ থেকে হয়তো নেওয়া হয়নি, কিন্তু ওদের বউ, ছেলে কিংবা শালার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল যেন। মিটিংয়ের প্রায় সব মেম্বার সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল— 'কক্ষনো না, সব ওই তাজা খবরের বানানো কথা।'

প্রশান্ত নীলাকে সাক্ষী মেনে বলল— 'দিদি, আপনিই বলুন, আপনিই তো কথাটা আমাকে বলেছেন।'

নীলা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। কথাটা প্রশান্তকে তিনিই বলেছিলেন বটে। তবে ও যে এভাবে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে, সেটা বুঝতে পারেননি।

নীলা চুপ করে আছেন দেখে প্রশান্ত বলল— 'কি হল, দিদি, বলুন!'

নিজেকে দ্রুত সামলে নিলেন নীলা। যতই হোক, তিনিও একজন পাকাপোক্ত জননেত্রী।

বললেন— 'ব্যক্তিগত ভাবে বলা কোনও কথা মিটিংয়ে টেনে আনা চলে না, প্রশান্ত।'

মোক্ষম দাওয়াই। প্রশান্ত চুপসে গেল।

তবে বরুণদা বললেন— 'দিলীপবাবু, সামনেই ভোট আসছে। কাজেই কোনওরকম অভিযোগ এলে তা যেন খতিয়ে দেখা হয়। আপনাকে সেই অনুরোধ আমরা করছি। আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা যেন না থাকে।'

দিলীপদা বললেন— 'অভিযোগ এলে সবসময়ই খতিয়ে দেখা হয়। তবে এটাও মনে রাখা দরকার, অভিযোগ আর কুৎসা এক জিনিস নয়। নীলা, আপনি আমাদের দলের যথেষ্ট সিনিয়র মেম্বার। এধরনের কথা ব্যক্তিগত ভাবে বলাও আপনার উচিত হয়নি।'

নীলার মুখ সামান্য লাল হল।

বললেন— 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কি বলেছি না বলেছি, তার ওপর মিটিংয়ে কোনও আলোচনা হতে পারে না।'

কে একজন ফুট কেটে বলল— 'আপনি কি দলের আইনের ঊর্ধ্বে?'

নীলা বললেন,— 'এসব অবান্তর কথা। যিনি বলছেন, তিনি নিজেই দলের সংবিধানটা পড়ে দেখুন।'

আবার একপ্রস্থ হল্লা শুরু হয়ে গেল।

শেষটায় দিলীপদাই থামালেন। বললেন— 'ঠিক আছে, আমি সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখছি। তিন-চারজন সদস্যকে নিয়ে কমিটি করে দেব। তার মধ্যে নীলা সামন্তও থাকবেন। কোনওরকম জমি-বাড়ি-সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও বিবাদে পার্টির কোনও সদস্য জড়িত আছেন প্রমাণিত হলে পরের নির্বাচনে, দরকার হলে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল পর্যন্ত করা হতে পারে। এবিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। নীলা, আপনাকেই আমি এই কমিটির আহ্বায়িকা তথা চেয়ারপার্সন হিসাবে প্রস্তাব করলাম।'

প্রশান্তই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'এই প্রস্তাব সমর্থন করা হল।'

রাত্রে গাড়িতে ফিরতে ফিরতে সারাদিনের এইসব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে মনে আসছিল। সংসদীয় রাজনীতির অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই রাজনীতিতেই হাত পাকিয়ে নীলা সামন্ত বেশ বুঝতে পারেন, তিনি শুধু নীলা দত্ত থেকেই নীলা সামন্ত হয়ে ওঠেননি, ব্যক্তি হিসাবেও অনেক পাল্টে গেছেন।

ক্লান্ত পায়ে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে যেতে যেতে নীলা সামন্তর মনে হল, রণুর ফোনটা না এলেই ভাল হত। আর যেন কোনওদিন না আসে।

সকালের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে বিশ্বদেব বলল— 'এবার তাহলে কি হবে?'

বউ সীমা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা পরিষ্কার করছিল। একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলল— 'কিসের কি হবে?'

বিশ্বদেব ওরফে দুলু বলল— 'যাঃ বাববা! ভিলাই থেকে বড়দা এসে তো এবাড়িতে উঠতে চাইছে।'

সীমা কাঠ-কাঠ মুখে বলল— 'তোমাদের ঘর, তোমাদের বাড়ি। যা ইচ্ছে কর না।'

— এ আবার কিরকম গা-বাঁচানো কথা! একটা পরামর্শ চাইছি।

— পরামর্শ করতে হয় নিজের ছোটভাই বিলুর সঙ্গে করো, নয়তো টালিগঞ্জে দিদিভাইয়ের কাছে যাও। আমার সঙ্গে কী! এমনিতেই সকালে ওঠা থেকে আমার বুক ধড়ফড় করছে।

দুলু পাত্তাই দিল না। উল্টে মৌজ করে একটা সিগারেট ধরাল। এই মহিলার সঙ্গে প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে ঘর করছে সে। ঘাঁত-ঘোঁত সবই জানে। এও জানে যে, যতই বুক ধড়ফড় করুক, হার্টফেল করবে না। তবে এরকম একটা হট ইস্যুতে এরকম কোল্ড দিচ্ছে কেন কে জানে!

সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিষয়টা জিইয়ে রাখার জন্য দুলু বলল— 'তাহলে তো দোতলার ভাড়াটেকে তুলে দিতে হয়। তিনতলায় তো আর জায়গা হবে না।'

সীমা কাঠ-কাঠ মুখে বলল— 'না।'

যাঃ বাববাঃ! এ আবার কি? এ যে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হল

মাত্র।

বিপদ বুঝে প্রসঙ্গটা একটু পাল্টাল বিশ্বদেব ওরফে দুলু। বলল— 'তোমার বুক কি খুব ধড়ফড় করছে?'

— করচে। তবে ভয় নেই, হার্টফেল করব না।

দুলু ভো-কাট্টা হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। বলল— 'না, বলছিলাম যে, তিনতলায় আমাদের দু-ভাইয়ের তিনটে-তিনটে ছটা ঘর। একটা করে কিচেন, একটা একটা দুটো বাথরুম, মাঝে কার্ডবোর্ডের পার্টিশান করে যার-যার ঘরে ঢোকার প্যাসেজ। এর মধ্যে আর জায়গা কোথায়?'

— আমার মাথায়।

দুলু হাল প্রায় ছেড়েই দিল। নাঃ, কোনও ওষুধেই কিছু হচ্ছে না। আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে ব্রহ্মাস্ত্রটা ছাড়ল।

বলল— 'তাছাড়া, আজ বাদে কাল বাবাইয়ের বিয়ে দিতে হবে। আমরা তো আর ঘর স্যাক্রিফাইস করতে পারি না। তাছাড়া একটা ঘরে বড়দা-বউদির কিই বা হবে? তাহলে বিলুকেও ওর একটা ঘর ছাড়তে হয়। যতই হোক, ওর দুটো মেয়ে, বিয়ে দিলে অন্যত্র চলে যাবে।'

সীমা এতক্ষণে একটা পুরো সেনটেন্স বলল— 'বাবাইকে বিয়ের পর আমি আর এবাড়িতে থাকতে দিচ্ছি না। যা পরিবেশ।'

ইঙ্গিতটা বুঝে দুলু আবারও থমকে গেল। অনেক বলে কয়েও ছোটভাই বিলুর রাতে মদ খেয়ে বাড়িতে ফেরার বদ অভ্যাসটা বন্ধ করা গেল না। তাও যদি এসে চুপচাপ থাকত। আজেবাজে বকবে, বউটাকে কারণে-অকারণে গালাগাল করবে, মেয়েদুটো এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, একটা টেনে, অন্যটা ক্লাস এইটে পড়ে। কোনও আক্কেল নেই। কি যে বড়দা এবাড়িতে উঠবে উঠবে করছে!

— তোমাদের দোষ কি জানো, ঝেড়ে কাশবে না। — সীমা ড্রেসিং টেবিলের পরিচর্যা ছেড়ে আলনার কাপড় গোছাতে গোছাতে বলল— 'এবাড়িতে যে বড়দার শেয়ার নেই, সেটা অনেক আগেই পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল।'

'কথাটা ঠিকই। তবে কথায় বলে না— হু উইল বেল দ্য ক্যাট? অর্থাৎ বেড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবে? অপ্রিয় সত্য কথা কে বলবে? হয়তো সবার মনেই অল্পবিস্তর অপরাধবোধ কাজ করছিল।'

আম্‌তা আম্‌তা করে দুলু বলল— 'জামাইবাবুই বলে দিলে পারতেন।'

— কি কথা! ভাগ হল ভাইতে ভাইতে, আর সেটার রিপোর্ট দেবে বাড়ির জামাই!

— তাহলে মা-রই বলা উচিত ছিল।

— ওই এক কথা আর কতবার শুনব? তিনি তো মরে ভূত হয়েছেন, সময়ের কথা সময়ে বলতে না পারলে এই অবস্থাই হয়।

'মরে ভূত' কথাটা শুনতে অবশ্য ভাল লাগল না দুলুর। তবু, যাই হোক, এ মন্দের ভাল। কোল্ড থেকে হট হচ্ছে।

— তাছাড়া, বাবাই যে এখানেই থাকবে, তার গ্যারান্টি কি?'— আলনা গুছিয়ে বেতের চেয়ারে এসে বসল সীমা। — 'হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছে, কালও তো আমাকে বলল, দিল্লীতে চাকরি পেলে চলে যাবে।'

দুলুর ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হল। তার মানে নিজের ছেলেও প্রবাসী হবে? হতেই পারে। যা দিনকাল! অফিসেও তো দেখছে, ক'জনের ছেলে আর পৈতৃক ভিটে আগলে পড়ে থাকছে? বড়দার নিজের ছেলেই তো আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়েছে।

— তোমাদের উচিত ছিল এ-বাড়ির মায়া ত্যাগ করে নিজেদের মতো একটা ফ্ল্যাট কিনে নেওয়া।'— সীমা চেয়ারে বসে প্রবল বেগে পা দোলাতে শুরু করেছে। এটি তার একটি বদভ্যাস। মেয়েদের পা-দোলানি বিশ্বদেবের একদম পছন্দ হয় না।

— ফোকটে পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে গেলে ফ্ল্যাটের পেছনে টাকা ঢালে কোন শালা?

— আঃ! মুখ খারাপ করো না। তাহলে অন্তত শান্তিতে থাকা যেত। প্রথমে জ্বালালেন তোমার মা। এখন জ্বালাচ্ছে তোমার গুণধর ভাই। যতসব ফালতু পাবলিকের সঙ্গে বসবাস।

দুলু চুপ করে গেল।

বিলুটা চিরকেলে স্পয়েল্ড। কম বয়সে বাবা মারা গেলেন, বড়দা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেল, মা ওকে আদর দিয়ে বাঁদর তৈরী করলেন। কিছুই করে না, তবুও আদ করে বিয়েটা দিলেন। বিশ্বদেবের একেবারে মত ছিল না। সেসময় বড়দার সাপোর্টও চেয়েছিল সে। আশ্চর্য! বড়দা ট্যাঁ-ফোঁ করল না। সেই থেকে বড়দার ওপরও মনে মনে চটে আছে বিশ্বদেব।

— বাজারটা করে আনো।— সীমার কথায় চমক ভাঙল বিশ্বদেবের। — 'আজ রোববার। এরপর ভিড় হয়ে যাবে।'

— বাবাইকে পাঠিয়ে সামন্তর স্টলটা থেকে একটু সব্জি-টব্জি আনিয়ে নাও না।

— বাবাই ঘুমোচ্ছে। ন'টার আগে উঠবে না। তাছাড়া, মাছ আনতে হবে। ডিমে পোষাচ্ছে না। অম্বল হচ্ছে।

বিশ্বদেব আড়মোড়া ভাঙতে লাগল। নভেম্বরের মাঝামাঝি পার হয়ে গেল, এখনও কলকাতায় ঠাণ্ডা পড়ল না। আর মনে হয় পড়বেও না। কলকাতা থেকে শীত বিদায় নিয়েছে। এখন ঋতু বলতে দুটোই— গ্রীষ্ম ও বর্ষা। শীতকালেও বৃষ্টি হয়।

প্রকৃতির যেমন একটা ছন্দ থাকা উচিত, মানুষের জীবনেও একটা ছন্দ থাকা দরকার। দিব্যি চলছিল, মধ্যে থেকে বড়দার এই অদ্ভুত ডিসিশানটাই সব গড়বড় করে দিল। পারলে এখন তিনতলার ওপরে চারতলা তুলুক এসে। যত্তসব!

— বড়দা বিলুকে কিছু জানিয়েছে?'— বিশ্বদেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল।

— আমি তার কি জানি?'— সীমা আলমারি থেকে

বাজারের টাকা এনে বিশ্বদেবের হাতে ধরাল।

— ওর বউ কেয়াকে জিজ্ঞেস করো না?

— বয়ে গেছে আমার। যেমন দেব, তার তেমনিই দেবী। একজন রাত্তির এগারোটায় মাতাল হয়ে বাড়িতে ঢুকবেন, আর একজন দিন নেই, রাত নেই টিভি চালিয়ে বসে থাকবেন। সাধে কি বলি, এ বাড়িতে আর থাকা যায় না? হোক না বাবাইয়ের দিল্লীতে চাকরি, আমিও দিল্লীতেই চলে যাব। তুমি থাকো তোমার এই ভূতের বাড়ি আগলে।

খোঁচাটা হজম করতে হল বিশ্বদেব ওরফে দুলুকে। অথচ কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। এবাড়ির জন্য তার মনে এমন কিছু প্রবল সেন্টিমেন্ট নেই।

তবে এটা ঠিক, ওই মাতালটার সঙ্গে এভাবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা যায় না। মাতালটাকে বলি-বলি করেও বলা হচ্ছে না। পুরো বাড়িটাকে প্রোমোটারকে ধরে দিয়ে ফ্ল্যাট কিংবা টাকা, দুটোর একটা হাতিয়ে নেওয়াই যায়।

কিন্তু, সর্বত্রই সমস্যা হচ্ছে— হু উইল বেল দ্য ক্যাট। মাতালটাকেই বা কে বলবে এসব কথা। আর বড়দাকেই বা কে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে, তোমার শেয়ার নেই, এসো না।

বাজারে বেরিয়ে রাস্তায় দেখা হল বড়দারই পুরোনো বন্ধু সতুদার সঙ্গে। একসঙ্গে একটা থিয়েটার দল চালাত ওরা। বাদলদা, কেষ্টদা আরও কে কে সব ছিল। এদের মধ্যে বাদলদা বছরখানেক হল মারা গেছে। কেষ্টদা দমদমের দিকে কোথায় চলে গেছে। টিকে আছে একমাত্র সতুদাই।

— এই যে, দুলু, কাল হঠাৎ একটা চিঠি পেয়ে আমি তো অবাক।

— চিঠি! কার?

— আরে, নীলু, মানে তোমার দাদার। লিখেছে, অনেক খুঁজে-পেতে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছে।

— ও।

— তা সে তো নাকি রিটায়ার করে চলে আসতে চাইছে?

— হুঁ।

— তা ভালো। আর কতদিনই বা বিদেশে পড়ে থাকবে?

বিশ্বদেবের বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তা আপনার বাড়িতে নিয়ে তুলুন না।

অবশ্য, যা বাড়ির ছিরি! সতুদারই মতো। জীবনে খুব একটা কিছু করতে পারল না সতুদা। থিয়েটার-থিয়েটার করে বার্ন কোম্পানির চাকরিটাও খোয়াল। এদিকে তিন-তিনটে মেয়ে। তার মধ্যে ছোটটা আবার বোবা-কালা।

বিশ্বদেব সতুদার দিকে চোখ তুলে তাকাল। চেহারাটাও নিজের বাড়িটারই মতো হয়ে গিয়েছে সত্যদার। প্রায় হাড়-জিরজিরে। গায়ের হাফ পাঞ্জাবিটা আধময়লা। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথার চুল সামনের দিকে উঠে গিয়ে টাক বেরিয়ে গেছে। গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল সতুদার। এখন জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। পাজামাটা ঝুলে খাটো। পায়ে হাওয়াই চটি।

এখন চলে কি করে সতুদার? থাকার মধ্যে তো ওই বাপ-পিতামহ-র কালের ধ্যাড়ধেড়ে একতলা বাড়ি। আর তো কিছুই নেই। অবশ্য, এই বাড়ির ব্যাপারে সতুদার সেন্টিমেন্ট খুব প্রবল। ওই বাড়িও প্রোমোটার ধরতে চেয়েছিল। ওরা তো পুরনো কিছু রাখতে চায় না। সব ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরী করে। কিন্তু আশ্চর্য সতুদার সেন্টিমেন্ট। বলল— 'বাপ-পিতামহর ভিটে বলে কথা। একশো বছরের ওপর হয়ে গেল, লর্ড কার্জনের আমলে তৈরি। সবচেয়ে বড় কথা, এ বাড়িতে অমিতেশবাবু পায়ের ধুলো দিয়েছেন। অত বড় নাট্যব্যক্তিত্ব!'

— বোঝো! আসলে বড়দার বন্ধু-বান্ধবদের গ্রুপটাই এরকম ছিল। ইম্প্র্যাকটিক্যাল, ইমোশনাল। সতুদাকেই দ্যাখো না, খেতে পায়না, তবু ফি-বছর অমিতেশবাবুর জন্মজয়ন্তী করা চাই।

— তা, বাজারে যাচ্ছ বুঝি? — সতুদার প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করল বিশ্বদেব। .... দেখতেই তো পাচ্ছেন, হাতে থলি, এসব নিয়ে লোকে আর কোথায় যায়? শ্বশুরবাড়ি?

বিশ্বদেব গুম হয়ে জবাব দিল— 'হুঁ।'

— বলছিলাম যে ভায়া, একটা নিবেদন ছিল।

বিশ্বদেব একটু চমকে উঠল। ধার-টার চাইবে নাকি? একে ধার দেওয়া মানে তো পকেটমার হওয়া। অবশ্য অবস্থা যতই খারাপ হোক, এই দুর্নামটা অবশ্য সতুদার নেই।

— 'বলুন।'— তাও বিশ্বদেব একটু ভয়ে ভয়েই রইল।

— দ্যাখো, এত বছর পর নীলু আসছে। বাড়ির ছেলে বাড়িতেই উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তবে জাস্ট দুটো দিন যদি আমার বাড়িতে গিয়ে থাকে, ডাল-ভাত আমাদের যা জোটে তাই খাওয়াব, শুধু দুটো দিন দুই বন্ধুতে মিলে অমিতেশবাবুর একটু স্মৃতিচারণ করব, এখন তুমি যদি পারমিশান দাও....

... ওই বাড়িতে বড়দা এসে উঠবে! টিনের মগ ডুবিয়ে ছ্যাতলাপড়া চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে স্নান করবে! লোকটা কি পাগল? বড়দা কোন টপ্ পজিশান থেকে রিটায়ার করল ও কি জানে? চোখে দেখেছে কখনও বড়দার বিশাল বাংলো, ঝাঁ-চক্‌চকে এসি গাড়ি, ও কি জানে বড়দার ছেলে ফরেনে ইঞ্জিনিয়ার, জামাই ব্যাংকের অফিসার?

লোকটা কেমন হাঁ করে, ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বিশ্বদেবের একটু মায়াই হল।

বলল— 'আমার পারমিশানের আর কি আছে? আপনার বন্ধু আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকবে....'

— দুটো দিন, জাস্ট দুটো দিন।'— লোকটা যেন প্রায় হাত কচলাতে লাগল। — 'আমি জানি, নীলু কত বড় পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছে। ওর ছেলে ফরেনে ইঞ্জিনিয়ার। তবে কি জানো ভায়া, একটা জায়গাতে আমরা সমান-সমান। আমরা দু'জনেই অমিতেশবাবুর ছাত্র। আমি জানি, আজ আমি নীলুর কাছে কিস্যু না, কিন্তু ওই একটা জায়গাতে...'

... পাগল! পাগল! বদ্ধ পাগল!

কিন্তু সমস্যা হল, বন্ধু হয়ে এই লোকটা বড়দাকে নিজের বাড়িতে তুলে দরদ দেখাবে, আর মায়ের পেটের ভাই হয়ে বিশ্বদেবকে ডিক্লিয়ার করতে হবে, এ-বাড়িতে বড়দার কোনও শেয়ার নেই, এ তো বড় মুস্কিল হয়ে গেল!

নাঃ, আজই রাতে ভাইঝি টুপুরকে একটা ফোন করতে হবে। গোড়াতেই 'ধর তক্তা, মারো পেরেক' করাটা ঠিক হবে না। বলতে হবে— 'তোদের কাছাকাছি কোনও একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট ভাড়া করে বাবা-মাকে কিছুদিনের জন্য রাখ না। এখানে তো জানিস, দোতলা, একতলা জুড়ে ভাড়াটে, তুলতেও তো একটু সময় লাগবে...'

হ্যাঁ, প্ল্যান হিসেবে এটাই ভাল। সইয়ে সইয়ে বাণ মারলেই হবে। গোড়াতেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে নেই।

— 'কপি কত করে গো?'— ফুলকপি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল বিশ্বদেব।

— তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো?— ব্রততীর প্রশ্নে উদ্বেগ ঝরে পড়ল। — 'মাঝেমাঝেই মাথা ঘুরে উঠছে বলছ!'

— ব্রেনে মাঝে-মাঝে একটু চিড়িক দিচ্ছে।— রণদেব বিষয়টাকে লঘু করতে একটু ফিচেল হাসি হাসলেন।

— হেসো নাতো, গা জ্বলে যায়। যেদিন থেকে তোমার মাথায় কলকাতা-কলকাতা বাই ঢুকেছে, সেদিন থেকেই শরীরটা বিগড়েছে।

— আরে বাবা, স্টীল হসপিটালে ডাক্তার বর্মাকে তো দেখিয়ে এলাম, কয়েকটা টেস্টও তো করালেন, সবই তো নর্মাল।

— তাহলে এরকম হচ্ছে কেন?— ব্রততী অস্থির হয়ে উঠল— 'এখানকার ডাক্তাররা ধরতেই পারছে না, বয়স হয়েছে, পুরনো স্পণ্ডিলোসিসও আছে, তা বলে দু-এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও ওরকম ব্ল্যাক-আউট হয়ে যাবে কেন?'

— সেই জন্যই তো আরও কলকাতা যাওয়া দরকার।— রণদেব মুচকি হাসি হাসলেন। — 'ওখানে আরও বড় বড় ডাক্তাররা আছে।'

— তার সঙ্গে একগাদা অশান্তিও আছে। আচ্ছা, এত বছর পরে আমার পক্ষে সম্ভব, তোমাদের ওই শোভাবাজারের বাড়িতে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করে থাকা? তুমি শুধু নিজের তালেই নাচছো, আমার কথাটা একবারও ভাবছ না!

রণদেব একটু চুপ করে গেলেন। কথাটা ব্রততী মিথ্যে বলেনি। মনে মনে রণদেব নিজেও জানেন, এত বছর প্রবাসে থেকে সত্যিই আর ও-বাড়িতে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করা সম্ভব হবে না। মনে মনে এটাও বুঝতে পারেন, ভাইদের সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত, ব্রাত্য। তবুও একটা প্রশ্নের সমাধান করতে চান তিনি। সত্যিই কি ওবাড়িতে তাঁর কোনও অধিকার নেই? প্রবাসী বলে নিজের মাও তাঁকে এতটাই ছেঁটে ফেলে দিতে পেরেছেন?

ব্রততীর এসবে মত নেই। যে কোনও ঝুট ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। দরকার কী? ও-বাড়িতে রণদেবের শেয়ার থাক আর না-ই থাক, মোটেই তাঁরা ও-বাড়ির মুখাপেক্ষী নন। রিটায়ার করে যে বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়েছেন রণদেব, তাতে খাস কলকাতায় না হোক, সামান্য তফাতে একটা পাঁচ-ছশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট জুটে যাবে। মুকুট আর ডোরা আজকাল আর আসেই না। কলকাতায় এলেও তাজবেঙ্গলে ওঠে। শোভাবাজারের ধারও মাড়ায় না। রণদেব কি বোঝেন না, শেয়ার থাক আর না-ই থাক, তাঁর উত্তর পুরুষদের কারোরই ও-বাড়ি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই? শুধু শুধু ও-বাড়ি নিয়ে লড়ে লাভ আছে কিছু? ও থাকলে আছে, না থাকলে নেই।

বরং সবচেয়ে ভাল হত, এখানেই কো-অপারেটিভ কর্পোরেশনের ফ্ল্যাট ধরে নিতে পারলে। সস্তাও হত, মোটামুটি বড়-সড় ফ্ল্যাটও পাওয়া যেত। অবশ্য অনেক আসবাবপত্র বিক্রিও করে দিতে হোত। সে আর কি করা যাবে? এই বাংলোর সাইজ বারোশো স্কোয়ার ফিট, সামনে পিছনে বাগান। এ তো রাজপ্রাসাদ। ব্রততীর একটা চাপা নিঃশ্বাস পড়ল। নোটিস এসে গেছে। আর মেয়াদ মাত্র এক মাস। ছেড়ে দিতেই হবে এই প্রাসাদ।

— মিসেস পারেখ বলছিলেন, এখানে কো-অপারেটিভের একটা ফ্ল্যাট কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করে রাখো না। কলকাতায় কোনও প্রবলেম হলে এখানে অন্তত একটা ঠেক থাকবে।

— 'হুঁ, ভাবছি।'— রণদেব রিমোট টিপে টিভিটা চালু করে দিলেন।

সন্ধে হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও একটা দিন। কমে গেল এখানে এই সাজানো সংসারের আরও একটা দিনের মেয়াদ। ডিসেম্বর শেষ হতে চলল, জানুয়ারি আসছে। নববর্ষ, ২০০৯। কিন্তু ব্রততীর কাছে সে যেন নতুন কোনও আশা ভরসা নিয়ে আসছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই প্রবাসের ইস্পাত-নগরীতে বত্রিশ বছরের সাংসারিক জীবনটা চোখের নিমেষে ফুরিয়ে গেল।

কলকাতার জন্য কোনও টান নেই ব্রততীর। নিজে খড়্গপুরের মেয়ে। দুই বোন। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়ির পাটও উঠে গিয়েছে। এই প্রবাসকেই আপন করে নিয়েছে একটু একটু করে।

কত-কি... কত কি.. ঘটনা। ছোট-বড় সব মিলিয়ে স্মৃতির ঝাঁপি ভরপুর। রণদেবের সঙ্গে মান-অভিমান, একটু-আধটু ঝগড়াঝাঁটি। ফ্ল্যাশ-ব্যাকে সমস্ত কিছুই যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ব্রততী। এই সব কিছু ফেলে চলে যেতে হবে।

কোথায়? না, কলকাতায়। ব্রততীর কাছে সেই তো প্রবাস!

ভাল লাগে না, একদম ভাল লাগে না। তার ওপর শরীরটা যে কি গড়বড় করছে রণদেবের! দিব্যি তো ছিল, রোগবালাই ছিল না বড় একটা। এখানে যদি না-ই সারে, তাহলে কি কলকাতায় যাওয়াই ভাল হবে? মুকুটকে এখনও কিছু জানায়নি ব্রততী। এখনও ততটা সিরিয়াস কিছু তো নয়। শুনলেই হয়তো বলবে— এখানে চলে এসো।

মন খারাপ লাগলে আজকাল টুপুরকেই ফোন করে ব্রততী। আগে এতটা করত না। মেয়ে ব্যস্ত তার নিজের সংসার নিয়ে। তবুও ভেতরের ঘরে এসে ল্যাণ্ড ফোনের এস টি ডি লকটা খুলে মেয়েকেই একটা ফোন করল ব্রততী।

— কি করি, বলতো? মন-মেজাজ একদম ভাল লাগছে না। বাংলো ছাড়ার নোটিসও ধরিয়ে দিয়েছে। এতদিনের ঘর-সংসার ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

— বাপির শরীর কেমন আছে?

— ওই একরকম। মুখে তো কিছু বলবে না। হেসে ওড়াবে।

— ব্ল্যাক-আউট হচ্ছে এখনও?

— হচ্ছে তো। রোজ অবশ্য হয় না, মাঝেমাঝে, হঠাৎ-হঠাৎ।

— বাপিকে চোখটা দেখাতে বলো তো।

— দেখিয়েছে তো। কোনও গণ্ডগোল নেই।

— তাহলে এরকম হচ্ছে কেন?

— এখানে কেউ কেউ বলছে, ভেলোর নিয়ে যেতে। ব্রেনের নার্ভের কোনও গণ্ডগোল আছে বোধহয়। এখন বলতো, আমি কোনদিকে যাই? এদিকে বাংলো ছাড়তে হবে, ওদিকে আবার ভেলোর দৌড়াতে হবে...

— শোনো না, সবদিক ভেবে আমার মনে হয়, তোমরা কলকাতাতেই চলে এসো।

— উঠব কোথায়? নয়-নয় করেও কিছু মালপত্তর তো থাকবে, সবই তো আর বেচে দেওয়া যাবে না।

টুপুর এবার ফিক্ করে একটু হাসল। বলল— 'কেন? বাপির শোভাবাজারে।'

মেয়ের ফাজলামিতে একটু চটেই গেল ব্রততী। বলল— 'তুই আর আমার জ্বালা বাড়াস না। বলার মতো কিছু থাকলে বল। আবার যেন তোদের বাড়িতে উঠতে বলিস না। ওসব আমি পারব না।'

— রাগ করো না। তোমাদের জামাই আমাদের বাড়ির কাছেই একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট দেখেছে। একটু চাপাচাপি করে হলেও তোমাদের অন্তত কিছুদিন চলে যাবে।

— তোদের কাছাকাছি? মানে, টালিগঞ্জে? সে তো অনেক টাকা ভাড়া হবে রে!

— আঃ! শোনো না। যে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট, তিনি নিজে

এখানে থাকেন না। বাপির মতো ওঁরও একটা 'শোভাবাজারের বাড়ি' আছে। সেখানে বিস্তর শরিকী ঝামেলা, তাই ফ্ল্যাটটা কিনে রেখেছেন।

— তা, কত ভাড়া নেবে?

— আট হাজার।

— আট হাজার।— জায়গা অনুপাতে ভাড়াটা অবশ্য মোটামুটি ঠিকই মনে হল ব্রততীর।

— আর সেলামি-টেলামি?

— কিচ্ছু লাগবে না।

— সে কি রে! কেন?

— আসলে আদিত্য যখন কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিল, তখন ভদ্রলোকের হাউজ লোন পাওয়ার ব্যাপারে একটু হেল্প-টেল্প করেছিল। সেজন্য জাস্ট আট হাজার টাকা ভাড়ায় এক বছরের কন্ট্রাক্ট-এ দিতে রাজি হয়েছে। আট বারো ছিয়ানব্বই, ওই এক লাখই দিয়ে দিও, যতই হোক, তোমার জামাইয়ের তো একটা প্রেস্টিজ আছে। এখন ফিফটি থাউজ্যাণ্ড দিয়ে ঢুকে পড়ো, বাকিটা আবার পরে...

— মন্দ নয়

— আমি তো তোর বাপিকে বলছি, এখানকার কো-অপারেটিভে একটা ফ্ল্যাট বুক করে রাখতে।

— সে তো খুব ভালো। যে করেই হোক বাপির মাথা থেকে ওই শোভাবাজারের ভূতটা নামাও তো। একটা ননসেন্স! ওখানে উঠে তোমরা থাকতে পারবে?

— যাক, এভাবে বাপিকে কিছু বলিস-টলিস না যেন, এমনিতেই শরীরটা ভাল নেই।

— বাপিকে কেন বলতে যাব? তোমাকেই বলছি। তুমি নিজে পারবে এত বছর পর ও-বাড়িতে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে?

— সে তো একটু আগেও তোর বাপিকে আমি বলেছি।

— কি বলছে? মানছে না?

— মানছে না বলবো না। কিন্তু ভূতটা ঘাড় থেকে নেমেও নামছে না। কি যে হয়েছে, খুঁজে খুঁজে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখছে, ফোন করছে.... তুই নীলা সামন্তর নাম জানিস?

— নী-লা সামন্ত! চেনা চেনা লাগছে একটু। ও, হ্যাঁ, টিভিতে দেখেছি, এম এল এ না, এম পি কি যেন!

— এম এল এ।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। এম এল এ। ওই নর্থের দিকে কোথায় যেন। তার সঙ্গে বাপির কি?

— একসঙ্গে পড়ত, প্রেসিডেন্সী কলেজে।

— তাকেও ফোন করেছে?

— হ্যাঁ।

— তা এম এল এ, এমপি হাতে থাকা ভালো।

— আবার বলছে, পুরনো বন্ধুরা মিলে শোভাবাজারে একটা 'অমিতেশ অ্যাকাডেমি' খুলবে।

— কি অ্যাকাডেমি?

— অমিতেশ, অমিতেশ।

— সে আবার কে?

— এভাবে বলিস না। তোর বাপি শুনলে খুব কষ্ট পাবে। কোথা থেকে একটা ছবি যোগাড় করে বসার ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছে।

— বুঝলাম তো, কিন্তু লোকটা কে?

— বিখ্যাত অভিনেতা। অমিতেশ চট্টোপাধ্যায়। তোর বাপির থিয়েটারের গুরু।

— তা হবে। আমি নাম শুনিনি কখনও। আমি অবশ্য এখানকার কালচার টালচারের কি-ই বা জানি? এখন টিভিতে যাদের দেখায়, শুধু তাদের চিনি। ওই চিরঞ্জীব-টিরঞ্জীব...

তা বটে। মুকুট তো আরও কিছু জানে না। ভিলাই থেকে চলে গেল কানপুর আই আই টি। সেখান থেকে ইউ এস এ। ইণ্ডিয়ার খবরই কতটা রাখে তার ঠিক নেই তো বেঙ্গলি কালচার। আর নাতি ডিক্! তার কাছে কলকাতা, শোভাবাজারের বাড়ি মানে তো অ্যান্টার্কটিকা, নাকি?

রাতে খাবার পর মেয়ের সঙ্গে বলা কথাগুলো তুলল ব্রততী। রণদেবের চোখ তখনও টিভিতে। স্ক্রীনে সেই নীলা সামন্ত। যত্ত রাজনৈতিক কচকচি। রণদেবের হাত থেকে রিমোটটা কেড়ে নিয়ে টুক্ করে টিভিটা অফ করে দিল ব্রততী।

— টুপুর বলছিল, কলকাতায় গেলে ওরা তোমাকে বাঙুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরোলজিতে নিয়ে দেখাবে।

— কেন এসব বলে ডিস্টার্ব করতে গেলে ওকে? গত তিন-চারদিন তো ওষুধটা খেয়ে ভালোই আছি আমি। আর কিছু হয়-টয়নি।

— হয়নি মানে? কালও দুপুরে খাবার পর...

— আরে, ও তো স্প্রিট সেকেণ্ড...

— কি সেকেণ্ড আমি জানি না। হবে কেন? ব্ল্যাক আউট না হোক, মাথাটা তো মাঝে-মাঝে ঘুরছে, নিজেই বলছ।

— আজ সন্ধ্যে থেকে একবারও ঘোরেনি। ফার্স্ট ক্লাস আছি।

স্বামীর কাছে ঘেঁষে এল ব্রততী। কাঁধে মুখ রেখে বলল— 'হ্যাঁগো, তুমি ওই মেয়েটাকে বারবার দ্যাখো কেন?'

— কে মেয়ে?

— ওই যে... তোমার... নীলা সামন্ত।

রণদেব একটু হাসলেন। বললেন— 'আমি দেখি না, ওকেই দেখায়। ভোট আসছে তো।'

— না, তুমি দেখবে না।

— কি যে ছেলেমানুষী করছ!

— আর ফোন করেছ ওকে?

— না রে বাবা, না।

— আমার গা ছুঁয়ে বলো।

রণদেব হাসতে লাগলেন। বললেন— 'ওঃ। তোমরা মেয়েরা না....'

স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ব্রততী। বলল, — 'তুমি আমার কথা একটুও ভাবছ না, একটুও...। এই ঘর, এই সংসার ছেড়ে যেতে যে আমার কত কষ্ট হচ্ছে...

— কষ্ট কি আমারও হচ্ছে না?

— না, হচ্ছে না।'— ব্রততীর কণ্ঠ অশ্রুবিকৃত। — 'তাহলে এত কলকাতা কলকাতা করে লাফাতে না। তোমরা পুরুষ মানুষ.... তোমরা কি বুঝবে একটু একটু করে গড়ে তোলা সংসার ভেঙে দিতে কত কষ্ট হয়! ওই যে ওয়াশিং মেশিনটা... পঁচিশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীতে কিনে দিয়েছিলে। এখন ওটাকেও আমাকে বেচে দিতে হবে। কিচেনে পড়ে আছে অনেক পুরনো একটা প্রেসার কুকুর... কত বছর আগে একবার ডাবল ইনসেন্টিভ পেয়েছিলে, সেই টাকায় কেনা... আমি পারব না। পারব না ওটা বেচতে।'— ব্রততীর চোখের জল আর বাঁধ মানল না।

স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রণদেব বললেন— 'কেঁদো না। কি ছেলেমানুষী করছ?'

স্বামীকে জড়িয়ে ধরল ব্রততী। বলল— 'আমি কোথাও যাব না, কোথাও না। এই জায়গাই আমার ঘর, আমার বাড়ি। দরকার নেই তোমার কলকাতার। শুধু তোমাকে সুস্থ করে নিয়ে চলে আসব। কোথাও থাকব না আমরা, কোথাও না। মেয়ের কাছে না, ছেলের কাছে না, শোভাবাজারেও না। তুমি আমাকে এখানেই ফ্ল্যাট কিনে দাও। এখানেই থাকব আমরা। তুমি আমাকে ফেলে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবে? বলো?'

স্ত্রীকে গভীরভাবে চুম্বন করলেন রণদেব।

একটু পরে আলো নিভে গেল শোবার ঘরের। অন্ধকার সাক্ষী রইল দুটি মানব-শরীরের গভীর, গোপন তৃপ্তির। রণদেবের বুকে তখনও মুখ ঘষছে ব্রততী। গুণগুণ করে বলছে— 'এইখানে, এইখানে থাকব আমরা। তারপর একসঙ্গে মরব। এইখানে।'

এই বাড়িটার প্রতি একটা অন্ধ আবেগ কাজ করে সত্যদেব ওরফে বিলুর মনে। তার দুই দাদার তুলনায় সে নেহাতই অকৃতী, অধম। মেজদা ভাল সরকারি চাকরি করে, বড়দার তো কথাই নেই। ভিলাইতে দু-তিনবার গিয়ে দেখেছে বড়দার রমরমা। বড়দা ওখানকার 'ব্যানার্জীসাহেব'। বউদি 'মেমসাহেব'। সে তুলনায় নিজে সে কিচ্ছু না। বাবাকে হারিয়েছে কোন ছোট বয়েসে। ভাল করে মনেই পড়ে না। হয়তো সেটাই তার জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট'। এই ইংরাজি শব্দটা সে বড়দার মুখেই শুনেছিল। বড়দার নিজের জীবনও উল্টে-পাল্টে যায় এই অকালমৃত্যুতে। কিন্তু তারপরেও বড়দা সামলে উঠেছিল। সামান্য চাকরি নিয়ে স্টীল প্ল্যান্টে ঢুকে এখন সে 'ব্যানার্জীসাহেব'। কিন্তু বিলুর কি হল?

সব মায়েরই অক্ষম সন্তানের প্রতি কিঞ্চিৎ বাড়তি মমতা থাকে। থাকে প্রশ্রয়ও। বিলুর মায়ের ছিল। ছোট ছেলের কথা ভেবেই দোতলা, একতলায় ভাড়াটে রেখে দেওয়া হল। এছাড়া বড়দাকে চিঠি লিখে লিখে তার ব্যবসার জন্য টাকা আদায় করত মা-ই। কতরকমের ব্যবসারই না সে চেষ্টা করেছে। ডেকরেটারের ব্যবসা, বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, জেরক্সের ব্যবসা। কোনওটাতেই কিছু হল না। চতুর্দিকে ধারে-দেনায় সব ব্যবসাই লালবাতি জ্বালাল। বিরক্ত হয়ে বড়দাও টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিল। সব অক্ষমেরই সক্ষমদের উপর রাগ বা ঈর্ষা থাকে। বিলুও সেই থেকেই বড়দার ওপরে চটা।

শেষপর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে এই বাড়িটায়। ভাড়া বাবদ এখান থেকে হাজার দশেক টাকা আয় হয়। সেটাই বিলুর সম্বল। এই টাকার ভাগ অবশ্য বড়দা চায়নি কোনওদিন। কিন্তু মেজদার লোভ ছিল। মা অবশ্য সেটা বুঝে দোতলা-একতলা পাকাপাকি ভাবে ছোট ছেলের নামে করে দিয়ে গেছে। নয়তো, সে পথে বসত।

যাই হোক, এপর্যন্ত সবই পরিষ্কার। শুধু একটা রহস্যই থেকে গেছে। তিনতলাটা মা কি করে গেছে?

রাতে যখন বাড়ি ফেরে, তখন কথা বলা বা শোনার অবস্থায় থাকে না সত্যদেব ওরফে বিলু। সারা জীবনে কিছু না হওয়ার জ্বালাটা সে মদ্যপান করে জুড়োয়। এ একরকম বিষে বিষক্ষয়। বউ কেয়া এসব পছন্দ করে না, একরকম ঘৃণাই করে। মেয়ে দুটোকে নিয়ে আলাদা শোয়। দেখতে দেখতে মেয়ে দুটোও বড় হয়ে গেল। একটা টেনে পড়ে, অন্যটা এইটে। মা একরকম জোর করেই ওর বিয়েটা দিয়েছিল। মেজদার মত ছিল না। বোধহয়, বড়দারও না। কেয়ার বাপ-মা ছিল না, মামার বাড়িতে মানুষ। মামাদের অবস্থাও খুব একটা বলার মতো কিছু নয়। দুই মামা উলুবেড়িয়া চটকলে কাজ করত। ভাগ্নিকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে আর কিছু চায় না, সুতরাং বিয়েটা হয়ে গেল। কেয়াকে দেখতেও তেমন কিছু না, রং কালো, বাঁ চোখটা একটু ট্যারাও।

তবুও এই মরুভূমির মাঝখানে, এই বাড়িটাই একটা ওয়েসিস। দোতলা, একতলার ভাড়াটিয়ার কাছে সে বিলু নয়, বাড়িওয়ালা সত্যবাবু। এই একটা জায়গাতেই তার ভাল নামটা চলে। নয়তো, নিজের ভাল নাম সে নিজেই ভুলে যেতে বসেছে। অপদার্থ, মাতাল হলেও কাগজে কলমে সেই বাড়িওয়ালা। দোতলা, একতলা জুড়ে তারই সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে যেটুকু খাতির প্রাপ্য, তার সবটাই পায় সে। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ভাড়া দিলেও পুরনো ভাড়াটে সে টিকিয়ে রেখেছে। কারণ, এতদঞ্চলে প্রোমোটার ব্যাটাদের খুবই রমরমা। পুরনো ঘরবাড়ি দেখলেই ওদের জিভ লক্‌লক্ করে। কোনও বাড়িতে পুরনো ভাড়াটে থাকলেই বরং ওরা একটু পিছিয়ে যায়। ওদেরও একটা অলিখিত দাবী তৈরি হয়ে

যায়। তা বলে অবশ্য একেবারেই যে ভাড়াটে বদলানো হয় না, তা নয়। তবে প্রতি তিন বছর অন্তরই অদল-বদল করে না বিলু। ভাব দেখায়, যেন দয়া করছে। — 'থাকুন, আরও দু-একটা বছর।'— এইরকমই আর কি! এখন এইভাবেই চলছে। ভাড়া অবশ্য সে শিগগিরই বাড়াবে। দুটো তলা থেকে পাঁচ-পাঁচ দশ হাজারে ঠিক হচ্ছে না। ওটা অন্তত সাড়ে সাত করে পনের করবে।

তা, এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু এসব কি শোনা যাচ্ছে? বড়দা নাকি রিটায়ার করে এবাড়িতে চলে আসতে চাইছে?

কিন্তু তা তো হবে না। বড়দার এবাড়িতে থাকা হবে না। থাকবেই বা কোথায়? তিনতলায় আর এক ইঞ্চি জায়গাও নেই। দোতলা-একতলা বিলুর জমিদারি, প্রশ্নই নেই। তা বড়দা কি সেসব জানে না? জানে যদি তো এসব ছেলেমানুষি করছেই বা কেন?

করবে না করবে না করেও আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের মোবাইল ফোন থেকে বড়দাকে ধরার চেষ্টা করল সত্যদেব। বড়দা তখন ছিল না, ফোনটা ধরল বউদি। কাঠ-কাঠ গলায় বলল— 'হঠাৎ, কি ব্যাপার?'

— বড়দা কখন ফিরবে?

— দেরি হবে।

বলব না বলব না করেও শেষপর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলল সত্যদেব, ওরফে বিলু।

— তোমরা নাকি এবাড়িতে চলে আসতে চাইছ?

— চাইতেই তো পারি।

কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! মেমসাহেব তো! গরম দেখাচ্ছে।

— মানে?— বিলুর গলা থমথম করতে লাগল।

— মানের আবার কি আছে? তোমার বড়দা রিটায়ার করেছে। একটা আস্ত বাড়ি থাকতে আবার আমরা অন্য বাড়িতে থাকতে যাব নাকি?

— আস্ত বাড়ি কোথায় দেখলে! — নেশার চোখ লাল হতে শুরু করল বিলুর। — 'দোতলা-একতলায় ভাড়া দেওয়া আছে, তিনতলায় আমরা দু-ভাই থাকি। কোনও জায়গা নেই।'

— দোতলার ভাড়া তুলে দাও।

— মানে?

— আবার কিসের মানে? বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরতে চাইছে, ভাড়াটে দিয়ে তুমি জায়গা আটকে রাখবে?

— তুমি বড়দাকে ফোনটা দাও।

— বললাম তো, বড়দা নেই। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় বলো, নয়তো ফোন ছেড়ে দাও।

— তুমি আজেবাজে বকছ, বউদি।

— কিছু আজেবাজে বকছি না। তুমি ছোট, ছোটর মতো থাকো। বড়ভাইকে বাড়িতে থাকতে দেব না বলতে লজ্জা করছে না?

— না, করছে না।— বিলু রুখে উঠল। — 'দোতলা-একতলা আমার। ওখানে থেকে ভাড়াটে তুলব না আমি। আমার তাহলে কি করে চলবে?'

— তুমি তাহলে দোতলাটা তোমার বড়দাকে বেচে দাও।

— বেচে দেব!

— হ্যাঁ, বেচে দেবে। কত টাকা চাই তোমার?

— দ্যাখো বউদি, টাকার গরম দেখিও না।

— ছিঃ ছিঃ, কিভাবে কথা বলছ? আমি শুধু তোমার বউদিই নই, বয়েসেও অনেক বড়।

— থামো। অতই যদি টাকার গরম, যেখানে ইচ্ছে সেখানে টাকা ছড়িয়ে থাকো গিয়ে, এবাড়িতে যদি ঢোকার চেষ্টা করেছ, গুণ্ডা পাঠিয়ে পাড়া-ছাড়া করব তোমাদের আমি।

— কি বললে?

— হ্যাঁ, যা বলেছি, তাই করব। মনে রেখো, এবাড়ি আমাদের। এপাড়া আমাদের পাড়া। আমাদের সবাই চেনে, তোমাদের কেউ চেনে না। কেউ তোমাদের সাপোর্টে দাঁড়াবে না। তোমরা হলে রিফিউজি, রিফিউজি।

— রিফিউজি!

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। ... আমি বড়দাকে ফোন করে এসব কথা বলব।

— খবরদার, তুমি তোমার দাদাকে ফোন করবে না।

— ফোন করব আমার দাদাকে, আমার পয়সায়, তুমি বাধা দেবার কে? তখন থেকে ফটরফটর করে যাচ্ছ, এক ঝাঁপড়ে তোমার....

ছেড়ে যাওয়া নেশাটা কি মাথায় চড়ে বসল? কথাটা বলে নিজেই জিভ কেটে ফেলল বিলু।

— কি বললে? কি বললে তুমি?... ছি, ছি, ছি। ছোটলোক, ইতর! এতখানি সাহস তোমার! ব্যবসার নামে দাদার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট করে আবার চোখ রাঙাচ্ছ?

— হ্যাঁ, বেশ করেছি। আমার দাদার পয়সা আমি নষ্ট করেছি। তোমার... ইয়ের পয়সা নষ্ট করেছি? আমি দাদাকে ফোন করব।

— খবরদার না। তোমার দাদার শরীর একদম ভাল নেই। হসপিটালে গেছে ডাক্তার দেখাতে। একদম ডিস্টার্ব করবে না।

— তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

— সত্যি কি মিথ্যে সেটা মানুষটাকে চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে। শোনো, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, খুব শিগগিরই। তবে ভয় নেই, ওবাড়িতে উঠতে যাব না। তবে এও বলি, যে অপমান তুমি আমাকে আজ করলে, ভগবানের দয়ায় তোমার দাদা সুস্থ হয়ে উঠলে, আমিও দেখে ছাড়ব। ওবাড়িতে তোমার বড়দার রাইট আছে কিনা!

ফোন ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ঝুম হয়ে বসে রইল বিলু। যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড হয়ে গেল। সব কিছু একেবারে খুল্লামখুল্লা হয়ে গেল। কথা বলাই উচিত হয়নি তার বউদির সঙ্গে।

কিন্তু বড়দার কি সত্যিই শরীর খারাপ? নাকি, এটাও ফলস্ দিল ওই ভদ্রমহিলা! বড়দাকে ফোন করলে আসল ব্যাপারটা বোঝা যেত। কিন্তু এখন যা অবস্থা হল, সত্যিই সে আর বড়দাকে ফোন করতে পারবে না।

দুদ্দুর! জামা-কাপড় ছেড়ে গঙ্গায় নেমে পড়ল বিলু। একটু অবগাহন স্নান করা দরকার। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। শরীরটাও কেমন ঝিম ঝিম করছে।

প্রায় আধঘন্টা জলে কাটিয়ে যখন উঠে এল, তখন শরীরটা বেশ জুড়িয়ে এসেছে। কেষ্টদার কাছ থেকে একটা গামছা চেয়ে নিয়ে গা-মাথা বেশ ভাল করে মুছল সে। ভিজে আণ্ডারওয়্যারটা খুলে নিংড়ে নিয়ে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ঢোকাল। তারপর, প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টটা গায়ে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। ঘাটের ধারে চক্ররেলের লাইন পার হয়ে আরও মিনিট দশেক হাঁটতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, তার স্বভাবটা বরাবরই বড় বেপরোয়া, হঠকারী। মুখের লাগাম একেবারেই নেই। হয়তো এটাই শিক্ষার অভাবের ফল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অক্ষম সন্তানের প্রতি বিধবা মা-র প্রশ্রয়। একবার বড় জামাইবাবু জ্যোতির্ময়কেও সে মা-র সামনেই অপমান করেছিল। বাবার মৃত্যুর পর বড়দা চাকরির খোঁজে যখন ভিলাই চলে গেল, তখন বড় জামাইবাবুই ছিলেন মা-র ডানহাত। সেই মানুষটাকেও একদিন যখন সে অপমান করল, আর মা সব দেখেশুনেও চুপ করে রইল। তারপর থেকে অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে, জামাইবাবু আর কোনওদিনই শোভাবাজারে আসেননি। তবে না এলেও জামাইবাবুকে মনে মনে সন্দেহ করে বিলু। সেদিনের অপমান জামাইবাবু মুখ বুজে সহ্য করলেও ভালভাবে যে নেননি সে তো বোঝাই যায়। তারপরেও কি মা-র সঙ্গে জামাইবাবুর তলায় তলায় কোনও যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল? শেষ দিকটায় মা অবশ্য চোখেও ভাল দেখত না, কানেও ভাল শুনত না। ফোন-টোন করাও আর সম্ভব ছিল না। তবুও জামাইবাবু বুদ্ধিমান মানুষ। আর ক্ষেপে গেলে এরা খুব ডেঞ্জারাস হয়। বিলু জানে, শিক্ষা কম হওয়ায় তার বুদ্ধিও কম। তাই সব বুদ্ধিহীন লোকদের মতো সেও বুদ্ধিমানকে ভয় করে।

তার ওপর আজ বড় বউদিকে চটিয়ে দিয়ে সে কি ঠিক কাজ করল? এভাবে তো তার শত্রু বেড়েই যাচ্ছে।

উচিত হয়নি আজ বড় বউদিকে 'ঝাঁপড় মারব' বলা। বলেই অবশ্য সে জিভ কেটেছে। কিন্তু ফোনে তো আর আয়না ফিট করা নেই যে বড় বউদি দেখতে পেয়েছে। ছি, ছি, কাজটা খুব খারাপ হল। কোনও লাভই হল না, উল্টে আর একজন শত্রু বাড়ল।

আসলে সব দিক থেকে কোণঠাসা হতে হতে তার আশ্রয় শুধু ওই বাড়িটায় গিয়ে ঠেকেছে। কখনও কখনও প্রোমোটারের কথা ভাবলেও, এখন এই বাড়ির ভাগ কেউ চাইবে, এটা ভাবলেই তার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। বউদিরও উচিত ছিল তার এই সেন্টিমেন্টটাকে বোঝা। দিব্যি বলে দিল— 'দোতলাটা বেচে দাও!' প্রাণ থাকতে সে এই বাড়ির একটা আধলা ইঁটও বেচতে পারবে না। না, সে আর প্রোমোটারের কথা ভাবে না। যখন সবাই, সব কিছু তার দিক থেকে নির্মমভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, তখন এই বাড়িটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বাড়ির জোরেই সে দুটো ভাড়াটিয়ার 'বাড়িওয়ালা'। হোক না শিক্ষিত, ভদ্দরলোক, তবুও তাদের মাথার উপরে তিন তলায় তার অধিষ্ঠান। মাত্র এই একটা জায়গাতেই সে আক্ষরিক অর্থেই 'টপে' রয়েছে। এখান থেকে তাকে কেউ নামিয়ে দেবার কথা বললে সে ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে। এই বাড়িকে সে প্রাণে ধরে দু-ভাগের বেশি তিনভাগ হতে দেবে না। অনেক বছর আগে এই বিষয়েই জামাইবাবুর সঙ্গে তার খটাখটি লেগেছিল। জামাইবাবু বড়দার পক্ষে ছিলেন।

বাড়িতে ঢুকে সে গম্ভীরভাবে বউকে বলল— 'ভাত দাও।' বউও গম্ভীরভাবে বলল— 'স্নান করে এসো।'— 'করেই এসেছি, ভাত দাও।'

ভাত খেয়ে খুব একচোট ঘুমোলো সত্যদেব ওরফে বিলু। তারপর সন্ধেবেলা অভ্যেসমতো নেশার আড্ডায় চলে গেল। ফিরল অনেক রাতে। তখন সে নিয়মমাফিক চুরচুরে মাতাল। তবে আজ অবস্থা যেন আরও খারাপ। হোঁচট খেতে খেতে কোনওক্রমে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। ভাড়াটেরা ততক্ষণে শুয়ে পড়ে, এই যা রক্ষা। এরই মধ্যে পকেট থেকে মোবাইল সেটটা

বার করে একবার মাথায় ঠেকাল। বিড়বিড় করে বলল— 'বউদি, ক্ষমা করো।'

— পুরনো বাড়ি কিনে ফ্ল্যাটবাড়ি তোলাই তো আমাদের কাজ। — দামী একটা লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়ল প্রোমোটার দিগ্বিজয় সিংহ। জাতিতে রাজপুত। দেড়শো বছর ধরে কলকাতায় থাকতে থাকতে বাঙালীই হয়ে গেছে।

— তবে মজার কথা কি জানেন তো? আমাদের নিজেদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িটাই এখনও ভাঙতে পারিনি।

— কেন?— বিশ্বদেব বিস্ময় প্রকাশ করল।

— সাত শরিকের বাড়ি, মশাই। সবাই তো আর আমার মতো প্রোমোটারি না। সবাই একমত হচ্ছে না। ভাবুন। আমার হাতেই তৈরি হচ্ছে ঝাঁ চক্‌চকে ফ্ল্যাট, আর ওদিকে আমার নিজের বাড়িতেই পুরনো কাঠের কড়ি-বরগা, উঠোনে পা রাখলেই শুনবেন পায়রার বকুম-বকুম, বাড়িময় ছুঁচো আর ইঁদুরের রাজত্ব।

— হে-হে..।— বিশ্বদেব হাসল।

— তাই বলছিলাম, তড়িঘড়ি করবেন না। আপনি যেমন ধরেই নিয়েছেন, ছোট ভাইয়ের মত আছে। এটা ঠিক না। কার মনে যে কি আছে, কে বলতে পারে? তারপর এখন একটা ইয়েও হয়েছে।— মোবাইল বেজে উঠতেই অন্য কথা শুরু করল প্রোমোটার দিগ্বিজয়।

এসব সুবচন বিশ্বদেবের অবশ্য ভাল লাগল না।

এদিকে কাল ভিলাই থেকে বড়দা-বউদিও কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। ভাইঝি টুপুর ফোন করেছিল। উঠেছে ওরই বাড়ির কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে। তবে বড়দার শরীর নাকি ভাল নেই। মাঝেমাঝেই সেন্সলেস হয়ে পড়ছে। ওরা বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরোলজির ডাক্তার গুপ্তকে দেখাবে ঠিক করেছে।

অতএব আর দেরি করা যায় না। ওরা এখন বড়দাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বড়দাও বাড়ির ভাগ নিয়ে কাজিয়া করতে আসবে না। যা করার এইবেলা চটপট্ করে ফেলতে হবে। মাতালটার সঙ্গে আর বসবাস করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় বাবাই চাকরি পেয়ে বাইরে কোথাও চলে গেলে সীমাও যদি ওর সঙ্গে চলে যায়, তবে একা ওবাড়িতে একেবারে অকুল পাথারে পড়বে বিশ্বদেব ওরফে দুলু। তার চেয়ে বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট করে আলাদা আলাদা খোপ নিয়ে নেওয়াই ভাল। কিংবা যদি ক্যাশ চাও তো ক্যাশ...

— আপনার কাগজপত্তর এমনিতে ঠিক আছে। — দিগ্বিজয়ের কথায় চমক ভাঙল বিশ্বদেবের। আবার মোবাইলটা বেজে উঠতেই টুক্ করে বোতাম টিপে 'একটু পরে, ব্যস্ত আছি' বলে বিশ্বদেবকে বলল— 'তবে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। এক, বাড়িতে আপনার বড়দার কোনও শেয়ার নেই, আর দোতলা-একতলা থেকে শুরু করে তিনতলার অর্ধাংশ, অর্থাৎ বাড়িটার প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার কিন্তু আপনার ছোটভাইয়ের।'

— হ্যাঁ, তা তো বটেই।'— বিশ্বদেবকে স্বীকার করতে হল।

— তা এরকম আন-ইকুয়াল ডিভিশান হল কেন?

বিশ্বদেব সংক্ষেপে ইতিহাসটা বলল।

শুনে দিগ্বিজয় সিগারেটের শেষপ্রান্তটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল— 'স্ট্রেঞ্জ! বাড়িতে বড় ভাইয়ের কোনও শেয়ারই নেই!'

— ওই যে বললাম, প্রবাসী বলে....

দিগ্বিজয় মাথা নাড়তে লাগল। তারপর বলল— 'দেখুন, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমরা ব্যবসায়ী লোক। তবে ব্যবসা করতে করতেই অনেক অদ্ভুত সব কেস দেখতে পাই। ... অল্ রাইট, কাগজপত্র রেখে দিলাম। কিন্তু আমাকে আরও একটু খোঁজখবর করতে হবে।'

.... এই না হলে প্রোমোটার! কেমন ল্যাজে খেলাচ্ছে দ্যাখো।...

তবে একটা কথা ব্যাটা ঠিকই বলেছে। যতই ছোটলোক, মাতাল বলে উড়িয়ে দাও না কেন, বাড়িটার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার কিন্তু এই বিলুটারই। এই হল অক্ষম সন্তানের মহিমা। একেবারে প্রতিবন্ধী কোটা।

বিশ্বদেব একটু গলা খাঁকারি দিল। বলল— 'আরেকটা কথা একটু বলার ছিল।'

— বলুন।

— আমার ছোট ভাইয়ের হিস্ট্রিটা তো আপনাকে বললাম। ও ঠিক বোঝানো পড়ানোর মানুষ না। ও দুটো জিনিস বোঝে। হয় লোভ, নয় ভয়। কাজ হলে এই দুটোর একটাতেই কাজ হবে। কোন্‌টা দেখালে কাজ হয় একটু ভেবে দেখবেন।

দিগ্বিজয় হাসল। বলল— 'আমরা ব্যবসায়ী লোক। বড় বড় কথা আমাদের মুখে মানায় না। তবু কাজ করতে করতে যা দেখি, তাই বুঝি। শুধু আপনার ছোট ভাইকে দোষ দিচ্ছেন কেন? বেশি লেখাপড়া শেখেনি, তাই? আচ্ছা-আচ্ছা শিক্ষিত লোকের মধ্যেও আজকাল ওই দুটো জিনিসই কাজ করে। হয় ভয়, নয় লোভ। আর যা নেই, তা হল লজ্জা আর ঘেন্না। দুটোই গেছে।'

বিশ্বদেব একটু চুপ করে থেকে বলল— 'কি করবেন, বলুন? যে রোগের যে দাওয়াই।'

— সবসময় সব দাওয়াই প্রয়োগ করা যায় না।— দিগ্বিজয় আবার একটা সিগারেট ধরাল। লোকটা বোধহয় চেন স্মোকার। — 'পিটিয়ে তুলে দিতে একটু বাইরের সাপোর্ট লাগে। আর সবসময় সেটা পাওয়া যায় না।'

— আপনারাও পান না?'— বিশ্বদেব হাত উল্টে হতাশার ভাব করল।

— সবসময় পাই না। তবে ভোট আসছে তো, এবারে হয়তো পাব।

— কিভাবে?

— সেসব আপনার শুনে কাজ নেই। কিছু আমাদের নিজস্ব সিক্রেট। আমরা বাইরের লোককে বলি না। টোটাল নর্থ ক্যালাকাটায় জমি-বাড়ি বিক্রির ওপর হুলিয়া জারি হয়েছে, জানেন?

— হুলিয়া!

— অলমোস্ট। আগে যেসব জায়গা থেকে আমরা হেল্প পেতাম, এখন সেসব প্রায় বন্ধ।

— কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি?

— নেই। থাকেও না। কিন্তু সব ব্যবসাতেই একটা বেসরকারি বন্দোবস্ত থাকে। এখন সেখানে মন্দা দেখা দিয়েছে। ফলে খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। কোনওরকম গণ্ডগোল হলে আগে যেসব প্রোটেকশান পেতাম, এখন সেসব বন্ধ।

— তাহলে উপায়?

— বললাম তো, তড়িঘড়ি করা চলবে না। আর ফোর্স তো অ্যাপ্লাই করাই যাবে না, সে আপনার ছোটভাই যতই অশিক্ষিত, গোঁয়ার হোক না কেন।

— হঠাৎ কি হল আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

— কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল।— দিগ্বিজয় সিগারেটে শেষ টান মেরে অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল— 'আপনি বোধহয় মিস করেছেন।'

— সে তো আমেরিকায় ফ্ল্যাট বিক্রিতে মন্দা...

— না, মশাই না। এখানেই তিন সদস্যের একটা কন্ট্রোল কমিটি হয়েছে। তার চেয়ারপার্সন একজন মহিলা এম এল এ। খুব কড়া হাতে তিনি বিষয়টা সামলাচ্ছেন। সমস্ত কাগজপত্র সেই কমিটিকে দেখিয়ে পাস করিয়ে নিতে হচ্ছে। সাধে কি আর বলছি, তড়িঘড়ি করবেন না।

— মহিলার নাম?

দিগ্বিজয় উত্তর দেবার আগেই ওর মোবাইল ফোনটা আবার বেজে উঠল। হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু হল। থামে আর না। মিনিট দশেক পার হয়ে যেতে বিশ্বদেব উসখুস করতে লাগল। আর বসে থাকা ভাল দেখায় না। সে উঠে পড়তেই দিগ্বিজয়ও হাত তুলে বিদায় জানানোর ইঙ্গিত করল।

বাইরে বেরিয়ে এসে হাতঘড়িতে সময় দেখল। সাড়ে তিনটে। এখনই একবার অফিসে যেতেই হবে। আগের দিন আর নেই, যখন খুশি কেটে পড়লেই হল। রীতিমত অ্যারাইভ্যাল-ডিপারচার নিয়ে চাকরি করতে হচ্ছে।

আচ্ছা... বড়দার ঠিক কি হয়েছে? মাঝে মাঝে সেন্সলেস হয়ে পড়ছে, এ তো ভাল কথা নয়। একবার দেখতে যাওয়া উচিত। অবশ্য, এটা ঠিক যে, বড়দা বউদি তাদের ভরসায় কলকাতায় আসেনি। এসেছে মেয়ে-জামাইয়ের ভরসাতে। তা একেবারে ছেলের কাছে ফরেনে চলে গেল না কেন? আরও ভাল ট্রিটমেন্ট হত।

ভাবতে ভাবতে চিৎপুর মসজিদের কাছে প্রায় চলে এসেছে বিশ্বদেব, একসময় বুকপকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। চোখে চশমাটা নেই, হাঁটার সময় এখনও ততটা লাগে না। তাই নাম্বারটা আবছা দেখে কিছু অনুমান করতে পারল না বিশ্বদেব। আন্দাজেই বলল— 'হ্যালো?'

— মেজকা, আমি টুপুর বলছি।

—ও আচ্ছা, কি ব্যাপার, বল্?

— বড্ড শব্দ হচ্ছে। তুমি এখন কোথায়?

— আমি অফিসের কাজেই একটা জায়গায় এসেছি।

— কখন ফিরবে?

— আধঘন্টার মধ্যেই।

— তাহলে তখনই ফোন করব। এখন কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তোমার অফিসের নাম্বারটা একটু বলবে? নাকি, ওবাড়িতে মেজকাকিকে ফোন করব?

— না, না। মেজকাকি এখন ঘুমোয়। ওখানে ফোন করতে যাস না। আমাকেই অফিসে ফোন কর। নাম্বারটা বলছি, নোট করে নে।

অফিসে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বিশ্বদেব দেখল, ইতিমধ্যেই টেবিলে দু-তিনটে ফাইল জমে গিয়েছে। আজকাল এরকমই হচ্ছে। সরকারি অফিসে আগের সেই রামরাজত্ব আর নেই। মাইনে বেড়েছে অনেক, কিন্তু লোকও কমে গেছে। তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে বিশ্বদেব যখন প্রথম ঢুকেছিল, তখনকার অফিসাররা টেবিলে বসে মাছি মারত। অবন্তী রায় বলে একজন অফিসার ছিলেন, তিনি তো নিয়ম করে রোজ দুপুরে ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতেন।

একটা ফাইল ছেড়ে দিয়ে পরের ফাইলটা ধরতে যাবে, টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল।

— হ্যালো, মেজকা?

টুপুর।

— হ্যাঁ, বল্।

— বাপির কণ্ডিশনটা আমাদের কিন্তু সুবিধার ঠেকছে না। আজও বার-দুই সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল।

— সবে এসে পৌঁছেছে তো। অতটা ট্রেন জার্নি, তার তো একটা ধকল আছে। বউদির উচিতই হয়নি অতটা রাস্তা একা নিয়ে আসা। ট্রেনে যদি কিছু হত?

— একা তো আসেনি। সঙ্গে বোসকাকু আর দত্তকাকু ছিল। জানো তো ওদের? বাবার ভী-ষ-ণ ভীষণ বন্ধু। আমার বিয়ের সময় কত খেটেছিল, ভুলে গেছ?

... তা হবে। মোটকথা, টুপুরের বিয়ের সময় এসব পাতানো কাকুদের দৌরাত্ম্য ভাল লাগেনি বিশ্বদেবের। এরাই যেন সব,

বড়দার নিজের ভাইয়েরা কিছু না। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলে কি এরকমই হয়! যাকগে...

— তোরা ডাক্তার দেখিয়েছিস?

— আদিত্য কালকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কিন্তু এর মধ্যে...

— এর মধ্যে কি?

— লেফ্‌ট সাইডটা যেন ঠিক নাড়তে চাড়তে পারছে না। একটু যেন প্যারালিসিস।

— তার মানে তো স্ট্রোক হয়েছে।

— সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মা তো বলছে, ট্রেনে আসা পর্যন্ত এসব কিছুই ছিল না। দিব্যি ওভারব্রীজ ভেঙে প্ল্যাটফর্মে এসে কামরায় উঠল ভিলাই স্টেশনে... আমরা তো কাল হাওড়া থেকে নিয়েও এলাম। তখনও তো...

— বউদি কি করছে?

— আর বোলো না, বাপির এই অবস্থা দেখে খুব কান্নাকাটি করছে।

— বড়দার সামনেই।

— না, না। আড়ালেই...

— দেখিস, বড়দার সামনে যেন এসব ননসেন্স না করে। তুই এখন কোথায়?

— ফিরে এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে। মেজকা... বলছিলাম যে...

— কি?

— আমাকে তো এবাড়িতে চলে আসতেই হবে, আমার মেয়েটাও তো বাচ্চা... তাই...

— একটু তাড়াতাড়ি বল। টেবিলে কাজ জমে আছে।

— বলছিলাম যে .... মেজকাকি এসে কয়েকটা দিন যদি মা-র সঙ্গে একটু থাকে...

— ক্ষেপেছিস! সে তো নিজেই একটা রোগের ডিপো। ওকে দিয়ে তোর কিস্‌স্যু সুবিধা হবে না। ঠিক আছে, কাল ডাক্তার দেখিয়ে আমাকে জানাস। তারপর আমিই না হয় যাব। ফ্ল্যাটের ডিরেকশানটা আমাকে দিয়ে দে।

বাড়িতে ঢুকতে যাবে, সতুদার সঙ্গে দেখা।

— শুনলাম, নীলু নাকি অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছে?

— হুঁ। আপনাকে কে বলল?

— বিলু বলছিল। তবে ইয়ে... মানে ও তো সবসময় ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকে না। তাই তোমাকে ... তা কোথায় আছে ও?

— টালিগঞ্জে। একটা ভাড়ার ফ্ল্যাটে।

— সেকি! আমরা থাকতে ওখানে কেন? তুমি আমাকে ঠিকানাটা বলো তো। আমি গিয়ে দেখা করব।

— আমি নিজেই যাইনি এখনও। গেলে আপনাকে জানাব।

বাড়িতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বিশ্বদেব।

— তোমাদের অতসব জিনিসপত্র কোথায় রেখে এলে?— করবী জিজ্ঞেস করল।

— সব বাংলোতেই পড়ে আছে, দিদিভাই। কি যে হবে।— ব্রততী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

— বাংলোতে থাকতে দিচ্ছে এখনও?

— নোটিস তো এসেই গিয়েছিল। এখন অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আর দু-মাস মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তারপর যে কি হবে!

করবী জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকাল। খুব মন দিয়ে রিপোর্ট, প্রেসিক্রিপশানগুলো দেখে যাচ্ছেন জ্যোতির্ময়। টুপুর পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফাইল হাতে নিয়ে।

ফ্ল্যাটটা ছোটই। মধ্যবিত্ত মানুষের যেমন হয়। কলকাতার ওপরে যে ধরতে পেরেছে, এটাই যথেষ্ট। বুদ্ধিটা টুপুর আর আদিত্য মন্দ করেনি। ভাড়াও মডারেট। নয়তো কোথায় উঠত ব্রততী অসুস্থ মানুষটাকে নিয়ে?

— মুকুটকে জানিয়েছ?

— এখনও জানাইনি।

— এবার কিন্তু তোমাদের জানানো উচিত। একটা ডিসিশান নিতে চলেছ। — করবী বেজে ওঠা মোবাইল ফোনের সুইচটা টিপে লাইনটা কেটে দিল। তারপর অফ করে দিল সেট্‌টা।

— আদিত্য বলছিল, আরও কয়েকটা টেস্ট রিপোর্ট আসুক। ডায়াগনিসিসটা হোক।

— গাড়ি-টাড়ি সবই বিক্রি করে দেবে?

— স-ব। কলকাতায় গাড়ি এনে কে চালাবে, দিদিভাই? মানুষটারই হাতে-পায়ের জোর চলে গেল।

— তুমি অত ভেঙে পড়ো না। জোর গেছে, আবার আসবে। ... টুপুর, এই ফ্ল্যাটটা কতদিনের কন্ট্রাক্টে ভাড়া নিয়েছিস?

— এক বছর।

— ভালই করেছিস। ওবাড়িতে এদের থাকা সম্ভব নয়।

ব্রততীর মুখ একটু থমথম করে উঠল। দিন আসুক, মানুষটা সুস্থ হোক, তারপর একদিন সবার সঙ্গে ব্রততী কোমর কষে ঝগড়া করবে। এরা ভাবেটা কি? কোনও অধিকার নেই তাদের শোভাবাজারের বাড়িতে?

যে থাকতে চেয়েছিল, সেই বরং আজকাল একটু নির্লিপ্ত। একটু যেন বেহুঁশও। মাঝে-মাঝে দু-চারটে অসংলগ্ন কথাও বলে ফেলছে রণদেব। ব্রততীর মনে একটা সংস্কার কাজ করছে। যেদিন থেকে 'কলকাতায় আসব, কলকাতায় আসব' শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই রণদেবের শরীরটা খারাপ। এমনকি, কলকাতায়

আসার পর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থার যেন আরও অবনতি হয়েছে।

এখানে তাই থাকতে চায় না ব্রততী। কিন্তু তাহলেও ভেতরে ভেতরে একটা জেদ চড়ে গিয়েছে। বিলুর ফোনটা বড় কথা নয়, ওটা একটা অমানুষ। কিন্তু বাকিরা? তারা তো কেউ আর বিলু নয়। তাদেরই বা মনোভাব এরকম কেন? বাইরে থেকে কোন চোরদায়ে ধরা পড়েছে ওরা যে, বসতবাটিতে সামান্য অধিকারটুকুও থাকবে না?

ঝগড়াটা তাই করেই ছাড়বে ব্রততী। ওই মানুষটা তো আর পারবে না। তবু তারই জন্য গলা ফাটাবে ব্রততী। তারপর চলে যাবে ওই মানুষটাকে নিয়ে। প্রবাসীর প্রবাসজীবনই ভাল। ওখানে এরকম দু-কামরার ছোট বাড়িও কি পাওয়া যাবে না? খুব পাওয়া যাবে। শুধু মানুষটা যেন সুস্থ হয়। যেন হাঁটতে-চলতে পারে।

— জামাইবাবু!

ব্রততীর ডাকে চোখ থেকে চশমাটা খুলে ওর দিকে তাকালেন জ্যোতির্ময়।

— কিছু বুঝলেন?

জ্যোতির্ময় হাসলেন একটু। বললেন— 'আমি তো আর ডাক্তার নই। যাই হোক, তবে এটুকু বলছি, নীলু সেরে যাবে।'

টুপুর বলল— 'পিসাই, এর পরের দিন কিন্তু আমাদের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে তুমিও থাকবে।'

— ওই দিনটা তো পারব না রে মা। আমার প্রাতঃভ্রমণের এক বন্ধুর ছেলের গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন আছে।

— না! তুমি থাকবে। — টুপুরের গলায় আব্দার ঝরে পড়ল।

পিসিকে কোনওদিনই খুব পছন্দ করে না টুপুর। কেন, তা অবশ্য সে সঠিকভাবে বলতে পারবে না। কাকা-কাকিদের সঙ্গেও সেভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু, পিসাই যেন অন্যরকম। কতবার একাই চলে গেছেন ওদের ভিলাইয়ের কোয়ার্টারে। হাওড়া থেকে রাতের ট্রেনে চেপে পরেরদিন সকালে পৌঁছে মাকে বলতেন— 'দ্যাখো ব্রততী, চলে এলাম।' বাপি অফিস থেকে ফিরে অবাক হয়ে যেত।

— আমি তাহলে ফোন করব তোমাকে। মোবাইলটা অন রেখো।— টুপুর বলল।

— করিস। — টুপুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন জ্যোতির্ময়। ইস! টুপুর যে কেন আবার ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারে না। ঠিক তার মেয়ে তিতলির মতো।

— তোর বাপির বন্ধুরা ফিরে গেছে ভিলাইতে?— জানতে চাইলেন জ্যোতির্ময়।

— হ্যাঁ। বোসকাকু ফিরেছে পরশু, আর দত্তকাকু কালকে।

— ওঁরা যা করলেন ভোলার নয়। — ব্রততী বলল। — 'এই কয়েকটা জিনিস যে নিয়ে আসতে পেরেছি, সে শুধু ওঁদের জন্য। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে খাট, আলমারি, চেয়ার টেবিলগুলো ট্রাকে তোলার ব্যবস্থা করলেন। তারপরেও ট্রেনে আমাকে একা ছাড়লেন না। বললেন— বউদি, তা কি হয়? ভগবান না করুন, রাস্তায় যদি ব্যানার্জীদার হঠাৎ কিছু হয়। নিজেদের যাতায়াতের ভাড়াটা পর্যন্ত নিলেন না।... আর আমার নিজের দ্যাওর... আমাকে ফোনে...

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ব্রততী।

করবী মুখ ঘুরিয়ে নিল। জ্যোতির্ময় বললেন— 'চুপ করো ব্রততী। ভুলে যাও ওসব কথা।'

— কি করে ভুলে যাব জামাইবাবু? আপনি নিজে কি ভুলতে পেরেছেন ওবাড়িতে আপনার অপমান? আপনার দোষ এই, একমাত্র আপনিই আপনার ভাইয়ের হয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন। আমরা এতই খারাপ, জামাইবাবু, এতই খারাপ? তাহলে আমিও বলব, পক্ষ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল আপনার ভাই, দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বিদেশে একা, কেউ গিয়েছিল এখান থেকে? ভগবানকে ডাকতাম, ছোঁয়াচে অসুখ, যেন আমার না হয়, ছেলেমেয়ে দুটো খেতে পাবে না তাহলে। স্কুটার থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেছিল আমার, আপনার ভাই এখানে দুলুকে ফোন করে বলল— অন্তত দশটা দিনের জন্য সীমাকে পাঠিয়ে দে, তার মধ্যে কাজের লোক খুঁজে পেলে আমি নিজে গিয়ে ওকে আবার কলকাতায় পৌঁছে দেব। পাঠিয়েছিল দুলু তার বউকে? ... এরকম অনেক কথা আমিও বলতে পারি, জামাইবাবু, দূরে থাকি বলে কিভাবে আমাদের বিপদে-আপদে মুখ ঘুরিয়ে থাকা হয়েছে। যেন সাধ করে দূরে চাকরি করতে গিয়েছিল আপনার ভাই। ভগবান এসবের শোধ তুলবেন। জামাইবাবু, ভগবান এসবের শোধ তুলবেন।'

উত্তেজনায়, ক্ষোভে হাঁপাতে থাকে ব্রততী। টুপুর বলে ওঠে— 'মা, চুপ করো।' জ্যোতির্ময়ও বলেন— 'চুপ করো ব্রততী। এখন মাথা গরমের সময় নয়। মানুষটাকে আগে সুস্থ করে তুলতে হবে আমাদের।'

সব চুপচাপ। ব্রততী আস্তে আস্তে সামলে নিল নিজেকে।

নিচে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছে। রাতের দিকটায় আর নিজে ড্রাইভ করেন না জ্যোতির্ময়। উল্টোদিক থেকে হেড লাইটের আলোয় চোখ বড্ড ধাঁধিয়ে যায়।

গাড়িতে ওঠার আগে আবার টুপুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন জ্যোতির্ময়। বললেন— 'ঘাবড়াস না। বাপি ঠিক ভাল হয়ে যাবে।'

— দাদাকে একটা ফোন করব, পিসাই?

জ্যোতির্ময় দু-এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন— 'আর দু-একটা দিন দ্যাখ।'

ফেব্রুয়ারির শেষ, ঠাণ্ডা এবার কলকাতায় পড়লই না সেরকম। একটু আধটু হাওয়া আসছে, মন্দ লাগছে না।

শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল বোধহয় করবী। তারপর জ্যোতির্ময়কে বলল— 'নীলুর বউকে অতটা আস্কারা দেওয়া

তোমার উচিত হয়নি।'

জ্যোতির্ময় আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আস্কারা দেওয়ার আবার কি দেখলে?'

— ওর অনেক দোষ। বড় বউয়ের দায়দায়িত্ব কোনও কালে পালন করেছে? এখন নিজের দোষ ঢাকতে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

— দোষ সবারই আছে। সবাই মানুষ।— জ্যোতির্ময় পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন— 'চুলচেরা বিশ্লেষণ করা তো সম্ভব নয়।'

— তুমি ওকে বাড়ি প্রোমোটারকে সেল করার ব্যাপারে কিছু বলোনি তো?

— কথাবার্তা তো সব তোমার সামনেই হল। ব্রততীকে আড়ালে ডেকে তো আমি কিছু বলিনি।

— আঃ! ফোনে-টোনেও তো...

এবার বেশ বিরক্ত হলেন জ্যোতির্ময়। বললেন— 'কি যা তা বকছ? তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে আমি আর নেই।'

— আমি কিন্তু নীলুর কণ্ডিশানটা খুব ভাল বুঝছি না। ব্রততীও দেখলাম, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে।

— হুঁ।— জ্যোতির্ময় অন্যমনস্ক ভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ঘনশ্যাম বোধহয় আবারও কোনও একটা শর্টকাট ধরেছিল। গাড়ি বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

— ওরা তো সবসময় ভিলাইয়ের 'এই ভাল, ওই ভাল' বলে বেড়ায়। তা ওখান থেকে তো পেশেন্টটাকে আধমরা করে কলকাতায় পাঠাল।

জ্যোতির্ময়ের এবার একটু হাসিই পেল। তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বরাবরই ভিলাই আর কলকাতা দুই প্রতিপক্ষ। তফাৎ এই যে, কলকাতার দিকেই পাল্লাটা ভারি।

এই দুয়ের মধ্যেও যোগসূত্র ছিলেন জ্যোতির্ময়। মাঝে-মাঝে একাই চলে যেতেন ভিলাই। ব্রততীকে ওরা যতই 'নাক উঁচু', 'ডাঁটিয়াল' বলে থাকুক, নিজের বাড়িতে সে খুবই আন্তরিক। বরং করবীই কোনওদিনও তার নবাবনন্দিনীর খোলস ছাড়তে পেরেছে কিনা, সে বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের মনেই সন্দেহ আছে। করবীর ভুরু সর্বদাই ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখের ভাব কদাচিৎ প্রসন্ন।

মন-মেজাজ কারোরই খুব ভাল নেই। খাবার টেবিলে বসে আর তেমন কথাবার্তা হল না। করবী শুতে চলে গেল। বেতের চেয়ারটা টেনে ব্যালকনিতে এসে বসলেন জ্যোতির্ময়।

রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে এসেছে। বজবজের দিক থেকে একটা মালগাড়ি তার দীর্ঘ শরীরটা টানতে টানতে শেয়ালদার দিকে চলেছে। অনেকটা যেন জ্যোতির্ময়েরই আটষট্টি বছরের দীর্ঘ জীবনটার মতো। এই জীবনে সবসময়ই ন্যায়ের সপক্ষে থাকতে পেরেছেন, এমন দাবী করতে পারবেন না জ্যোতির্ময়। না কর্মজীবনে, না সাংসারিক জীবনে। আটষট্টি বছরে পৌঁছে পিছনে ফিরে তাকালে জ্যোতির্ময় যে জীবনটাকে দেখতে পান, তার অনেকটাই আপোসের, কিছুটা প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। এর মধ্যে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধটুকুই সচেতনভাবে করা, আপোস অসচেতন। অভ্যাসেই হয়ে যায়, কিছুটা বাধ্যবাধকতায়। তবুও

এরই মধ্যে নিজের মান-অপমানবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিছুটা হলেও জ্যোতির্ময় সেটা পেরেছেন। কর্মক্ষেত্রে, সংসারেও। সাফল্য বলতে এটুকুই।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল। অনেকক্ষণ ব্যালকনিতে চেয়ারে চুপচাপ বসে ছিলেন জ্যোতির্ময়। এবারে উঠলেন। এত রাতে একজনকেই ফোন করা যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের চেম্বারে বসে সে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত মক্কেলদের নথিপত্র দেখে। নীলুরা কলকাতায় এসেছে, এই খবর পেয়ে মাসকয়েক আগে সকালে একেই ফোন করেছিলেন জ্যোতির্ময়। আইনজীবী অভিজিত দত্ত। জ্যোতির্ময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আজ রাতে আবার সেই নাম্বারেই বোতাম টিপতে লাগলেন জ্যোতির্ময়।

পার্টি মিটিং-এ সেদিন তৎপরতা তুঙ্গে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

অ্যাসেম্বলির অধিবেশন সেরে বেরোতে একটু দেরিই হল নীলা সামন্তর।

বেরোতেই সাংবাদিককুল ছেঁকে ধরল তাঁকে। — 'দিদি, নাম-টাম কিছু বলুন। কারা যাচ্ছেন দিল্লীতে?'

— আমি তার কি জানি, ভাই? মিটিংয়ে গেলে তো জানব।— দু-হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন জননেত্রী।

পিছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলল— 'দিদি, আপনার নামও কিন্তু শুনতে পাচ্ছি।'

এবারে একটু ঘুরে তাকালেন নীলা সামন্ত। বললেন— 'কোত্থেকে এসব গুজব শুনতে পান? আমি নিজেই জানি না, আর আপনি জেনে বসে আছেন।'

পিছন থেকে সেই কণ্ঠ আবার সোচ্চারে জানিয়ে দিল— 'দিদি, মিলিয়ে নেবেন।'

রাস্তায় সামান্য জ্যাম ছিল। অ্যাসেম্বলি থেকে পার্টি অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে একটু দেরিই হল।

যখন পৌঁছলেন, তখন মিটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। জেনারেল সেক্রেটারি প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনে দলের অবস্থান কি হবে, প্রচারের অভিমুখই বা কেমন হবে, ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মোটের ওপর বেশ দীর্ঘ ভাষণ।

এরপর শুরু হল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা।

এক নম্বর, দু-নম্বর পার হয়ে তিন নম্বর নামে এসে গলা সামান্য তুললেন সেক্রেটারি। বললেন— পূর্বতন প্রার্থীর বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই কেন্দ্রে আমাদের নতুন প্রার্থী— শ্রীমতী নীলা সামন্ত।

প্রোটোকল ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন নীলা সামন্ত। বললেন— 'এ কি! আমি নিজেই কিছু জানি না।'

সেক্রেটারি মৃদু হেসে তাঁকে আসন গ্রহণ করার ইঙ্গিত দিলেন। গোটা হল জুড়ে ততক্ষণে প্রবল কলতালি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এরপর পর-পর নাম ঘোষিত হতে লাগল। অনেকেই পুরনো, কয়েকজন নতুন। তাঁদেরই মধ্যে একজন নীলা সামন্ত।

এরপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব।

দলের একজন সদস্য প্রবাল মিত্র বলল— 'দিদিকে আমাদের কেন্দ্রে দিন না। অন্তত পঞ্চাশ হাজারের লিড দিয়ে দেব।'

সেক্রেটারি মৃদু হেসে বললেন— 'নীলা সামন্ত যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই পঞ্চাশ হাজার লিড্ পাবেন। আমরা ওঁকে সঠিক জায়গাতেই দিয়েছি।'

এবার আবারও উঠে দাঁড়ালেন নীলা। বললেন— 'কিন্তু, আমাকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না আপনারা?'

জেনারেল সেক্রেটারি মৃদুহাস্যে বললেন— 'দু-একটা সারপ্রাইজ ছাড়া কি জীবনটাই নীরস হয়ে যায় না, ম্যাডাম? আপনাকে নাহয় একটা সারপ্রাইজ দিলাম।'

কে একজন টুকরো মন্তব্য করলেন— 'মধুর সারপ্রাইজ।'

মিটিং-এর পরে চা-চক্র।

সেখানে সাংবাদিকরা আবার ঘিরে ধরল নীলাকে। মুহুর্মুহু ক্যামেরার ফ্ল্যাসবাল্ব ঝলসাতে লাগল, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে টেলি-মিডিয়ার সব সাংবাদিকেরই মুখে একটাই প্রশ্ন— 'কেমন লাগছে, বলুন?'

— ভালো, খুব ভালো।— নীলা জানেন, আজ সন্ধ্যাতেই টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে খবরটা দেখানো হবে। সেখানে হাসি-হাসি মুখই দেখানো চাই।

একজন ছোকরা সাংবাদিক এগিয়ে এসে বলল— 'দিদি, আপনার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেব। কবে যোগাযোগ করব, বলুন?'

— যে কোনও দিন। একটা ফোন করে চলে এসো। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করলে না তো? তোমরা আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

— না, না। কি যে বলেন! ... আপনার নাম্বারটা?

— আমাদের অফিসের এনকোয়ারি থেকে জেনে নিও।

একটি কমবয়সী মেয়ে এগিয়ে এসে বলল— 'আন্টি, আমি নিবেদিতা মিত্র। ইয়ং বেঙ্গল কাগজ থেকে এসেছি। আপনাকে আন্টি বলে ডাকছি, কেন জানেন?

— না তো!

— আমার বাবা দিলীপ বিশ্বাস অনেক বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে আপনার সঙ্গে পড়তেন। চিনতে পারছেন?

— হ্যাঁ, মানে... অনেকদিনের কথা তো...

— আপনার রণদেব ব্যানার্জীকে মনে আছে? থিয়েটার করতেন!

... রণু!

এই ষাট বছরের পরিণত রাজনীতিক জীবনেও হঠাৎ যেন অন্য একটা সুর বেজে উঠল।

— হ্যাঁ, মানে....

— আমার বাবাও ওই একই গ্রুপে থিয়েটার করতেন।

— ও।— নিজেকে সামলে নিলেন জননেত্রী। বললেন— 'তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?'

— ভালোই আছেন। আজ বাবাকে গিয়ে বলব, আন্টির সঙ্গে আলাপ হল।

— বোলো। চা খেয়েছ? ... মিষ্টি মেয়ে!— গালটা একটু টিপে আদর করলেন নীলা সামন্ত।

সারাদিনের পর এবার বাড়ি ফেরার পালা।

রাজনীতিতে দেখতে দেখতে চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল। কিসে কি হয় ভালই জানেন নীলা সামন্ত। একসময় করতেন আবেগের রাজনীতি, এখন করেন আপোসের রাজনীতি। কিংবা 'করেন' বলাও বোধহয় ভুল হল, করতে হয়।

না, কেন্দ্র নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। কলকাতার লাগোয়া ওটা সেফ সিট। পার্টি তাঁকে ডোবায়নি। ডোবাবেও না। কারণ, আসল কথা একটাই। পার্টি চায় না তিনি আর রাজ্যে থাকুন।

গত দু-তিন মাসের মধ্যেই প্রোমোটারচক্রের ঘুঘুর বাসা ঢিলে করে দিয়েছেন তিনি। নর্থ ক্যালকাটার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমস্ত বেআইনী, আধা-আইনী নির্মাণকাজ বন্ধ। টাকা ঢেলে এগোতে না পেরে বিপাকে পড়ে গেছে বেশ কিছু প্রোমোটার। কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে সমস্ত কাগজপত্র নিজে খুঁটিয়ে দেখছেন নীলা সামন্ত। প্রয়োজনে পার্টির আইনজীবী সেল-এর পরামর্শ নিচ্ছেন। মাথায় হাত পড়ে গেছে দিগ্বিজয় সিং, প্রভুরাম আগরওয়াল, সৌরভ বণিকদের মতো তাবড় তাবড় প্রোমোটারদের। ফলে দলের ভেতর থেকেই চাপ আসছে কন্ট্রোল কমিশন ভেঙে দেবার। ভয় হচ্ছে, আর কিছুদিন গেলে, ভোটের পর নীলা না তাঁর নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে কমিশনের পক্ষে সরকারি সীলমোহরও আদায় করে বসেন।

তার চেয়ে সরিয়ে দাও নীলা সামন্তকে। ব্যস্ত করে রাখো নিজের নির্বাচনী প্রচারে। সেফ সিটে দাঁড় করিয়ে পাঠিয়ে দাও দিল্লীতে। বুঝেও কিছু বলতে পারবেন না নীলা সামন্ত। পার্টি তো তাঁকে শাস্তি দেয়নি। উল্টে পুরস্কৃত করেছে।

সেই পুরস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামলেন নীলা সামন্ত। ড্রাইভার গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে চলে গেল। ক্লান্ত পায়ে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরের সোফায় এসে বসলেন নীলা। বাড়ি একদম ফাঁকা। স্বামী রঞ্জিত পার্টির কাজেই এখন দিল্লীতে। ফিরতে ফিরতে সেই পরশু।

ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে একটু ঠাণ্ডা জল খেলেন নীলা।

হঠাৎই মনে পড়ল, একতলার অফিসঘরে কন্ট্রোল কমিশনের দু-তিনটে ফাইল এখনও পড়ে আছে। আর ফাইল নেবেন না নীলা সামন্ত। নিয়ে লাভ নেই। পার্টির ইঙ্গিত তিনি বুঝে গেছেন। তাছাড়া, সময়ও হবে না আর। এরপর থেকে ওই অফিস ঘরে বসে অন্য কাজ করতে হবে। সে কাজ নির্বাচনী প্রচারের।

তার আগে শেষ দু-তিনটে আপদ বিদায় করে দেওয়াই ভাল। বিশেষ কিছু আর দেখারও দরকার নেই। সব 'ওকে' করে দেবেন। যা ইচ্ছে করুক দিগ্বিজয় সিং, অথবা প্রভুরাম আগরওয়ালের বাহিনী।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার ঘরের তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে চাবি দিয়ে লোহার আলমারির পাল্লা খুলে বার করলেন ফাইলপত্র। প্রথম ফাইলের কাগজপত্র একটু উল্টে পাল্টে দেখে সই করে ছেড়ে দিলেন। আর মাত্র দুটো ফাইল বাকি।

দ্বিতীয়টাও ছেড়ে দিলেন।

শেষ ফাইল। ... এটা পাঠিয়েছে দিগ্বিজয় সিং। শোভাবাজারের একটা পুরনো বাড়ির কেস। এটাও ছেড়ে দেবেন।

তবুও শেষ ফাইল বলে কথা। এরপরে তো আর কিছুই নেই। তাই একটু উল্টে পাল্টে দেখছিলেন নীলা সামন্ত। হঠাৎই একটা নামে এসে তাঁর চোখ আটকে গেল।

... রামরতন ব্যানার্জী।

শোভাবাজার... রামরতন ব্যানার্জী। তাঁর অবর্তমানে দলিলে সই করছেন স্ত্রী দেবিকা ব্যানার্জী। ... ১৬ নম্বর আহিরীটোলা স্ট্রিট!

... রামরতন....দেবিকা.... ১৬ নম্বর আহিরীটোলা...

চোখ থেকে চশমাটা একটানে খুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন জননেত্রী।

.... রণু!

এ তো রণুদের বাড়ির দলিল।

কিন্তু, আশ্চর্য! এতে রণুর নাম কোথায়?

না, না। আছে নিশ্চয়ই। ভুল হচ্ছে নীলারই।

চোখে চশমাটা লাগিয়ে দলিলটা আবার পড়তে শুরু করলেন জননেত্রী। একবার দুবার। নাঃ। নেই, নাম নেই। দেবিকা ব্যানার্জী বাড়ি ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর মেজ আর ছোট ছেলের মধ্যে।

তার মানে, ওবাড়িতে রণুর শেয়ার নেই। আর এই কেসও 'ওকে' করে দিতে হবে নীলা সামন্তকে!

রণু বলত — 'বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। জাত মানেন। তোমার মতো কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করলে বাড়ি থেকে ঠিক তাড়াবেন

আমাকে। ত্যাজ্য করবেন।'

আর সেদিনের নীলা দত্ত ভেংচি কেটে বলত— 'বেশ হবে।'

কিন্তু নীলা দত্ত তো নীলা ব্যানার্জী হতে পারেনি।

তাহলেও রণু কেন ত্যাজ্য হল? কোন অপরাধে?

রণুকে আর ফোন করেননি নীলা, রণুও আর ফোন করেনি তারপর থেকে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছেন নীলা। সেই ফোনটার পর থেকে কোন-না কোনওভাবে রণু তাঁর জীবনে এসে উঁকি মারছেই। পার্টি অফিসেও ওই রিপোর্টার মেয়েটা... কি যেন নাম.... নিবেদিতা, রণুর নাম করল। আর এখন টেবিলের ওপর রণুদেরই বাড়ির দলিল, অথচ তাতে রণুর নাম নেই!

এই ফাইল এইভাবে ছেড়ে দিতে পারবেন না নীলা সামন্ত। রণুর সঙ্গে একবার কথা বলতেই হবে। ও কি চলে এসেছে কলকাতায়, নাকি এখনও ভিলাইতেই?

ঘড়িতে সময় দেখলেন নীলা সামন্ত। প্রায় সাড়ে দশটা। যতদূর মনে পড়ে, মাসকয়েক আগে এরকম সময়েই ওর ফোনটা এসেছিল। তার মানে, এখন ও জেগেই থাকে।

মোবাইলের বোতাম টিপলেন নীলা সামন্ত।

কয়েক সেকেণ্ড কোনও সাড়া নেই। তারপর এক যান্ত্রিক কণ্ঠ জানাল— 'সুইচড্ অফ।'

আরও কিছুক্ষণ পর, রাতের খাওয়া সেরে, করব কি করব না ভাবতে ভাবতে আবারও নাম্বারটায় বোতাম টিপলেন নীলা সামন্ত।

আবারও সেই একই কথা কানে ভেসে এল।

— সুইচড্ অফ।

আদিত্যর অফিস এখন মাথায় উঠেছে।

এরই মধ্যে তিনদিন কামাই হয়ে গিয়েছে। আজ নিয়ে চতুর্থদিন হল। এভাবে আর অফিসকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সে নিজেও বুঝতে পারছে।

কিন্তু আজ একবার ডাক্তার গুপ্তর চেম্বারে না গেলেই নয়। সমস্ত রিপোর্ট এসে গিয়েছে। সব কিছু দেখে আজই যা বলার বলবেন উনি। টুপুরও আছে সঙ্গে। ওরও স্কুল কামাই হচ্ছে।

— কেমন আছে পেশেন্ট?— ডাক্তার গুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে রিপোর্ট দেখে চশমাটা খুলে কাঁচদুটো রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন।

টুপুর বলল— 'খুব ড্রাউজি হয়ে পড়ছেন। কথাবার্তার ঠিক নেই, কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে।'

— লেফ্‌ট সাইডের প্যারালিসিস?

— হুঁ। ... আপনার ভাই যেন কোথায় থাকেন?

— ভাই তো নয়, দাদা।

— এনিওয়ে। কোথায় যেন থাকেন? কানাডা না অস্ট্রেলিয়া?

— ইউ এস এ-তে।

— হুঁ। ... দাদাকে খবর দিন।

— কেন ডক্তারবাবু? — টুপুরের মুখ শুকিয়ে গেল।

'আপনি কি খারাপ কিছু সাসপেক্ট করছেন?'

ডাক্তার গুপ্ত চশমাটা পরলেন। ফাইলটা সরিয়ে রেখে বড় একটা হলুদ খাম থেকে একটা স্লাইড বার করে আলোতে মেলে ধরে বললেন— 'সাসপেক্ট আগেই করেছিলাম। তবে সমস্ত কিছু হাতে না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। তাই ওয়েট করছিলাম। এখন জানাচ্ছি, ইটস্ আ কেস অফ ব্রেন টিউমার।'

— ব্রেন টিউমার!— আদিত্য আর টুপুর সমস্বরে বলে উঠল।

— অ্যাডভান্সড স্টেজ। খুব দ্রুত বাড়ছে। খোলাখুলি বলছি, বিকজ বোথ অফ ইউ আর অ্যাডাল্ট স্, ইন মোস্ট কেসেস এসব ম্যালিগন্যান্ট হয়।

— ম্যালিগন্যান্ট!— টুপুরের গলা বুজে এল।

— তাহলে ... ইয়ে মানে আমরা এখন... আদিত্যর দিশেহারা ভাব কাটছে না।

— বায়োপ্সি তো করতেই হবে। ম্যালিগনান্সির স্টেজটা বুঝতে হবে, তারপর অপারেশন।

— পেশেন্ট বাঁচবে তো?— আদিত্য জানতে চাইল।

— ট্যু আর্লি টু সে।

— এরা কি অ্যাট অল বাঁচে?

— হ্যাঁ, বাঁচে। ... আমি নিজেই দেখেছি।

— আপনি নিজেই তো অপারেশন করবেন?

— করতাম।

— মানে?

— পরশু আমি লণ্ডন চলে যাচ্ছি। একটা কনফারেন্স আছে।

— সেকি! আমরা তাহলে...

— বিচলিত হবেন না। সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আমার বদলে অপারেশন করবেন ডাক্তার ত্রিপাঠি। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

আদিত্য ঘাড় নাড়ল— 'শুনেছি। বিখ্যাত সার্জেন।'

চেম্বারের বাইরে আসতেই টুপুর কান্নায় ভেঙে পড়ল। আদিত্য ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল— 'হচ্ছেটা কি? বি স্টেডি।'

টুপুর নিজেকে কোনওমতে সামলে নিয়ে বলল— 'তুমি পিসাইকে একটা ফোন কর।'

— নাকি পিসিকে?

— না, না, পিসাইকে। যা বললাম তাই করো।

বাধ্য হয়ে মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগল আদিত্য। কিন্তু লাভ হল না কিছু। সুইচড্ অফ।

কোল্ড ড্রিঙ্কের দোকানের পাশেই একটা টেলিফোন বুথ। মোবাইল ফোন চালু হবার পর থেকে এসব দোকান আজকাল প্রায় ফাঁকাই যায়। হাতঘড়িতে সময় দেখল আদিত্য। বেলা বারোটা বেজে পাঁচ। টুপুরকে বলল— 'মুকুটকে একটা ফোন করবে এখান থেকে?'

— ওদের ওখানে এখন অনেক রাত। যদি শুয়ে পড়ে?

— দেখি না, একবার ট্রাই করে।

— টাকা আছে?

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। পার্স খুলে একটা পাঁচশো টাকার নোট দেখাল। তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কের দাম মিটিয়ে দিয়ে টুপুরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ফোনের বুথে।

ডায়াল করতেই টুপুর হাত বাড়িয়ে বলল— 'আমি কথা বলব।'

বাধ্য হয়ে আদিত্য সরে দাঁড়াল।

— হ্যালো, দাদা? আমি টুপুর বলছি রে!

রিসিভারের ফাঁক দিয়ে মুকুটের গলা শোনা গেল— 'হ্যাঁ, বল্। ...এত রাতে?'

— শুয়ে পড়েছিলি?

— না, একটা পার্টি ছিল। এই তো ফিরলাম। কাল এখানে একটা ছুটি আছে।

— শোন না, বাপির না শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।

— কী হয়েছে? কবে হয়েছে?

— হয়েছে ... মানে গত তিন-চারমাস ধরেই...

— সেকি! আমাকে মা কিছু জানায়নি তো!

— শোন না... তুই অত দূরে আছিস তো... হয়তো সেইজন্য...

— এখন ওরা কোথায় আছে? আমারও অনেকদিন ফোন করা হয়নি.... লাস্ট মান্থে একবার করেছিলাম.... তখনও তো...

— কলকাতায়, আমাদের কাছে।

— ডাক্তার দেখিয়েছিস? কি বলছে?

— বলছে...। — ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল টুপুর।

— হ্যালো... হ্যালো, এই কাঁদছিস কেন?

— দাদা। — কান্নায় স্বর বুজে এল টুপুরের।

এদিকে বিল চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে দেখে আদিত্য টুপুরের হাত থেকে একটু জোর করেই রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বলল— 'আমি আদিত্য বলছি, দাদা।'

— হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলো তো?

আদিত্য যা বলার প্রায় সবই বলল। আর গোপন করা উচিত নয়। যতই প্রবাসী হোক, সেই ছেলে, আদিত্যর চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশি।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ফোন ছেড়ে দিয়ে পয়সা মিটিয়ে টুপুরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আদিত্য।

যতক্ষণ ফোন করছিল, টুপুর প্রায় কিছুই মন দিয়ে শোনেনি, কেঁদেই যাচ্ছিল। এবার জিজ্ঞেস করল— 'কি বলল দাদা?'

— বলল, তোমরা এতদিন পর আমাকে খবর দিচ্ছ?

টুপুরের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল— 'ও কি রাগ করেছে?'

— একটু তো অফেণ্ডেড হয়েছেই। বিদেশেই থাক আর যেখানেই থাক, ছেলে তো নাকি!

হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ওখান থেকে ট্রেন ধরে টালিগঞ্জে নামবে।

— মাকে কি বলবে? — টুপুর জিজ্ঞেস করল।

— ভাবছি।

— আচ্ছা... দাদা আসার আগেই যদি অপারেশন করতে হয়?

— হতেই পারে। ডাক্তার গুপ্ত তো কালকেই 'ইউ কেয়ারে' ভর্তি করে দিতে বললেন।

— তাহলে? ... এত বড় একটা রিস্ক... দাদাকে ছাড়া...

আদিত্য হাত ধরে টুপুরকে দাঁড় করাল। ফুটপাথের এই জায়গাটায় একটু ছায়া-ছায়া।

বলল— 'শোনো, তুমি এবার শোভাবাজারে তোমার কাকাদের খবর দাও।'

অমনিই জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে টুপুর বলে উঠল— 'আমি পারব না।'

— দ্যাখো, ছেলেমানুষি করো না।

— কি ছেলেমানুষি করছি? মেজকাকে সেদিন ফোন করে বললাম, মেজকাকিকে ক'দিনের জন্য পাঠিয়ে দাও, মা-র সঙ্গে একটু থাকুক, পাত্তাই দিল না। বলল, নিজে আসবে, তাও এলো না। ফোনে ছোটকা মাকে কি নাকি বলল! ... ও'বাড়ির সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও সম্পর্ক নেই।

টুপুরের ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল।

বলল— 'মা ঠিকই বলে। ওটা একটা অলক্ষুণে বাড়ি। যেদিন থেকে ওবাড়িতে যাব, ওবাড়িতে যাব শুরু করেছে বাপি, সেদিন থেকেই শরীরটা খারাপ। কত বুঝিয়েছে মা। দরকার নেই আমাদের ওই বাড়ির। শেয়ার নেই তো নেই। চুলোয় যাক। তবু ওখানেই যাওয়া চাই। খুঁজে খুঁজে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের ফোন করা, চিঠি লেখা! মা ঠিকই বলেছে.. জানিস টুপুর, তখন থেকেই আমার মনে কু-ডাক দিচ্ছে। এত বেশি পিছুটান ভাল নয়।'

আদিত্য চুপ করে রইল। সত্যিই নিজেকে দিশেহারা লাগছে।

বলল — 'আমি নিজে যদি একবার যাই?'

— খবরদার না। ছোটকার মাথার ঠিক নেই। একবার

পিসাইকে যা-তা বলেছিল, তোমাকেও কি বলতে কি বলে বসবে।

— পিসাইকে একটা ফোন করব? তখন তো লাইনটা পেলাম না।

— করো। ... কিন্তু ওবাড়ির ব্যাপারে কোনও কথা বোলো না।

— ঠিক আছে। — বলে মোবাইলের সুইচটা টিপতে যাবে আদিত্য, এমন সময় ফোনটাই বেজে উঠল। — পিসাই।

— হ্যালো আদিত্য, বলো কি খবর? বন্ধুর ছেলের গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন ছিল, ওখানে অনেক লোকের ভিড়ে কিছু শুনতে পাব না, তাই ফোনটা অফ রেখেছিলাম। তা, কি বললেন ডাক্তার?

আদিত্য সবটাই বলল। মুকুটের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে, ও আসার চেষ্টা করছে, সেটাও জানাল।

জ্যোতির্ময় বললেন— 'ব্রততীকে জানিয়েছ?'

— না। আমরা এখনও রাস্তায়। ভাবছি, কিভাবে বলব। টুপুর তো ভীষণ কান্নাকাটি করছে।

— ঠিক আছে, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

— বাঁচালেন পিসাই!

— আর একটা কথা, শোভাবাজারে জানিয়েছ?

— আদিত্য আড়চোখে টুপুরের দিকে চেয়ে ঢোঁক গিলল। তারপর বলল — 'না, ... মানে ইয়ে ... ঠিক...'

— কিন্তু ওখানে তো খবর দিতে হবে।

— হ্যাঁ, মানে... দেখি ফোন টোন করে...

— ফোনে এসব খবর হয় না। যেতে হবে।

আদিত্যর গলা আবার শুকিয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল— 'কিন্তু কে যাবে?'

— তুমি ওবেলা ফ্রি আছ?

— তা আছি।

— তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাব।

— আপনি! কিন্তু... আপনি তো অনেক বছর হল ওবাড়িতে আর যান না।

— এখন ইমার্জেন্সি। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে চলবে না।

— পিসাই!

— শোনো, আমাদের ডিউটি আমরা করব। তারপর ওদের ডিউটি ওরা বুঝে যা করার করবে।

বিকেলে একাই এলেন জ্যোতির্ময়। বললেন— 'শোনো ব্রততী, নীলুর ব্রেনে একটা টিউমার দেখা গিয়েছে, অপারেশন করতে হবে। এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কান্নাকাটিরও কিছু নেই। তোমার দিদিভাইয়েরও টিউমার হয়েছিল ওভারিতে, কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এরকম অনেক হয়, সেরেও যায়। আর হ্যাঁ, তোমার ছেলেকেও খবর দেওয়া হয়েছে, সেও আসার চেষ্টা করছে। আমি এখন আদিত্যকে নিয়ে একটু বেরোব, কাল নার্সিং হোমে ভর্তির সব ব্যবস্থা করে ফিরব। রাত হতে পারে। ততক্ষণ টুপুর তোমার কাছে রইল।... চলো আদিত্য।'

টুপুর দরজা আটকে দাঁড়াল। বলল— 'উহুঁ। চা খেয়ে যেতে হবে।'

হেসে ফেললেন জ্যোতির্ময়। বললেন— 'ঠিক আছে, দে।'

চা খেয়ে বেরিয়ে গেল ওরা দুজনে। প্রথমে শোভাবাজার, সেখানে মিনিট দশেক, তারপর নার্সিং হোম, প্ল্যানটা মোটামুটি এরকমই।

ওরা মা-মেয়ে গিয়ে বসল বিছানায়, রণদেবের পাশে। ঝিম মেরে শুয়ে আছে মানুষটা। ব্রততী মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। টুপুর বলল— 'মা, বাপির মোবাইল সেটটা কোথায়?'

— ওই তো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। বোধহয় সুইচ অফ। আমি তো আমার নিজেরটাই ব্যবহার করছি।

— তোমার সেটে সেনকাকু-বোসকাকুদের নাম্বার স্টোর করা আছে?

— আমারটায় নেই। তোর বাপিরটায় আছে। কেন?

— ওঁদের একবার ফোন করব?

— কর।

রণদেবের সেট্‌টা নিয়ে বাইরের একফালি বারান্দায় চলে এল টুপুর। চালু করে নাম্বারগুলো খুঁজতে যাবে, হঠাৎই ওটা বাজতে শুরু করল আর স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা নাম্বার আর তার সঙ্গে অদ্ভুত একটা নাম— অ্যাংগ্রি ম্যাডাম।

আশ্চর্য! ইনি কে?

— হ্যালো!

— রণদেব নেই?

— কি দরকার, বলুন?

— আপনি কে? ওর ওয়াইফ?

— না, মেয়ে।

— ও, আপনি... মানে... তুমি কি এখন ভিলাইতে?

— না। বাপি এখন কলকাতায়, আমার কাছে।

— একটু কথা বলা যাবে?

— স্যরি! সম্ভব নয়। উনি খুব অসুস্থ।

— অসুস্থ! কি হয়েছে?

টুপুর সংক্ষেপে বলল।

— অপারেশন কোথায় হবে?

— উই কেয়ার নার্সিং হোম, নর্থ ক্যালকাটা।

— উই কেয়ার?

— হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

— ঠিক আছে। ওখানেই দেখা হবে।

লাইনটা কেটে দিয়েছেন মহিলা। ... অদ্ভুত তো! নাম্বার খুঁজতে খুঁজতে টুপুর দেখল, সবার নাম্বারই নামে তোলা আছে, শুধু এঁরই কোনও নাম নেই। শুধু 'অ্যাংগ্রি ম্যাডাম'! মানে?

টুপুর যখন ভিলাইতে ফোন করছে, তখন এই নামহীনা মহিলার ফোনটা বেজে উঠল আর একবার।

— আমি দিগ্বিজয় সিং কথা বলছি, ম্যাডাম।... আমার শোভাবাজার কেসের ফাইলটা আপনি কিন্তু এখনও ছাড়লেন না।

— একটু দেরি হবে। — লাইনটা কেটে দিলেন নীলা সামন্ত।

বায়োপ্সি রিপোর্টটা দেখে ডাক্তার ত্রিপাঠি বললেন— 'ঠিক আছে। লেগে পড়া যাক।'

অনেক যুদ্ধের সৈনিক বলেই হয়তো ওঁর মুখে সবসময়ই একটা মৃদু হাসি লেগে থাকে। ব্যাকব্রাশ করা একমাথা কাঁচা-পাকা চুল, গায়ের রং সাহেবদের মতো ফর্সা, লম্বায় প্রায় ছ-ফুট।

জ্যোতির্ময় জিজ্ঞেস করলেন— 'কেমন বুঝছেন?'

— ফিফটি-ফিফটি।

— তাহলে কবে অপারেশন করছেন?— জ্যোতির্ময় জানতে চাইলেন।

— দিন দুয়েকের মধ্যেই। শুধু আর কয়েকটা রুটিন টেস্ট করাত হবে। .... পেশেন্টের ছেলে....

— আসতে চেষ্টা করছে, ইউ এস এ থেকে। তবে অপারেশনের আগেই এসে পৌঁছতে পারবে কিনা জানি না।

— ঠিক আছে, লেট হিম কাম। নয়তো আপনাদের মধ্যেই কেউ বণ্ডে সই করে দেবেন।

জ্যোতির্ময়কে এবার একটু চিন্তিত দেখাল। বললেন— 'বুঝতেই তো পারছেন, একটা ক্রিটিকাল ব্যাপার...'

— ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, — ডাক্তার ত্রিপাঠি বলে উঠলেন, — 'এই পেশেন্টের ব্লাড গ্রুপটা কিন্তু খুব রেয়ার, ব্লাড ব্যাংকে পাওয়া খুব শক্ত।'

— তাহলে?— আদিত্যর মুখ শুকিয়ে গেল।

— বেস্ট হয়, আপনাদের মধ্যেই যদি কারও সঙ্গে মেলে।

আদিত্য আর জ্যোতির্ময় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। জ্যোতির্ময় বললেন— 'গ্রুপটা কি বলুন, দেখছি।'

ব্রততী আর টুপুর বাইরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল। জ্যোতির্ময়ই যা বলার বললেন। টুপুর বলল— 'পিসাই, তোমাকে বলা হয়নি, তুমি একবার ক্যাশ কাউন্টারে দেখা করো।'

— কেন রে... কোনও ঝামেলা টামেলা?'

— না, না। ওরা একটা অদ্ভুত কথা বলছে।

— কিরকম?

— বলছে, আপনাদের একটা রেকমেণ্ডেশান আছে। শুধু ডক্টরস্ ফি আর মেডিসিনের দাম দেবেন। নার্সিং হোম চার্জ কিছু লাগবে না।

— সে কি রে? একি রামরাজত্ব নাকি? কার রেকমেণ্ডেশান?

— সেসব তো কিছু বলছে না।

— আদিত্য, এসো তো দেখি!

তিনটে ক্যাশ কাউন্টার, আর তার সবকটাতেই ভিড়। ওরা কি করবে, কাকে জিজ্ঞেস করবে ভাবছে, এমনসময় উর্দিপরা একজন কর্মচারী এগিয়ে এসে বলল— 'কি দরকার, বলুন?'

জ্যোতির্ময় বললেন— 'আচ্ছা, ম্যানেজারের সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?'

— আসুন।

ম্যানেজারটি বয়েসে নবীন। ওদের দু'জনকে ঢুকতে দেখে বললেন— 'কি ব্যাপার, বলুন?'

জ্যোতির্ময় বললেন।

— বেড নাম্বার?

— তিনশো ছয়। আই সি ইউ।

— নাম?

— মিস্টার রণদেব ব্যানার্জী।

— ভিলাইয়ের পেশেন্ট তো?

— হ্যাঁ।

— ক্যাশ কাউন্টার ঠিকই বলেছে। একটা রেকমেণ্ডেশান আছে।

— আশ্চর্য! কিন্তু কার?

— ম্যানেজার হাতজোড় করলেন।

— মাপ করবেন, সেটা বলতে নিষেধ আছে।

আদিত্য, যতই হোক ব্যাঙ্কের অফিসার। মুচকি হেসে বলল— 'কিছু মনে করবেন না, এরকম রেকমেণ্ডেশান থাকলে তো আপনাদের বিজনেস লাটে উঠবে।'

ম্যানেজারটিও পাল্টা হেসে বলল— 'না, তার কোনও চান্স নেই। যিনি বলেছেন, তিনি কখনওই কাউকে রেকমেণ্ড করেন না। ওসব ওঁর ধাতেই নেই।... বরং আপনাদের কোনও অসুবিধা হলে আমাকে সরাসরি জানাবেন।'

ফিরে এসে ওরা দেখল, শোভাবাজার থেকে সত্যদেব অর্থাৎ বিলু এসে বসে আছে। তার হাবভাব অনেকটা ধরা-পড়া চোরের মতো। ব্রততীর দিকে তাকাতে পারছে না, ব্রততী নিজেও মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে। যা দু-একটা কথা টুপুরের সঙ্গেই বলছে।

বিকেলে বিশ্বদেব এল সীমাকে সঙ্গে নিয়ে। তার কিছু পরে করবী। বিশ্বদেবেরও মুখের চেহারা খুব সুবিধার নয়। ব্যাপারটা যে এতটাই ঘোরালো হয়ে উঠবে, কেউই বুঝতে পারেনি।

ফলে, বিশ্বদেবকেই এখন ব্রততীকে বলতে হল— 'বউদি, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, ওখানেই থাকবে।'

ব্রততীর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল— 'না, ভাই, একা আর যাব না ওবাড়িতে। যদি কখনও

যাই, তোমার বড়দাকে নিয়েই যাব। তোমরা সেই প্রার্থনা করো।'

বিশ্বদেব মাথা নিচু করে রইল।

সীমা বলল— 'আমি ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরে মানত করেছি, দিদি। বড়দা নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।'

বিশ্বদেব টুপুরকে বলল— 'অপারেশনের দিন আমরা সারাক্ষণই থাকব। আমি ছুটি নিচ্ছি অফিস থেকে। মুকুটের কি খবর?

— আসতে চেষ্টা করছে।

— যদি দরকার হয়, বলিস, রিস্ক-বণ্ডে না হয় আমিই সই করে দেব।

ব্রততী বলল— 'তার দরকার নেই, দুলু। আমিই সই করব। যা হবার আমার হাতেই হোক।'

এর মধ্যে আরেকজন ভদ্রলোক এসে টুপুরকে বললেন— 'আমি একবার রণদেব, মানে নীলুর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

— আপনি?

— আমি ওর খুব ছোটবেলার বন্ধু। শোভাবাজারেই আমার বাড়ি, একই পাড়ায়।

বিশ্বদেব দেখল, সতুদা! কার কাছ থেকে খবর পেয়েছে কে জানে!

টুপুর বলল— 'বাপিকে ইনসেনটিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। কারও ঢোকা বারণ। শুধু আমাকে আর মাকে ছাড় দেওয়া আছে।'

ভদ্রলোক হতাশ হয়ে বললেন— 'তাহলে দেখা হবে না?'

— এমনিতেই বাপির সেন্স খুব একটা নেই। দেখলেও আপনাকে হয়তো চিনতে পারবেন না। তবে খুব যদি ইচ্ছে হয়, কাঁচের পার্টিশনের আড়াল থেকে দেখে আসতে পারেন।

ভদ্রলোক নিজেকে যেন একটু গুটিয়ে নিয়ে বললেন— 'না, থাক। তোমার মা...?

— এই তো, এখানেই আছেন। মা, দ্যাখো তো, বাপির ছোটবেলার বন্ধু, চিনতে পারো কিনা?

ব্রততী মাথা নাড়ল। চিনতে পারছে না।

— বউদি, আমার নাম সতু। আমরা একসঙ্গে থিয়েটার করতাম। আমাদের একটা গ্রুপও ছিল।

— ও, আচ্ছা, বুঝেছি। আপনার সঙ্গেই তো ... কি যেন... অমিতেশ অ্যাকাডেমি করার কথা বলছিল?

— হ্যাঁ, বউদি। আমি কাজ এগিয়েও রেখেছিলাম। আপনি আসুন না আমার বাড়িতে, আপনাকেও দেখাব।

বিশ্বদেব এগিয়ে এসে বলল— 'সতুদা, এটা হসপিটাল। এখানে ওসব কথা বলার জায়গা নয়।'

টুপুর দেখল, মেজকার মৃদু ধমক খেয়ে ভদ্রলোকের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। ... পাগল আছে লোকটা! বাপিও তো একসময় থিয়েটার-পাগল ছিল, এরই মতো।

টুপুর বলল— 'আপনি বসুন। চা খাবেন? আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কে চা আছে।'

— না, না।

— খান না, একটু।

প্লাস্টিকের একটা কাপে একটু চা ঢেলে দিল টুপুর। চায়ে একটু চুমুক দিয়ে লোকটা বলল— 'তোমাকে একটা কথা বলি মা। বউদি কিন্তু আমার বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারেন। আমার বাড়ি এমনিতে পুরনো, ভাঙাচোরা। তবে তারও মধ্যে একখানা ঘর আমি সাফসুতরো করে রাখি। প্রতিবছর ওই ঘরেই অমিতেশবাবুর জন্মজয়ন্তী পালন করি। বউদিকে আমি না হয় ওই ঘরটাই ছেড়ে দেব।'

টুপুর দেখল, পাশে দাঁড়িয়ে মেজকার মুখ থমথম করছে। আবারও যদি কিছু বলে বসে, তাই টুপুর নিজেই বলে উঠল— 'ঠিক আছে, কাকা। মা'র যদি ইচ্ছে হয়, আপনাকে জানাব।'

এরই মধ্যে আদিত্য, জ্যোতির্ময় ফিরে এসে জানাল, — 'সারা কলকাতা তন্নতন্ন করে খুঁজেও রণদেবের গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মাত্র ব্লাড ব্যাঙ্ক সামান্য ভরসা দিয়েছে, তবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

কথাটা শুনে এককোণা থেকে উঠে এল সত্যদেব। ব্রততী আবারও মুখ ঘুরিয়ে নিল। জ্যোতির্ময় জিজ্ঞেস করলেন— 'তুমি কিছু বলবে?'

সত্যদেব হাতছানি দিয়ে টুপুরকে একপাশে ডেকে কি যেন বলল।

টুপুর ফিরে এসে বলল— 'ছোটকা বলছে, ও রক্ত দেবে।'

সবাই অবাক হয়ে সমস্বরে বলল— 'মানে?'

— ছোটকার আর বাবার ব্লাড গ্রুপ নাকি সেম। ছোটকা এটা জানে।

ব্রততী বলল— 'ওকে একবার ডাক তো। বল, আমি ডাকছি।'

সত্যদেব গুটি-গুটি পায়ে এসে দাঁড়াতেই ব্রততী বলল— 'এই তো চেহারা করেছ! রক্ত দেবে কি করে?'

সত্যদেবের মুখে কথা নেই। টুপুর দেখল, ছোটকা মার দিকে মুখ তুলেও তাকাল না। শুধু ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল, পারবে।

.... কে বলে রণদেবের জ্ঞান নেই?

রণদেব নিজে জানেন, কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। সবই তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর চোখের সামনে, সিনেমার ছবির মতোই একেবারে স্পষ্ট। কানেও শুনতে পাচ্ছেন সব। শুধু একটাই পার্থক্য, যা দেখছেন সবই অতীতের চিত্র। নিজের জীবনটাকেই যেন আবার ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে তাঁকে। তার সমস্ত রঙ, রূপ, শব্দ, গন্ধ নিয়ে।

একটু আগেই দেখেছেন শোভাবাজার ক্রান্তি সঙ্ঘের মাঠে পায়ে বল নিয়ে ছুটে চলা এক কিশোরকে।

এরকম আরও কত খণ্ডচিত্র ভেসে উঠছে চোখের সামনে! থিয়েটার করে একদিন মাঝরাতে বাড়ি ফিরে বাবার বকুনি খাচ্ছে

আঠারো বছরের রণদেব।

দেখতে পাচ্ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজ আর তাকে ঘিরে উত্তাল রাজনীতির আসর। মিছিল, স্লোগান, ধর্মঘট, ক্লাস বয়কট। আবার এই অশান্ত কলেজ স্ট্রিটেরই অন্যপ্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন আলোকিত নাট্যমঞ্চ , আর সেখানে আলোর সমস্ত বৃত্তটুকু নিজের অধিকারে এনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বিচরমান এক সুদর্শন নাট্যব্যক্তিত্ব— অমিতেশ চট্টোপাধ্যায়।

আবার যখন খণ্ডচিত্র হয়ে ফিরে আসছে কলেজ স্ট্রিট, শুনতে পাচ্ছেন বোমার শব্দ, দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া পলায়মান জনতাকে তাড়া করে ছুটে যাওয়া লাঠি হাতে দুরন্ত পুলিশ।

যেমন দেখতে পাচ্ছেন সব কোলাহলের শেষে কলেজ স্কোয়ারের শান্ত, নির্জন কোণ, সবেমাত্র অস্ত যাওয়া সূর্য আর গোধূলির ছায়ামাখা আলো! সেই আলো শরীরে মেখে এক তরুণী তার প্রেমিককে বলছে— 'আমি তোমাকেই বিয়ে করব, রণু। সে তুমি রাজনীতি করো আর না-ই করো।'

.... নীলা! নীলা দত্ত।...

রণদেব বুঝতে পারছেন না, কোনটা আসল নীলা। দুপুরে যে আকাশের দিকে হাতের মুঠি তুলে 'ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' বলে স্লোগান দিচ্ছিল, সে নাকি যার দু-চোখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সে!

এরপর যেন সিনেমার বিরতি।

বিরতির পর পট পরিবর্তন হচ্ছে।

পরিবর্তিত সেই পটচিত্রে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে আরেকটি মুখ। ... ব্রততী। ... ওই তো, বিয়ের পর একসঙ্গে ভিলাই স্টেশনে এসে নামল দু'জনে। এক কামরার কোয়ার্টার... সাইকেল... পিছনের ক্যারিয়ারে বাঁধা টিফিনের বাক্স।

এক কামরা থেকে দু-কামরা... মুকুট... টুপুর। ওই তো... কোয়ার্টারের সামনের উঠোনে স্কিপিং করছে টুপুর, আর একটু দূরে ফাঁকা মাঠটায় রণদেবের সাইকেলটা নিয়ে সাইকেল শিখছে মুকুট।

মুকুট... টুপুর... ডোরা.... ডিক.... আদিত্য... তিতলি... আর ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে ব্রততী.... যেন একটা ফ্রেমে বাঁধা ফটো। আবার পরের ফ্রেমে শোভাবাজারের বাড়ি... বাবা..... মা.... রণদেব, বিশ্বদেব..... আর রণদেবের কোলে ছোট সত্যদেব। এই ছবিটা সাদা-কালো।

বর্তমানে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না রণদেবের। কেউ কি তাঁকে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকে? শুনতেও চান না আর কিছু। বুঁদ হয়ে অতীতের চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে হঠাৎই যেন দেখতে পান, আকাশজুড়ে মাটিতে নেমে এল প্রকাণ্ড এক জটায়ু পাখি, আর তার

পিঠ থেকে নেমে আসছে মুকুট।

পরক্ষণেই সেই অতিকায় জটায়ুর ডানার ঝাপ্‌টা লেগে উঠল ঝড়, আর সেই ঝড়ে খুলে গেল চারিদিকের সমস্ত বড় বড় জানালার কপাট। হু-হু করে এসে ঢুকল আকাশের নীল আলো। আর সেই আলোয় নীল সমুদ্রের বুকে কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন রণদেব।

... খবরটা ফুটে উঠেছিল একজনের মোবাইলের স্ক্রিনে। ম্যানেজার, উই কেয়ার, নার্সিংহোমের খবর। তাঁরই এলাকার নার্সিং হোম, বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের মেম্বারও তিনি। এইমাত্র লোকসভার প্রার্থী হিসেবে নমিনেশান পেপার জমা দিয়ে এলেন তিনি। সমর্থকদের কোলাহল, উত্তেজনা, মুহুর্মুহু ক্যামেরার ঝলসানি। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলারও ফুরসত মেলেনি। তবুও গাড়িতে উঠে মনে হল, এবার ওই ফাইলটা তাঁকে ছেড়েই দিতে হবে। আর ধরে রাখার কোনও মানে হয় না।

আয়নার সামনে আর এখন আসতে চায় না ব্রততী। নিজেকে কেমন অচেনা মনে হয়। শূন্য সিঁথির দিকে বার-বার নজর চলে যায়।

তবুও আজ জোর করে ভাল করে স্নান করিয়ে আয়নার সামনে বসিয়ে মা-র চুল বেঁধে দিচ্ছিল টুপুর।

গতকাল কালীঘাটে রণদেবের পারলৌকিক কাজ হয়ে গিয়েছে। তিনদিনেই সেরে ফেলতে হল। মুকুটের পক্ষে নিয়ম মাফিক দশ-বারোদিন পর্যন্ত থাকা সম্ভব নয়।

মুকুট নার্সিং হোমে পৌঁছানোর সামান্য আগেই রণদেবের মৃত্যু হয়। ডাক্তারদের ভাষায়— সাডেন কার্ডিয়াক ফেলিওর। অপারেশনের ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কোনও কোনও পেশেন্টের নাকি এরকম হয়। কাগজে কলমে হার্টের অবস্থা ভাল থাকলেও কিছু করার থাকে না। শরীর এক রহস্যময় যন্ত্র। কখন যে বিগড়ে যাবে বড়-বড় ডাক্তাররাও বুঝতে পারেন না।

ভিলাই থেকে শুধু সেনকাকু আসতে পেরেছিলেন। বোসকাকু-দত্তকাকুরা আর ছুটি পাননি। তবে সেনকাকুর হাত দিয়েই স্টীল প্ল্যান্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর শোকবার্তা পাঠিয়েছেন এবং সঙ্গে রয়েছে একটি চিঠি। বাংলোয় ব্রততী আরও তিনমাস পর্যন্ত থাকতে পারবে। পাহারার বন্দোবস্তও যেমন ছিল, তেমনই থাকবে, ফেলে আসা মালপত্রের জন্য কোনও চিন্তা নেই।

এই চিঠি পাওয়ার পর মুকুট ঠিক করেছে সে মাকে আপাতত নিজের কাছে নিয়ে যাবে। কি ভাগ্যি যে ব্রততী নিজের আর রণদেবের পাসপোর্ট দুটো সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। মুকুট আজ তার পরিচিত এক ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে গিয়েছে। মনে হয়,

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিন্তু, তারপর কি হবে?

মা কোথায় থাকবে? টুপুর ভাবছিল।

শোভাবাজারের বাড়িতে বাপির শেয়ার নেই, কাজেই ওখানে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ভিলাইয়ের বাংলোও আজ না হয় কাল ছেড়ে দিতেই হবে। টালিগঞ্জের এই ফ্ল্যাটও মাত্র এক বছরের কড়ারে ভাড়া নেওয়া।

তাহলে কি এক প্রবাস থেকে অন্য এক প্রবাসই হবে মা-র ঠিকানা? কিন্তু সে যে আরও সুদূর প্রবাস।

বেশ ক'দিন ছুটি নেওয়ার পর আদিত্যর আর দম ফেলার ফুরসত নেই। কালীঘাটে কাজের সময়ও সে থাকতে পারেনি। কাকা-কাকিরা, খুড়তুতো ভাইবোনেরা সবাই অবশ্য এসেছিল। ফেরার সময় মাকে ওবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধাসাধি অবশ্য কিছু কম করেনি। ছোটকা তো মা-র পা ছুঁয়ে ক্ষমাই চেয়ে ফেলল। মুখে অবশ্য একটু মদের গন্ধ ছিল ছোটকার। কিন্তু মা-র সেই একই কথা— 'দেখি। তোমরা তো রইলেই। কোথাও না কোথাও ঠাঁই মিলবেই।'

আরও একটা ব্যাপারে টুপুরের অস্বস্তি হচ্ছে। মা কিন্তু কাঁদেনি একবারও। দাদাকে দেখেও না। টিউমারের রকমটা যতই খারাপ হোক, ডাক্তার ত্রিপাঠির মতো একজনের হাতেও যে অত তাড়াতাড়ি এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, সেটা তো ওরা কেউই ভাবেনি। সেদিক থেকে বাপির মৃত্যু অপ্রত্যাশিত। আরও অন্তত দু-একটা বছর বাঁচার আশা যেখানে সবাই করেছিল, সেখানে মা'ও কি আর এরকম আশা করেনি?

অথচ, মা-র চোখে জল নেই। উল্টে সেদিনের পর থেকেই কথা ভীষণ কম বলছে। এসব তো মোটেই ভাল লক্ষণ নয়।

সেদিনের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে আর প্রায় যেতেই পারেনি টুপুর। আদিত্যকে পাঠিয়ে তিতলিকে এখানে নিয়ে এসেছে। ঘরে একটা বাচ্চা থাকলে তবু মা-র মন একটু ভাল থাকবে।

আজ সন্ধ্যের পর অবশ্য পিসাই আসবে। কিসব নাকি কথা আছে। আজ শনিবার। একটু আগে আদিত্যকে একটা ফোন করেছিল টুপুর। ও আজ বোধহয় একটু আগেই বেরিয়ে পড়তে পারবে। চেষ্টা করবে আটটার মধ্যে টালিগঞ্জ পৌঁছে যেতে। তার অনেক আগে অবশ্য দাদাও এসে যাবে। জ্যোতির্ময় নিজেই বলেছেন, ওঁরও এখানে আসতে মোটামুটি আটটা হবে।

এবাড়িতে একটা বড় অসুবিধে সময় কাটানোর একটা বড় উপকরণই নেই। বাপিরা টিভিটা নিয়ে আসতে পারেনি। তাও যতদিন বাপি ছিল, রুগীর পরিচর্যা করতে করতে সময়টা কেটে যেত। ডাক্তার, ওষুধ, ইঞ্জেকশান, সব মিলিয়ে সে একটা অন্য জগৎ।

কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। নার্সিং হোমে যাতায়াতের পাটও চুকে গেছে। মানুষটাই আর নেই।

মুকুট ফিরে এল দুপুর আড়াইটে নাগাদ। ট্রাভেল এজেন্সি সব ব্যবস্থা করে দেবে। আজ শনিবার, বুধবারেই যেতে হবে। মুকুটের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে, কোনওক্রমে বলে-কয়ে এই কয়েকটা দিন ম্যানেজ করেছে।

এবার তাহলে গোছগাছের পালা শুরু করতে হয়। মা অনেক কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি, সুতরাং কিছু কেনাকাটাও করে দিতে হয়।

বিকেলের পর ব্রততী আর তিতলিকে নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়ল টুপুর। মুকুট আর বেরোল না। ওর খুব ঘুম পাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে লেকের দিকটায় একটু চক্কর দিয়ে ওরা সোজা চলে গেল গড়িয়াহাটের দিকে।

এটা-সেটা কিনতে কিনতে সময় কাটিয়ে তারপর ঢুকল একটা আইসক্রিম পার্লারে। ফ্ল্যাটে যখন ফিরল তখন সাতটা বেজে গেছে। পিসাই আর আদিত্যর আসার সময় মোটামুটি হয়ে এসেছে।

দুজনের মধ্যে পিসাই-ই একটু আগে এল। সঙ্গে একটা ব্যাগ। ব্যাপারটা কি টুপুর ঠিক বুঝল না। তিতলিকে নিয়ে বাইরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আদিত্য'র অপেক্ষা করতে লাগল। আটটা প্রায় বাজে। টুপুরের হাতে রণদেবের মোবাইল সেটটা। অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎই ফুটে উঠল— 'অ্যাংগ্রি ম্যাডাম'। আচ্ছা ইনি তো আর ফোন করলেন না? বলেছিলেন, নার্সিং হোমে আসবেন, তাও তো এলেন না। ইনি?

আদিত্য এল সোয়া আটটা নাগাদ। ওকে দেখেই পিসাই বলল— 'এসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ব্রততী বুধবার ছেলের কাছে চলে যাচ্ছে। তবে তার আগে আমার কিছু কথা বলার আছে। তোমাদের সবারই সেটা শোনা দরকার।'

সঙ্গের ব্যাগ থেকে একটা সাদা রঙের প্লাস্টিক ফোল্ডার বার করল পিসাই। তার মধ্যে কিসব কাগজপত্র। তারপর বলল— 'ব্রততী, তুমি যদি চাও, তাহলে এসব কাগজপত্র তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

— এসব কি, জামাইবাবু?

— তোমাদের শোভাবাজারের বাড়ির দলিল।

— দলিল! তা নিয়ে আমি কি করব? ওখানে তো আমাদের স্থান নেই। ... তাছাড়া, ওবাড়ির দলিল আপনার কাছেই বা গেল কি করে?

জ্যোতির্ময় চোখ থেকে চশমাটা খুলে বুক-পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁচদুটো পরিষ্কার করতে করতে বললেন— 'এটা আমার কাছেই ছিল। কিংবা, ঠিক আমার কাছেও না। ছিল আমার বন্ধু অভিজিতের কাছে। এটা অন্য দলিল।'

ওরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল — 'মানে?'

জ্যোতির্ময় চশমাটা চোখে পরলেন। বললেন— 'তোমরা যা জানো, তার প্রায় সবটাই ঠিক। বিলু যেদিন আমাকে আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে — আপনি বাড়ির জামাই, জামাইয়ের মতোই

থাকুন, তারপর থেকে আমি ওবাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিই। নীলুকে বঞ্চি ত করে বাড়িটা ওদের দু-ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার বুদ্ধি টা আমার ভাল লাগেনি। অথচ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, ওদের চাপের কাছে শাশুড়ি অসহায়। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওরা গোপনে কাজটা সেরে ফেলতে চাইছে। নীলুকে ওরা কিছু জানাবে না। দূর প্রবাসে থেকে নীলু কিছু জানতেও পারবে না। একবার ভেবেছিলাম আমিই নীলুকে সব জানাই, কিন্তু ততক্ষণে ওরা দলিল করে ফেলেছে।'

সবাই চুপ। যেন এক রহস্যগল্প শুনছে।

জ্যোতির্ময় বলতে লাগলেন— 'তবে কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হয়তো বাড়ির দখল নেওয়ার আনন্দেই ওরা সবাই দল বেঁধে সাতদিনের জন্য পুরী বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন শুধু শাশুড়ি আর দুলু, মানে বিশ্বদেব। তবে সে সকালে অফিসে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসে। সারাটা দিন শাশুড়ি একা, শুধু একটি কাজের লোক থাকে।

আমি এই সুযোগে আবার একদিন ওবাড়ি গেলাম। একথা আজ পর্যন্ত কেউ জানত না। আমাকে দেখে শাশুড়ি কেঁদে ফেললেন। অপরাধবোধ তাঁকেও কুরে কুরে খাচ্ছিল।

কিন্তু আমি সেদিন হেস্তনেস্ত করতেই গিয়েছি। এরকম সুযোগ আর পাবো না। আর ওরা যদি অন্যায় করার জন্য জোর খাটাতে পারে, তবে ন্যায়বিচারের জন্য আমি জোর খাটালেও সেটা দোষের হয় না।

বললাম — 'আপনি আরেকটা দলিল করুন। তিনতলা পর্যন্ত নীলুর অধিকার না থাকুক, আপনি ওকে চারতলায় ঘর তোলার অধিকার দিন। আর কোনও অবস্থাতেই নীলু বা ব্রততীর অজ্ঞাতে কেউ যেন এই সম্পত্তি হস্তান্তর না করতে পারে।'

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ একজন, বোধহয় আদিত্যই রুদ্ধ স্বরে বলল— 'তারপর?'

— শাশুড়ি আমাকে ব্যবস্থা করতে বললেন। আমার বন্ধু অভিজিতকে ধরে ওই সাতদিনের মধ্যেই আমি ব্যবস্থা করে ফেলি। এই সেই দলিল, যা আমি এতদিন নিজের কাছেও রাখিনি, অভিজিতের হেফাজতেই রেখে দিয়েছিলাম। আজই অভিজিত ওর লোক পাঠিয়ে ওবাড়িতে এই দলিলের কপি পৌঁছে দিয়েছে। ভেবেছিলাম নীলু সুস্থ হয়ে উঠলে ওর হাতেই এই দলিল তুলে দেব। পারলাম না। মনে একটা দুঃখ নিয়ে সে চলে গেল। .... ব্রততী, এই দলিল এখন তোমার। তুমিই নাও।'

ফোল্ডার থেকে দলিল বার করে ব্রততীর হাতে তুলে দিলেন জ্যোতির্ময়। তারপর টুপুরের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন— 'তোর মা-র থাকার জায়গার অভাব নেই রে! তুই যদি আবার ভিলাইতে যেতে চাস, যেতে পারবি। ... ব্রততী, তুমি বোধহয় কখনও নীলুকে ওখানে কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট বুক করতে বলেছিলে?'

ব্রততীর দৃষ্টিতে বিস্ময়। একথা জামাইবাবু জানলেন কি করে?

জ্যোতির্ময় একটু হেসে বললেন— 'সেই ফ্ল্যাটও নীলু বুক করে গিয়েছে। হয়তো তোমাকে জানানোর সুযোগ আর পায়নি। কি ভেবে জানি না, ওদের অফিসে আমার ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল। গতকালই ওখান থেকে সব কাগজপত্র আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।.... টুপুর তুই এটা নে।'

টুপুর এগিয়ে এসে কাগজপত্র নিয়ে ব্রততীর হাতেই তুলে দিল। আর সেই মুহূর্তেই এতদিন ধরে যা হয়নি, তাই ঘটে গেল। দু-হাতে মুখ আড়াল করে কান্নায় ভেঙে পড়ল ব্রততী। বলল— 'আমি আর কিছু চাই না... কিছু চাই না, জামাইবাবু। আপনি শুধু আমাকে মানুষটাকে ফিরিয়ে দিন।'

টুপুর জড়িয়ে ধরল ব্রততীকে। বলল— 'মা, চুপ করো।' জ্যোতির্ময়ও উঠে এসে হাত রাখলেন ওর মাথায়। বললেন— 'চুপ করো ব্রততী।.... সব কি আর পারা যায়?'

প্লেন উড়তে শুরু করেছে।

নিচে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে কলকাতা।

কলকাতা!

দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষ করে এখানেই ফিরে আসতে চেয়েছিল মানুষটা। .... পারেনি।

তবে ব্রততী ফিরে আসবে।

তার থাকার জায়গার তো অভাব নেই।

'চিঙ্গুরাবী খোনলুপ'— প্রাচীন মণিপুরী হরফে চিঙ্গুরেনবীর বিবাহ কাহিনী।

মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যালীলা

ডঃ বলরাম চক্রবর্তী

মণিপুরীরা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জঙ্গিবাদের শিকার হওয়ার পর থেকে নিজেদের সম্বন্ধে দুটো বিশেষণ ব্যবহার করছেন— 'মিতেই' ও 'ময়াম'। 'মিতেই' বলতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বোঝাতে চান ভূমিপুত্রদের। এবং ময়াম বলতে তাঁরা বোঝাতে চান বহিরাগতদের, যারা অন্যপ্রদেশ বা প্রান্ত থেকে মণিপুরে এসেছেন।

কিন্তু মণিপুরের ভূমিপুত্র বোঝাতে গেলে মণিপুরের ইতিহাস ও ভূগোলের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মণিপুরের সমতল ভাগ ছিল বিশাল লোক্‌তাক্ হ্রদের মতো জলে পূর্ণ। আর চারদিকে ছিল পাহাড়। যেখানে পাহাড়ের ওপর বাস করত ঝুমচাষী নাগারা। সেখানে তখন অন্য মানুষদের দেখা যায়নি। এখন যাঁদের মণিপুরের ভূমিপুত্র বা মিতেই বলা হয়, তাঁরা তখন উত্তরদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় (বর্তমান গৌহাটির বেলতলা অঞ্চলের কাছাকাছি) বাস করতেন। তাদের রাজ্যের নাম ছিল মৈরাঙ এবং রাজার নাম ছিল মহীরঙ্গ।

অসমের দেবধাই পুরোহিতদের লেখা অসম বুরঞ্জীর মতে, প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রথম রাজা ছিলেন মহীরঙ্গ দানব। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল মৈরাঙ। বর্তমান গুয়াহাটির বেলতলাতে এখনও ওই জায়গাটিকে মৈরাঙ নামেই অভিহিত করা হয়। মহীরঙ্গ দানবের বংশকেও বলা হয় মৈরাঙ রাজবংশ। দানব ভাষায় 'মৈ' শব্দের অর্থ হল 'ধান'। আর 'রাঙ' শব্দের অর্থ হল খোসা ছাড়ানো। তাই মৈরাঙ কথাটির মানে হল, খোসা ছাড়ানো ধান বা চাল। এই চালই ছিল পূর্ব ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীমাতৃক অঞ্চলের দানবগোষ্ঠীর মানুষের প্রধান খাদ্য। (উৎস ঃ 'নদীমাতৃক সংস্কৃতি' বাঙালী— কাছাড়ী তানি-তিপ্রাদের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড, ডঃ বলরাম চক্রবর্তী)। এই চাল বাংলা, ত্রিপুরা, অসমের নদীমাতৃক দেশগুলির প্রধান খাদ্য। এবং তাঁদের দেশের নামের সঙ্গেও যুক্ত। যেমন উত্তর বাংলার রংপুর আসলে মহিরঙ্গপুরের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাই বঙ্গের রংপুরের মানুষ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মহিরঙ্গপুরের মানুষ আর মণিপুরের মৈরঙ-এর মানুষ সকলেই ভূমিপুত্র এবং চাল (বা তণ্ডুল) সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

এঁদের কাউকেই বহিরাগত বলা যাবে না।

তবে এদের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে মণিপুরে ছড়িয়ে পড়ার যে ইতিহাস আছে, তা এরকম— উত্তরবঙ্গের রংপুর অর্থাৎ মহীরঙ্গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মহীরঙ্গ দানবের রাজ্য। মহীরঙ্গের পরে রাজা হয়েছিলেন হাটকাসুর, তারপর রাজা হলেন সম্বরাসুর, তাঁর উত্তরাধিকারী রত্নাসুর এবং তার পরে ঘটকাসুর। অসুর বংশেরই পঞ্চ ম রাজা ঘটকাসুরের রাজত্বকালে মিথিলা থেকে জনক রাজার পুত্র নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণ করেন। এখানে মহীরঙ্গকে কোথাও অসুর, আবার কোথাও দানব বলা হয়েছে। তাঁরা সংস্কৃতভাষী দেব নয় এটা বোঝাবার জন্য। আসলে এদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন 'তানি'। এর থেকে দানব কথা এসেছে। এখানে অসুর এবং দানবকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দানবরাজ ঘটক তাঁর চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে আক্রমণকারী নরকাসুরকে বাধা দেন, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিহত হন (ডঃ ডি শর্মা, কামরূপ শাসনাবলী, পাবলিকেশন বোর্ড, অসম ১৯৮১)।

তেষামধিপতিস্তোত্র ঘটকো নাম বীর্যবান
স ক্রোধাচ্চতুরঙ্গেন বলেন মহতাযুতঃ
আসসাদ জগন্নাথং নরকং চ মহাবলম্
শিরং কিরাত রাজস্য চিচ্ছেদ নরকোবলী। (১)

ঘটকের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতনের পর নরকাসুর তাঁর সাদা হাতিটি দখল করে নেন। সেই সাদা হাতিতে চড়ে নরকাসুর দানবরাজের কিরাত প্রজাদের দিক্করবাসিনী নদী পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। অনেক দানব ব্রহ্মপুত্র নদীপথে দক্ষিণে গিয়ে সাগর পেরিয়ে দেশান্তরে চলে গিয়েছিলেন।

বিদ্রাবিতা কিরাতাস্তে সাগরান্তং সমাশ্রিতস্
হতশ্চ ঘটকাখ্যো হি কিরাতাধিপতির্মহান।। (২)

নৌকো করে যাবার সময় তাঁদের কোনও দল বা উপদল শিলচর বন্দরে নেমে নতুন দেশে বসতি স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানকার অধিবাসী নাগাদের কাছে আশ্রয় বা প্রশ্রয় না পেয়ে আরও পূর্বে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা মণিপুরের লোক্‌তাক্ হ্রদ সন্নিহিত অঞ্চ লে বসতি স্থাপন করেন ও উপত্যকার অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। পাহাড়ের ওপরে নাগারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ওই তানির সন্তানদের দেখে প্রশ্ন করতেন, 'এই অন্য মানুষেরা কে?' 'মি' মানে মানুষেরা, আতেই মানে অন্য— এই মি-আতেই শব্দটি মিতেই রূপ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে আসা আগন্তুকদের বোঝাতে লাগল, তাই আজ 'মিতেই' কথার অর্থ ভূমিপুত্র বোঝালেও, আসলে তার মানে হল অন্য বা আগন্তুক মানুষ।

এই প্রসঙ্গে চারি ছত্রের কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে—

মৃত্যুঞ্জয়ী গুরু 'অতীয়া'র মণিপুরে / কে আছ মিতেই আমার আপন / কেই বা ময়াং রয়ে গেল মোর পর /অজ্ঞানের অন্ধকারে আছড়ে চলেছি ভ্রাতৃরক্তে স্নান করে পরস্পর।

১২ই জুন ২০০৯-এর টেলিগ্রাফ পত্রিকার খবর হল— মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ৪ কিমি দূরে কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কাজ করতে গিয়েছিলেন কয়েকজন বাঙালী যুবক। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাথরপ্রতিমা ব্লকের তিনজন বাসিন্দা এবং বেহালা ঠাকুরপুকুর এলাকার একজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত এই শ্রমিকরা তাঁদের ঠিকাদার বিনোদ মণ্ডলের বানানো ঝুপড়িতে থাকতেন। এই বহিরাগতদের ঝুপড়িগুলি ক্রমশ মণিপুরী জঙ্গিদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায়। রাত তখন ৮টা। কয়েকজন কালো পোশাক পরিহিত জঙ্গিরা হানা দেয় শ্রমিকদের ডেরায়। এ কে সিরিজের রাইফেল উঁচিয়ে তারা বহিরাগত শ্রমিকদের বাইরে আসতে বলে। নিরস্ত্র নিরীহ শ্রমিকরা বাইরে বেরিয়ে এলে তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় — গৌরাঙ্গ মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডল এবং জগন্নাথ মণ্ডল। অন্য আরেকজন পরদিন সকালে হাসপাতালে মারা যান, তিনি হলেন মেহেরপুর গ্রামের বাসিন্দা সুবোধ মির্ধা। আহত পলাশ চন্দ্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মণিপুরী জঙ্গিদের এই বাঙালী বিদ্বেষ কেন?

মণিপুরকে মূল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জঙ্গিরা যে কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেশবাসী লক্ষ্য করেছেন। প্রায় ৪ বছর আগে ২০০৫ সালে ইম্ফলের প্রাচীন সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বহু শতাব্দীর ইতিহাসের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। গ্রন্থাগারিক এইচ দেবেন্দ্র সিংহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতির হিসাব দশ কোটি টাকা বলেছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রশ্ন করেছিলেন শুধু টাকার

মূল্য দিয়েই কি মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাসকে নষ্ট করার সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে? মণিপুরী তরুণ ছাত্রদের বোঝানো হয়েছিল, বাংলা হরফকে তাড়িয়ে মাইতেই হরফ আনতে হবে, তাই এই অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু এই স্বস্তিকা পত্রিকাতেই ১৪১২ সালের পূজা সংখ্যায় আমরা আলোচনা করে ও ছবি এঁকে দেখিয়েছি যে, ব্রাহ্মী হরফ কেমন করে দেবনাগরি, বাংলা ও মিতেই অর্থাৎ মণিপুরী হরফে কালান্তরে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। বাংলা হরফ ও মিতেই হরফ উভয়েরই মূল হলো ব্রাহ্মী। দেশভেদে ও কালভেদে ব্রাহ্মীরই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা রূপ নিয়েছে দেবনাগরি, মিতেই প্রভৃতিতে।

সেদিন অক্ষরের বিষয়ে যে উৎস অনুসন্ধান করেছিলাম সেই অনুসন্ধানই আজ এতগুলি বাঙালীর মণিপুরে গিয়ে নিহত হওয়ার শোক মুহূর্তেই জঙ্গিদের বোঝাতে চাই যে, যাদের তোমরা বহিরাগত বা তথাকথিত 'ময়াঙ' বলে মেরে ফেলেছ, তাদের তোমরা চিনতে পারোনি। যেমন ব্রাহ্মী অক্ষর থেকে বাংলা প্রভৃতি লিপিধারা বয়ে এসেছে, তেমনি একই পূর্বপুরুষের রক্তধারা বয়ে এসেছে পরবর্তীকালে মিতেই এবং ময়াঙ ভাগ করে কাউকে মণিপুরী বা কাউকে বহিরাগত বলার মধ্যে। কিন্তু শতশত বছর তথাকথিত মায়াঙ এবং মিতেইদের রক্ত সংমিশ্রণের ফলে যে মণিপুরী বংশ ও পদবী ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, আজও শতশত মণিপুরী সেইসব পদবী ধারণ করে নিজেদের মণিপুরী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদের কুলজী বা কুলপঞ্জী ঘেঁটে আমরা শতশত বাঙালী, ওড়িয়া, অসমিয়া, বিহারীদের এইসব বংশের আদি পুরুষ রূপে পাই। তারা ও আমরা উভয়েই ভারতবাসী। একই রক্তের একই বংশের ও রক্তধারার মানুষ। আমাদের এই আত্মীয়তা এক প্রজন্মের নয়, এক পুরুষের নয়, এ হল শতশত বছরের পুরনো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঋষি দৃষ্টিতে মণিপুরী ও অ-মণিপুরী ভারতবাসীর এই একাত্মতা অনুভব করে বলেছিলেন, 'হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বলো মুর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

জীবিকার সন্ধানে যে মুষ্টিমেয় বাঙালি আজ ইম্ফলে গিয়ে নিহত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মণিপুরী পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পুরুষ ধরে বসবাস করে আসছেন। তার বিবরণ প্রাচীনেরা দিয়ে গেছেন। আগেকার প্রাচীন মণিপুরী হরফেও বিভিন্ন পুঁথি মিলে যেমন চিঙ্গুরেনবীর বিবাহ কাহিনী বা 'চিঙ্গুরাম্বী খোনলুপ'। ১৩০২ সাল থেকে ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন মণিপুরের রাণী চিঙ্গুরেনবী ও তাঁর স্বামী মেইদুঙ্গ থাওয়ান থাপা। মণিপুরের রাণী চিঙ্গুরেনবী ছিলেন মাইবং-এর ডিমাসা দলপতি থোঙ্গা মায়াঙ খণ্ডমারির কন্যা। ডিমাসা দলপতি তাঁর কন্যার সঙ্গে যে দাস-দাসী পাঠিয়েছিলেন তাদের নাম থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাঙালীও ছিলেন। এই দাস-দাসীদের বিবরণ চিঙ্গুরেনবী বিবাহের যে পুস্তকটি 'চিঙ্গুরেনবী খোনলুপ' নামে পাওয়া যায়, তাতে তাদের নামধাম ও কাজ নিম্নলিখিত ভাবে বলা আছে— (১) লখী নামাল বা নারায়ণ— রানীর মাথা এবং চুল ধোওয়ার ব্যাপারে তদারকি করতেন। এই জন্য তার পদবী হল 'ঙগ্ইরাঙবাম'। (২) রাম নারায়ণ— তার কাজ ছিল ঘরের ছাঁচ কাটা এবং তার পদবী হল 'সাইখো'। (৩) তাইপুবামাহুত, তার পদবী হল 'মইঞ্জম'। (৪) লাকেন, তাদের পদবী হল 'তাইম্জম্'। (৫) তুলসীরাম কতিপুরাঃ তার পদবী হল 'কতেম', সে মাউত। (৬) তুলসীরাম পুরকাপা— বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষক, তার পদবী হল 'য়েনদুস্নাফ্'। (৭) স্বর্ণকার হরির পদবী হল 'স্নসাম্'। (৮) সহিস হরিনারায়ণ, তার পদবী হল 'সগোল সেম্'। (৯) তেলি দেবানন্দ, তারও পদবী হল 'সাগোল সেম্' (তার কাজ তেল বিক্রী)। (১০) সহিস আখুন, তার পদবী হল 'সাগোল সেম্'।

এই দাস-দাসীরা আবার মণিপুরের অন্যান্য মিতেইদের সঙ্গে বিবাহ করতে শুরু করে। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মিতেই মনে করেন। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে রাণী চিঙ্গুরেনবীর সঙ্গে এঁদের পূর্বপুরুষেরা মণিপুরে এসে প্রায় হাজার বছর ধরে বসবাস করায় তাদের ভাষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি ও জীবনধারা পুরোপুরি মিতেই ভাবাপন্ন। কিন্তু তা হলেও এদের পেশার সঙ্গে যুক্ত পদবীগুলি যেমন— তেলি, মালী, সহিস ও মাহুত-দের বংশগত পেশা ও নৈপুণ্যের ধারা আজও প্রবহমান। তেমনি এদের মধ্যে যুগী শ্রেণীর শিবভক্তি ও আসনাদির বিষয়টিও লক্ষণীয়, যা দেশের পশ্চিমাঞ্চলে থেকে এলেও মণিপুরের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

মাইবং-এর মানুষদের মণিপুরীরা ময়াঙ বা বহিরাগত বললেও মণিপুরের এই বংশের লোকেরা তাঁদের আত্মীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত। শুধু চিঙ্গুরেনবীর দাস-দাসীদের মণিপুরে আসার কথাই নয়, 'বামন কুন্থক' নামে একটি পুস্তকে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা মাইতুভকিয়াঙ্গ আমল থেকে যে ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন তাঁদের বিবরণ দেওয়া আছে। আমরা কিছু বংশের পূর্বপুরুষদের নাম লিখে দিলাম—

(১) পুরাইলাৎপাম শুভীনারায়ণের বংশধর বিয়ে করেছিলেন হাওকে কুমারী সোইনুকে। (২) পিতাম্বর চেরথাবা মায়ুম (মায়ুম মানে হল বংশ বা কুল) এদের আদি পুরুষ মিশ্র পিতাম্বর বিয়ে করেছিলেন ঙ্গাপ্রুম কুমারী হাওচানুকে। এঁরা এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (৩) পণ্ডা বংশে ছিল দুই স্ত্রী। একজনকে মণিপুরী বলতেন ময়ানাচৌ, অন্যকে বলতেন কুম্বিচানু (কুমারী)। রসিকা মিশ্রি পণ্ডাও এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (৪) শ্রী মায়ুমের আদি পুরুষ ছিলেন শ্রীরায়ধর। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন স্ত্রী হীরামণি এবং ছোট ভাই রাই ধর। এঁরা এসেছিলেন গুজরাট থেকে। (৫) গতি মায়ুন বংশের উত্তর-পুরুষ ছিলেন শারঙ্গি। তিনি বিয়ে করেছিলেন অ-মণিপুরী হাওচা হেওকং বংশের মেয়ে কুমারী কাম্বীকে। সারঙ্গী নেপাল থেকে এসেছিলেন। (৬) সিজাগুরুম্মায়ম্ ছিলেন পিৎনির দাম গঙ্গারামের বংশধর। তিনি কুমারী মাইসুবী দমকে বিয়ে করেছিলেন। (৭) কাকচিং রাম্বাম ছিলেন গণরামহন্তধর-এর বংশধর, যিনি ময়াঙ হেইকং কুমারী

কুমুকে বিয়ে করেন। তিনি ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন। (৮) অধিকারী মায়ুম ছিলেন রাংগেচরণের বংশধর। তিনি কুমারী হেউকি তিংবিকে বিয়ে করেন। তিনি ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন। (৯) সীতারাম মায়ুমের বংশের আদি পুরুষ হলেন সীতারাম। তিনি লাংগুম্ বংশের মেয়ে মাইতেকপিকে বিয়ে করেন। তিনি এসেছিলেন নদীয়া থেকে। (১০) বাচস্পতি মায়ুম্ বংশের এবং সঞ্জুখীলাবোইম্চা বংশের আদি পুরুষ হলেন তেন্না। তিনি কুম্বীদের মেয়ে সম্দেম্বীকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন নদীয়া থেকে। (১১) লাইখুঙ ছাঙবাস্ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন জবাসিং। তিনি বিয়ে করেছিলেন খংবাং কুমারী ধনীকে। তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (১২) ভঞ্জুম্ এসেছিলেন নদীয়া থেকে। কিন্তু তিনি রেখে যাননি কোনও বংশধর। (১৩) সাঞ্জুকি লাম্বুইচা বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন রাহু। তিনি বিয়ে করেছিলেন সমুপন কুমারী চৌবীকে। তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (১৪) সঞ্জুকী লাম্বুইশার আরেক নাম ছিল দণ্ডস্বামী মায়ুম্। এই বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন হরিদেব। তিনি বিয়ে করেছিলেন কুম্বী কুমারী সম্ফাবুকে। তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (১৫) তাখেল চাংবাম্ বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন হরি বিদ্যালংকার। তিনি বিয়ে করেছিলেন তাংখোম্বীদের মেয়ে মাইসুবীকে। তিনিও এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (১৬) সাঞ্জুকী লাম্ববোইম্চা বংশের আরেক নাম হল লেইহাউথাবাম্। এই বংশের উত্তরসূরী ছিলেন গণেশ গিরি। তিনি বিয়ে করেছিলেন অ-মণিপুরী তৌবাইদের মেয়ে হাউবীকে। তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরা থেকে। (১৭) লেহাউথাবাম্ বংশের উত্তরসূরী হলেন দামোদর। তিনি এসেছিলেন কানপুর থেকে। (১৮) কাকচিংতাবাম্ বংশের উত্তরপুরুষ হলেন পরমানন্দ। তিনি এসেছিলেন শ্রীহট্টের কুলীন গ্রাম থেকে।

(১৯) মণিপুরের পরবর্তী রাজা মাইতিঙ্গু নান্গিনফাবা। সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর সময়ে হিদাং মায়ুম্ খারাং বাম্ বংশের সূচনা হয়। এই বংশের উত্তরসূরী রোলেইরে। বিয়ে করেছিলেন খুর্ খুন্ লাইতা বংশের মেয়ে নিঙলোকে। তিনি এসেছিলেন উত্তরের হাউ থেকে এক পিপে মদ সঙ্গে নিয়ে। (২০) এই বংশ আরাম্বাম বংশে পরিবর্তিত হয় যার উত্তরসূরী ছিলেন গণকমণিরাম। তিনি বিয়ে করেছিলেন হাউচাংদের মেয়ে গৌরীকে। এর পরবর্তী রাজা মাইতেঙ্গু চালাম্বা যখন ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, তখন গৌড়দেশ থেকে যে ব্রাহ্মণেরা এসেছিলেন তাঁদের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

(২১) হাঞ্জাবা চন্দ্রশ্যাম মায়ুম্ বংশের আদিপুরুষ হলেন গোবিন্দ। তিনি বিয়ে করেছিলেন পান বংশের এক কুমারীকে। (২২) খুরাইতাবা কনৌজীমায়ুম্ বংশের আদিপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণচরণ তিওয়ারী। তিনি এসেছিলেন কানপুর থেকে। (২৩) কেই কল্যাণবর এসেছিলেন গৌড় দেশ থেকে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর স্ত্রী রঘুনাথ ও শ্রীনাথ নামে দুই সন্তানের জন্ম দেন। রঘুনাথ তিনটি মণিপুরী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। নিঙ্গোল লাক্পি নামে কাবোর মেয়েকে, পরশিকে ও সাইখম্দের মেয়ে চিন্তিকে।

রঘুনাথ ও গণক ঠেঙ্গা ছিলেন বাল্যবন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গী। গণক

মৈতে ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থের আবরণ।

ঠেঙ্গার স্ত্রী যখন মারা যান, তখন রঘুনাথ তাঁর সর্বকনিষ্ঠা ভার্যা চিন্তিকে গণক ঠেঙ্গাকে প্রদান করেন। চিন্তি তখন তিন মাসের গর্ভবতী। চিন্তি দুই সন্তানের জন্ম দেন, তাঁদের নাম হল কেশর ও জীবনাথ। তাঁরা গুরুমায়ুম্ বংশের অন্তর্ভুক্ত হন।

(২৪) এরপর মণিপুর রাজ মেইতিঙ্গু, মান্গ্যাম্বা ১৫৬২ সালে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে মণিপুরে এসেছিলেন শুধু অসম, বাংলা, ত্রিপুরা থেকেই নয়, খোদ কলকাতা থেকেও বাঙালীরা এবং তাঁরা সেখানে তাঁদের বংশধর রেখে গেছেন। যাঁরা ঘোষাটোর মায়ুম্ চান্দ্রগোস্বামীর বংশধর। তিনি অধিকাই মায়ুম্ চানুকে বিয়ে করেন। তিনি শান্তিপুর থেকে এসেছিলেন। মায়ুম্ খেরিয়া কলকাতা থেকে আসেন। তিনি লাইরিল ইয়েঙবাঙকে চানুকে বিবাহ করেন। লাইরিলের গর্ভে জন্ম হয় লালাজিতের। পরবর্তীকালে তাদের বংশ অধিকারী মায়ুমে রূপান্তরিত হয়। মায়াম্ ভোগান বাবু তিনিও কলকাতা থেকে আসেন। তিনি লেখিকা লাইরিক ইয়াঙবামকে বিয়ে করেন। তাদের সন্তানের নাম গোপাল লাকপা। পরবর্তীকালে তাদের বংশের নাম বদল ঘটে। চৌধুরী মায়ুম্ বংশে পরিণত হয়।

শুধু যে ব্রাহ্মণরা তাই নয়, ক্ষত্রিয়রাও এসেছিলেন দলে দলে ত্রিপুরা থেকে। বাংলা থেকে কাশী থেকে। তাদের কুলজী বা ইতিহাস পাওয়া যায় 'ক্ষেত্রীলোন' নামক পুস্তকে। ত্রিপুরা থেকে তিনজন ক্ষত্রিয় এসেছিলেন। তাদের নাম হল ক্ষত্রিয় দুর্গা সেন, অমসং ও ক্ষত্রি কিনেলাই (অর্থাৎ গণেশ রায়)। তাঁরা মণিপুররাজ চালম্বার রাজত্বকালে এসেছিলেন। তাঁরা ক্রমশ মণিপুরী ভাষা বলতে থাকেন

ও মণিপুরী জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হন। তাঁদের বংশধরদের বলা হয় ক্ষত্রিমায়ুম্। এদের মধ্যে বাঙালী ক্ষত্রিয়রাও ছিলেন। নদীয়ার শান্তিপুর থেকে এসেছিলেন হরসিং ও রতন সিং। কাশী থেকে এসেছিলেন মধু সিং নামে একজন ক্ষত্রিয় মণিপুররাজ গম্ভীর সিং-এর রাজত্বকালে। ক্ষেত্রিলোন পুস্তকে তাদের কথা লেখা আছে।

খনকচুয়াঙ ক্ষত্রিয় বংশের একটি বৃত্ত শুরু হয়েছে সূর্যকে নমস্কার করে। 'ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ।' যিনি পুরুষ ও নারী উভয়কেই প্রকাশিত করেন।

ত্রিপুরা ছিল মণিপুরের একটি পার্শ্ববর্তী রাজ্য। সেখানে কুম্ফী উপজাতিরা বসবাস করতেন। যে অঞ্চ লটি এখন বাংলাদেশের লাকসাম অঞ্চ ল নামে কথিত হয়। সেখানে উপজাতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে তখন যুদ্ধ বিগ্রহ করছিলেন। অবশেষে রাজা গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হলেন। তাঁর ভাই রাজা ধর্মমাণিক্য উত্তর অভিমুখে গেলেন এবং কুমিল্লায় পৌঁছালেন (৯১.১৩ পূর্ব ২৩.২৫ উত্তর) ও কুমিল্লার কুশমতির সঙ্গে ধর্মরাজ মাণিক্য বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু কুমিল্লার মন্ত্রীরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে ধর্মমাণিক্যকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন ধর্মমাণিক্য তাঁর স্ত্রী ও সহচরদের নিয়ে গোপনে কুমিল্লা ত্যাগ করে মণিপুরে চলে আসেন। এই কুম্ফী উপজাতির আগমনের ৫-১০ বছরের মধ্যে কলাইবু নামে একটি বংশ ধর্মমাণিক্যের দলে এসে যোগ দেন। যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা ত্রিপুরা থেকে এসেছেন।

তাঁরা এসেছিলেন মাবিঙ্গু কালোম্বের রাজত্বকালে ১৫২৪ থেকে ১৫৮২ খৃস্টাব্দের মধ্যে। তারা সেখানে থেকে একটি খাল খনন করেন। যেহেতু কুম্ফিরা এই খাল খনন করেছিলেন, তাই এই খালের নাম তাখেলখোম। অর্থাৎ ত্রিপুরার খাল।

মণিপুরের মানুষ ব্রহ্মদেশে যাওয়ার সময় এই খালটি ব্যবহার করে থাকেন। অ-মণিপুরী যারা ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন এবং মণিপুরেই বসবাস শুরু করেন, তাঁরা নিম্নলিখিত উপাধির ব্যবহার আজও করে থাকেন— (১) টুপালয়াম, (২) কাঙপালটাবাস (কাঙফাল্টাবাম, কঙপাল্টাবান), (৩) চানামবাম, (৪) পনগ্সাংবাম, (৫) সাগোল- সাঙবাম, (৬) ওয়াধাবাম-তারুকসিনি। ধর্ম মানিক্যেরা তথা কুম্ফী উপজাতির মানুষেরা যখন এইভাবে খাল কেটে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সংযোগ সাধন করেছিলেন— কম্বু কৌণ্ডিল্যেরা যখন ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ নিয়ে মহাভারত গড়ে তুলছিলেন, তারপরে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা খাল কেটে সেই দেশ গড়ার কাজ বন্ধ করে দেশভাঙ্গার ও স্বজন নিধনের কাজ শুরু করেছেন, মিতেই-ময়াঙ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনোখুনির মাধ্যমে আজকের জঙ্গি ও তাদের দালালেরা। এই স্বজন নিধন বন্ধ করতেই হবে।

সংবিধান ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের বর্তমান সংবিধানের আত্মপ্রকাশ ও কার্যকারিতার যাত্রা শুরু। তারপর প্রায় ৬০ বছর কেটে গেছে, ৯৩টি সংশোধনও হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হতে পারে, না হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রায় হাজার বছর পরাধীনতার পর আমাদের নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল একটি সুসংবদ্ধ সংবিধানের। এর দ্বারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আমরা আমাদের স্বকীয় শাসন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের রূপরেখা মেনে নিয়েছি। তাছাড়া সংবিধানের মাধ্যমে একই ছত্রছায়ায় মিলিত হওয়ার প্রয়াস দেখা দিয়েছে আমাদের এই নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় মহাজাতির। এই জাতীয় ঐক্যের প্রয়াস কতদূর সার্থক হয়েছে, পণ্ডিতেরা তার বিচার করবেন। তবে বিগত ৬০ বছর ধরে আমরা শুনে আসছি যে, এই সংবিধান নাকি বহু দেশের সংবিধান পর্যালোচনার পর এক অনবদ্য সৃষ্টি। বহু শিক্ষিত মানুষের কাছে শুনেছি, এই সংবিধান বা তার বিধান নিয়ে সংশয়ের কিছু নেই— তাঁদের মতে, দেশে যত গোলমাল, তার উৎস এদেশের মানুষ। এই ত্রুন্ঙ্স্তুব্দন্দ্বব্ধ -এর বাইরে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তার পর্যালোচনা করা দরকার। যে কোনও গণতন্ত্রের সংবিধানে দেখা যায়, সেই জাতির ইতিহাস, জীবনধারা, জলবায়ু, প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশেষত তার জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়াস এবং চরিত্র রক্ষার একটি দৃঢ় সংকল্পের প্রতিফলন। আমাদের সংবিধানে সেগুলির প্রয়াস আজ পর্যন্ত কতখানি সার্থক হয়েছে তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। আমরা সাধারণ মানুষ যা পেয়েছি বা পাইনি সেটুকুতেই এই প্রবন্ধের আলোচনা সীমিত রাখছি।

গত ৬০ বছরে অনেকগুলি সরকার এসেছে, গেছে। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, গণতন্ত্র কখনই বাতিল হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি। এর জন্য সংবিধানকে বাহবা দেবেন না সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অভিনন্দন জানাবেন

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা।

> “আমাদের সংবিধান ৬০ বছরে ৯৩ বার সংশোধন করার পরেও আমরা কী পেয়েছি বা পেতে পারি তা ভাববার নয় কী? অনেকেই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন, ভারতের সমস্যাগুলির মূল উৎস রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং তার মূলে আছে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। এখন ভাবতে হবে, ভোটব্যাঙ্ক গড়ার জন্য সব দলের প্রবল আগ্রহ হয় কেন? উত্তরে বলা যায়, ভোটব্যাঙ্ক গড়ার প্রয়োজন আসছে সংবিধান থেকে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত যে, ক্ষমতার মূল উৎস ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।”

তা ভাবতে হয়। দেশের উন্নতি হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। আজ দেশে খাদ্যাভাব বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নেই। যদিও ভেজালের ব্যবসা আজও চলছে রমরমিয়ে সারা দেশে। ভারী শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি অনস্বীকার্য। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, পরিবহন, তথ্য সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়েছে। বহু ভারতীয় দেশে ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। আমেরিকার প্রখ্যাত Forbes Magazine-এর পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের প্রথম দশজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় ভারতীয় স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য দিকটাও বিবেচনা করার মতো, যেমন— (১) বর্তমান লোকসভার প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের দাগী আসামী। অর্থাৎ যাঁরা আইনভঙ্গকারী তাঁরাই আইন প্রণয়ন করছেন। (২) গত কয়েক বছরে প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শহরে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা করে হাজার হাজার মানুষ খুন এবং বহু সম্পত্তি বিনষ্ট করেছে। কিন্তু একটি বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট হারাবার ভয়ে সরকার কোনও আইনানুগ প্রতিকার করে উঠতে পারেনি।

(৩) অসম্ভব লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষত, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, এবং অন্তহীন অনুপ্রবেশ চলছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি শিশু জন্মাচ্ছে। কোনও সরকারই বিগত কয়েক দশক ধরে কোনও কঠিন পদক্ষেপ নিতে সাহস করেনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট হারানোর ভয়ে।

(৪) রাজনীতি ও গণতন্ত্রের নামে বন্‌ধ, অবরোধ, জনজীবন বিপর্যস্ত করা, ধর্মঘট, খুন-খারাপি, বিশৃঙ্খলা, জনজীবনে অসভ্যতা ও অশালীনতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

(৫) গত কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষের সংখ্যার পরিবর্তন প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমান এই সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি। অনুমান করা যায়, বৃহত্তর সমাজের এক অংশ দরিদ্র থেকেই যাচ্ছে, আর অস্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। এক সম্প্রদায়ের নেতারা তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বা বংশবৃদ্ধির সমর্থন জানাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটের স্বার্থে ও সাম্প্রদায়িক তক্‌মার ভয়ে কোনওরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। এতে যে দেশের অখণ্ডতার সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, রাজনৈতিক নেতারা বুঝেও বুঝতে চান না।

(৬) গ্রামীণ বিকাশের অভাবে শহরগুলিতে লোকসংখ্যার মারাত্মক বৃদ্ধি। পরিকাঠামোর ওপর অত্যধিক চাপের ফলে শহরগুলিতে জীবনযাত্রার মান ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে। যেমন শক্ত বর্জ্য পদার্থগুলির মারাত্মক বৃদ্ধি তে তাদের অপসারণ ব্যবস্থা ও treatment প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম হচ্ছে। সমস্ত প্রধান শহরে নোংরার আধিক্য।

(৭) পরিষেবায় নিযুক্ত সরকারি কর্মীদের কর্মে অনীহা। প্রায়শই ধর্মঘট বা ওইরকম কিছু করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে জনসেবার হানি। ফলে জনজীবনে হতাশা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এরকম বহু মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য দেশের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না বা জীবনধারার বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিকারের জন্য যদি কোনও নেতৃত্বের ব্যর্থতা দায়ী হত, পরবর্তী কেউ না কেউ শুধরে উঠতে পারতেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। অতএব সমস্যাগুলির জন্য বা প্রতিকারের ব্যর্থতার জন্য নেতৃত্ব বা সংবিধান দায়ী কিনা তা ভাববার বিষয়।

বর্তমান ব্যবস্থায় পরিষদীয় গণতন্ত্র হলেও শাসক দলের একটা বড় রকমের সংখ্যাধিক্য থাকলে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী একনায়কতন্ত্রের মতো আচরণ করতে পারেন। তাঁর উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন একক সিদ্ধান্তে নেহরুজী কাশ্মীর সমস্যা আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে গেলেন। শান্তির বার্তা তুলে সামরিক শক্তিকে দুর্বল করলেন এবং চীনের আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হল। ইন্দিরাজী স্বার্থ ও গদি রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রের অমর্যাদা করলেন। রাজীবজী দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুসলিম নারীর স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়ন করলেন। আবার শ্রীলঙ্কায় সৈন্যও পাঠালেন।

দেশে বারবার পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে। জনগণ আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তারা আশাহত হয়েছে। এটা ব্যর্থ নেতৃত্বের জন্য না সংবিধানের জন্য? দেশের সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের ধারণা যে, 'সংবিধান কেবল দু-ধরনের হয়— আমেরিকার মতো 'প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম' অথবা বৃটেনের মতো 'পার্লামেন্টারি সিস্টেম'। পার্লামেন্টারি সিস্টেমে একনায়কতন্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই আমরা বৃটেনের ওই সিস্টেম নিয়ে ভালই করেছি। ভাল যোগ্য লোক নেতৃত্বে অভিষিক্ত হলে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলে আমাদের সমস্যাগুলোর সুন্দর সমাধান হবে। তাই পরিবর্তনের হাওয়া এলেই মানুষ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে দেখে যে, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। যা চলছিল, তাই চলছে ও চলবে। মানুষ ভাবতে চায় না যে পার্লামেন্টারি বা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম ছাড়া একটা 'ইণ্ডিয়ান সিস্টেম'ও হতে পারে।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আপেক্ষিক বিচারে দেখা যায় যে, সংবিধান রক্ষায় একটি স্থায়ী সুদৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জাতীয় ঐক্য, আইনের শাসন, শৃঙ্খলাবোধ, শিক্ষা ও সচেতনতার মান, সংবাদ মাধ্যমের শক্তি ও নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে সব ভারতীয় সাবালকরা শিক্ষাগত বা নৈতিক বা অন্য কোনরূপ যোগ্যতা নির্বিশেষে ভোটাধিকার পেল। সংবিধানের এই অধিকার দানে অনেকে বিহ্বল হলেন, আনন্দ করলেন, বহু বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু আজ ৬২ বছর পরেও কী জোর গলায় বলা যায়, সব সাবালক ভোটাধিকারীরা বা ভোটদাতারা লোকসভা বা বিধানসভার উদ্দেশ্য, বিতর্ক বিষয় বা আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন? সেইটুকু যোগ্যতা কী তারা অর্জন করেছে এতকাল পরে?

বৃটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আছে। কিন্তু তাদের পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। যেমন দেশটি ভারতের তুলনায় অনেক ছোট, সেখানে বৈচিত্র্যের অভাব। তাদের cultural এবং

religious unity বেশ সুদৃঢ়। সংখ্যাগুরুদের ethnic background মোটামুটি একরকমের। আর আছে তাদের নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সুযোগ্য সংবাদমাধ্যম যা গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে বা মদত দেয়। তাদের যোগ্য বলতে হয় এই বিশেষ কারণে যে, তারা অন্য কোনও দেশকে বা অন্য সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে না বা তোষামোদ করে না। তাদের প্রভূত স্বাভিমানবোধ এবং স্বদেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ আছে। আমাদের দেশের পরিস্থিতি কী একরকম বলা চলে?

আমেরিকার সংবিধান প্রায় দুইশত কুড়ি বছরের পুরনো। সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম। সংবিধান বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সব সাবালক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছিল, যেসব নাগরিকের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত তারাই কেবল ভোটাধিকার পাবে। নাগরিকদের ভোটাধিকার অর্জন করতে হবে। এজন্য 'ফেডারেল ট্যাক্স পেইয়ার' হয়ে ভোটাধিকার অর্জন করতে হত। সব পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে স্ত্রীলোকেরা অনেক আন্দোলনের পর ভোটাধিকার পেয়েছে মাত্র এই বিংশ শতাব্দীতে। দুশ বছরের বেশী পুরনো আমেরিকার সংবিধানে মাত্র ২৬টি সংশোধন হয়েছে। তার মধ্যে ১০টি সংশোধন হয়েছিল সংবিধান বলবৎ হওয়ার এক বছরের মধ্যে।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধান ৬০ বছরে ৯৩ বার সংশোধন করার পরেও আমরা কী পেয়েছি বা পেতে পারি তা ভাববার নয় কী? অনেকেই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন, ভারতের সমস্যাগুলির মূল উৎস রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং তার মূলে আছে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। এখন ভাবতে হবে, ভোটব্যাঙ্ক গড়ার জন্য সব দলের প্রবল আগ্রহ হয় কেন? উত্তরে বলা যায়, ভোটব্যাঙ্ক গড়ার প্রয়োজন আসছে সংবিধান থেকে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত যে, ক্ষমতার মূল উৎস ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। ভোটদাতাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, দরিদ্র, স্বার্থান্বেষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট। তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য বিগত কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক নেতারা প্রয়োগ করছেন তিন শক্তি। '৩-এম'। যেমন— 'মানি পাওয়ার', 'মাস্‌ল পাওয়ার' এবং 'ম্যানিপুলেশন'। এগুলো সবাই জানেন। বেশি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সবগুলি হচ্ছে দুষ্প্রবৃত্তি। এগুলির প্রয়োগ কোনও দলে বেশি আর কোথাও কম। ওই '৩-এম' অস্ত্রের দ্বারাই রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতায় আসে। একবার ক্ষমতায় এলে নেতারা যেমন দলগুলিও তেমনি আখের গোছাতে পারেন। একটি দল ক্ষমতায় আসার আগে সর্বহারা ছিল, এখন শোনা যায়, তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। সুইস ব্যাঙ্কে সর্বাধিক কালো টাকার মালিক ভারতীয়রা। নিজেদের স্বার্থ জড়িত হওয়ার জন্য শাসক দল ও তাদের সমর্থকরা ওই বিষয় নাড়াচাড়া করতে চান না। মশা-মাছির মতো রাজনৈতিক খুন চলছে দেশ জুড়ে। বিরোধীদের খুন করা এবং পুলিশকে চাপে রেখে কোনও প্রতিকার না করাটা শাসক দলের একরকম রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও নির্বাচনের সময় একটা প্রধান খবর থাকে— কতজন প্রাণ হারিয়েছেন। বিগত লোকসভায় 'নিউক্লিয়ার ডিল' নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির জন্য দশজন সদস্যকে জেল থেকে সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ আদেশবলে আনা হয়েছিল ওই ভোটে অংশগ্রহণের জন্য। জেলখাটা দাগী আসামী দশজন ছিলেন ওই মহামান্য লোকসভার নির্বাচিত সদস্য। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আবু সালেমের মতো বহু জেলখাটা অপরাধী জেল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা '৩-এম' প্রয়োগ করে বহুসময় এই অপরাধীদের জিতিয়েছেন। এগুলি কী রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন নয়? কিন্তু এর কোনও প্রতিকার সংবিধানে নেই। নিজের শাসনকালে নিজের মূর্তি ঘটা করে উদ্বোধন করার মতো নির্লজ্জতার প্রতিকার কী এই সংবিধান দিয়েছে? একটা সামান্য চাপরাসী বা কেরানীর কাজ পেতে গেলেও ন্যূনতম শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়, কিন্তু এদেশে সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে কোনও শিক্ষাগত ও নৈতিক যোগ্যতার প্রয়োজনের কথা সংবিধানে নেই। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে, অর্থাৎ চূড়ান্ত রকমের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, যার কোনও প্রতিকার সংবিধানে নেই।

আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন শক্তির উৎস যে নিরক্ষর গৃহবধূকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সারা রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের শাসক দলের ক্যাডারে পরিণত করা যায়, পুলিশ এবং সি বি আই-এর মতো সংস্থাগুলিকে দলের তল্পিবাহক করা যায়। এসবের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার মতো উপায় সংবিধানে থাকলে এত দুর্বৃত্তায়ন কী হতে পারত?

সংবিধানে যদিও শাসন ব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ, যেমন — Legislative, Executive, Judiciary অর্থাৎ আইনসভা, শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগকে পৃথক বলা হয়েছে। প্রকৃত বাস্তবে এদেশে সংখ্যাধিক্য ভাল থাকলে শাসক দল তিনটি অঙ্গের উপরই প্রভাব বিস্তার করেন বা সময়মত অধিকার প্রয়োগ করেন। আইনসভা ও শাসন বিভাগে তো তাঁদের অধিকার থাকেই, বিচার বিভাগকেও সময় সময় শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ— ইন্দিরাজীর দাবি ছিল "Committed Judges or Judiciary"। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর যে বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন তাঁকে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে একরকম নির্বাসনে পাঠানো হয়। রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্বাচিত বিচারকদের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য বাম শাসনে বামবিরোধী ব্যবহারজীবীদের কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক হওয়া সম্ভব হয়নি।

আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন শক্তির উৎস যে নিরক্ষর গৃহবধূকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সারা রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের শাসক দলের ক্যাডারে পরিণত করা যায়, পুলিশ এবং সি বি আই-এর মতো সংস্থাগুলিকে দলের তল্পিবাহক করা যায়। এসবের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার মতো উপায় সংবিধানে থাকলে এত দুর্বৃত্তায়ন কী হতে পারত?

ভোটে জিততে পারাই ক্ষমতালাভের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর হচ্ছে কে কত ভোট জোগাড় করতে পারে অর্থাৎ '৩-এম' প্রয়োগের ক্ষমতা কার কত? আর কতজনকে কে জিতিয়ে আনতে পারে তার উপর নির্ভর করছে তার নেতৃত্ব স্তরের পদমর্যাদা। আসলে ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারার শক্তিই নেতৃত্বে অভিষিক্ত হওয়ার প্রধান স্তম্ভজন্দ্ধন্দ্বজন্ত্র। তারপর আসবে মন্ত্রীত্ব বা আরও বেশী। মন্ত্রীত্ব না হলে আরও লোভনীয় বহু পদ থাকে যেমন— রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্পোরেশন বা আণ্ডারটেকিংগুলির চেয়ারম্যানের পদ ইত্যাদি। এই সব এক্সিকিউটিভ পদে এসে প্রভাব খাটিয়ে 'মানি পাওয়ারের' বিকাশ ঘটে। একজনের তো প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কালে ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা। পরবর্তী নির্বাচনে লড়ার সময় ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ তিনি দেখান প্রায় ৫০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ জিজ্ঞাসায় তাঁর উত্তর— ঠক্কুক্তন্দ্রব্ধ ন্দ্রজ্জস্পপ্ল ভ্রন্দ্বপ্তপ্তভ্রন্দ্বড়ন্দ্বজ্জক্ত। এই যদি ঘোষিত সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়, অঘোষিত সম্পদের পরিমাণ কত হবে কে জানে! আর দলই বা তার কতগুণ করে নিয়েছে কে জানে! এখন প্রশ্ন আসে, এই অর্থ কার ছিল? দুর্বৃত্তায়ন না হলে কি এই অর্থ জনহিতকর কর্মে ব্যয়িত হত না?

ফলে দেখা যায় যে, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ভোটে জেতার জন্য বা নেতা হওয়ার জন্য '৩-এম' ছাড়া বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত ঘটনা। প্রথমে প্রয়োজন আইনসভায় প্রবেশ, তারপর গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্তি মন্ত্রী, চেয়ারম্যান ইত্যাদি, সেখান থেকে নিজের দলীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি। পুলিশকে বা সিবিআইকে এক্সিকিউটিভ পদে থেকে কুক্ষিগত করা এবং পরোক্ষভাবে আইন ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার এবং লোকচক্ষে ভালমানুষী— এইগুলিই এখনকার রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও জীবনশৈলী। এখনও নিশ্চয়ই রাজনৈতিক স্তরে বিভিন্ন দলের কিছু রুচিসম্পন্ন সৎ মানুষ নেতৃত্বে আছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। দুর্বৃত্তের সংখ্যাই বেশি এবং তাদের নিরোধেরও কোনও উপায় নেই। এর ফলে দেশের বাতাবরণ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। মেধাবী ছাত্ররা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। গত ৪০-৫০ বছর ধরে অনবরত এই ঘটনা ঘটে চলেছে। দেশে যারা আছেন সৎ ও মেধাবী ব্যক্তি, তাঁরা প্রায় সবাই ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম। এর একটা প্রধান কারণ রাজনৈতিকভাবে এক্সিকিউটিভ পদে যাঁরা আছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই কৃতী মেধাবী ব্যক্তিদের পরিচালনা করার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই।

যাঁরা আজীবন '৩-এম'-এর সার্থক রূপকার ছিলেন, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, হঠাৎ মন্ত্রী হয়ে তাঁরা কী মন্ত্রীত্বের সার্থক রূপ দিতে পারেন? নিশ্চয়ই কয়েকজন সার্থক মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু দল-নির্বিশেষে গত ৫০-৬০ বছরের ইতিহাসে আমরা কী দেখতে পাই? অধিকাংশই মন্ত্রী হয়ে নিজেদের কয়েকজন পরিবার এবং দলকে বলশালী করার চেষ্টা করলেন। এতে শুধু যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উপকৃত হয়েছেন তাই নয়, সারা দেশে একটা হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন দেশে প্রায় তিরিশ কোটি বেকার। সে তুলনায় কর্মসংস্থান যথেষ্ট কম। গ্রামীণ উদ্যোগ বা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রীজ বা ব্যবসা অন্যান্য উন্নয়ণশীল দেশের তুলনায় বেশ কম— অথচ এরাই সর্বাধিক বেকারকে কাজে লাগাতে পারে। তাই উল্লেখ করছি, বিশ্ববাজারে এখন ভারতের অবদান মাত্র এক শতাংশ, কিন্তু জনসংখ্যা বিশ্বের ১৭ শতাংশ। এই বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান কী ভোটমোহনী আম আদমীকে অনুদানের দ্বারা সম্ভব?

তাহলে নিষ্কৃতির কী কোনও উপায় নেই? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আছে। সেজন্য নেতাদের সমালোচনা না করে সিস্টেমকে উন্নত ও শক্তিশালী করার কথা ভাবতে হবে। সিস্টেম অর্থাৎ সংবিধান এমন সংশোধন করতে হবে, যাতে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে। এজন্য সবাই মিলে ঠিক করলে একটা উপায় হবে না কেন? ভাবতে হবে বর্তমান সংবিধানের মধ্যে থেকেই ন্যূনতম interference দ্বারা সুযোগ্য সংশোধনী প্রস্তাব। এজন্য দেশের মনীষী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে, Mindset -এর পরিবর্তন করতে হবে। সারা দেশ জুড়ে বিতর্ক হলে একটা আলোড়ন পড়বে, তখনই কতকগুলি উপযুক্ত উপায়ের উদ্ভাবন হবে।

আলোচনা আরম্ভ করার ছলে আমি একটা প্রস্তাব রাখছি। যেমন আমরা কী পেতে চাই তা আগে ভাবতে হবে। আমার দৃঢ় ধারণা, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত "effective and complete separation of legistature, executive and Judiciary"। সংশোধনী প্রস্তাবে লেখা উচিত "No elected representative of the legislature shall hold any position in the executive branch of the Government"। এতে ভোটে লড়া বা জয়ী হওয়ার পাগলামো অনেকটা কমে যাবে। এবং নির্বাচনের খরচও কমবে। দুর্বৃত্তায়নও কমবে। দ্বিতীয়, "PM or CM should be elected by a special electorate for a fixed term only."¼ îÔÂîÂÏûþîÂ, "PM or CM shall nominate member of the cabinet from the best brains of the country and a Legislative committee shall accept or reject, and then recommend the candidate for appointment."। এভাবে একটা "Check and balance approach" হবে এবং দলমত নির্বিশেষে গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিরা প্রশাসনে আসতে পারবেন। যথোপোযুক্ত সংশোধনের জন্য বিদ্বজ্জনের চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, 'মাইণ্ডসেট' বদলাতে হবে। সারা দেশে আন্দোলন হলে একটা সুষ্ঠু প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে হবে— এই মানসিকতা চাই। জয়হিন্দ।

গফুর মিঞার স্বপ্ন পূরণ

শিবাশিস্ দত্ত

।।এক।।
ঘুটঘুটে কালো ছিল সেই রাত
ঝুপড়ির দরজাটা বন্ধ
দিনভর খেটে মরা আব্বুর
শরীরটা বুঝি নিস্পন্দ!
সাত ভাবে আম্মীর সাড়া নেই
খেটে-খুটে সেও অবসন্ন
লড়াইটা ভোর থেকে সন্ধে
নুন-ভাত জোটানোর জন্য!

আশেপাশে সবাই চুপচাপ
ঘুমে অচেতন সারা বস্তি
ছেলেটার চোখে তবু ঘুম নেই
আধপেটা খিদে অস্বস্তি!

দরমার দরজার ফোকরে
উঁকি মারে রাস্তার হ্যালোজেন
দখিনা হাওয়ার এক ঝলকে
ঘরে যেন ঢুকে পড়ে হাইড্রেন!
ছেলেটাকে রেখেছিল জাগিয়ে
সেই পচা উৎকট গন্ধ
ঘুটঘুটে কালো ছিল সেই রাত
ঝুপড়ির দরজাটা বন্ধ!
ঘুটঘুটে কালো ছিল সেই রাত
ঝুপড়ির দরজাটা বন্ধ!!

।। দুই।।
হঠাৎ একি ঘটলটা কি
ফুলকি কিসের ফুটল?
দাউ দাউ দাউ অগ্নিশিখা
লকলকিয়ে উঠল!

দমকা হাওয়ায় ছড়ায় আগুন
ছুটছে হাজার তুবড়ি
গলগল্ গল কালো ধোঁয়া
পুড়ছে যত ঝুপড়ি!

দৈত্য যেন উঠল জেগে
বাজায় মরণ ঘন্টা
চতুর্দিকে আতঙ্ক আর
প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা!

চটকা লেগে জাগল যারা
ঊর্ধশ্বাসে ছুটল
রাতদুপুরে আর্তনাদে
বস্তি জেগে উঠল!
রাতদুপুরে আর্তনাদে
বস্তি জেগে উঠল!!

।। তিন।।
আট বছরের ছোট্ট আসেফ
আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাসে
খিদের জ্বালায় নির্ঘুম চোখে

ভেগেছিল ঘরে একা সে,
কতবার ডাকে – আম্মী-আব্বু
ওঠো ভেগে ওঠো জল্দি
আগুন লেগেছে এক্ষুণি চলো
খাল থেকে এনে জল দি।

চোখের নিমেষে হুড়মুড় করে
ভেঙ্গে পড়ে ঘর পল্কা
চিৎকার করে কাঁদছে আসেফ
গায়ে আগুনের হল্কা!

আসলাম চাচা ছুটে এলো তাই
জান বেঁচে গেল ছেলেটার
ঘুমে অচেতন আব্বু-আম্মী
চাইবে না চোখ মেলে আর!
ঘুমে অচেতন আব্বু-আম্মী
চাইবে না চোখ মেলে আর!!

।। চার ।।
নদীর বুকে ছলাৎ ছলাৎ পানি
গফুর মিঞার সেই পানিতেই বাস
জাল ফেলা আর নৌকো টানাটানি –
এমনি করেই ফুরায় বছর-মাস!

ফরিদপুরে পাঁচ পুরুষের ভিটে
সেথায় এখন অন্য দখলদার
মহাজনের দেদার দেনার দায়ে
গফুর মিঞার হা-ভাতে সংসার!

গরীব জেলে হারিয়ে ভিটে-মাটি
নদীর বুকেই থাকতো সারাক্ষণ
মাঝে মাঝেই একবেলা পেট খালি
ঘুচলো না তার অভাব-অনটন!
মাঝে মাঝেই একবেলা পেট খালি
ঘুচলো না তার অভাব-অনটন!!

।। পাঁচ ।।
ফুটো-ফাটা নৌকোটা
হয়ে গেছে জীর্ণ
বুভুক্ষু গফুরের
দেহখানি শীর্ণ
লড়তে লড়তে যেন
নিস্তেজ ক্লান্ত
দু'বেলা জোটে না তাও
পেঁয়াজ আর পান্তা!

ছেঁড়া জাল ফুটো নাও
ছুঁড়ে ফেলে পদ্মায়
তাই সে করল শুরু
নতুন এক অধ্যায়!

খেয়া পাড়ে একদিন
এসেছিল নূর ভাই
হেসে বলে – চলো মিঞা
তোমার চিন্তা নাই,
বখশিস নিয়ে কিছু
করল ব্যবস্থা
গফুরকে দেখালো সে
বাঁচবার রাস্তা!

কাঁটাতার পার করে
দিলো সে সীমান্তে
কতলোক আসে রোজ
এভাবে অজান্তে!

নূর ভাই জানে সবই
এখানে কে ঘুস খায়,
কাঁটাতার টপ্‌কাতে
কারা কেন উস্‌কায়?

সেসব জটিল কথা
ভেবে নেই কাজ যে
গফুর পৌঁছে গেলো
নতুন এক রাজ্যে!
গফুর পৌঁছে গেলো
নতুন এক রাজ্যে!!

।। ছয় ।।
বোঁচকা কাঁধে গফুর হাঁটে
অবাক দুটি চোখ
জানে না সে যাচ্ছে কোথায়
হেথায় হাজার লোক
ব্যস্ত হয়ে ছুটছে সবাই
কেউ করে না সন্দ –
কোন লোকটা ভালো মানুষ
কোন লোকটা মন্দ!

ছুটতে ছুটতে ইস্টিশানে
রেল ঝমাঝম্ গাড়ি,
কে যেন কয় – আরে দাদা
উঠুন তাড়াতাড়ি!

বিন টিকিতেই পৌঁছে গেলো
দিব্বি শিয়ালদায়
আজব দেশের জনস্রোতে
গফুর মিশে যায়!
আজব দেশের জনস্রোতে
গফুর মিশে যায়!!

।। সাত ।।
আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে
কয়েকটা দিন কাটলো যেই
এই শহরের রকম সকম
বুঝে গেলো যেন অজান্তেই!

খাস্তা পাঁপড় সস্তাতে
কিনে নিয়ে ভরে বস্তাতে
বনগাঁ লোকালে ধরলো হকারি
মন ফুরফুর আনন্দেই!
এই শহরের রকম সকম
বুঝে গেল যেন অজান্তেই!!

বন্ধু জুটিয়ে দিব্বি ছুটিয়ে
মেতে ওঠে হই-হুল্লোড়ে
খোদার দয়ায় গফুর মিঞার
নসীব এবার খুললো রে,
ইউনিয়নে লিখিয়ে নাম
বাড়লো কদর বাড়লো দাম
ঝুপ্‌ড়িখানাও জুটলো একটা
খালপাড়ের ওই বস্তিতে

ছাওয়াল-বিবির সঙ্গে গফুর
রইলো সেথায় মস্তিতে!
ছাওয়াল-বিবির সঙ্গে গফুর
রইলো সেথায় মস্তিতে!!

।। আট ।।
হাতে নিয়ে রক্তিম পতাকা
ওই সিঁঞা হাঁটছেন মিছিলে
জানতে চায় না কেউ পরিচয় –
এতোকাল কোন দেশে কি ছিলে?

বড় নেতা নগেন সমাদ্দার
চুপিচুপি ডেকে বলে – ভাই রে,
করে দেবো এদেশের নাগরিক
শুধু তোর ভোটখানি চাই রে!

গফুরের চোখে ভাসে স্বপ্ন
আল্লা মেহেরবান সত্যি
হাতছানি দেয় ওর সামনেই
স্বাধীন দেশের প্রতিপত্তি!

এরপর রেশনের তালিকায়
গফুর সিঁঞার পুরো পরিবার
সচিত্র পরিচয়পত্রে
পেয়ে যায় এদেশের অধিকার!

কফাদার গফুরের পরিজন
চোখ বুজে ভোট দেয় সকলে,

ভোটব্যাঙ্ক মোটা করে এভাবেই
যুগ যুগ থাকে গদি দখলে!
ভোটব্যাঙ্ক মোটা করে এভাবেই
যুগ যুগ থাকে গদি দখলে!!

।। নয় ।।
এই যে মহান নেতা
চরিত্র অদ্ভুত
কখনও সে দানবীর
কখনও বা যমদূত!

মোটা টাকা ঢালে নাকি
ক্যাডারকে পুষতে
কাঁচা-ভোঁতা মাথাগুলো
চেবাতে ও চুষতে!

প্রমোটার মিঠুলিয়া
গোপনেতে আসিয়া
গদ গদ মুখ করে
দেঁতো হাসি হাসিয়া
নগেনবাবুর সাথে
দেখা করে রাত্রে
দু'জনে ভেজান গলা
টুং টাং পাত্রে!

বলে – দাদা যতো চান
দেবো আমি সবটাই,
নতুন প্রজেক্টের
একখানি প্লট চাই!

নগেন নেশার ঘোরে
হেসে বলে – বাবাধন,
পুকুর বুজিয়ে ক'টা
করলে যে আবাসন?

তারপর ফিস্‌ফিস্
হল কথাবার্তা
কত টাকা রফা হল
বলবে কে আর তা?

ক'দিনের মধ্যেই
কি আজব কারবার
খালপাড় বস্তিটা
হয়ে গেল ছারখার!

কত লোক গৃহহারা
কত পুড়ে মরলো
কেউ কি সঠিকভাবে
হিসেবটা করলো
আগুনের উৎসটা
কেন বোঝা গেল না?
কেন বা সময়মতো
দমকল এলো না?

সত্য তথ্য সব
পড়ে ধামাচাপা যে
খবরের কাগজেতে
হয় না তা ছাপা যে!

ক্ষতিপূরণের টাকা
দিয়ে কিছু অল্প
বস্তিবাসীর সাথে
শেষ হল গল্প!

ধীরে ধীরে সরে যায়
বস্তির ছাইপাঁশ
সেখানে গজিয়ে ওঠে
ঝক্‌ঝকে ক্যাম্পাস!

সেখানে গজিয়ে ওঠে
ঝক্‌ঝকে ক্যাম্পাস!!

।। দশ ।।
গফুর মিঞার ছোট নাতি সেই
অসহায় আসেফের
অবুঝ মনেতে বারবার ভেসে
প্রশ্নটা আসে ফের –
যার বফাদারি করেছিল দাদু
আমরণ এতোকাল,
আব্বুর হাত ধরে নিয়ে সাথে
পতাকায় লালে লাল
দীর্ঘ মিছিলে মিছিলমিছি কেন
হেঁটে হেঁটে হ'ত ক্লান্ত?
মুখোশেতে ঢাকা মুখগুলোকে তো
দাদুও চিনতো জানতো!

সবহারা সেই আসেফের দল
গোপনে এখন গর্জায়
প্রতিহিংসার ঘোর সংকট
কড়া নাড়ে তাই দরজায়!
প্রতিহিংসার ঘোর সংকট
কড়া নাড়ে তাই দরজায়!!

নকল ডান তর্জনী

দীপঙ্কর দাস

রবিবারের সকাল। রবিবার সকালে তেমন আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি না হলে নেপাল সচরাচর যতটা সম্ভব ঘরে শুয়ে বসেই কাটিয়ে দেয়। আজও সকালের যোগব্যায়াম শেষ করে নেপাল বিপিনকে এক কাপ চায়ের নির্দেশ দিয়ে এসে বসল তার কম্পিউটারের সামনে। নেট ওপেন করল নিতান্ত আলস্যে। কিন্তু সেই আলস্যকে নেপাল খুব একটা প্রশ্রয় দিতে পারল না। দেখল তার সাইটে একটা মেল এসে পড়ে আছে। মেলটা পাঠিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের রাজধানী শহর রাঁচির পুলিশের ডি আই জি (ক্রাইম) শ্রী বেদপ্রকাশ ভার্মা।

নেপাল কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে মেলটা খুলল। ডিয়ার রায়, আই অ্যাম নাউ ইন ডিপ ট্রাবল্। কাম

ইমিডিয়েটলি অ্যাণ্ড হেল্প। সিনসিয়ারলি ইওরস— বেদপ্রকাশ ভার্মা। নামটা নেপালের অপরিচিত তো নয়ই, বরং যথেষ্ট পরিচিত। তবে এটা ঠিক যে, বেদপ্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগটা অনেকদিন ধরেই আলগা হয়ে গেছে নেপালের। নেপাল ছাত্রজীবন শেষ করে কিছুদিন একটা বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছিল। সেই কাজে থাকতে থাকতে নেপাল ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস-এর পরীক্ষায় বসে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিল। নেপালের বয়স প্রায় পঁচিশ। তখন নেপাল উৎসাহে ফুটছে। অপরাধ জগতের রহস্যের জাল ছেঁড়ার অদম্য বাসনা নিয়েই নেপাল সেইসময় বিহার রাজ্যে কাজের জন্য অপশন দিয়েছিল। প্রথম পোস্টিং হয়েছিল বিহারের নালন্দা জেলায়। নেপালের সঙ্গে বেদপ্রকাশও ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে বিহার পুলিশে যোগ দিয়েছিল। বেদপ্রকাশও প্রথম পোস্টিং পেয়েছিল নালন্দা জেলার পার্শ্ববর্তী গয়া জেলায়। ফলে দু'জনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

বছর পাঁচেক এক সঙ্গে কাজ করার পর নেপাল এবং বেদপ্রকাশের পদোন্নতি ঘটে। সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ পদে প্রমোশন নিয়ে বেদপ্রকাশ চলে যায় পশ্চিম বিহারের সাসারামে। আর নেপাল দায়িত্ব পায় মুঙ্গের জেলার। কিন্তু বড় জোর বছর দুই নেপাল এস পি পদে কাজ করেছিল। পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পরদিন থেকেই নেপাল দেখছিল স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার এদেশের পুলিশের নেই। প্রধানত ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের অধীনেই তাদের কাজ করতে হয়। কোনও সরকারের অধীনে থেকে সরকারের নির্দেশে জনগণের স্বার্থে কাজ করাটাই যে কোনও সরকারি কর্মীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। নেপালও কোনও দিন একজন যথার্থ পাবলিক সার্ভেন্ট হয়ে ওঠার জন্য সংবিধান নির্দেশিত পথেই চলতে চাইছিল। কিন্তু নেপাল অচিরেই দেখল, এদেশের যে কোনও রাজ্য সরকারই গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত হয়েও গণতন্ত্রের মূল যে শর্ত— অর্থাৎ নিরপেক্ষ সরকার হয়ে থাকার দিকে আদৌ যত্নবান নয়। নিরপেক্ষতার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ দেখার দিকেই তাদের উৎসাহ বেশি। অর্থাৎ সরকার এবং দল— দুটো একাকার হয়ে যায়। আর এদেশে রাজনৈতিক দলগুলি অপরাধ জগতের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা বজায় রেখে চলে। সেই হেতু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের আশ্রয়ে থাকা অতি বড় অপরাধীর কোনও অপরাধের জন্যই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না পুলিশ। অপরাধীর কেশাগ্র স্পর্শ করার আগেই পুলিশের ওপর মহল থেকে নির্দেশ চলে আসে— আর এক পাও না এগোনোর।

এইরকম এক পরিস্থিতিতে এস পি-র পদে দু'বছর কাটানোর পরে নেপাল কাউকে না জানিয়ে পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে আসে। নেপালের কাণ্ড দেখে নেপালের দুই দাদা— ব্রজমোহন আর দ্বিজমোহন একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন। দুই ভাই একই সঙ্গে বলে উঠেছিলেন— তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল রে নেপাল? আই পি এস-এর মতো লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দেয় কেউ!

— ওটা আবার চাকরি নাকি! নেপাল নির্বিকার। বলেছিল— আই পি এস কথাটার অর্থ জানো?

— ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস। ব্রজমোহন বলেছিলেন

— হ্যাঁ। প্রথম দিকে হয়তো আই পি এস-এর অর্থ সেটাই ছিল। এখন হয়েছে— ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিস। জনসাধারণের করের টাকায় মোটা মাইনে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের তাঁবেদারি করার জন্যই আই পি এস-দের নিযুক্ত করা হয়। সাত বছর ধরে তো অনেক তাঁবেদারি করলাম। এবার নিজেকে একটু স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও।

— কি করতে চাস তুই? মেজদা দ্বিজমোহন জিজ্ঞেস করেছিলেন।

— স্বাধীন ভাবে প্র্যাকটিস করব। নেপাল বলেছিল— নিজেই একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খুলব।

যেমন কথা তেমনি কাজ। যাবতীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করে হোম ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন নিয়ে নেপাল নিজেই একটা গোয়েন্দা দপ্তর খুলে বসল। দক্ষিণ কলকাতার পাম এভিনিউয়ে তৈরি হল নেপালের অফিস।

এসব বছর দশেক আগের কথা। এই দশ বছরে নেপাল এমন কিছু সাড়াজাগানো কেস হাতে নিয়ে অপরাধীদের চিহ্নিত করেছে, যা কেবল রাজ্যেই নয়, সারা দেশে হইচই ফেলে দিতে পেরেছে। যে কোনও রাজ্যের পুলিশের যে কোনও উচ্চপদস্থ কর্মীর কাছে নেপাল এখন অপরিচিত নয়। নেপালের নিজস্ব ওয়েবসাইটও জানা হয়ে গেছে দেশের প্রায় সব রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরের।

ফলে নেটে নিজের সাইটে ভিজিট করে বেদপ্রকাশের মেল দেখে নেপাল খুব একটা আশ্চর্য হল না। পরিবর্তে প্রায় বছর দশ পরে পুরনো সহকর্মী এবং বন্ধুর সঙ্গে এভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হল দেখে নেপাল মনে মনে একটু প্রসন্নই হল।

মেল থেকে বেদপ্রকাশের মোবাইল নম্বরটা নেপাল নিজের সেল ফোনে লোড করে নিল। তারপর বিপিনকে বলল— রুবানকে একবার ডাক দে তো।

এবারের পুজো পড়েছে সেপ্টেম্বর মাসেই। অর্থাৎ গাঙ্গেয় বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার অনেক আগেই পুজো। এখন বর্ষা যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে আছে। দিন কয়েক টানা বৃষ্টির পরে আজকেই বৃষ্টি একটু থেমেছে। তবে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়নি। ফলে সকাল থেকে মেঘ রোদ্দুরের খেলা চলছে।

রুবান এবছর বিজ্ঞান শাখায় হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে উন্নীত হয়ে জয়েন্টে ভাল র‍্যাঙ্ক রাখতে পেরেছিল। ফলে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড টেলিকমিউনিকেশনে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। পুজোর ঠিক পরে রুবানের ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা। তার আগে প্রজেক্ট জমা দিতে হবে। রবিবার রুবান সকাল থেকে তার স্টাডি রুমে ব্যস্ত ছিল প্রজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে।

বিপিন এসে দাঁড়াল রুবানের স্টাডি রুমে— দাদাবাবু ছোট

কর্তা ডাকছে।

এই বাড়িটা তিনতলা। যোধপুর পার্কের এ বাড়িতে আসার আগে নেপালেরা ছিল উত্তর কলকাতায়— পাইকপাড়ায়। বাবা বেঁচে থাকতে থাতকেই ব্রজমোহন আর দ্বিজমোহন যোধপুর পার্কের এই এলাকায় চারকাঠা পরিমাণ জমি কিনে রেখেছিলেন। নেপালদের বাবা মারা যাওয়ার পর পাইকপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে যোধপুর পার্কের বাড়িটা বানিয়ে তিন ভাই দক্ষিণের বাসিন্দা হয়েছে।

তিনতলা বাড়ি। তিনতলাটা নিয়েছেন নেপালের মেজ দাদা দ্বিজমোহন। দোতলায় থাকেন বড় দাদা ব্রজমোহন। আর একতলাটা ব্যবহার করে নেপাল। তবে নেপাল যেহেতু বিয়ে থা করেনি, ঘর সংসারও নেই;এই কারণে গোটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরের প্রয়োজন পড়ে না তার। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের একটা ঘরে রুবান থাকে। ঘরের পাশেই রুবানের স্টাডিরুম। এছাড়াও গ্রাউণ্ড ফ্লোরেই আছে এবাড়ির বৈঠকখানা। নেপালের ঘর। সঙ্গে একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি। লাইব্রেরি ঘরে অপরাধ বিজ্ঞানের ওপর প্রকাশিত দেশী, বিদেশী প্রকাশকের অজস্র বই।

রুবান ব্রজমোহনের বড় ছেলে। নেপালের ভীষণ অনুরক্ত। নেপালও তার এই মেধাবী ভাইপোটিকে যথেষ্ট স্নেহ করে। সময় সময় তার গোয়েন্দার কাজে রুবানের শলাপরামর্শও শোনে। বেশ কয়েকটা কেস সমাধান করার সময় নেপাল রুবানকে সহকারি হিসেবে কাজে লাগিয়ে বিশেষ উপকারও পেয়েছে।

— ডাকছো ছোটকা?

নেপালের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে নেপাল জিজ্ঞেস করল — কবের মধ্যে তোকে প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে রে?

— দেরি আছে। পুজোর পর। সাড়া দিল রুবান।

— এবার পুজো পড়েছে কত তারিখে?

— পুজো তো এসেই গেল। রুবান বলল— আজ টুয়েন্টি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর। সপ্তমী পড়েছে টুয়েন্টি ফিফথ্।

— তাহলে টুয়েন্টি ফোর্থ নাইটে আমরা হাওড়া—হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরতেই পারি। কি বলিস! নেপাল বলল।

— কোনও অসুবিধা নেই। রুবান বলল— আমি রেডি।

নেপাল তার পরিচিত ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করল। তেইশে সেপ্টেম্বর হাওড়া—হাতিয়া এক্সপ্রেসে দুটো এসি টু টিয়ারের টিকিট রিজার্ভ রাখতে বলল।

।।দুই।।

হাওড়া-হাতিয়া এক্সপ্রেস প্রায় ঘন্টাখানেক লেট করে সকাল সাতটা দশ মিনিটে রাঁচি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। যাত্রার আগে নেপাল বেদপ্রকাশের মোবাইল নম্বরে ফোন করে কোচ নম্বর জানিয়ে রেখেছিল। এ কারণে এসি টু টিয়ার কোচ থেকে নেমেই নেপাল দেখল, প্ল্যাটফর্মে খাঁকি উর্দিধারী দু'জন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আরও দুজন সহকারি।

নেপাল আর রুবান প্ল্যাটফর্মে নামার পরেই একজন অফিসার নেপালের দিকে এগিয়ে এসে একটা সেলুট ঠুকে বলল— ইফ আ'য়াম নট রং, ইউ আর মিস্টার রায়?

— হ্যাঁ, আপনার অনুমান নির্ভুল। নেপাল করমর্দনের জন্য পুলিশ অফিসারটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

— আ'য়াম চন্দ্রশেখর কোড়ে। অফিসারটি নেপালের সঙ্গে করমর্দন সেরে নিজের পরিচয় জানিয়ে বলল— ডি এস পি। ক্রাইম ব্রাঞ্চ । রাঁচি। ডি আই জি সাহেব আপনাকে রিসিভ করার জন্য পাঠিয়েছেন।

— আমার নাম দীপক চন্দ্র ঝা। ডি এস পি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স— রাঁচি। দ্বিতীয় অফিসারটিও নেপালের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নিয়ে বলল— ট্রেনে কোনও অসুবিধা হয়নি তো!

— আদৌ নয়। হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ামাত্র সেই যে ঘুম দিয়েছি, চোখ খুলে দেখি গাড়ি মুরি জংশনে দাঁড়িয়ে আছে। নেপাল গলার নীচে হাসল। তারপর প্রসঙ্গ বদলে রুবানের সঙ্গে দুই অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিল— এর নাম রথীন্দ্র নাথ রায়। এ স্টুডেন্ট অফ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এখন ফার্স্ট ইয়ার। ওর সাবজেক্ট ইলেকট্রনিক্স। আবার আমার ভাইপোও বটে।

— ভাতিজা কাম এ্যাসিসট্যান্ট। তাই না! দীপক ঝা বলল।

— তা একরকম বলাই যায়। নেপাল সম্মতি জানাল।— আজকাল আমি ওকে ছাড়া এক পা-ও এগুতে পারি না। বিশেষ করে সাইবার ক্রাইমের কেসগুলিতে ওর সাহায্য আমাকে নিতেই হয়। কম্পিউটার সায়েন্সটা ও যেন গুলে খেয়ে ফেলেছে। নেট হ্যাকিং-এ ও একটা খুদে এক্সপার্ট।

— তাহলে তো রথীন্দ্রবাবু আমাদের যথেষ্ট হেল্প করতে পারবেন। চন্দ্রশেখর কোড়ে বলল।

— আপনাদের ডি আই জি সাহেব কী তবে কোনও সাইবার ক্রাইমের রহস্য ভেদের জন্যই আমাকে কলকাতা থেকে ছুটিয়ে এনেছেন? নেপাল লঘু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

— সেটা না হয় ডি আই জি সাহেবের মুখ থেকেই শুনবেন। গম্ভীর মুখে জবাব দিল দীপক ঝা।

রাঁচি স্টেশনের বাইরে একটা লালবাতি লাগানো টাটা সুমো দাঁড়িয়েছিল। আগে নেপাল এবং রুবান উঠল। তারপর উঠল চন্দ্রশেখর এবং দীপক। কন্সটেবল দু'জন একটি ভিন্ন জীপে উঠল। দুটো গাড়িই একসঙ্গে ছেড়ে দিল।

— আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে? নেপাল একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

চন্দ্রশেখর বলল— ডি আই জি সাহেব আপনার থাকার ব্যবস্থা

এক হোটেলে করে রেখেছেন। হোটেল সিটি প্যালেস। আপার সার্কুলার রোডের ওপর। আশাকরি আপনাদের সেখানে থাকতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

— আবার হোটেল টোটেল কেন মিস্টার কোড়ে! নেপাল বলল— মাত্র তো ক'টা দিন। আমরা পি ডব্লিউ ডি বাংলোতেই থাকতে পারতাম।

— আপনি ঠিক কেন এবং কতদিনের জন্য এসেছেন আমি জানি না। তবে ডি আই জি সাহেব আমাকে বলেছেন, আপনার রাঁচি আসার বিষয়টা যতখানি সম্ভব গোপন রাখতে। পি ডব্লিউ ডি-র বাংলো কেন, যে কোনও সরকারি ভবনে আপনার থাকার বন্দোবস্ত করা হলে আর বিষয়টা গোপন থাকতো না। জানাজানি হয়ে যেত যে, ফেমাস প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার মিস্টার রায় ডি আই জি সাহেবের নিমন্ত্রণ পেয়ে রাঁচিতে এসেছেন। চন্দ্রশেখর কোড়ে বলল।

— জানাজানি হলে ক্ষতি কি? নেপাল প্রশ্ন করল।

— দুশমনরা অনেক সতর্ক হয়ে পড়বে।

— দুশমন কারা?

— আপনাকে তো আগেই বলেছি মিস্টার রায় যে, আপনাকে ঠিক কোন দুশমনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ডি আই জি সাহেব ডেকে এনেছেন সেকথা ডি আই জি সাহেবের মুখ থেকেই শুনবেন। আবার ভারি পাথুরে গলায় সাড়া দিল চন্দ্রশেখর কোড়ে। তারপর বলল— এখন আমাদের ঘরে বাইরে সর্বত্র দুশমন।

— বাইরের দুশমন না হয় বুঝলাম। কিন্তু ঘরের দুশমন তো বুঝলাম না।

— ধীরে ধীরে বুঝবেন।

আপার সার্কুলার রোডের লালপুর মোড় পেরিয়ে গাড়ি একটা মাঝারি মাপের হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। দীপক ঝা এবং চন্দ্রশেখর কোড়ে আগে নামল। পেছন পেছন নামল নেপাল এবং রুবান।

দুই ডি এস পি-কে দেখে হোটেলের ভেতর থেকে মালিক কাম ম্যানেজার নীতিশ যাদব একরকম ছুটে বেরিয়ে এল। হাতজোড় করে দুই ডি এস পি সাহেবকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে এসে বসাল। চন্দ্রশেখর নেপাল এবং রুবানকে উদ্দেশ্য করে একটা খালি সোফা দেখিয়ে বলল— আপনারা বসুন স্যার। আপনাদের লাগেজ আপনাদের ঘরে পৌঁছে যাবে।

দীপক ঝা নীতিশ যাদবকে উদ্দেশ্য করে বলল— এই ভদ্রলোক আমাদের বিশেষ মেহমান। ডি আই জি সাহেবের জিগরি দোস্ত। আর এ হচ্ছে তার ভাতিজা। ক'দিনের জন্য রাঁচি ঘুমনে আয়া। আপনি খেয়াল রাখবেন।

— হায় রাম! ডি আই জি সাহেবের দোস্ত আমার মেহমান হয়ে এসেছেন। আর আমি কিনা বে-খেয়ালে থাকব! যাদব দুই হাত কচলাতে কচলাতে দীপক ঝা-কে বলল— আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমার দিক থেকে সামান্য তকলিফ পৌঁছাতে দেব না। কথা শেষ করে নীতিশ যাদব এক হাঁক ছাড়লেন— রামলাল, হেই রামলাল!

রামলাল নামক হোটেল কর্মীটি সম্ভবত হোটেলের ভেতরে কোনও ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল। নীতিশ যাদবের গলা শুনে সাড়া দিল— আ রহি হ্যায় মালিক।

রামলাল একরকম ছুটে হাজির হল হোটেলের লাউঞ্জে। নীতিশ যাদব বলল— গাড়ি থেকে এই সাহেবদের সামানগুলি দুশো তিন নম্বর ঘরে পৌঁছিয়ে দাও।

রামলাল টাটা সুমো থেকে নেপাল এবং রুবানের ব্যাগ দুটো মাথায় চাপিয়ে দোতলার দুশো তিন নম্বর ঘরে নিয়ে গেল।

— তাহলে এবার আমরা চলি! চন্দ্রশেখর নেপালের সঙ্গে বিদায়ের করমর্দন করে বলল— আপনারা বিশ্রাম নিন। পরে দেখা হবে।

চন্দ্রশেখর এবং দীপক, দুই ডি এস পি চলে গেল।

— চা নেবেন? নীতিশ যাদব জিজ্ঞেস করল।

— হলে খারাপ হয় না। নেপাল সাড়া দিল— সকাল থেকে চা খাওয়া হয়নি একবারের জন্যও।

নীতিশ যাদব রিসেপশন কাউন্টারে রাখা ফোন থেকে সম্ভবত হোটেলের কিচেনে ফোন করল। ওপার থেকে সাড়া ভেসে এলে যাদব বলল— দু কাপ চা ভেজো রিসেপশনে।

যাদব ফোন ছেড়ে নেপালের সামনে দাঁড়িয়ে বিগলিত হাসি হেসে বলল— রাঁচি বেড়াতে এসেছেন, তাই না?

— হ্যাঁ। নেপাল ছোট জবাব দিল

— সাইট ভিজিট করবেন নিশ্চয়? নীতিশ যাদবের আবার সেই হাসি।

— এখানে দেখার মতো কি আছে? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— কি নেই বলুন তো? ঝাড়খণ্ড স্টেটটাই তো একটা টুরিস্টদের প্যারাডাইস। কেবল রাঁচি টাউনেই টুরিস্ট স্পট যে কত আছে বলে শেষ করা যাবে না। টেগোর হিল, রাঁচি হিল, কাঁকে রোডে পাগলাদের হসপিটাল, হেতালপুর ড্যাম। এছাড়া দশম ফলস্, হুণ্ডু ফলস্, জনা ফলস্ তো আছেই। এখন তো বর্ষার শেষ। হুণ্ডু, জনা, দশম ফলস্ জলে পরিপূর্ণ। রাজারাপনায় গিয়ে দামোদরের উৎস দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

— বাববাঃ এ যে দেখছি স্বর্গরাজ্য। নেপালের গলায় চাপা রসিকতা খেলে গেল। সেই ঢঙেই নেপাল বলল— তাহলে তো রাঁচিতে সারা বছরই টুরিস্টদের প্রেসার লেগে থাকে। আপনার হোটেলেও টুরিস্ট কম আসেন না।

— একসময় আসতো। তবে এখন আর তেমন আসে কৈ! নীতিশের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল— হোটেল এখন কাফি নুকশান মে চলে হুজুর।

— কেন? হঠাৎ করে টুরিস্টদের সংখ্যা কমে গেল কেন? নেপালের গলায় কৌতূহল।

— রাঁচি জিলাটাই এখন ভীষণ ডিস্টার্বড। ওই টেরোরিস্ট না আতঙ্কবাদী— কী যেন বলেন আপনারা— ওদের কার্যকলাপ এদিকে ভীষণ বেড়ে গেছে। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও ওই

আতঙ্কবাদীদের টিট্ করতে পারছে না। এরকম অবস্থায় কে আর বেঘোরে প্রাণ দিতে রাঁচি বেড়াতে আসবে বলুন স্যার!

নেপালের সেলফোনটা বেজে উঠল। নেপাল দেখল সেলফোনের স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে বেদপ্রকাশের নাম। নেপাল সুইচ টিপে কানে ধরল ফোন— হ্যালো!

।। তিন।।

এতক্ষণ বেশ গরমই ছিল। রোদ ছিল যথেষ্ট তেজি। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাঁচি শহর নাকি আগে এতটা উষ্ণতা দেখেনি। ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের পর, রাঁচিকে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার পথে রাঁচি শহরের আশপাশে যেমন ব্যাপক হারে গাছপালা কাটা হয়েছে, তেমনি পর্যাপ্ত সবুজ তৃণভূমি ধ্বংস করে নির্মিত হয়েছে বহুতল আবাসন, শপিং মল, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স। এর ফলে নাকি বছর কয়েক ধরে রাঁচি শহরের উষ্ণতা অনেকটাই বেড়ে গেছে।

তবু এর মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে গুমোট ভাবটা অনেকটাই কেটেছে। স্নান-খাওয়া সেরে নেপাল এবং রুবান যখন সিটি প্যালেস হোটেল থেকে বেরিয়ে এল তখন বেলা প্রায় এগারোটা। আজ মহাসপ্তমী। স্টেশন থেকে হোটেলে আসার পথে টাটা সুমোর জানলা দিয়ে রুবান দেখেছিল, স্টেশন সংলগ্ন রেল কলোনীতে পুজো হচ্ছে। এছাড়াও গাড়ি যখন আপার মার্কেটের কাছে পৌঁছেছিল তখনও সেখানে পুজো প্যাণ্ডেল। অর্থাৎ রাঁচি শহরেও দুর্গাপূজা বেশ আড়ম্বর সহকারেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে শহরের শরীরে পুজোর কোনও ছাপ পড়ে না।

একারণেই রুবান দেখল সপ্তমীর বেলা এগারোটায় সার্কুলার রোডে গাড়ি, বাস, অটো, বিক্রান্ত ট্রেকারের প্রবাহ বয়ে চলেছে। দোকান-বাজার, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ— সবই খোলা। রাস্তায় দেহাতি মানুষজন থেকে শুরু করে সম্পন্ন শহুরে মানুষের প্রবাহে কামাই নেই।

বস্তুত পক্ষে সার্কুলার রোডটা রাঁচি পুরুলিয়া সড়কের বর্ধিত অংশ। বাংলার পুরুলিয়া থেকে যে সড়ক রাঁচি শহরে পৌঁছেছে, সেই প্রশস্ত সড়কটি রাঁচি শহরে ঢোকার পর সার্কুলার রোড নাম ধারণ করেছে। আবার এই সড়কটি আরও একটু পশ্চিমে গিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের পর থেকে নামাঙ্কিত হয়েছে রাতু রোড হিসেবে। ফলে সার্কুলার রোডটি রাঁচি শহরের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এই সড়কের দুপাশে যেমন সারি দিয়ে গড়ে উঠেছে বহু শপিং মল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, প্লাজা, তেমনি গড়ে উঠেছে বহু অফিস-কাছারিও। হাইকোর্ট থেকে শুরু করে জেলা সেশন কোর্ট— সবই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আছে ঝাড়খণ্ড সরকারের সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং। হাইকোর্টের বিচারকদের আবাসন কমপ্লেক্স, সিনিয়র আই এ এস সচিবদের বাংলো, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের বাংলোও সার্কুলার রোডের ওপর।

একসময় রুবান দেখল, গাড়ি সার্কুলার রোড ছাড়িয়ে ডান হাতে বাঁক নিয়ে রাতু রোডের ওপর উঠে গেল।

সিটি প্যালেস হোটেলে নেপালের সঙ্গে ফোনে বেদপ্রকাশের কি কথা হয়েছে, জানে না রুবান। জানার কোনও কৌতূহলও নেই। বেশ কিছুদিন নেপাল কাকার সঙ্গে সে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তিন তিনটি রোমহর্ষক কেস মীমাংসা করার সময় ছোটকাকার সহকারি হিসেবে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সেই সুবাদেই রুবান জানে, অহেতুক কৌতূহল থাকাটা যোগ্য সহকারী হয়ে ওঠার পক্ষে ঠিক বাঞ্ছিত নয়। কেবলমাত্র চোখ কান খুলে চারপাশ দেখে যাও। তেমন বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নজরে পড়লে নেপাল কাকাকে জানাও। নেপাল কাকা সময় হলে রুবানকে সব বিশদে ব্যাখ্যা করে দেবে। তখন প্রয়োজন পড়লে নেপাল কাকা রুবানের পরামর্শও চাইতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটা জানা হয়ে গেছে রুবানের। ফলে নেপাল কাকা নিজে থেকে রুবানকে কিছু না বললে রুবান নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বিশেষ করে তদন্তের সময়।

— এই রাঁচি শহরের সঙ্গে বাঙালীদের যোগাযোগ বহুদিনের। নেপাল গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ রেখে একসময় নীরবতা ভাঙল— একসময় রাঁচির জলহাওয়ার খুব খ্যাতি ছিল। এই কারণে রাঁচি শহরের বিভিন্ন এলাকায় এখনও কিছু পুরনো ঘরবাড়ি দেখতে পাবি, যা একদিন কলকাতার বনেদী বাঙালীবাবুরা বানিয়েছিলেন। তারা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাঁচি এসে থাকতেন। ঠিক একই কারণে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাঁচিতে এসেছিলেন। তিনি তো শেষ জীবনটা রাঁচিতেই কাটিয়ে গেছেন। মারাও গেছেন এখানে।

— এছাড়া এদিকেই তো ম্যাকলাকসিগঞ্জ। নেতারহাটও তো যাওয়া যায় রাঁচি থেকে। রুবান বলল।

— হ্যাঁ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পালামৌ ডিসট্রিক্ট-এর যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানেও রাঁচির উল্লেখ আছে। নেপাল কথা থামিয়ে জানলা দিয়ে কিছু যেন পর্যবেক্ষণ করল কিছুক্ষণ। তারপর প্রসঙ্গ বদলে বলল— তুই পথচারীদের পায়ের দিকে একটু লক্ষ্য কর রুবান।

রুবান গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। একটু আগেই এক পশলা ভারি বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তার খানাখন্দে এখনও বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দু-পাশের মাটির ফুটপাথের গর্তে টর্তেও এখনও জমা জল চোখে পড়ছে। তবে কাদা বলতে ঠিক যা বোঝায় সে জাতীয় কিছু চোখে পড়ছে না। তবু পথচারীদের বিশেষ করে দেহাতি গরীবগুর্বো মানুষের পায়ের জুতোয় আঠার মতো লেগে আছে লালমাটির প্রলেপ। দেখলে বোঝাই যায়, জুতোর ওই কাদা তারা সংগ্রহ করেছে দু-তিন দিন আগেই।

— কি দেখলি? জিজ্ঞেস করল নেপাল।

— এদিকের ভেজা মাটিতে সহজে কাদা যেমন হয় না, তেমনি

আবার একবার কাদা লাগলে সেই কাদা সহজে ওঠেও না। অন্তত স্বাভাবিক ভাবে ওঠে না। এটা কিন্তু বাংলার বিশেষ করে গাঙ্গেয় বাংলার দোঁয়াশ মাটির ধর্মের ঠিক বিপরীত। রুবান বলল।

— তাহলে অন্য দিক দিয়ে ভাবলে এটাও বোঝা যায় যে, এই মাটিতে বৃষ্টি বাদলার দিনে কোনও কারণে একবার কোনও দাগ পড়লে সেই দাগ সহজে মেলায় না। যেমন সামনের ওই দাগগুলি দেখ। নেপালের ডান তর্জনী গাড়ির সামনের দিকে রুবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

নেপাল দেখল, রাতু রোডের এদিকটা অনেকটাই খোলামেলা। রাস্তার প্রস্থও অনেক কম। ফলে পাশাপাশি দুটো বড় গাড়ি— যেমন বাস কিংবা লরি এসে গেলে একটিকে যাওয়ার জায়গা করে দিতে দ্বিতীয় যানটিকে রাস্তার এতটাই ধারে সরে আসতে হয় যে, সেই যানের একপাশের চাকাগুলি পিচরাস্তার বাইরে, কাঁচা ফুটপাথের ওপর নেমে আসে। এখন ঝাড়খণ্ডে বর্ষার শেষ পর্ব চলছে। ফলে শহরে বৃষ্টিপাতও হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাই রাস্তার দু-পাশের কাঁচা ফুটপাথের মাটিও নরম হয়ে গেছে। ফলে যখন কোনও ভারি গাড়ির চাকা চলে যায় ওই মাটির ওপর দিয়ে তখন মাটিতে টায়ারের গভীর দাগ পড়ে।

অথচ যেহেতু এদিককার মাটি গাঙ্গেয় বাংলার মাটি থেকে চরিত্রের দিক থেকে আলাদা, এই কারণে একবার টায়ারের দাগ পড়লে সেই দাগ পরের বৃষ্টিপাতেও মেলায় না। যেমন মেলায়নি সামনে রাস্তার পাশে মাটির ওপর পড়া টায়ারের দাগ। এমন ভাবে জেগে আছে যে দেখলে মনে হবে কেউ যেন ওখানে মাটির ওপর একটা পাকা নর্দমা তৈরি করে রেখেছে। নর্দমার দুই পাড় বালি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রেখে গেছে।

— ল্যাটেরাইট সয়েলের ক্যারেক্টারই এইরকম। নেপাল বলল— একে তো যথেষ্ট পোরাস সয়েল। তাই জল ধারণ করার ক্ষমতা যথেষ্ট কম। তার ওপর প্রচুর পরিমাণে রেড হেমাটাইস মিশে থাকার জন্য এদিকের মাটিতে এক ধরনের কাঠিন্য দেখা যায়। এই কাঠিন্যই যে কোনও দাগকে ধরে রাখে। সহজে ধুয়ে যেতে দেয় না। নেপাল কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি রাঁচির পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতর প্রবেশ করল।

★★★

রাঁচি ঝাড়খণ্ডের রাজধানী ঘোষিত হওয়ার পর রাজ্যের পুলিশ প্রধানের কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপনের জন্য নতুন পুলিশ ব্যারাকটি নির্মিত হয়েছে। পৃথক রাজ্য হওয়ার আগে, অর্থাৎ রাঁচি জেলাও যখন বিহারের আর দু-দশটা প্রশাসনিক জেলার মতোই ছিল, তখন পুলিশ ব্যারাকটি ছিল রাঁচি-হাজারিবাগ সড়কের ওপর— কান্টাতলি চৌকের কাছে। সেখানে পৃথক করে রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মতো যথেষ্ট পরিকাঠামো ছিল না। তাই প্রধান কার্যালয়ের জন্য নতুন করে জমির সন্ধান করতে গিয়ে শহর ছেড়ে রাতু রোডের দিকে সরে আসতে হয়েছে।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন পুলিশ ব্যারাক। এখানে যেমন রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রীয় অফিস আছে, তেমনি আছে বহু প্রশাসনিক ভবনও। এই কমপ্লেক্সে আছে রাজ্যের আই জি অফ পুলিশের দপ্তর। আছে বিভিন্ন শাখার ভারপ্রাপ্ত ডি আই জি-দের দপ্তর। সেই সঙ্গে আছে রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্স-এর দপ্তর। টেলিকমিউনিকেশন সিগন্যালিং-এর দপ্তর। সর্বোপরি আছে ইনভেস্টিগেশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল দপ্তরও। এই দপ্তরটি ডি আই জি (ক্রাইম)-এর বিভাগের অধীনে।

ইনভেস্টিগেশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল দপ্তরের হলুদ রঙের বাড়িটার সামনে নেপালদার গাড়িটা দাঁড়াল।

বাড়ির ভেতর থেকে স্বয়ং বেদপ্রকাশ বেরিয়ে এল। নেপাল বেদপ্রকাশকে দেখামাত্র চিনতে পারল। দ্রুত গাড়ি ছেড়ে নীচে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বেদপ্রকাশের দিকেই। করমর্দন করতে করতে নেপাল বলল— কী ভীষণ মুটিয়ে গেছ তুমি! — এবার বল হঠাৎ এতদিন পরে আমার মতো সামান্য ব্যক্তিকে মনে পড়ার হেতুটা কি?

একটা মস্ত বড় হল ঘর। ঘরটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরটি কাঠের পার্টিশন দিয়ে তিনটি পৃথক চেম্বারে ভাগ করা আছে। একটি চেম্বারের দেওয়াল জুড়ে পর পর কয়েকটা কাঠের র‍্যাক। র‍্যাকে ঠাসা ফাইলপত্র। এগুলি সবই যে এক একজন বাঘা বাঘা অপরাধীর কেস ফাইল, দেখেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় চেম্বারে পর পর কয়েকটি কম্পিউটার। কম্পিউটারের টেবিলের সামনে বসে আছে কর্মীরা। তৃতীয় চেম্বারটি ডি আই জি বেদপ্রকাশের অফিস ঘর। যদিও বেদপ্রকাশের প্রশাসনিক অফিস বাড়িটি অন্য একটি পৃথক বিল্ডিং-এ এবং ওই অফিস বাড়িতে বসেই বেদপ্রকাশ তার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে। তবে যখন বেদপ্রকাশ এই বাড়িতে আসে কাজেকর্মে তখন এই চেম্বারটিই ব্যবহার করে।

নেপাল এবং রুবানকে নিয়ে বেদপ্রকাশ সেই চেম্বারটিতেই বসল। তারপর নেপালের প্রশ্ন শুনে বলল— হঠাৎ নয় রায় সাহেব, অনেকদিন ধরেই তোমার কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন সূত্র পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ সেদিন ধানবাদে ইন্সপেকশনের কাজে গিয়ে ধানবাদের এস পি মিস্টার যোগেন্দ্র কোহলির মুখে তোমার প্রশংসা শুনে তোমার ওয়েবসাইটটা জানতে চাইলাম। দেখলাম যোগেন্দ্র তোমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ও আমাকে তোমার সাইটটা দিল। তখনই আমি মেল পাঠালাম।

— হ্যাঁ। যোগেন্দ্রর সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যেই যোগাযোগ হয়। নেপাল হাসল। বলল— বছর দুই আগে আমি ওর একটা কেস হাতে নিয়েছিলাম।

— কেবল হাতে নাওনি ব্রাদার। ধানবাদের কুখ্যাত কোল মাফিয়া পুরন্দর সিংকে ওর ডেরা থেকে পাকড়াও করে যোগিন্দারের ইজ্জত বাঁচিয়েছিলে। ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যা প্রেস্টিজ ইস্যু। পুরন্দরকে অ্যাট এনি কস্ট অ্যারেস্ট করার জন্য স্টেট তো বটেই, সেন্ট্রাল কোল মিনিস্ট্রি থেকে খুব চাপ আসছিল। বেদপ্রকাশ টেবিলের ওপর

রাখা একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে করতে বলল— পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

— এটা আমার প্রফেশন। নেপাল বলল— প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়াই আমার কাজ। এই কাজের জন্য তো তোমরা আমাকে পারিশ্রমিকও দাও। ফলে কৃতজ্ঞতার কোনও প্রশ্নই আসে না। তুমি তো জানো ব্রাদার, ফ্রিলি কাজ করব বলেই আমি একদিন আই পি এস-এর চাকরি ছেড়েছি।

— এবার আমাকে উদ্ধার কর ব্রাদার। বেদপ্রকাশ বেশ গম্ভীর স্বরে বলল।

— উদ্ধার টুদ্ধার করা আমার কাজ নয়। আমি কোনও সন্ত দরবেশও নই। মগজাস্ত্র ব্যবহার করে কাজ করি। নেপাল বলল— তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে বলল— আমার যতদূর অনুমান তুমি রাঁচি এবং ডালটনগঞ্জ জেলায় ক্রমবর্ধমান টেরোরিস্টদের অ্যাকটিভিটিজ নিয়ে খুবই চিন্তিত আছো!

— ঠিক ধরেছ। বেদপ্রকাশ বলল— এমনিতে রাঁচি, পালামৌ যথেষ্ট শান্তিপ্রিয় জায়গা ছিল। আর সন্ত্রাসবাদী বলতে লোকে যা বুঝত, সেই সি পি আই (এম এল) পার্টি, যাকে এখানকার লোকে 'ম্যালে' পার্টি বলেই জানতো। তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল নর্থ বিহার, আর সাউথ ঝাড়খণ্ডে। তবে সেই ম্যালে পার্টি তো এখন অনেকগুলি পার্টিতে ভাগ হয়ে যাওয়ায় অনেকটাই হীনবল হয়ে পড়েছে। মাঝে মধ্যে কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় বটে, তবে সেটা আমরা সামলে নিই। কিন্তু লাস্ট দু-চার বছরে ঝাড়খণ্ড বিহারের টেরোরিস্টদের মুভমেন্ট সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সি পি আই (এম এল) পার্টির তৈরি আতঙ্কের বাতাবরণের ফায়দা নিয়ে ঢুকে পড়েছে কিছু বিদেশী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। বিশেষ করে দুই একটি মুসলিম টেরোরিস্ট গ্রুপ খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেদপ্রকাশ সংক্ষেপে বর্তমান পরিস্থিতিটা নেপালকে বুঝিয়ে দিল। তারপর বেল বাজাল। এক প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা সেলুট ঠুকল। বেদপ্রকাশ বলল— মিস্টার পিটারকে বোলাও।

প্রহরী ফিরে গেল। একটু পরে একটি বছর সাতাশ আঠাশের পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে বলল— স্যার!

— এ হচ্ছে পিটার। জেনাথন পিটার। হাতিয়ার ছেলে। নেপালের সঙ্গে পিটারের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বেদপ্রকাশ এবার পিটারকে বলল— আর ইনি হচ্ছেন ফেমাস ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর নেপাল রায়। তুমি একবার কম্পিউটার থেকে আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানের করিডোরশিটটা বের করে আনো তো।

পিটার একটু পরেই পাশের কম্পিউটার চেম্বার থেকে একটা শিট নিয়ে ফিরে এল।

বেদপ্রকাশ শিটটা টেবিলের ওপর রেখে নেপালকে উদ্দেশ্য করে বলল— এই যে তুমি করিডোরটা দেখছ, নেপালের বর্ডার টাউন বীরনগর থেকে শুরু করে বিহারের যোগবানী কিষাণগঞ্জ কিউল আর জাহানাবাদ হয়ে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণার ভেতর দিয়ে হাজারিবাগ, রাঁচি, চাইবাসা ছুঁয়ে ওড়িশার পাল্লাহারা ঢেনকানাল পর্যন্ত চলে গেছে। গোটা করিডোরটাই ঘন অরণ্য। আর পাহাড়ের অবস্থানের ফলে কেবল দুর্গমই নয়, রাস্তাঘাটের অভাবে ভীষণ বিপদসঙ্কুলও বটে। ফলে গোটা করিডোরের দু-পাশে তেমন উল্লেখযোগ্য জনবসতিও গড়ে ওঠেনি। এখন দু-দুটো ইসলামি টেরোরিস্ট গ্রুপ, যারা নাকি বাংলাদেশ হয়ে নেপাল দিয়ে এই করিডোরে ঢুকছে, খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে খবর আছে। ওই দুই গ্রুপ এক হয়ে জইশ-এ-মুজাহিদ নামে একটি গ্রুপ গঠন করে দেশের পূর্বাঞ্চলে বড়সড় কোনও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই গ্রুপের প্রধান ডাইরেক্টর হচ্ছে জিয়াউদ্দিন নিয়াজি। পাকিস্তানের পেশোয়ারের ছেলে। ছাত্রাবস্থা কেটেছে লাহোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কম্পিউটার সায়েন্স-এর ছাত্র। হায়ার স্টাডিজের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিল। সেখানেই ইসলামিক ফাণ্ডামেন্টালিস্টদের সঙ্গে পড়ে গোঁড়া মৌলবাদী হয়ে উঠে। ফলে এত গুণী এবং কৃতী এক ছাত্র স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে ইণ্ডিয়াকে ইসলামিক স্টেট বানানোর জন্য টেরোরিস্ট সংগঠন তৈরি করে অনেকদিন আজাদ কাশ্মীরে কাজ করে। আজ বছর দুই ধরে দেশের পূর্বাঞ্চলে নাশকতা চালানোর জন্য রাঁচি-হাজারিবাগ বেল্টে আশ্রয় নিয়েছে।

— তা এধরনের জঙ্গি হানা মোকাবিলার জন্য তো সেনাবাহিনী আছে। পুলিশের ইন্টারস্টেট টাস্ক ফোর্স আছে। এখানে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের ভূমিকা কতটুকু? নেপাল বলল— হাজার হোক আমি তো আর সমর বিশেষজ্ঞ নই।

— রাইট ইউ আর ব্রাদার। বেদপ্রকাশ বলল— এই কারণেই আমি এতদিন তোমার হেল্প চাইনি। কিন্তু এই সেদিনের ঘটনার পর, আই মিন নাইনটিন্থ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরেই মনে হল এখুনি তোমার সাহায্য চাওয়া উচিত। না হলে যে কোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় কোনও বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

— নাইনটিন্থ সেপ্টেম্বর কী ঘটেছিল? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— আমাদের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সোর্স জয়রাম খবর দিয়েছিল, রাঁচি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে রামগড় পাহাড়ের নিচে কানহাইয়া টং জঙ্গলের ভেতর বিকেল চারটায় জিয়াউদ্দিন নিয়াজি তার গ্রুপের একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডেকেছে। সেই মিটিংয়ে ঠিক করা হবে ওদের পরবর্তী নাশকতার ছক। খবর পেয়ে আমরা নাইনটিন্থ মর্নিং-এ কানহাইয়া টং ফরেস্টে ঢোকার সব ক'টি সম্ভাব্য প্রবেশ পথে ফোর্স পোস্টিং করে দিই। মোট চারটে স্ট্র্যাটেজিক রুটে পুলিশ ফোর্স পাহারায় ছিল। প্রতিটি পয়েন্টের দায়িত্বে ছিল আমার অতি বিশ্বাসভাজন ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত চার ডি এস পি। একজন পিটার, দ্বিতীয়জন দীপক, তৃতীয়জন চন্দ্রশেখর আর চতুর্থজন সুরিন্দর প্রসাদ। সেদিন সকাল থেকেই এদিকের ওয়েদার খুব খারাপ ছিল। বৃষ্টি পড়ছিল মুসলধারায়। তবু আমাদের ফোর্স একচুলও নড়েনি তাদের জায়গা থেকে। কিন্তু দিন গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। একসময় রাতও গড়িয়ে গেল। জিয়াউদ্দিন তো দূরে থাক, তার গ্রুপের কোনও পদাধিকারীরই পাত্তা পাওয়া গেল না।

— হয়তো তোমার সোর্স ঠিক খবর দেয়নি। নেপাল বলল।

— জয়রাম কোনওদিন আমার সঙ্গে নেমকহারামি করেনি ব্রাদার। বেদপ্রকাশ বলল। তারপর যথেষ্ট চিন্তিত গলায় মন্তব্য করল— জয়রাম পাকেচক্রে জিয়াউদ্দিনের গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছিল ঠিকই। তবে তার মনে দেশভক্তি কম ছিল না। এই কারণে টুয়েনটিস্থ সেপ্টেম্বর মর্নিং-এ কানাহাইয়া টং-এর জঙ্গলে জয়রামের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে।

— মাই গড! নেপাল বলল— তার মানে জয়রাম যে তোমাদের সোর্স হয়ে জিয়াউদ্দিনের দলে ভিড়ে আছে, সেটা জিয়াউদ্দিনের কাছে আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের খবর দেওয়ার কারণে জিয়াউদ্দিন সেদিন কেবল একজিকিউটিভ বডির মিটিংই ক্যানসেল করেনি, জয়রামকে খুন করে সেই মিটিং প্লেসেই ফেলে রেখে গেছে।

— রাইট। বেদপ্রকাশের কপালে বেশ কয়েকটা চিন্তার নদীনালা ফুটে উঠল। বেদপ্রকাশ গলা নামিয়ে বলল— কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কে জিয়াউদ্দিনের কানে জয়রামের খবর আর আমাদের পুলিশ অভিযানের কথা পৌঁছে দিয়েছিল?

— তোমার টাস্ক ফোর্সের কেউ নিশ্চয়। নেপাল বলল।

— তাহলে বুঝতে পারছো ব্রাদার আমি তোমাকে কেন ইয়াদ করেছি। বেদপ্রকাশ বলল।

।। পাঁচ ।।

বেলা পড়ে আসার পর বেদপ্রকাশ বলল নেপালকে— চল, ইন্সপেক্টর জেনারেল সাহেবের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই।

— এখন তোমাদের আই জি সাহেব কে? নেপাল কফির কাপে হাল্‌কা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

— জগতরাম শর্মা। বেদপ্রকাশ বলল— বিহার ক্যাডার থেকে অপশন দিয়ে ঝাড়খণ্ড ক্যাডারে এসেছিলেন। এসেই ডি আই জি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট হয়েছিলেন। এখন স্টেটের আই জি।

— জগতরাম শর্মা? নেপাল নামটা মনে করার চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করল বেদপ্রকাশকে— আমি কি তাকে কখনও মিট করেছি?

— না। বেদপ্রকাশ বলল— তেমন সুযোগ ছিল না। তুমি যতদিন বিহার পুলিশে চাকরি করেছ, ততদিন শর্মাসাহেব দিল্লিতেই ছিলেন। বিহার গভর্ণমেন্টের রেসিডেন্ট পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব সামলেছিলেন। সেখান থেকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডি আই জি হয়েছিলেন। বছর পাঁচ-ছয় হল তিনি নিজের পেরেন্ট ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসেছেন।

— আমার কাজের সঙ্গে তোমার আই জি সাহেবের কি কোনও যোগাযোগ আছে? নেপাল জিজ্ঞেস করল বেদপ্রকাশকে।

— অবশ্যই। গভর্ণমেন্ট টেরোরিস্টদের অ্যাকটিভিটিজ বন্ধ করার জন্য যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বানিয়েছে, তার প্রধানও তো তিনি। বেদপ্রকাশ বলল— আমি তোমাকে মেল পাঠানোর আগে আই জি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে আই জি সাহেব তো এককথায় রাজি। আমাকে বলেছিলেন— তুমি রাঁচি এলে ওঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে।

— ওঁর অফিস কি এই নতুন পুলিশ ব্যারাকের ভেতরেই? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ। বেদপ্রকাশ বলল— তবে আজ তিনি অফিস করেননি। শরীরটা ভাল নয়। এখন বাড়িতেই আছেন।

নেপাল, রুবান আর বেদপ্রকাশ একসঙ্গে বেদপ্রকাশের কালো রঙের স্করপিওতে উঠল। সামনের সিটে বসল বেদপ্রকাশের সিকিউরিটি। গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে ছেড়ে দিল।

রাতু রোডের পুলিশ ব্যারাকের নিউ কমপ্লেক্সের পেছন দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে কাঁকে রোডের দিকে। ওদিকেই আছে রাঁচির বিখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র। মাঝের জায়গাটা অনেক অংশেই সমতল। এই জায়গাতে পরপর দুটো সুদৃশ্য বাংলো। মানুষপ্রমাণ উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। একটি বাংলো রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কোয়ার্টার। অন্যটি রাজ্যের মুখ্য সচিবের আবাসন।

প্রথম বাংলোটির প্রবেশদ্বারের মুখে বেদপ্রকাশের গাড়ি পৌঁছানো মাত্র প্রবেশ দ্বারের মুখে প্রহরারত দুই সশস্ত্র প্রহরী সসম্ভ্রমে গেট খুলে দিল। বেদপ্রকাশের গাড়ি প্রবেশদ্বার পেরিয়ে বাংলোর ভেতরে প্রবেশ করল।

অনেকটা পরিসর নিয়ে তৈরি একতলা সাদা রঙের বাংলো। বাংলোটিও যে অনেকটা জায়গা জুড়ে নির্মিত, বাইরে থেকে দেখলেও বোঝা যায়। চারদিকে ছড়ানো বেশ কিছু খোলা জমি। সামনের দিকে সযত্নে লালিত বাগান। এদিকের মাটির তেমন সমসত্ত্ব চরিত্র নেই। কোনও কোনও জায়গায় ভূপৃষ্ঠ সম্পূর্ণ লাল ল্যাটেরাইট সয়েলে আবৃত। আবার কোনও কোনও জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে বেলেমাটির স্তরও চোখে পড়ে। ফলে রাঁচি শহরেই মাটির এই বিপরীতধর্মিতার কারণে গাছগাছালির প্রকারভেদও চোখে পড়ার মতো। কোথাও কোথাও কেবল শাল, গরাণ, শিশু, নিম, ইউক্যালিপটাস গাছের প্রাচুর্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি কোথাও কোথাও চোখে পড়ে ফুলের গাছের প্রাচুর্য।

গেট থেকে সাদা গ্র্যাভেল আচ্ছাদিত রাস্তা চলে গেছে বাংলোর বারান্দার নিচে। বারান্দার সামনে পোর্টিকোর নিচে বেদপ্রকাশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। বেদপ্রকাশের সঙ্গে নেপাল এবং রুবানও নামল গাড়ি থেকে। বাংলোর ভেতর থেকে কেয়ারটেকারের দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ কর্মী বেরিয়ে এসে বেদপ্রকাশকে সেলাম ঠুকে বলল— আইয়ে সাহাব।

— আই জি সাহেব কোথায়? বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল পুলিশ কর্মীটিকে।

— সাহাব ওখানে। বাগিচায় আছেন। কর্মীটি বলল।

বেদপ্রকাশ নেপালকে বলল— চল, আমরা বাগিচার দিকে যাই। আই জি সাহেবের বাগান করার খুব শখ। অবসর পেলেই বাংলোর মালির সঙ্গে বাগানের পরিচর্যায় লেগে যান।

নেপাল বাংলোর বাগানের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে বুঝল বেদপ্রকাশের কথার যথার্থতা। রাজ্যের আই জি সাহেবের আবাসন বাংলোয় সযত্নে লালিত ফুলের বাগান থাকাটাই স্বাভাবিক। তবু কেবলমাত্র মাইনে পাওয়া সরকারি মালির ভরসায় ফেলে রাখলে এমন সুন্দর বাগান গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাগান দেখলেই বোঝা যায়, আই জি সাহেবের উৎসাহ আছে যথেষ্ট। এমনকি মালিকে স্বয়ং যে বাগান পরিচর্যায় সময় দেন, তার চিহ্ন যেন বাগানের প্রতিটি ফুলগাছের পাতায় পাতায় ফুটে আছে।

গোলাপ বাগান রাঁচি শহরে এমন কিছু বিরল নয়। রাঁচির গোলাপের খ্যাতি আছে। তবে রাঁচি এলাকায় গোলাপের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। অধিকাংশই রক্তলাল গোলাপ। কিন্তু নেপাল এই বাগানেই দেখল লালের সঙ্গে কমলা, গোলাপি, এমনকি সাদা গোলাপ ফুটে আছে পর্যাপ্ত।

দু-পা এগিয়ে যেতেই বেদপ্রকাশ বলল— দেখুন সাহেবের কাণ্ড! কেমন বারমুডা পরে মালির সঙ্গে সঙ্গে খুরপি দিয়ে বাগানের মাটি কোপাচ্ছেন।

নেপাল দেখল গায়ে একটা সাদা রঙের টি-শার্ট পরনে কালো রঙের বারমুডা পরিহিত এক দীর্ঘকায় পুরুষ মাটিতে উবু হয়ে বসে মাটি আলগা করছেন। পাশে বাগানের মালি নিচু হয়ে বসে মাটির আগাছা পরিষ্কার করছে।

— স্যার! বেদপ্রকাশ আই জি সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

আই জি সাহেব বেদপ্রকাশের উপস্থিতি টের পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন— আরে! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আজকে আমাদের ডিস্টিংগুইসড্ গেস্ট-এর সঙ্গে আলাপ করাবার মতো সময় বের করতে পারলে না। কাছে দাঁড়ানো মালিটি তার কাঁধে ভাঁজ করে রাখা একটি সাদা তোয়ালে এগিয়ে দিল আই জি সাহেবের দিকে। আই জি সাহেব তোয়ালে নিয়ে মুখে কপালে ঘাড়ে গলায় জমে ওঠা ঘাম মুছে নিয়ে নেপালের দিকে চোখ ফিরিয়ে বেদপ্রকাশকে উদ্দেশ্য করে বললেন— আমি অনুমান করছি উনিই আমাদের সেই বিশেষ অতিথি?

— স্যার! বেদপ্রকাশ সম্মতি জানাল। — এই হচ্ছে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নেপাল রায়। আর ও হচ্ছে নেপালের ভাতিজা, নেপালের সহকারি।

— নাইস টু মীট ইউ। নেপাল সৌজন্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে তার ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল আই জি সাহেবের দিকে, করমর্দনের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু করমর্দন করা হল না নেপালের। আই জি জগতরাম শর্মা নেপালের বাড়ানো ডান হাত স্পর্শ না করে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে বললেন— ও, নো মিস্টার রায়। আমার দুটে হাতই এখন নোংরা। আপনার শুভেচ্ছা আমি গ্রহণ করলাম। কথা শেষ করে শর্মাসাহেব বাংলোর দিকে এগুতে লাগালেন। পেছন পেছন বেদপ্রকাশ, তার পাশে নেপাল ও রুবান।

পেছন থেকে জগতরাম শর্মাকে ভাল করে দেখল নেপাল। বেশ লম্বা, প্রায় ছ'ফুট দুই ইঞ্চি তো হবেই উচ্চতা। গায়ের রঙ যথেষ্ট উজ্জ্বল। চওড়া কাঁধ, মেদহীন শক্ত পেটানো চেহারা। প্রথম দেখার পরে যে কোনও মানুষের মনে হতে পারে জগতরাম শর্মা সম্ভবত কোনও আফগান। ভারতীয়দের শারীরিক গঠনটা এমন মজবুত হয় না। তবে শর্মাজীর বাম থাইয়ের পেছন অংশে একটা আরও সাদা রঙের প্যাচ নজরে পড়ল নেপালের। প্যাচের অর্ধেকের বেশি অংশই বারমুডার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। বাকিটা বেরিয়ে আছে বারমুডার নীচে থেকে। হয়তো জন্মদাগ-টাগ হবে— ভাবল নেপাল। জগতরাম শর্মার বাম হাতে এখনও মাটি কোপানোর খুরপিটা ধরা আছে। ডান হাতে ধরা আছে ঘাম মোছার সাদা তোয়ালেটা। নেপাল প্রথমেই দেখেছিল শর্মাসাহেব যখন বাগান পরিচর্যা করছিলেন, তখনও তার বাম হাতেই খুরপিটা ধরা আছে। অর্থাৎ বাম হাতেই তিনি মাটি কোপানোর কাজ করছিলেন।

খুরপির গায়ে জড়ানো মাটির অবশিষ্টাংশের দিকে ভাল করে নজর দিল নেপাল। তারপর পেছন থেকে নেপাল বলল— স্যার, আপনার খুরপিটা তো বেশ দেখতে। এ জাতীয় খুরপি কিন্তু বিহারে দেখা যায় না, একটু দেখতে দেবেন?

— অফকোর্স! দেখুন মিস্টার রায়। দেখুন। শর্মাসাহেব খুরপি নেপালের হাতে দিয়ে বললেন— আপনিই প্রথম খুরপিটার বৈশিষ্ট্য আইডেনটিফাই করলেন। এটি আমি যখন দিল্লী থাকি, তখন পাহাড়গঞ্জ মার্কেট থেকে এক আফগান ব্যাপারীর কাছ থেকে কিনেছিলাম। খুরপির হাতল থেকে ফলা— সব কিছুই ডিফারেন্ট। আসলে পাথুরে মাটিতে গাছের চারা লাগানোর প্রয়োজনে এই খুরপি ব্যবহার করা হয়।

— আপনার বাগানের মাটি কিন্তু পাথুরে নয়। এমনকি চারপাশের মতো ল্যাটেরাইট সয়েলও নয়। নেপাল খুরপির মুখে জড়িয়ে থাকা সামান্য মাটি আঙুলে নিয়ে একটু টিপল। তারপর বলল— এই বাগানের মাটি দোঁয়াশ আর এঁটেল মাটির মিক্সচার। অ্যালুডিয়াল সয়েল যাকে বলে। ফুল চাষের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মাটি।

— ঠিক বলেছ ব্রাদার। বেদপ্রকাশ বলল— এই বাংলোর ভেতরের ল্যাটেরাইট সয়েল ফেলে দিয়ে রাজারাপনা থেকে দামোদরের সয়েল দিয়ে ভরাট করা হয়েছে।

।। ছয় ।।

সন্ধ্যা নেমেছে রাঁচি শহরে। সার্কুলার রোডের দু-পারের দোকান,

বাজার মল, মাল্টি প্লেক্স, ফুডপ্লাজাগুলি আলোকমালায় সেজে উঠেছে। কোনও কোনও মাল্টি প্লেক্সের সামনে যুবক- যুবতীদের ভিড়। প্রায় সকলেই দু-চাকার মোটর বাইক নিয়েই এসেছে সান্ধ্য আড্ডায়। একারণে মাল্টি প্লেক্সের সামনে মানুষের সঙ্গে তাল দিয়ে জমে উঠেছে মোটর বাইকের ভিড়ও।

হোটেল সিটি প্যালেসের সামনে নেপাল এবং রুবান নেমে গেল। বেদপ্রকাশ সঙ্গে এসেছিল। সে গাড়ি নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেল। বেদপ্রকাশের কোয়ার্টার আপার বাজারের ওদিকে— রাঁচি মেইন রোডের ধারে।

হোটেল সিটি প্যালেসের সামনে দাঁড়িয়ে রুবানের মনটা কিছুক্ষণের জন্য দমে গেল। আজ সেপ্টেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখ। শুক্রবার। এখন মহাসপ্তমীর সন্ধ্যা। এসময় কলকাতা যে কেমন সেজে উঠেছে, চারশো কিলোমিটার দূর থেকেও অনুমান করতে পারছিল রুবান। বিশেষ করে তাদের পাড়ার— অর্থাৎ যোধপুর পার্কের প্যাণ্ডেল, আলোকমালা আর প্রতিমার কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছিল রুবানের। ভাগ্য বলতে হবে, যে পাড়ার প্যাণ্ডেলে পঞ্চ মীর সকালেই প্রতিমা পৌঁছে গিয়েছিল। এই কারণে প্রতিমাটা দেখে আসতে পেরেছে রুবান।

নেপাল এবং রুবান সোজা দোতলায় উঠে এল। তাদের দুশো তিন নম্বর ঘরটা প্রকৃতপক্ষে থ্রি বেডেড রুম। এই কারণে আয়তাকার। চওড়ায় যদি চৌদ্দ ফুট হয়, তবে লম্বায় চবিবশ ফুট হবে। কিন্তু ডি আই জি সাহেবের খাস মেহমান বলে হোটেল মালিক কাম ম্যানেজার লোক দিয়ে ঘরের তৃতীয় বেডটা সরিয়ে নিয়েছে। এর ফলে দুটো বেডের মাঝখানে অনেকটা খোলা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে রাখা হয়েছে সোফা সেট।

— কিরে, কলকাতার জন্য মন খারাপ করছে বুঝি! সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— না বললে মিথ্যে বলা হবে। রুবান গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বলল। — জামাটা খুলে একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। তারপর পূর্ব কথার প্রসঙ্গেই বলল— তার চেয়েও বেশি মন খারাপ লাগছে আই জি জগতরাম শর্মার ব্যবহারে। কেন তুমি হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়েছিলে বলতো? হাতে হাত মেলালো না পর্যন্ত লোকটা। মিনিমাম সৌজন্যবোধটুকুও নেই।

— বলল তো তার হাতদুটো নোংরা। এই কারণে হাত মেলাতে পারছেন না। নেপাল হাসতে হাসতে জবাব দিল। — তবে আমার শুভেচ্ছা তো উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন।

— বাঁ হাতটা না হয় নোংরা ছিল। কিন্তু ডান হাতটা তো নোংরা ছিল না। রুবান উত্তর দিয়ে বাথরুমের গিজারের সুইচটা অন করে দিয়ে ফিরে এল। মিনিট দশেক যাক। এর মধ্যে জল গরম হয়ে যাবে। বাইরে এসে রাতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাটা ঠিক নয়। গরম

জলেই স্নান করা উচিত। এটা নেপালেরই শিক্ষা।

— হয়তো ডান হাতটাও নোংরা ছিল। নেপাল হাল্কা চালে জবাব দিল।

— নোংরাই যদি হবে, তাহলে ডান হাতটাকে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন কেন তোমাদের আই জি সাহেব। রুবান বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে গলা তুলে বলল— আসলে এদেশে পুলিশ অফিসাররা সামান্য ভদ্রতাটুকুও জানেন না। এই কারণে দেখলে না বাংলোয় ব্যক্তিগত কাজের জন্য কতগুলি অধস্তন পুলিশ কর্মীকে ব্যবহার করছেন! অথচ এই কর্মীদের মাস মাইনের টাকাটা কিন্তু এদেশের জনগণই জোগান দেয়। কোনও পুলিশ অফিসারের পকেট থেকে আসে না। রুবান বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল।

নেপাল একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সেন্টার টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা পাটনা থেকে প্রকাশিত একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক তুলে নিল। রাঁচি থেকেও অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে সব কটা হিন্দি। একটি ইংরেজি দৈনিকের রাঁচি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। সেই কাগজগুলি সকালেই দেখে রেখেছিল নেপাল। পাটনার কাগজ রাঁচিতে পৌঁছাতে দিনগড়িয়ে যায়। এই কারণে নেপাল হোটেল ছাড়ার আগে দেখে যেতে পারেনি।

কাগজের পেজ ফাইভের অষ্টম কলামের নীচের দিকে মুদ্রিত একটি সংবাদের ওপর চোখ আটকে গেল নেপালের। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশের বিজনৌরের কাছে নাজিবাবাদ থানার এক অফিসার খুন হয়েছেন। খুনের পদ্ধতিটা একটু বিস্ময়কর। পুলিশ অফিসারটিকে প্রথমে আততায়ী কোনও তীক্ষ্ণ ফলাকা দিয়ে যথেচ্ছ আঘাত করেছে। তারপর একেবারে কাছ থেকে মাথায় গুলি করেছে। খুন করার পরে নাজিবাবাদ জঙ্গলমহলে ফেলে রেখে যায় আততায়ী। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এই খুন কোনও টেরোরিস্ট গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তির কাজ বলে অনুমান করছে।

— যাও, ছোটকা যাও। স্নানটা সেরে নাও। তারপর চা খেতে হবে। রুবান তোয়ালে মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে তাড়া দিল নেপালকে।

নেপাল হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তারপর গায়ে জল ঢালতে ঢালতে সেই আপাত গুরুত্বহীন খবরটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলও এখন আর আগের মতো শান্ত নেই। আগে গাড়োয়াল, কুমায়ুঁন পার্বত্য অঞ্চলগুলি কেবল যে তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়েই সমতলের মানুষের আকর্ষণ করত এমন নয়, এসব এলাকার বিস্ময়কর নৈঃশব্দ আর সরল মানুষের শান্ত জীবনযাপনও এই এলাকাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল।

কিন্তু ইদানীং সেই শান্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা থেকে এখন বহু টেরোরিস্ট গ্রুপ পশ্চিমে সরে আসতে শুরু করেছে। নিজেদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা নেপালের সীমান্ত অঞ্চলের ভূমিও ব্যবহার করছে। তার চেয়েও বড় কথা, কোথাও কোনও বড় নাশকতা চালানোর প্রস্তুতি হিসেবে তারা কেবল গোলা-বারুদের ভরসায় থাকছে না, অনেকটা গেরিলা ওয়্যারফেয়ারের কায়দায় বিশেষ বিশেষ কাউকে— বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে খুন করে জনপদেই ফেলে রেখে যাচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য, পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি সীমান্ত থেকে ঘুরিয়ে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

স্নান সেরে পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিল নেপাল। রুবান একটা বারমুডার ওপর চাপিয়েছে একটা ঘিয়ে রঙের গেঞ্জি। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে একতলার ডাইনিং হলে ঢুকল। হলের একটা ধার ঘেঁষে টেবিলে বসল। অ্যাটেনডেন্ট এসে দাঁড়ালে নেপাল বলল— দো প্লেট দহিবড়া।

চামচে একটি বড়ার অংশ ভেঙে নিয়ে নেপাল মুখে পুরল। তারপর চিবাতে চিবাতে বলল— তুই কিন্তু তোর অজান্তেই আজ একটা ভীষণ সিগনিফিকেন্ট কথা বলে ফেলেছিস রুবান।

রুবান এক মনে দহিবড়ার সদ্ব্যবহার করছিল। ইতিমধ্যেই একটি বড়া শেষ করে ফেলেছে। দ্বিতীয় বড়াটির গায়ে চামচ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল— কোন কথা?

— ওই যে স্নানে যাওয়ার আগে আই জি সাহেবের করমর্দনের অনিচ্ছার বিষয়ে বললি— ওর ডান হাতটা তো নোংরা ছিল না। নোংরা হলে আই জি সাহেব নিশ্চয় হাতে তোয়ালে জড়িয়ে রাখতেন না।

— যা সত্যি, তাই বলেছি। রুবান পাত্রের দই চামচে তুলে খেতে খেতে বলল— এতে আবার তুমি বিশেষত্ব আবিষ্কার করলে কেমন করে?

— এই কারণেই বিশেষত্ব আছে— যে হাতটা নোংরা বলেই সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন তিনি। নোংরাটা আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন।

— নোংরা যদি হতো তাহলে তো আই জি সাহেব ডানহাতটা আগে থেকেই লুকিয়ে রাখতেন। রুবান বলল— তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ ছোটকা, যে আমরা তার কাছে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত তিনি ডান হাতটা উন্মুক্তই রেখেছিলেন। আমরা এসে পড়ার পরেই আই জি সাহেব ঘাম মোছার অছিলায় মালির কাছ থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মুখ গলার ঘাম মুছে পুনরায় মালির কাছে ফিরিয়ে দেননি।

— আগে থেকে ডানহাতটা লুকানোর কোনও প্রয়োজন পড়েনি। নেপাল বলল— এমনও তো হতে পারে মালিরও জানা ছিল যে আই জি সাহেবের ডান হাতটা নোংরা। মালি আই জি সাহেবের ঘনিষ্ঠ বলেই আই জি সাহেব আগে থেকে ডান হাতটা খোলাই রেখেছিল।

— তুমি কি ধরনের নোংরার কথা বলছ? রুবানের দহিবড়া খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। খাওয়ার শেষে টিসু পেপারে ঠোঁট মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল। বলল— নিশ্চয় মাটি লাগা নোংরার কথা বলছ না!

— সে তো বটেই। নেপাল চিন্তিত গলায় বলল— মাটির

নোংরা হলে ওই হাতটা তোয়ালে জড়িয়ে রাখবেন কেন? বিশেষ করে তিনি যখন বাগানেরই মাটি কোপাচ্ছিলেন। মাটির নোংরা লুকোতে হলে বাম হাতটাকেও তো আড়াল করার কথা ছিল।

দু-কাপ কফি দিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট। কফির কাপে নেপাল এবং রুবান ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল। ঠিক এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার নীতিশ যাদব ডাইনিং হলে আবির্ভূত হল। নেপালের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা মুখ আঁটা সাদা খাম এগিয়ে দিল— সাহাব, এটা আপনার জন্য।

নেপাল খামের মুখ ছিঁড়ল। ভেতরে একটা সবুজ রঙের কাগজ। কাগজে গোটা গোটা দেবনগরী হরফে লেখা— শালা বঙ্গাল! কিঁউ খামোকা মৃত্যুকে ডেকে আনছিস! প্রাণে বাঁচতে হলে কালকেই রাঁচি ছেড়ে বাপস চলে যা।

।। সাত।।

— আমাকে জয়রামের, আই মিন তোমাদের সেই সোর্স, যার লাশ সেদিন কানহাইয়া টং জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছিল, তার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখতে হবে ব্রাদার। নেপাল বেদপ্রকাশের অফিস ঘরে মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল।

— ওর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তোমার কোন কাজে আসবে শুনি? বেদপ্রকাশ তাকাল নেপালের দিকে— মাথার পেছনে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছিল জয়রামকে। তার অর্থ খুব পরিষ্কার। জয়রামের খুন হওয়ার মুহূর্তে খুনী জয়রামের ঠিক পেছনেই ছিল।

— সে তো বটেই। নেপাল বলল— তবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করলে গুলির ভরবেগ তেমন থাকে না যে গুলি মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে।

— আমি তো বলিনি গুলি মাথার খুলি পেনিট্রেট করে বেরিয়ে গেছে। বেদপ্রকাশ বলল, ওর কপালে কোনও ছিদ্র ছিল না।

— তাহলে কার্তুজটা কোথায়? নেপাল বলল— আমার দেখা প্রয়োজন।

— কার্তুজ! কোন কার্তুজের কথা তুমি বলছ? বেদপ্রকাশ রীতিমতো অপ্রস্তুত।

— যে কার্তুজটা জয়রামের মাথার ভেতর পাওয়া গেছে। নেপাল বলল— যেহেতু কম মোমেনটামের জন্য বুলেটটি জয়রামের মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায়নি, সেহেতু কার্তুজটা জয়রামের মাথার ভেতরেই জড়িয়ে থাকার কথা। সেই কার্তুজটা আমি দেখব।

— মাই গড! বেদপ্রকাশ সশব্দে টেবিলের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা চাপড় মারল— আমি তো এদিকটা একেবারে ভেবে দেখিনি। কথা শেষ করে বেদপ্রকাশ বেল না বাজিয়েই হাঁক পাড়ল— হ্যায় কোই ইঁহা!

— জী! ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একজন প্রহরী লম্বা সেলুট জানিয়ে উপস্থিতি জানান দিল।

— জেনাথন পিটার সাহেব কো বোলাও। হাঁক দিল বেদপ্রকাশ।

একটু পরেই পিটার বেদপ্রকাশের ঘরে ঢুকল। নেপাল এবং রুবানকে দেখে হেসে সুপ্রভাত জানাল। পিটারের গায়ের রঙ ঘন শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ মুখে পিটারের দুধসাদা দাঁতের পাটি পিটারের হাসিকে অনেকটাই নির্মল করে দিল।

— ডেকেছেন স্যার! পিটার বেদপ্রকাশের সামনে দাঁড়াল।

— জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কি আমাদের হাতে এসেছে! বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল।

— না স্যার। জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তো এখনও ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ স্টেশন থেকে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। জয়রামের মার্ডার কেসের এফ আই আর তো ক্যান্টনমেন্ট থানাতেই করা হয়েছিল। পিটার নম্র গলায় বলল।

— তাহলে এখুনি রিপোর্ট আনার ব্যবস্থা কর। বেদপ্রকাশ নির্দেশ দিল— রিপোর্টটা মিস্টার রায় দেখবেন।

— স্যার! সম্মতি জানিয়ে পিটার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

— তারপর বল, আমাদের আই জি সাহেবকে কাল মিট করে কেমন বুঝলে? বেদপ্রকাশ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

— নাইস জেন্টেলম্যান। এবং যথেষ্ট টাফও বলতে পারো। নেপাল হাসল নিচু গলায়। আবার বলল— দেখেই বোঝা যায় এখনও নিয়মিত শরীর চর্চা করেন। কথাটা বলে ফেলেই হঠাৎ করে নেপালের কিছু যেন একটা মনে পড়ে গেল। — আচ্ছা ভাই একটা অফ দি রেকর্ড ইনফর্মেশন দাও তো। আই জি সাহেবের বাংলোতে যেসব কন্সটেবলদের বিভিন্ন কাজের জন্য পোস্টিং করা হয়েছে, তাদের পরিচয় কি তোমার জানা আছে?

— আজ কি হয়েছে তোমার বলো তো! সকাল থেকেই আজব আজব প্রশ্ন করে যাচ্ছো! বেদপ্রকাশ একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল— এত বছর পুলিশ সার্ভিসে কাজ করেছিলে। চাকরি ছেড়ে তোমার পেশার সূত্রেই তুমি বিভিন্ন স্টেটের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্লোজ কনটাক্ট-এ আছো। তার পরেও জিজ্ঞেস করছ একজন ডি আই জি কিনা আলাপ করবে আই জি সাহেবের বাংলোর সিকিউরিটি স্টাফদের সঙ্গে? আমাদের এই কেসের সঙ্গে তোমার এমন আজব প্রশ্নের সম্পর্কটা কোথায়?

— সম্পর্কটা আছেব্রাদার। নেপাল অনুত্তেজিত গলায় বলল— এখুনি দেখবে সম্পর্কটা কোথায়?

নেপালের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ ভেসে এল বেদপ্রকাশের ঘরের ভেতর। সেই সঙ্গে শোনা গেল গাড়ির দরজা খোলার শব্দ। পরবর্তী ক্ষণে শোনা গেল গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ। শব্দটাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল পিটার। তার হাতে কালো রেকসিনে বাঁধানো একটা ফাইল।

— এই যে স্যার! জয়রামের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট ইনডিটেলস্ এই ফাইলেই আছে। পিটার বেদপ্রকাশকে সেলাম করে

ফাইলটা বেদপ্রকাশের সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে দিল।

— এই নাও। দেখাও এই ফাইলের সঙ্গে আই জি সাহেবের বাংলোয় পোস্টেড পুলিশ স্টাফদের সম্পর্কটা কোথায়! বেদপ্রকাশ ফাইলটা না খুলেই নেপালের দিকে এগিয়ে দিল।

— তাহলে আমি এখন যাই স্যার! পিটার যাওয়ার অনুমতি চাইল।

— হ্যাঁ, যাও। তবে তোমার কাজটা কতদূর এগুলো? বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল।

— স্ক্যানিং কমপ্লিট। তবে ডাটা এন্ট্রিতে একটু ট্রাবল ফেস করতে হচ্ছে। মাঝেমাঝেই ইনফর্মেশনের অভাবে কম্পিউটার ডাটা ডিমাণ্ড করছে।

— তেমন হলে কনসার্নড জেলার এস পি-র অফিসের সঙ্গে কনটাক্ট কর। বল, আপডেটিং কনসার্নড পাঠাতে। বেদপ্রকাশ বলল।

— কনস্টান্ট কনটাক্টেই আছি। পিটার বলল— দুমকা ডিস্ট্রিক্টকে বলেছি, ওই রানধাওয়া সিং-এর হিস্ট্রিটা কালেক্ট করে রাখতে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দ্যাট রানধাওয়া সিং মানুষটার অনেক নাম আছে। হয়তো প্রেজেন্ট নামটাও সঠিক নাম নয়।

— আপনার অনুমান একশো শতাংশই ঠিক, মিস্টার পিটার। নেপাল জয়রামের পাশের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ফাইলটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে পিটারের কথার শেষে বলে উঠল।— আপাতত যেটুকু ইনফর্মেশন পেয়েছি, তার ভিত্তিতে এটা বলতে পারি যে, রানধাওয়া সিং নামটা ওই ভদ্রলোকের তৃতীয় নাম। এর আগে দু-দুবার নাম বদল করেছে সে। প্রথম নাম মেঘা সিং। ধানবাদ ডিসট্রিক্ট-এর মহুদা কোলিয়ারির আতঙ্ক। তারপর নাম নিয়েছিল সূরজমল। মুঙ্গের ডিসট্রিক্ট-এর ট্রেজারি লুঠ করেছিল। থার্ড নাম রানধাওয়া সিং— দুমকা ডিসট্রিক্টের গিরিডি টাউনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ থেকে তেইশ লক্ষ টাকা ডাকাতি করে ফেরার হয়ে গিয়েছিল।

— মাই গড! বেদপ্রকাশ এবং পিটার— দুজনেই একসঙ্গে বিস্ময় সূচক শব্দ উচ্চারণ করল মুখ দিয়ে। তারপর বেদপ্রকাশ বলল— তুমি তো দেখছি মোবাইল কম্পিউটার। সব ডাটা মজুত করে রেখেছো মগজে। কেবল মগজের সুইচ টিপলেই হল।

— আমি তো আর তোমাদের মতো পোলিটিশিয়ানদের সেবা করে বেড়াই না, যে লিডারদের ইচ্ছে অনুযায়ী ঠিক করব কোন অপরাধের তদন্ত করব আর কোন অপরাধের তদন্ত করব না। মনগড়া রিপোর্ট লিখে ফাইল ক্লোজ করে দেব। নেপাল হাসতে হাসতে বলল— পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স-এর জন্য আজকে সারা দেশের পুলিশ সার্ভিসটাই এমন কোলাপস্ করে গেছে যে তোমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ টা একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে, না হলে এখনও তোমরা বাবরের কালের তথ্য নিয়ে বসে আছো!

— যেমন! বেদপ্রকাশের সতর্ক জিজ্ঞাসা। — কোন ইনফর্মেশনটা পুরনো?

— কেন, ওই রানধাওয়া সিং। ওকি এখন ওই নাম ধারণ করে বসে আছে নাকি? ইতিমধ্যে আরও একটা নাম সে নিয়েছে। সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। নেপাল অনেকক্ষণ সিগারেট ধরায়নি। ফলে নেপাল মাথায় সামান্য ভার ভার অনুভব করছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল— তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, দু-বছর আগে যাদুগোড়ার ইউরেনিয়াম মাইনস্-এর কেলেঙ্কারির কথা!

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব মনে আছে। বেদপ্রকাশ বলল— সেই কেসটা তো তুমি হ্যাণ্ডেল করেছিলে! সেই সঙ্গে চাইবাসা রেঞ্জে যে ইউরেনিয়াম ট্রাফিটিং-এর নেটওয়ার্কটা পর্দা ফাঁস করে দিয়েছিলে।

— যাক, তাহলে একটু আধটু সাম্প্রতিক খবরও রাখো তোমরা। নেপাল হাসল। হাসিটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল— ওই ইউরেনিয়াম ঘোটালার লিডার ছিল আসফাক ওমর। সে আর কেউ নয়— সে ছিল তোমাদের রানধাওয়া সিং স্বয়ং।

— তাহলে তো রানধাওয়া সিং ওরফে আসফাক ওমর বাবাজীবন চাইবাসা ডিসট্রিক্ট জেলে পচে মরছে। ওর আপডেটেড ইনফর্মেশন নিয়ে লাভ কি?

— না। ওমর সাহেব জেলে আদৌ নেই। গত বছরই সে জেল ভেঙে উধাও হয়ে গেছে। নেপাল বলল। তারপর জয়রামের বডির পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের ফাইলটা বেদপ্রকাশকে দিয়ে বলল— এটা এখন তোমার কাছেই রাখ। আমার অনুমান, ফাইল হাতছাড়া করলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাই বদলে যাবে। তখন তোমার বেইজ্জতের এক শেষ।

।। আট ।।

— বুঝলি রুবান, এবারের কেসটা একটু ভোগাবে মনে হচ্ছে। রাতের ডিনার সারার জন্য হোটেল সিটি প্যালেসের ডাইনিং হলের দিকে যেতে যেতে বলল নেপাল।

রুবান কোনও সাড়া দিল না। আজ সন্ধ্যার পরে হোটেলের ঘরে ফিরে আসার পর থেকেই রুবান লক্ষ্য করছিল তার নেপাল কাকা একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। হোটেলের ঘরে ঢুকে প্রথমে যথারীতি স্নান সেরে নিয়েছিল দুজনেই। স্নানের পর রুবান নিজেই ইন্টারকমে ফোন তুলে ক্যান্টিনে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। ঘরে বসেই চা খেয়েছিল নেপাল এবং রুবান। এরপর রুবান প্রত্যাশা করেছিল, নেপাল তার সঙ্গে কথা বলবে। অন্তত জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে কোনও রকম ক্লু পেয়েছে কিনা এই ব্যাপারে কিছু বলবে নেপাল। কারণ রুবান বেদপ্রকাশের চেম্বারে বসে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ফাইলটাকে যেভাবে পড়ছিল, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেপালের মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাচ্ছিল— তা রুবান বেশ মনোযোগ নিয়েই পর্যবেক্ষণ করছিল। নেপালের মুখের ওই পরিবর্তিত অভিব্যক্তিই রুবানকে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, নেপালের চোখে জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাকে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। নির্ঘাত কোনও স্ববিরোধিতা ধরা পড়েছিল নেপালের

চোখে। আর সেখান থেকেই নেপাল হয়তো বিশেষ কোনও সূত্র পেয়েছে। বেদপ্রকাশের চেম্বারে বসে পিটারের সামনে নেপাল চায়নি পোস্টমর্টেম রিপোর্টের স্ববিরোধিতা বেদপ্রকাশকে জানাতে। ফলে রুবান আশা করেছিল হোটেলে ফিরে নিরালায় নেপাল তার বিশ্বস্ত সহকারি রুবানকে জানাবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে সে কোনও সূত্র পেয়েছে কিনা।

বস্তুত রুবানকে নিরাশ হতে হল। চা খাওয়ার পরেই নেপাল একটা সিগারেট ধরিয়ে সটান বেডে শরীর এলিয়ে দিল। এক মনে সিগারেটটার সদ্ব্যবহার করে সেই যে চোখ বুজল, চোখ খুলল এখন, রাত ন'টায়। এখন রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ঘরের দরজা লক্ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নেপাল প্রথম কথা বলল— বুঝলি রুবান, এবারের কেসটা একটু ভোগাবে মনে হচ্ছে।

আজ মহাষ্টমী। কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে এখন জনতার ঢল নেমেছে, সেকথা রাঁচিতে বসেই বুঝতে পারছিল রুবান। অবশ্য আজ দু-দিন রুবান কলকাতার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখেনি। রাঁচিতে সন্ধ্যার মুখে নাকি কলকাতার কয়েকটা বাংলা কাগজ আসে। মূলত আপার মার্কেটের সরস্বতী কিতাব মহলেই আসে সেই কাগজ। সেখান থেকে বাঙালি মহল্লায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় হকাররা। এদিকে আসে না সেই কাগজ বিক্রেতারা। তবে রুবান হোটেলের ম্যানেজারের মুখে শুনেছে আপার মার্কেটে গেলে বাংলা কাগজ কেনা যায়। রুবানের তেমন উৎসাহ নেই।

অষ্টমীর রাতে হোটেল সিটি প্যালেসের ডাইনিং হল একেবারে জমজমাট। রাঁচি পালামৌ জেলার বনাঞ্চলে উগ্রপন্থীদের সমাবেশের খবর জানা সত্ত্বেও বাঙালি ট্যুরিস্টদের ঠিক টেনে এনেছে রাঁচি শহরে। ফলে এখন রাঁচির সব হোটেলেই 'নো- রুম' বোর্ড ঝুলছে। হোটেল সিটি প্যালেসও বাদ যায়নি।

নেপালদের ডাইনিং হলে ঢুকতে দেখে ম্যানেজার নীতিশ যাদব একরকম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল— চলুন স্যার। আপনাদের জন্য একটা টেবিল খালি করে রেখেছি। বসে পড়ুন। বলতে বলতে নীতিশ যাদব নেপালদের নিয়ে ডাইনিং হলের এক প্রান্তে একটা খালি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল— আরামসে ডিনার সারুন। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমি আপনাদের খাবারটা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। কি নেবেন বলুন— চিলি চিকেন, না মটন শাহী রেজালা!

— কি রে রুবান, মটন শাহী রেজালা চলবে নাকি? নেপাল ঠোঁট টিপে থামল। বলল— আবার রাঁচির মটন কিন্তু আমাদের কলকাতার মতো বুড়ো খাসির মাংস নয়। খেয়ে সুখ আছে।

— চলবে। রুবান মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল আবার— আজ কিন্তু রাইস নয়। তন্দুরি দেবেন। শেষের কথাটা রুবান নীতিশ যাদবকে বলল।

— জো হুকুম স্যার। নীতিশ যাদব কিচেন ঘরের দিকে চলে গেল।

একটু পরেই হোটেল কর্মী এসে নেপালদের টেবিলে ডিনার পরিবেশন করে গেল। নেপাল একটা তন্দুরি রুটির ধার ছিঁড়ে ডালের বাটিতে ডুবিয়ে নিয়ে মুখে চালান করে দিল। রুবান ডালের বাটি সরিয়ে রেখে মটন রেজালার পটটা টেনে নিল। এক টুকরো মাংস মুখে দিল। বার দুই চিবিয়েই টের পেল নেপালের কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বেশ নরম আর রসালো মাংস।

— কাল কিন্তু তোর একটা কাজ আছে। একটা তন্দুরি দিয়ে খেয়ে বাটির অবশিষ্ট ডালটুকু নেপাল বাটিতে চুমুক দিয়ে শেষ করল। তারপর বলল— তবে কাজটা একটু গোপনে সারতে হবে।

— কী কাজ! রুবান অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটিকে কাছে ডাকল। তাকে আর এক পট মটন রেজালার অর্ডার দিয়ে বলল— মারদাঙ্গা নয়তো?

— তোর নেপালকাকা কবে মারদাঙ্গার কাজের দায়িত্ব তোকে দিয়েছে বল তো! মটন রেজালার পটে কাঁটা দিয়ে এক পিস মটন গেঁথে নিয়ে মুখে চালান করে দিল নেপাল। তারপর মাংসের টুকরোটা চিবাতে চিবাতে বলল— অবশ্য এবারে যে রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, মারদাঙ্গাও যে কোনও মুহূর্তেই বেধে যেতে পারে। এর জন্যই তোকে গোপনীয়তার সঙ্গে কাজটা সারতে বলছি।

— বেশ বল। আমি সিক্রেটলি সেরে ফেলব কাজটা। রুবান বলল।

— পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম বোরের কোনও পিস্তল ইণ্ডিয়ান মার্কেটে এখনও পর্যন্ত ঢুকেছে কিনা— এই ব্যাপারে তোকে খোঁজ নিতে হবে এবং দ্রুত। নেপাল বলল।

— পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম! রুবান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল— এত সেনসেটিভ পিস্তল দেশের কোনও স্বীকৃত গান কোম্পানি বানায় বলে আমার জানা নেই। রুবান দইয়ের প্লেটে চামচ ডুবিয়ে এক চামচ দই তুলে নিয়ে মুখে দিল।

— বিদেশী কোম্পানি তো বানাতে পারে। নেপাল চাপা গলায় বলল— বিশেষ করে নেপালের কোনও কোম্পানি!

— তাহলে তো ইন্টারনেট সাফল্ করে দেখতে হবে। এখানে সেরকম সফিস্টিকেটেড ইন্টারন্যাশনাল নেট সার্ভিস পাওয়া যাবে কি? রুবানের গলায় সংশয়।

— পাওয়া যাবে। নেপাল ঠিক আগের মতোই নিচু গলায় বলল। তারপর যোগ করল— এখান থেকে বেরিয়ে তুই যদি মেসরা-র দিকে যাস, তবে বিড়লা ইন্সটিটিউট টেকনোলজির কলেজ পাবি। কলেজ গেটের উল্টো দিকে আছে একটা সাইবার কাফে। ওর ম্যানেজার জিতেন্দ্র প্রসাদ। ওর কাছে তুই তোর পরিচয় দিবি। জিতেন্দ্র সব ব্যবস্থা করে দেবে।

— এত ঝামেলা করার দরকার কি? রুবান বলল— তোমার বেদপ্রকাশের অফিসেই তো নেট সার্ভিস অ্যাভেলেবেল। ওখান থেকেই তো নেট সার্চিং ভাল হবে।

— ভাল হলেও গোপন থাকবে না। নেপাল বলল।

— কেন? ওরা তো সব রকম গোপনীয়তা বজায় রেখেই কাজ করছে। রুবানের প্রশ্ন।

— তাহলে তুই কি শুনেছিস। নেপাল শান্ত গলায় বলল—

কালকেই তো বেদপ্রকাশ বলল যে, ওদের গোপন খবরাখবর কেউ বাইরে পাচার করে দিচ্ছে।

— তা বটে। রুবান মাথা নাড়ল। তারপর বলল, — তুমি কি তাহলে বেদপ্রকাশের টাস্ক ফোর্সের অফিসারদেরও সন্দেহ করছ?

— সন্দেহের বাইরেও রাখছি না।

নীতিশ যাদব এগিয়ে এল নেপালদের টেবিলের সামনে। বলল— খানা আচ্ছা থা কেয়া?

— জী। বহুত টেস্টি। নেপাল সাড়া দিল।

— দু'দিন হয়ে গেল রাঁচি এসেছেন। তবু আপনারা একবারও সাইট সিইং-এ বেরুলেন না। নীতিশ যাদব হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ। দু'দিন ডি আই জি সাহাব ধরে রেখেছিলেন। নেপাল বলল— কাল বেরুব।

— কোথায় যাবেন? হুণ্ড্রু ফলস্, দশম ফলস্!

— নেহি, রাজারাপ্পা। নেপাল বলল।

— তাহলে গাড়ি বলে দিই! নীতিশ যাদব জিজ্ঞেস করল— কোন গাড়ি বলব, ইণ্ডিকা, স্যান্ট্রো, নাকি অ্যাম্বাসাডার?

— সুক্রিয়া। নেপাল হাসল। বলল— গাড়ি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। গাড়ির ব্যবস্থা ডি আই জি সাহেবই করে রেখেছেন।

নীতিশ যাদব চলে যাওয়ার পর নেপাল এবং রুবান টেবিল থেকে উঠল। মুখ ধুয়ে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ব্যাচের অতিথিরা ডাইনিং হলের সামনে লাউঞ্জে এসে জড়ো হয়েছে। রাত এখন সাড়ে ন'টা। ফলে সকলেরই খিদে পাওয়াটা স্বাভাবিক।

দোতলায় দুশো তিন নম্বর ঘরে ঢুকে দরজাটা লক করে দিল রুবান। নেপাল সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। রুবান জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। সামনে সার্কুলার রোড। ইতিমধ্যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে তাই হিম ভাব। জানালাটা বন্ধ করে দিল রুবান। তার কাছে এখন একটাই প্রশ্ন— নীতিশ যাদবকে কালকের প্রোগ্রাম নিয়ে মিথ্যে বলল কেন নেপালকাকা! কোনও গূঢ় কারণ আছে কি?

।। নয় ।।

বেদপ্রকাশ তার অফিস ঘরেই হাজির ছিল। নেপাল বেদপ্রকাশের চেম্বারে ঢুকে কোনওরকম ভূমিকা না করেই বলল— আমাকে এখুনি একবার কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে যেতে হবে। তুমি গাড়ির বন্দোবস্ত কর।

বেদপ্রকাশ নেপালের এমন অভাবিত প্রস্তাব শুনে একটু আশ্চর্য হল। নেপালকে বসার ইশারা করে বলল বেদপ্রকাশ— হঠাৎ কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টে যাওয়ার ইচ্ছে হল যে! ওই জঙ্গলে কি আজ স্বয়ং জিয়াউদ্দিন নিয়াজি হবেন?

— অসম্ভব কিছুই নয়। নেপাল শান্ত গলায় বলল।

— মাই গড! বেদপ্রকাশ চেয়ার ছেড়ে একরকম লাফিয়ে উঠল— এ খবর তোমাকে কে দিল? আর খবর যখন পেয়েছ, তখন আমাকে বলোনি কেন?

— প্রয়োজন বোধ করিনি। নেপালের আবার শান্ত উত্তর।

— ঠিক আছে মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু তুমি জিয়াউদ্দিনের মতো এমন একজন টেরোরিস্টের সঙ্গে একা একা কাউন্টার করবে কেমন করে? জিয়াউদ্দিন কখনও একা একা মুভ করে না। সঙ্গে সবসময় দশ-বারোজন বডিগার্ড থাকে। এরা সবাই জঙ্গলওয়্যার স্পেশালিস্ট। বেদপ্রকাশ বলল। তারপর যোগ করল— ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে আমার দুজন ডি এস পি-কে দিচ্ছি। ওরা ওদের ফোর্স নিয়ে তোমাকে ফলো করবে।

— কোনও দরকার নেই। নেপাল আশ্বস্ত করল বেদপ্রকাশকে। তারপর আশ্বস্ত করার সুরে বলল— তুমি মিছিমিছি এক্সাইটেড হয়ে পড়ছ বেদপ্রকাশ। বলেছি তো আমার কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। তুমি কেবল একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর। আর গাড়ির চালককে নির্দেশ দাও যে সে যেন কানহাইয়া টং ফরেস্টের যেখান থেকে জয়রামের লাশটা তোমরা উদ্ধার করেছিলে, সেই স্পটটা দেখিয়ে দেয়।

— স্পট দেখে কি করবে? স্পটের সুরৎহাল করবে? কি অবস্থায়, কেমন ভাবে জয়রামের লাশটা পড়েছিল, সেটা দেখবে? জয়রামের লাশ ওই স্পটে ফেলে দেওয়ার সময় সঙ্গে ক'জন ছিল, সেটা অনুমান করার চেষ্টা করবে? বেদপ্রকাশ শ্লেষজড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল নেপালকে।

— সুরৎহাল করা আমার কাজ নয়। সেটা তো তোমার অফিসাররা করে রেখেছে। আর জয়রামের লাশ জিয়াউদ্দিনের গোপন ডেরা থেকে কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টে বয়ে নিয়ে এসেছিল যারা, তাদের সংখ্যা কোনও অবস্থাতেই চারজনের কম ছিল না। স্পটে জুতোর দাগের সংখ্যা দেখে এটা তোমাদেরই অনুমান। এসব ইনফর্মেশন তোমাদের এনকোয়ারি রিপোর্ট এবং জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। সুতরাং ওসব দেখার কোনও আগ্রহ আমার নেই। নেপাল থামল।

— তবে কি দেখতে যেতে চাইছ? বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল— তাও আবার একা একা! উইদাউট হেল্প অফ পুলিশ ফোর্স বিশেষ করে তুমি যখন ভাল করে জানো যে, কানহাইয়া টং ফরেস্টে জিয়াউদ্দিনের আসল সেন্টার।

— দাগ দেখতে। জুতোর দাগ। নেপাল সাড়া দিল।

— ঘটনা ঘটেছে সেই নাইনটিন্থ মর্নিং-এ। আজ টুয়েন্টি সেভেন্থ। এর মধ্যে বৃষ্টি বাদলা কম হয়নি। তুমি কি ভাবছো এরপরেও ওই স্পটে মাটির ওপর জুতোর দাগগুলি কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? সব ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে না!

— মনে হয় যায়নি। নেপাল বলল— যাক, অনেকটা সময় নষ্ট করেছি আমরা। এবার তুমি গাড়ির বন্দোবস্ত করলে বাধিত হব।

আমি বেলায় বেলায় ফিরে আসতে চাই। কারণ, তারপর আমার ভাইপোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি আলোচনা করার আছে।

— তোমার সহকারি কোথায়? তাকে তো দেখছি না? বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল।

— ওকে একটা জরুরি কাজে পাঠিয়েছি। বিকেলের মধ্যেই ও কাজ সেরে হোটেলে ফিরে আসবে। নেপাল কথা শেষ করার আগেই শুনল বেদপ্রকাশ বেল বাজিয়ে প্রহরীকে ডেকে আদেশ দিল— পাশোয়ানকে গাড়ি নিয়ে আসতে বল।

একটু পরেই বেদপ্রকাশের চেম্বারের সামনে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ শোনা গেল। প্রহরীটি জানাল— গাড়ি রেডি সাব।

বেদপ্রকাশ নেপালকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারের বাইরে এল। চালক পাশোয়ানকে ডেকে আড়ালে নিয়ে বেদপ্রকাশ ভালো করে বুঝিয়ে দিল পাশোয়ানের দায়িত্বটা। তারপর নেপালকে বলল— বেস্ট অফ লাক। তবু সতর্ক থেকো।

প্রায় একটানা ঘন্টা দুই কালো রঙের স্করপিওটা ছুটে চলল। এদিকের রাস্তার অবস্থা যথেষ্ট ভাল। আসলে এটা তো ন্যাশনাল হাইওয়ে। নাম টাটানগর—হাজারিবাগ ন্যাশন্যাল হাইওয়ে। ফলে রাস্তায় যানবাহনের চাপ খুব একটা কম নয়। বিশেষ করে বারো চাকা, আঠারো চাকার ভারি লরিগুলি চলেছে সারি দিয়ে। সড়ক পথে হেভি মেশিনারিজ বহন করার জন্যই মূলত এই লরিগুলি ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও হাজারিবাগের দিক থেকে গাড়ি বোঝাই করে কয়লা এবং আকরিক লোহা-হেমাটাইটও বহন করা হয় টাটানগর লোহা কারখানার প্রয়োজনে।

টাটানগর-হাজারিবাগ সড়কটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হৃদপিণ্ডের প্রধান রক্তবাহী ধমনী বললেও ভুল হবে না। টাটানগরে এই জাতীয় সড়কটা বেরিয়েছে মুম্বই হাইওয়ে থেকে। তারপর রাজধানী শহর রাঁচির বুকের ওপর দিয়ে রামগড় পেরিয়ে হাজারিবাগে গিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক— গ্র্যাণ্ডট্যাঙ্ক রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে টাটানগর-হাজারিবাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি উন্নত সড়ক কেবল যে উন্নয়নের পথকে সুগম করে তোলে এমন নয়, উন্নত সড়ক আবার ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বিপদও ডেকে আনে। যেহেতু উত্তর ভারতের প্রধান সড়ক— জি টি রোডের সঙ্গে যুক্ত টাটানগর—হাজারিবাগ সড়ক, ফলে উত্তর বিহার থেকে নেপালে আশ্রয় নেওয়া উগ্রপন্থীরা সহজেই এই সড়ক ব্যবহার করে সোজা চলে যেতে পারে মুম্বই জাতীয় সড়কে। সেখান থেকে ছত্তিশগড় হয়ে পৌঁছিয়ে যেতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশের সাগর উপকূলের দুর্গম বনাঞ্চলে। ফলে এই সড়কটি সন্ত্রাসবাদীদের আসা-যাওয়ার করিডর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ি এখন রামগড় পাহাড় শ্রেণীর চড়াই ভেঙেছে। দু'দিকে কেবল পাহাড়ই নয়, ঘন অরণ্য বেষ্টিত ঊষর উপত্যকা। নেপাল দেখল রাস্তায় পথচারীদের সংখ্যা খুবই বিরল। কচ্চিৎ কদাচিৎ একজন কি দু'জন দেহাতী মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে, এদের চেহারায় দারিদ্র্যের চিহ্ন যত প্রকটই হোক, এদের সকলের পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বরাবরের জুতো। কালো জুতোর গায়ে সাদা ছোপ।

— এদিকে কি চুনাপাথরের মাইন আছে? নেপাল পাশোয়ানকে জিজ্ঞেস করল।

— জী সরকার। পাশোয়ান পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক অতিক্রম করার জন্য স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বলল— ওই পাহাড়িয়ার পিছে ঢোলপুরে একটা চুনাপাথরের খনি আছে। এদিককার গাঁওবালে ওই খনিতেই কাজ করে। তবে আমরা কিন্তু ওই খনি পর্যন্ত যাব না। তার আগেই লাকরাখান্দার মোড় থেকে ফরেস্টে নেমে যাব।

নেপাল সাড়া দিল না। কারণ তার চুনাপাথরের খাদান দেখার কোনও কৌতূহল নেই। তার যা জানার, জানা হয়ে গেছে।

একসময় গাড়ি একটি পোড়ো মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশোয়ান গাড়ি থেকে নেমে বলল— সাব এটাই কানহাইয়া টং-এর ফরেস্ট। খুব ঘন জঙ্গল। সাবধানে যাবেন।

মন্দিরটায় সম্ভবত কোনওকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। তবে ধ্বংসস্তূপের ইঁটের মাপ এবং নির্মাণশৈলী দেখে নেপাল বুঝতে পারল মন্দিরটি সম্ভবত রাঢ়ভূমের মল্লরাজাদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি হাম্বীরের শাসনকালে নির্মিত। কারণ মল্লরাজবংশ প্রধানত শাক্ত মতাবলম্বী হলেও হাম্বীর শেষ জীবনে বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাসের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব মতাবলম্বী হয়ে ওঠেন। তার সময় কেবল বিষ্ণুপুর কিংবা রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের আরাধনার জন্য এজাতীয় স্বল্প উচ্চতার চ্যাপটা ইঁট দিয়ে মন্দির বানানোর প্রচলন ঘটেছিল। যদিও হাজারিবাগের বনাঞ্চল পর্যন্ত মল্লরাজাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল না। তবে তাদের প্রভাবেই এদিককার কোনও নৃপতি মন্দিরটি বানিয়েছিলেন। একটু উঁচু ভূ-খণ্ডের ওপর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলেই হয়তো এই বনাঞ্চলের নাম লোকমুখে কানহাইয়া টং হয়ে গিয়েছিল।

যত ঘন বনাঞ্চলই হোক, নেপাল আশ্চর্য হয়ে দেখল, ঘন গাছগাছালির ভেতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষ যাওয়ার মতো সরু রাস্তা একটা আছে। রাস্তার দু-পাশের গাছগাছালির মধ্যে অধিকাংশই নিশিন্দা, ভেরেণ্ডা আর আকন্দর ঝোপঝাড়। গাছগুলির শাখাগুলি ছাঁটা। ফলে পথ ভাঙতে কোনও অসুবিধা হল না নেপালের।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে প্রবলভাবে। সঙ্গে সরীসৃপদের বুক টানার সর্‌সর্‌ শব্দ। কাছেপিঠে একটা ডাহুক ডেকে উঠল। একটা বেজি ছুটে গেল নেপালের সামনে দিয়ে।

একসময় নেপাল তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছালো। জায়গাটা একটা মস্তবড় চাতাল। এমন ঘন বনভূমির ভেতর এমন একটা সুপরিসরের চাতাল যে থাকতে পারে, বাইরে থেকে দেখে কল্পনা করা যায় না। চাতালটি যে নিকট অতীতে গাছ কেটে তৈরি হয়নি, সেটা চাতালের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই চাতালে কোনওদিন গাছপালা জন্মায়নি। কারণ চাতালটি চুনাপাথরের বিশাল চাঙড় ছাড়া আর কিছু নয়। সেই চাতালের ওপর এখনও দগদগ্‌ করছে বেশ কিছু

জুতোর ছাপ। নেপাল নিঃশব্দে জুতোর দাগগুলির ছবি তুলতে লাগল তার ক্যামেরায়। তারপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

।। দশ ।।

কানহাইয়া টং থেকে ফেরার পথে নেপাল আর রাতু রোডে বেদপ্রকাশের অফিসে গেল না। লালপুর চক-এর কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। চালক পাশোয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলল— তুমি দপ্তরে ফিরে যাও। ডি আই জি সাহেবকে বলো, আমি ফোনে কথা বলে নেব।

পাশোয়ান মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

নেপাল লালপুর চকে নেমে ডান হাতে রাজস্থান হোটেল বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। লালপুর চক এলাকাটা মূলতই বাণিজ্যভিত্তিক অঞ্চল। এখানে রাজস্থান হোটেল নামের যে হোটেলটি আছে, তা মূলতই মাল্টি প্লেক্স। গ্রাউণ্ড ফ্লোরটা মূলতই বিপণন কেন্দ্র। বিভিন্ন পণ্যের বহু দোকান আলোকমালায় সেজে উঠে বিপণন কেন্দ্রটিকে প্রাণময় করে তুলেছে। দোতলার একটা অংশে সম্ভবত বিউটি পার্লার। জিমনাসিয়াম। বাকি অংশে হোটেল রাজস্থানের রিসেপশন। সমগ্র তিনতলা, চারতলা আর পাঁচতলা জুড়ে হোটেল।

ঠিক এমন সময় নেপাল শুনল তার সেল ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে সেল ফোনটা বের করে স্ক্রীনে ফুটে ওঠা নম্বর দেখল নেপাল। রুবান ফোন করছে। সেলফোনের বোতাম টিপে কানে ধরল নেপাল— বল।

— আমি হোটেলে ফিরে এসেছি ছোটকা। রুবানের গলা ভেসে এল— তুমি এখন কোথায়?

— লালপুর চকে। নেপাল বলল— তোর কাজ কিছু হয়েছে?

— হলো বলতে হলো! রুবানের গলার উচ্ছ্বাস সেলফোনেও শোনা গেল— বলতে পারো মিশন হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেশফুল। আমি কিছু প্রিন্টআউটও নিয়ে এসেছি ডাউনলোড করে। তুমি হোটেলে কখন ফিরছ?

— আমার একটু দেরি হবে। নেপাল বলল— লালপুর চকের কাজ সেরে আমি কাঁটাতলি মোড়ে আবার এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মীট করতে যাব। সেখান থেকে হোটেলে ফিরব।

— তাহলে আমি বিকেলের টিফিনটা একা একা সেরে নিচ্ছি। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

— খেয়ে নে। তারপর হোটেলেই থাকিস। আমি এলে সবিস্তার কথা হবে। নেপাল কথা থামিয়ে হোটেল রাজস্থানের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে শপিং কমপ্লেক্সের ভেতর ঢুকল।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না নেপালকে। খুব সহজেই একটা ফটোগ্রাফিক্স-এর স্টুডিও পেয়ে গেল নেপাল। সাইনবোর্ড দেখল। সিটি স্টুডিও। শপ নম্বর তেইশ। লালপুর চক।

এক মাঝবয়সের ভদ্রলোক স্টুডিওটার মালিক। ভেতরে স্টুডিওতে সম্ভবত এক নতুন দম্পতি ছবি তুলছে। স্টুডিওর দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দৃশ্যটাকে উজ্জ্বল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বউটা ঘেমে উঠছে।

— বলিয়ে সার! আপকো ক্যায়সে সেবা করুঁ? মালিক লোকটি নেপালকে দেখে খাতির করে দোকানে বসাল।

নেপাল ক্যামেরা থেকে সদ্য ফুরানো ফিল্মের রিলটা বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল— ফটোগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডেভেলপ করে দিতে হবে। পারবেন?

— কবে চাই? মালিক জিজ্ঞেস করল।

— পারলে কাল সকালে। নেপাল বলল।

— সবেরে নেহি হোগা। মালিক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল— আমার ডেভেলপিং রুমে কাজ করার লোকের খুব শর্টেজ চলছে স্যার। সবাই দশেরা মানাতে আজ সকালেই মুল্লুক চলে গেছে। আছে কেবল একজন। আপ কাল সাম কো আইয়ে। ছ'বজে ডেলিভারি দিয়ে দেব।

— পাক্কা কথা তো? নেপাল ট্রাউজারের পেছনের পকেট থেকে পার্স বের করতে করতে বলল।

— জী পাক্কা। কথা দিয়ে মালিক ভদ্রলোক ক্যাশমেমো বের করতে করতে বলল— কোথাকার ফিল্ম খিঁচলেন বাবু? দশম ফলস্?

— সেটা রিল খুললেই দেখতে পাবেন। নেপাল হাসল— কেবল জুতোর সোলের ছাপ। ভেজা মাটিতে পড়া অনেকগুলি জুতো পরা পায়ের ছাপের ছবি তুলেছি।

— আজব কী বাত! মালিক ভদ্রলোকটি আলোর সামনে রিল খুলে নেগেটিভগুলি দেখতে দেখতে মন্তব্য করল— কেবল জুতোর সোলের ছাপের ফটো খিঁচে আপনি একটা গোটা রিল খরচ করে ফেললেন!

— দরকার আছে। নেপাল পার্স থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে মালিক ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল— দুশো টাকা অ্যাডভান্স দিলাম। বাকি টাকা কাল বিকেলে ডেলিভারির সময় দেব।

মালিক ভদ্রলোকটি ক্যাশমেমো কেটে নেপালকে দিল। নেপাল ক্যাশমেমোটা ভাঁজ করে পার্সের ভেতর রাখল।

— সাব, আপ সায়দ কৈ জাসুস হোঙ্গে? মালিক ভদ্রলোকটি মন্তব্য করল।

— নেহি। ফুটরিডার। নেপাল হাসতে হাসতে শপিং কমপ্লেক্সে থেকে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা নামছে রাঁচি শহরে। আজ তো মহানবমীর সন্ধ্যা। দুপুরে একপশলা বৃষ্টির পর সারা বিকেল আর বৃষ্টি হয়নি। এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার। টেগোর হিলের মথা ডিঙিয়ে নবমী সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছে। এদিকে আকাশে এখনও সন্ধ্যা তারা যথেষ্ট উজ্জ্বল।

প্রমথেশবাবু— প্রমথেশ ঘোষের সঙ্গে নেপালের আলাপটা

অনেক দিনের। প্রমথেশবাবু একসময় বাঁকুড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বাঁকুড়া শহরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার কাজ করতে করতেই তিনি রাঢ়ভূমের মল্ল রাজপরিবারের স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। গবেষণা শুরুর পরে প্রমথেশবাবুর অনুসন্ধিৎসা কেবলমাত্র মল্লভূমের রাজবংশের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাজপরিবারের সীমানা অতিক্রম করে তার গবেষণা ছড়িয়ে পড়ে এই অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির ইতিহাসের দিকে। পাইক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ— এসবের ওপর তিনি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিয়ে বছর দশ হল তিনি রাঁচিতে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে বসবাস করছেন। প্রমথেশবাবুর স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছিল মেয়ের বিয়ের আগেই।

বছর পাঁচেক আগে শিমুলতলায় বেড়াতে আসা এক অবস্থাপন্ন বাঙালি পরিবারের কাছ থেকে সোনার নারায়ণ মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময় প্রমথেশ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নেপালের। সেই চুরি রহস্য ভেদ করার জন্য 'সাঁওতাল পরগণার ইতিহাস এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামক প্রমথেশবাবু প্রণীত গ্রন্থটি ভীষণ কাজে লেগেছিল নেপালের। তখনই নেপাল কলকাতার প্রকাশকের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে প্রমথেশবাবুর রাঁচির বাড়িতে যোগাযোগ করেছিল। তারপর গত পাঁচ বছরে সেই আলাপ আরও ঘন হয়েছে।

লালপুর চক থেকে একটা অটো নিয়ে নিল নেপাল। তারপর কাঁটাতলি কলোনী পৌঁছে প্রমথেশবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না নেপালের।

প্রমথেশবাবু বাড়ি ছিলেন। তবে মেয়ে এবং নাতি নবমীর সন্ধ্যা বলে কাঁটাতলি মোড়ের পুজো প্যাণ্ডেলে গেছে। জামাই এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। প্রমথেশবাবুর জামাই ঊষা মার্টিন অ্যাণ্ড ব্ল্যাক কোম্পানিতে কাজ করে। অ্যাকাউনটেন্ট। ওদের নবমীর দিনেও অফিস।

— আসুন, আসুন মিস্টার রায়। বৃদ্ধ প্রমথেশবাবু নেপালকে খাতির করে বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ড্রয়িং রুমে একটা সোফায় বসালেন। তারপর বললেন— আমাদের দু'জনের আলাপ সেই পাঁচ বছরের। অথচ আজ কিনা চর্মচক্ষে আপনার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য হল!

প্রমথেশ ঘোষের বয়স সত্তর পূর্ণ করেছে। মাথায় যথেষ্ট উঁচু। উচ্চতা ছ'ফুটের কাছাকাছি হবে। অধ্যাপনার মতো শারীরিক শ্রমহীন পেশায় যুক্ত থাকলেও প্রমথেশবাবুর শরীরটা বেশ শক্ত। স্পষ্টই বোঝা যায় গবেষণার নেশায় তিনি রাঢ়ভূমি এবং ছোটনাগপুর এলাকা একসময় চষে বেড়াতেন। এই কারণে তাঁর শরীরে সত্তর বছর বয়সেও সামান্য শিথিলতার স্পর্শ লাগেনি। শরীরের পেশীগুলি এখনও পাথরে খোদাই বলে মনে হয়।

বাড়ির কাজের লোকটি একটা প্লেটে গোটা কয়েক মিষ্টি দিয়ে

গেল নেপালকে। নেপাল মৃদু আপত্তি করতেই প্রমথেশবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন— মহানবমীর সন্ধ্যায় আপনি এলেন। আর মিষ্টিমুখ করবেন না, তা কি হয়!

নেপাল কথা না বাড়িয়ে কাঁটায় একটা রসগোল্লা মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল— রামগড় এলাকাটা তো একদিন সাঁওতাল উপজাতির রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে, তাই না

স্যার?

— ঠিক সাঁওতাল উপজাতি নয়। এরা ছিল মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের রাজা ঝিন্দারাই মুণ্ডা রামগড়ের কাছাকাছি একটি স্থানে একটা গড় বানিয়েছিলেন। কোল বিদ্রোহের পর লর্ড আমহার্স্টের বর্বর সেনাদের সঙ্গে ঝিন্দারাই মুণ্ডার সেনাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। রাজা সেই গড়ের ভেতর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। আপনি এ বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হলে আমার এই বইটা দেখতে পারেন। বলতে বলতে ড্রয়িং রুমে সাজানো বইয়ের র‍্যাক থেকে প্রমথেশবাবু একটি বই নিয়ে নেপালকে দিলেন। নেপাল ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল। এবার হোটেল।

।।এগারো।।

"ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী কোলেরা হো, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলে তারা স্বাধীনভাবেই বসবাস করত। কিন্তু আঠারোশো কুড়ি খৃষ্টাব্দে পোড়হাটের এক কোল নৃপতি বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এই আনুগত্য স্বীকারের জন্য রাজাকে বিপুল পরিমাণের বার্ষিক কর দিতে হতো বৃটিশ রাজ কোষাগারে। এর পুরস্কার স্বরূপ পোড়হাটের রাজা সূরজ সানকি হাজারিবাগ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু হো সম্প্রদায়ের রাজা নোয়া মুণ্ডার রাজ্য যখন দাবি করে বসেন, তখন বৃটিশ সরকার বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সূরজ সানকিকে সাহায্য করেছিল এবং নোয়া মুণ্ডাকে পরাজিত করে তার রাজ্য সূরজ সানকিকে উপহার দেয়। এরপর সূরজ সানকি যখন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তার নতুন অধিকৃত নোয়া মুণ্ডার রাজ্য থেকে রাজস্ব আদায় করতে যান, তখন তিনি হো সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশাল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। হো জনজাতির মানুষের হাতে বেশ কয়েকজন ইংরেজ রাজকর্মচারী নিহতও হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজা সূরজ সানকির সাহায্য নিয়ে বিশাল বৃটিশ সেনাবাহিনী জঙ্গল মহলে প্রবেশ করে। কোলরা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত, সমরবিদ্যায় প্রশিক্ষিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে কেবলমাত্র বল্লম আর তীরধনুক সম্বল করে মরণপণ সংগ্রাম করে শহীদ হন। বৃটিশ সেনা এরপর অরণ্য সন্তানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। বস্তুত কোল বিদ্রোহের সূচনাটা ঘটেছিল এভাবেই।"

— তাহলে দেখা যাচ্ছে, মীরজাফর কেবল উচ্চবিত্তের মধ্যেই থাকে না, সরল সৎ আর সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত অরণ্যের সন্তানদের মধ্যেও মীরজাফররা লুকিয়ে থাকে। সময় হলে আত্মপ্রকাশ করে। অনেকটা স্বগতোক্তির মতো কথাগুলি বলল নেপাল। তারপর বইটা বন্ধ করল।

রুবান দেখল বইটার নাম— 'হলোকস্ট অফ ট্রাইবাল ওয়্যারফেয়ার'। গ্রন্থটির লেখক, প্রমথেশ ঘোষ। রুবানের মনে পড়ল এই লেখকের দুটি গ্রন্থ সে তাদের কলকাতার যোধপুর পার্কের বাড়িতে নেপাল কাকার লাইব্রেরিতে দেখেছে আগেই। তবে এই গ্রন্থটিকে দেখেনি। সম্ভবত নতুন সংগ্রহ।

— তুমি এই বইটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলে? হার্ডবোর্ডে বাঁধানো বইটা নাড়াচাড়া করে রুবান দেখল গ্রন্থটির প্রকাশক 'পেঙ্গুইন বুকস্' ইণ্ডিয়া। রাঁচির মতো জায়গায় এমন বই তো সহজে পাওয়ার কথা নয়।

— রাঁচি বলেই তো সহজে জোগাড় হয়ে গেল। নেপাল খাট থেকে উঠে বসল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল নেপাল— এই বইয়ের অথর স্বয়ং এখন রাঁচির বাসিন্দা। কাঁটাতলি কলোনীতে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে আছেন।

— এতসব তুমি জানলে কেমন করে? রুবানের প্রশ্ন।

— প্রমথেশবাবুর সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ। তবে এতদিন আলাপটা ফোনে আর ই-মেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আজ কানহাইয়া টং ফরেস্ট থেকে ফেরার পর আমি গেছিলাম প্রমথেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। উনি-ই আমাকে তাঁর সংগ্রহ থেকে এই বইটা দিলেন।

— মাই গড! রুবান বলে উঠল— তুমি যে কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টে যাবে, আমাকে বলোনি তো?

— বললে তুই কি আমার সঙ্গ ছাড়তিস! নেপাল হাসল।

— অবশ্যই নয়। রুবান বলল— এমন একটা এক্সাইটিং জার্নি, সঙ্গী হওয়ার সুযোগ কি কেউ ছাড়ে?

— তোর কাজটাও কম এক্সাইটিং ছিল না। তুই একবেলার মধ্যে তামাম দুনিয়ার বন্দুক কোম্পানির ওয়েবসাইটে ভিজিট করে যে সেনসেশনাল ইনফর্মেশন কালেক্ট করে এনেছিস, তার দাম অনেক। নেপাল বলল।

— সত্যি নেপালকাকা, টানা পাঁচ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন সাইটে ভিজিট করতে গিয়ে আমার পিঠ কাঁধ ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছে। ভাবছি রাতে ডিনারের পরে একটা পেইন কিলার খেয়ে ঘুমোবো। রুবান বলল।

— এখন বুঝতে পারছিস এখানেও আছে একজন মীরজাফর। নেপাল বলল।

— সত্যি পয়েন্ট ওয়ান নাইন এইট এম এম বুলেটটা জয়রামের আততায়ীর কাছে এল কেমন করে? ওই বুলেট প্রস্তুত করে খোদ সুইজারল্যাণ্ডের এক কোম্পানি। ওদের এই প্রোডাক্টের একমাত্র ক্রেতা আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। ওদের গোপনীয়তা তো বিশ্বখ্যাত।

— মীরজাফররা সব দেশে সব কালেই থাকে রে রুবান। নেপাল দগ্ধ সিগারেটের বাটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল— আমেরিকার এফ বি আই পুলিশও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। ওদের মধ্যের কোনও মীরজাফর ওই বুলেট বাইরে চড়া দামে পাচার করে না— এমন ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই।

— কিন্তু বুলেট না হয় বাইরে বেরুল। যে রকম সফিস্টিকেটেড বন্দুকে এই বুলেট ব্যবহার হয়, সেই বন্দুক পাবে কেমন করে জিয়াউদ্দিন? বলতে বলতে রুবান তার সংগ্রহ থেকে ডাউনলোড করে আনা সেই অদ্ভুত গঠনের বন্দুকের ছবিগুলি তুলে দিল নেপালের হাতে।

— নেপাল সিটটা দেখল খুব মনোযোগ দিয়ে। তিনটে ক্রশ সেকশন দেখানো হয়েছে। সেগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় উচ্চতাপ সহ কঠিন কোনও ধাতু শংকর দ্বারা নির্মিত তিন তিনটি সরু ব্যারেল বেরিয়ে আছে একটি কেন্দ্রীয় চেম্বার থেকে। চেম্বারটি এমনভাবে নির্মিত যে সেটি একটি লম্বা ধাতব পাতের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে। চেম্বারের ঠিক নিচে ট্রিগারের পরিবর্তে একটা স্প্রিং যুক্ত নাট আছে। সেটি আবার এমন একটা হাতলের সঙ্গে যুক্ত যা দেখে যে কেউ বন্দুকটিকে মাটি কোপানোর কোনও ছোট যন্ত্র বলে মনে করতে পারে। ব্যারেল তিনটির মুখে সহজেই প্রয়োজন মতো ইস্পাতের পাত যোগ করে বন্দুকটিকে কখনো খুরপি, কখনও নিড়ানী, কখনও ছোট শাবল কিংবা ছোট কাটারি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। .... নেপাল বন্দুকের ক্রশ সেকশনের ড্রয়িংগুলি দেখে রুবানকে ফিরিয়ে দিল। তারপর বলল— বন্দুকটির একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিস কি?

— ভীষণ আনকমন দেখতে। দেখে মনেই হবে না এটা একটা এরকম সফিস্টিকেটেড ওয়েপন। হাতে ক্যারি করলে সকলের মনে হবে নেহাৎই বাগান-টাগানের কাজের কোনও যন্ত্র। রুবান বলল— তাই ক্যারি করার সময় পুলিশকে বোকা বানানো যায়।

— তুই তো কেবল যন্ত্রটির চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বললি। নেপাল বলল— আমি এর এফিসিয়েন্সি নিয়ে বলতে চাইছি। আর সব বন্দুকের থেকে গুণগত দিক দিয়ে এটার পার্থক্য কোথায়?

— তুমি বল। রুবান মাথা নাড়ল।

— একবার ফায়ার করার পরেও ব্যারেলের মুখ পরীক্ষা করে বোঝার কোনও উপায় থাকবে না যে, এই বন্দুক থেকে গুলি করা হয়েছে। ফলে কোনও কালপ্রিট যদি খুব কাছ থেকেও কোনও ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে এবং বন্দুক সহ ধরাও পড়ে, তবে বন্দুকের ব্যারলের মুখ থেকে প্রমাণ করা অসম্ভব হবে যে গুলিটা সে এইমাত্র করেছে। নেপাল চিন্তিত গলায় বলল।

— তা কি করে সম্ভব! রুবান বলল— ব্যারেলের মুখে অন্তত এক্সপ্লোসিভ মেটিরিয়ালের অবশিষ্ট অংশ জড়িয়ে থাকবে।

— না। কোনও বারুদ জড়িয়ে থাকবে না। কারণ, ব্যারেলের ক্রশ সেকশন থেকে পরিষ্কার হচ্ছে যে ব্যারেলের ভেতরে হাই টেম্পারেচার স্ট্যাণ্ড করার মতো ভিনাইল ক্লোরাইড নামক পলিমারের লেয়ার দেওয়া আছে। ভিনাইল ক্লোরাইড যে কেবল হাই টেম্পারেচারই স্ট্যাণ্ড করতে পারে এমন নয়, যে কোনও এক্সপ্লোসিভ আফটার এক্সপ্লোসন অনায়াসে তাতে শোষিত হয়ে যায়। নেপাল ডট পেন দিয়ে প্যাডের ওপর স্কেচ করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল রুবানকে।

— এই কারণে বুলেটের ডায়ামিটার এত কম! রুবান বলল— ব্যারেলের ডায়ামিটার দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম না বুলেটগুলি এত সরু এবং তীক্ষ্ণ কেন! রুবান বলল— আসলে ব্যারেলের ইনার ডায়ামিটারই তো পলিমারের কোটিংয়ের জন্য কমে গেছে।

— রাইট ইউ আর। নেপাল রুবানের পিঠ চাপড়ে দিল।

— কিন্তু গুলির সাইজ আর ওয়েট দেখে বোঝা যাচ্ছে একবার ব্যারেল থেকে বেরিয়ে খুব একটা মোমেন্টাম গেইন করতে পারবে না। কারণ এত কম ওয়েটের একটা খোলের ভেতর কতটুকু আর বারুদ থাকে যে এক্সপ্লোসনের পরে হাই মোমেন্টাম গেন করবে? রুবান নেপালের মনযোগ আকর্ষণ করল।

— ঠিক ধরেছিস। নেপাল বলল— এই কারণে খুনীকে তার লক্ষ্যবস্তুর একেবারে কাছ থেকে, ধর লক্ষ্যবস্তুর গায়ে লাগিয়ে গুলি করতে হবে। আর মোমেন্টাম কম থাকার জন্য মাথা ভেদ করে গুলি বেরুবে না। কাজের কাজ করে দেবে।

— যেমন জয়রামকে খুন করা হয়েছে! আর জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে তুমি পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম-এর বুলেটের উল্লেখ দেখেই আমাকে ওই বুলেটের নির্মাণকারী কোম্পানির খোঁজ নিতে বলেছিলে। রুবান বলল— তাই না নেপালকাকা!

— ঠিক ধরেছিস। নেপাল বলল— চল, এবার ডিনারটা সেরে আসি।

।। বারো ।।

"আঠারো শো একত্রিশ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কোল উপজাতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজস্ব আদায়ের জন্য ছোটনাগপুর অঞ্চ ল বহু অবাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও শিখ মহাজনদের ইজারা দিয়েছিল বৃটিশ সরকার। এই সব মহাজনদের লোভ ছিল অপরিসীম। দয়ামায়া বলতে কিছুই ছিল না। ফলে রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমিপুত্রদের ওপর এইসব মহাজনদের অত্যাচারের কোনও সীমা ছিল না। পুরুষ কোলদের বেত্রাঘাত, অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে শরীরের মাংসপেশিতে ছিদ্র করা, হাতের এবং পায়ের আঙুলের নখ উপড়ে ফেলা— সবরকম বর্বর অত্যাচারের আশ্রয় নিত মহাজনরা। আর কোল রমণীদের ধর্ষণ, ধর্ষণের পর নিজের নিজের খামারবাড়িতে ক্রীতদাসী রূপে ব্যবহার করা হত।

এই শোষণ ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে বুদ্ধ ভগত, জোয়া ভগত ও সুই মুণ্ডা গর্জন করে ওঠেন। তারা দক্ষতার সঙ্গে কোলদের সমবেত করে কঠিন সংগঠন গড়ে তোলে। আঠারো শো একত্রিশ খৃষ্টাব্দে রাঁচি মেলায় মুণ্ডা ও ওরাঁও সম্প্রদায়ের কৃষকরা সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে রাঁচির পার্শ্ববর্তী জঙ্গল মহলেও। সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ ও পালামৌ জেলার সর্বত্র এই বিদ্রোহ দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়।

ঠিক এই সময় রামগড় উপত্যকায় একজন মুণ্ডা রাজা বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। বুদ্ধ ভগত, জোয়া ভগত এবং সুই মুণ্ডার নির্দেশে মুণ্ডা রাজা ঝিন্দারাই মুণ্ডা হাজারিবাগ জেলা থেকে সব মহাজন, জমিদারদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় পূর্বে, বাংলা সীমান্তে। এতবড় পরাজয় বৃটিশরাজ সহ্য করেনি। বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট-এর নির্দেশে বিশাল এক সেনাবাহিনী জঙ্গলমহলের দিকে অভিযান করে। হাজারিবাগের বনাঞ্চল ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী সশস্ত্র বাহিনী। ক্রমাগত গোলাগুলি বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যায় রামগড় জঙ্গলে, ঝিন্দারাই মুণ্ডার গড়ের দিকে। একটানা চৌদ্দ দিন এক অসম লাড়াই চালিয়ে যান রাজা ঝিন্দারাই মুণ্ডা। পঞ্চ দশ দিনে বৃটিশ সেনা গড়ে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রবেশ করে বৃটিশ সেনা দেখে গড়ের ভেতর রাজা রানী সহ সব সেনা কর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ হবে। বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর ম্যাকডোলান পঞ্চাশটি শবদেহকে সৎকারের জন্য গড়ের প্রবেশ পথ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় শো গজ দূরত্বে জঙ্গলের ভেতর মাটির ওপর চুনাপাথরের এক প্রশস্ত চাতালের ওপর পঞ্চাশটি চিতা জ্বালিয়ে গণসৎকার করেছিলেন।

ঝিন্দারাই মুণ্ডার নির্মিত সেই গড় আজও কোল বিদ্রোহের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কানহাইয়া টং নামক এক স্বল্প উচ্চতার টিলার পাশ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করলে কিছুটা জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রমের পরে প্রথমে সেই হতভাগ্য চাতালটিকে পাওয়া যায়— যার ওপর ঝিন্দারাই মুণ্ডা এবং তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং রাজ পরিবারের বিশ্বস্ত অনুচরের মৃতদেহ সৎকারের জন্য একদিন পঞ্চাশটি গণচিতা জ্বালানো হয়েছিল। এখন ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের চুনাপাথরের স্তরের ওপর কিছু সবুজ আগাছা জন্মেছে ঠিকই, তবে কোনও বৃহৎ বৃক্ষ জন্মাতে পারেনি। রাজা ঝিন্দারাই নির্মিত গড়টির নির্মাণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখের দাবি রাখে। দিল্লীর খিলজী রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর সন্নিকটে মেহরালিতে যে আলাই দরওয়াজা নামক দরবার মহল নির্মাণ করেছিলেন, ঝিন্দারা গড়ের বিচারশালাটিও ঠিক এমনই প্রযুক্তিতে তৈরি। এই মহলটির বৈশিষ্ট্য হল, মহলের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে বাইরের চারদিক দৃশ্যমান হয়। তবে বাইরের কোনও অবস্থান থেকেও কেন্দ্রবিন্দুতে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দৃষ্টিগোচর করা যায় না। গড়টির ছাদ একটি সুউচ্চ ডুমাকৃতির। তার ওপর একটি মিনার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একটি ঐতিহাসিক কর্ম রক্ষার্থে কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার আজও কোনও উদ্যোগ নেয়নি।"

এখন রাত কত হবে? নেপালর প্রমথেশবাবুর গ্রন্থটা বন্ধ করল। ঘড়ি দেখল— রাত বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। পাশের বেডে রুবান এখন ঘুমের অতলে ডুবে আছে। বেচারা রুবানের ওপর আজ অনেক বড় পরিশ্রম গেছে। তবু তো সারাদিন নেট সার্চ করে এমন কতগুলি তথ্য সংগ্রহ করেছে যা এই তদন্তের পক্ষে অমূল্য। এটা এখন নেপালের কাছে পরিষ্কার যে জয়রামকে যে খুন করেছে সে রুবানের সংগ্রহ করে আনা সেই বিচিত্র ধরনের বন্দুক ব্যবহার করে খুন করেছে। এই কারণেই মৃত জয়রামের মাথার ভেতর থেকে পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম বুলেটের পোড়া খোল পেয়েছে পোস্টমর্টেমকারী ডাক্তার। কিন্তু জয়রামের মতো এমন একটা সামান্য পুলিশের চরকে খুন করার জন্য আততায়ী অহেতুক পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম-এর মতো বিরল এবং মূল্যবান বুলেট খরচ করতে যাবে কেন? জিয়াউদ্দিনের যে পরিচয় নেপাল বেদপ্রকাশের কাছ থেকে পেয়েছে, তা থেকে নেপাল এটা অনুমান করতেই পারে যে, জিয়াউদ্দিনের গ্যাং-এ লোকসংখ্যা খুব কম নয়। এরা সবাই আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই পরিচালিত বিভিন্ন সমর শিক্ষার শিবিরে শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ফলে জয়রামকে মারার জন্য জিয়াউদ্দিন তার সঙ্গীদের কাউকে হুকুম দিতে পারত। এবং সঙ্গীটি একটা সাধারণ থ্রি নট থ্রি বুলেট ব্যবহার করে জয়রামকে খুন করতে পারত। এর জন্য অহেতুক একটি মূল্যবান বন্দুক এবং তার চেয়েও বেশি মূল্যবান বুলেট খরচের দরকার ছিল না।

তাহলে কি জয়রাম জিয়াউদ্দিন কিংবা তার গ্যাং-এর কারুর হাতে খুন হয়নি? জয়রামকে এমন কেউ খুন করে ঘটা করে বৃষ্টি বাদলা মাথায় নিয়ে কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে ফেলে রেখে এসেছে— যে আদৌ জিয়াউদ্দিনের শিবিরের লোক নয়! যদি জয়রামের মৃতদেহ ঝুঁকি নিয়ে কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে ফেলে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় যে বেদপ্রকাশের পুলিশের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, তাহলে জিয়াউদ্দিনের লোক ওই জঙ্গলেই ফেলে আসবে কেন? তারা তো ইচ্ছে করলে জয়রামের লাশটা রামগড়ের কাছে টাটানগর—হাজারিবাগ সড়কের ওপরেই ফেলে রাখতে পারত। এতে ত্রাসটা আরও ব্যাপক রূপ নিতে পারত।

তাহলে আবার প্রশ্ন আসে— অন্তত এই মুহূর্তে নেপালের মাথায় এরকম প্রশ্নই উঁকি দিল যে, জয়রাম জিয়াউদ্দিনের গ্যাংয়ের হাতে নয়, কোনও ব্যক্তি বিশেষের হাতে খুন হয়েছে। আর সেই ব্যক্তি জয়রামকে খুন করেছে ওই কানহাইয়া টং জঙ্গলের ভেতরেই। আর যেহেতু সেই ব্যক্তি ছিল একা, তাই বৃষ্টিবাদল দিনে ঘন এবং বিপজ্জনক জঙ্গলে জয়রামের বিরাশি কেজি ওজনের লাশটাকে টেনে টেনে টাটানগর—হাজারিবাগ জাতীয় সড়কে এনে ফেলতে পারেনি। ফেলতে হয়েছে সেই আগাছাহীন চুনাপাথরের চাঙড়ে ঢাকা চাতালটার ওপরেই।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, উনিশ তারিখের মাঝরাতের দিকের কোনও একসময় জয়রাম খুন হয়েছে। অর্থাৎ উনিশ তারিখ মাঝরাতে জয়রামের খুনী কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলেই ছিল। অর্থাৎ জয়রামের আততায়ী কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলের ভেতর কোথাও একটা আশ্রয় তৈরি করে নিয়েছে। কোথায় সেই জায়গা হতে পারে? জঙ্গলের ভেতর এমন কোনও স্থান আছে যেখানে জয়রামের আততায়ীর মতো আপাত ভদ্র সভ্য মানুষ বর্ষাবাদলের রাতেও আশ্রয় নিতে পারে!

মাই গড! নিজের অজান্তেই নেপালের মুখ দিয়ে শব্দ দুটো বেরিয়ে এল। নেপাল মনে মনে প্রমথেশ ঘোষ মহাশয়কে আবার

ধন্যবাদ জানাল। সেই জায়গা যে প্রমথেশবাবুর আবিষ্কৃত কানহাইয়া টং জঙ্গলের ভেতর মুণ্ডা রাজা ঝিন্দারা মুণ্ডার গড়— এবিষয়ে নেপালের মনে কোনও সংশয় নেই। তবে একটা রহস্য তো থাকছেই। নেপাল বেড ছেড়ে ঘরের পশ্চিম দিকের খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। এদিকে শহর এখনও তেমন ঘন হয়ে গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু ঝোপ জঙ্গল আছে, আছে বড় ছোট মাপের বেশ কিছু টিলা। কোথাও কোথাও বাড়ি ঘর উঠছে ঠিকই, তবে ফাঁকা জায়গা জমির বিস্তারই বেশি। মাঠের মাঝখানে বি এস এন এল-এর সিগনাল টাওয়ার। মাথার ওপর স্যাটেলাইট লিঙ্ক-এর জন্য ডিস্ক অ্যানটেনা লাগানো। তার মাথায় লাল আলো জ্বলছে।

কেমন করে জয়রামের লাশ ঘিরে এতগুলি জুতোর ফুটমার্ক তৈরি হল? তবে কি জয়রামের আততায়ী একা ছিল না। ফার্স্ট এনকোয়েস্ট রিপোর্টে লেখা আছে, কম করেও চার জনের চার জোড়া ফুটমার্ক পাওয়া গেছে। আজ নেপাল নিজে দেখে এসেছে চুনাপাথরের নরম মিল্ক অফ লাইম আর কাদার প্রলেপের ওপর অনেকগুলি ফুটমার্ক ফুটে আছে। সব ক'টা ফুটমার্ক-এর একাধিক ফটোও ক্যামেরাবন্দী করে এনেছে নেপাল। এখন নেগেটিভগুলির প্রিন্টগুলি পেলেই হয়তো এই রহস্যের সমাধান করা যাবে।

একটা সিগারেট ধরাল নেপাল। একটা টান দিয়েছে কি দেয়নি, ওমনি নেপালের মনে হল, হোটেলের পশ্চিম দিকের বাউণ্ডারি ওয়ালের বাইরে থেকে এক ছোট আলোর স্ফুলিঙ্গ বিচিত্র এক শব্দ করে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। নেপাল প্রথমে ভেবেছিল পাহাড় জঙ্গলের কোনও পতঙ্গ হয়তো, যার পেটের বাইরের অংশে পর্যন্ত ফসফরাস লাগানো আছে। তাই চকিতে নেপাল জানলার নিচে বসে পড়ল। আলোর স্ফুলিঙ্গটা বিদ্যুৎগতিতে জানালা পেরিয়ে মুখোমুখি দেওয়ালে ঝুলন্ত একটা ক্যালেণ্ডারের গায়ে আঘাত করল। এবং পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা আলোর ছটা তৈরি করে নিভে গেল। নেপাল দেখল ক্যালেণ্ডারটা জ্বলছে। দ্রুত হাতে চাপড় মেরে ক্যালেণ্ডারের আগুন নেভাল নেপাল। তারপর দেখল, দেওয়াল ঘেঁষে মেঝেয় পড়ে আছে একটি পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম বুলেটের জ্বলন্ত খোল।

।। তের ।।

আজ বিজয়া দশমী। অবাঙালীদের দশহরা উৎসব। ফলে আজ ঝাড়খণ্ডের ছুটির দিন। তবে দোকান বাজার খোলা আছে। তাদের তো দিন আনি, দিন খাই-এর ব্যাপার। উৎসবে মেতে উঠে দোকান বাজার বন্ধ রাখলে তাদের চলবে কেমন করে? যেমন ছুটি নেই রাঁচির পুলিশ কর্মীদের। দশহরা উৎসবের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হবে বিকেল সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে। তখন দীর্ঘদিন ধরে বাঁশবাখারি খড়-দড়ি দিয়ে তৈরি কাঠামোর ওপর বিভিন্ন রঙের কাগজের প্রলেপ চাপিয়ে যে রাবণ, মেঘনাদ এবং কুম্ভকর্ণের বৃহদাকারের তিনটি কুশপুত্তলিকা তৈরি করেছে কারিগররা। সেই তিনটি কুশপুতুলের গায়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কুশপুতুল তিনটির সারা অঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয় আকর্ষণীয় সব আতসবাজি। অগ্নি সংযোগের পরেই আগুন যেমন যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বিস্ফারিত হতে থাকে বিভিন্ন জাতের আতসবাজিগুলি। এক একটি আতসবাজি সশব্দে বিস্ফারিত হয়ে চোখ ধাঁধাঁনো বহুবর্ণের আলোকছটা সৃষ্টি করে যখন সন্ধ্যার আকাশে ভেসে যায়, তখন মনে হয়, বিজয়া দশমীর সন্ধ্যার আকাশে অশুভ শক্তির নিধনের আনন্দে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তার নন্দন কাননের আলোকসজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছেন আকাশে। এই কারণেই তো অশুভ শক্তির নিধন এবং শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক হিসেবে অবাঙালি হিন্দুদের কাছে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং মেঘনাদ বধের অনুষ্ঠানটি বিবেচিত হয়ে আসছে বহুদিন আগে।

কাল রাতে একটু দেরিতে ঘুম আসার ফলে নেপালের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সকাল অনেকটাই গড়িয়ে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে চোখ খুলে নেপাল প্রথমেই তাকালো ঘরের পশ্চিমমুখো খোলা জানালাটার দিকে। এখন জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, সেই অংশের সমগ্রটাই কালো মেঘপুঞ্জে ঢাকা। পুবদিকের আকাশ এখন সম্ভবত পরিষ্কার। ফলে সূর্য সকাল আটটার মধ্যে পূব আকাশের বেশ কিছুটা অংশ পেরিয়ে এসেছে। সেই রোদে কালো মেঘপুঞ্জের গায়ে বাদামি আভা ফুটে উঠেছে।

নেপাল বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। দেখল রুবান ঘরে নেই। সম্ভবত ও যথারীতি ছ'টায় ঘুম থেকে উঠেছে। টয়লেট সেরে ব্রাশ করে ও যখন দেখল নেপাল ঘুমিয়ে আছে, তখন না ডেকে নিচে গেছে। ফলে নেপাল দ্রুত বাথরুমের কাজ সেরে স্নানটা করে নিল। তারপর পাজামা পাঞ্জাবি পরে সোফায় এসে বসল।

আর ঠিক তখনই রুবান ঘরে ঢুকল। তার হাতে রাঁচি থেকে প্রকাশিত দুটি ইংরেজি দৈনিক। কাগজ দুটি নেপালের সামনে সেন্টার টেবিলে রেখে রুবান বলল— রাজ্য এবং কেন্দ্রের গোয়েন্দা দপ্তরের আশঙ্কা আজ সন্ধ্যায় দশহরা অনুষ্ঠানের মধ্যে উগ্রপন্থীরা ব্যাপক নাশকতা করতে পারে। রুবান কাগজের প্রথম পাতা খুলে নেপালকে বলল— এই দেখ, রাঁচি শহরে এই কারণে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

নেপাল রুবানের কথা শুনল। সামনে খোলা ইংরেজি কাগজটার প্রথম পাতার হেডিং হিসেবে এই লাল সতর্কতা জারির সংবাদটার ওপর চোখও বোলালো। তবে সরাসরি কোনও উত্তর দিল না। ইন্টারকামের রিসিভার তুলে রুবানকে জিজ্ঞেস করল নেপাল— চা খেয়েছিস?

— নাহ! তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রুবান সাড়া দিল।

নেপাল ক্যানটিনের নম্বর ডায়াল করে তাড়াতাড়ি দু'কাপ চা পাঠাবার অর্ডার দিল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল— আমাদের লাইন অফ থটটাই এবার বদলাতে হবে রে রুবান।

— তার মানে? রুবান কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না।

— মানেটা খুব পরিষ্কার। নেপাল বলল— বেদপ্রকাশের কথা মতো আমরা এতদিন অন্ধের মতো টেরোরিস্ট জিয়াউদ্দিন আর তার গ্রুপের পেছনেই ছুটছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমরা কেবল ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেই শক্তি খরচ করেছি। বেদপ্রকাশ আর তার স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসারগুলির মাথায় গোবর পোরা। কোনও গ্রুপ ট্রুপের ব্যাপার নয়। বেদপ্রকাশদের ঘোল খাইয়ে মারছে কোনও বিশেষ এক ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ জগতে কাজ করে করে যথেষ্ট দক্ষতাও অর্জন করে ফেলেছে।

— তুমি তাহলে বলতে চাইছো জিয়াউদ্দিন বলে কেউ নেই? রুবান জিজ্ঞেস করল।

নেপাল কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ঘরের বেলটা বেজে উঠল। নেপাল কথা ঘুরিয়ে হাঁক দিল— দরজা খোলা আছে। ভেতরে এসো।

এক হোটেল কর্মী দু-কাপ চা এবং সঙ্গে চারটে নোনতা বিস্কুটের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। রুবান সেন্টার টেবিলের ওপর ছড়ানো সংবাদপত্র দুটো ভাঁজ করে সরিয়ে নিল। হোটেল কর্মীটি চায়ের ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে নেপালকে জিজ্ঞেস করল— নাস্তা কখন দেব স্যার?

— ন'টায় দিও। আজ রুমেই দিয়ে যেও। দুটো প্লেন ধোসা।

— জী। কর্মীটি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বিস্কুটে কামড় দিয়ে নেপাল চায়ের কাপটা তুলে নিল হাতে। দেখাদেখি রুবানও। কাপে চুমুক দিল। এদিককার চা ভিন্ন স্বাদের হয়। চা পাতা ফুটন্ত জলের পরিবর্তে ফুটন্ত দুধে ফেলে ফুটিয়ে নেয়। সঙ্গে আদা এবং এলাচ কেটে মিশিয়ে দেয়। খেতে বেশ মুখরোচক হয়।

— জিয়াউদ্দিন বলে কেউ নেই। এমন কথা আমি বলছি না। নেপাল পূর্বকথার প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল— হয়তো আছে, হয়তো নেই। থাকলেও জয়রামের খুনী সে নয়। এবং জয়রামও বেদপ্রকাশদের কোনও বিশ্বাসযোগ্য ইনফর্মার ছিল না। সে সেই তথাকথিত জিয়াউদ্দিনেরই লোক ছিল। আর সেই তথাকথিত জিয়াউদ্দিনের নির্দেশ মতোই পুলিশকে বিপথে চালানোর জন্য লাস্ট নাইনটিনথ্ মর্নিং-এ কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে জিয়াউদ্দিনের টেরোরিস্ট গ্রুপের একজিকিউটিভ বডির মিটিংয়ের সংবাদটা দিয়েছিল। আর সেই বানানো গল্পকথা বিশ্বাস করেই বেদপ্রকাশের এস টি এফ-এর বাহিনী খামোকা দুর্যোগের ভেতর গোটা একটা দিন অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করেছিল।

— তাহলে তোমার তথাকথিত জিয়াউদ্দিন জয়প্রকাশকে হত্যা করলো!

— সো কল্ড জিয়াউদ্দিন কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না বলেই জয়রামকে মরতে হল।

— তাহলে জয়রামের লাশটা কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে ফেলে আসার সময় এতগুলি লোক গেছিল কেন? রুবান বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল— এনকোয়েস্ট রিপোর্টে তো বলা হয়েছে লাশের চারদিকে জুতোর দাগ দেখে একথাই মনে হয়েছে সঙ্গে চারজন ব্যক্তি ছিল।

— এনকোয়েস্ট রিপোর্টটা পুলিশের কাছেই থাক। ওরা আপাত দৃষ্টিতে যা দেখেছে, সেটাই রিপোর্টে লিখেছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওই বহু ফুট প্রিন্টগুলি একজনেরই। পুলিশকে মিসগাইড করার জন্য সেই ব্যক্তি জয়রামের লাশ ফেলার পর পাশের চারদিকে এলোমেলো পা ফেলে অনেকগুলি ফুটমার্ক তৈরি করেছিল। আমি যে সব প্রিন্টের ফটো তুলেছি, আমার বিশ্বাস প্রিন্টগুলি পেলে স্পষ্ট হবে আমার বিশ্বাস।

— তাহলে কে সেই ব্যক্তি, যে জিয়াউদ্দিনের নামে সন্ত্রাসবাদীদের গল্প ছড়িয়ে পুলিশকে বোকা বানাচ্ছে? রুবান জিজ্ঞেস করল— আর উদ্দেশ্যই বা কি?

— কে সেই ব্যক্তি এটা কেবল ঈশ্বর জানেন। আর জানেন স্বয়ং জিয়াউদ্দিন মহাশয়। তবে এটুকু বলতে পারি, নিছক দু-চারটে শহরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য নয়। আরও বড় কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সে কাজ করছে। নেপালের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে সিগারেটের দগ্ধাংশটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল।

— সে থাকে কোথায়? রুবান আবার জিজ্ঞেস করল।

— কখনও ঝিন্দারাই মুণ্ডার পরিত্যক্ত গড়ে, কখনও খোদ রাঁচি শহরেই। নেপাল ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ধরে রেখে বলল— অন্তত কাল রাতে যে সে রাঁচি শহরেই ছিল, এটা হলফ করে বলা যায়।

— এমন ধারণার হেতু?

— ওই ক্যালেণ্ডারটা দেখেছিস! নেপাল দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে ইশারা করল।

— মাই গড! আগুনে জ্বলল কেমন করে? রুবান বিস্মিত গলায় বলল— তুমি আবার সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো অন্যমনস্কতায় ওদিকে ছুঁড়ে দাওনি তো নেপালকাকা?

— সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো নয়। নেপাল কাল রাতে সংগ্রহ করে রাখা দগ্ধ পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম বুলেটের খোলটা কাগজের মোড়ক খুলে রুবানকে দেখাল। বলল— একেবারে আমার মাথা লক্ষ্য করে ফায়ার করেছিল তোদের জিয়াউদ্দিন। একটু অন্যমনস্ক হলে আমার সঙ্গে বসে সকালের চা খাওয়া হত না তোর। তবে হ্যাঁ, বুলেটটার কারসাজি দেখার মতো। ফায়ারের পরে এর পেছনের চেম্বারের বারুদ জ্বলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের পরে সামনের চেম্বারের বারুদ জ্বলে। এই দ্বিতীয় বারের বারুদই মাথার ঘিলু পুড়িয়ে দেয়।

।। চৌদ্দ।।

সাদা ধোসা এবং পরে চা— নেপাল আর রুবান সবেমাত্র নাস্তা শেষ করেছে। ঠিক এমন সময় নেপালের সেল ফোনটা বেজে

উঠল। বেড হেড টেবিলের ওপর রাখা সেলফোনটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নম্বরটা দেখে বুঝল ফোনটা বেদপ্রকাশ করছে।

— বল ব্রাদার! সেলফোনের বোতাম অন করে নেপাল কানে চেপে ধরে বলল— এত সকালেই আমাকে স্মরণ করার কারণটা কি জানতে পারি?

— মার্ডার! ওপার থেকে বেদপ্রকাশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বেদপ্রকাশ বলল— আবার একটা মার্ডার হয়েছে ব্রাদার। আবার একটা মার্ডার হয়েছে।

— কখন? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— গতকাল শেষ রাতের দিকে কোনও একটা সময় খুনটা হয়েছে। অন্তত আই জি সাহেবের সেই রকমই অনুমান। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া গেলে সময়টা কনফার্ম করা যাবে না। বেদপ্রকাশ বলল।

— আই জি সাহেবের অনুমান বলছো কেন? নেপালের ভুরু দুটো কোঁচকালো— আই জি সাহেব এলেন কোথা থেকে?

— আরে খুনটা তো আই জি সাহেবের বাংলোয় হয়েছে। আর যে খুন হয়েছে, সে তো আমাদের পুলিশেরই লোক। আই জি সাহেবের বাংলোয় সিকিউরিটির জন্য পোস্টেড ছিল। যদিও জগদীশ আই জি সাহেবের কুক-এর কাজ করত। বেদপ্রকাশ একটানা কথাগুলি বলে যেন হাঁপাতে লাগল।

— জগদীশের লাশ এখন কোথায়? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— আমাদের হেফাজতে। তুমি শিগগির চলে এসো ভাই। তোমাকে না দেখিয়ে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য চালান করতে পারছি না। বেদপ্রকাশ অনুনয় জানানোর মতো করে বলল।

— ঠিক আছে। উই মিন টুয়েন্টি মিনিটে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। নেপাল বলল— তুমি কেবল তোমাদের আই জি সাহেবকে তার বাংলোয় আপাতত কিছুক্ষণ থাকতে বল। উনি যেন ট্যুর ফুরে বেরিয়ে না যান।

একটা অটো নিয়ে নেপাল এবং রুবান যখন রাতু রোডে নতুন নির্মিত পুলিশ লাইনে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় পৌনে দশটা। হঠাৎ গোটা আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা। নেপাল অটোচালককে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রুবানকে নিয়ে একরকম দৌড়ে বেদপ্রকাশের কথামতো ডেডবডির ট্রানজিট রুমে ঢুকল।

একটা টেবিলের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে মৃত জগদীশ। মুখটা দেখে মনে পড়ল নেপালের যে এই মানুষটাকেই সে যেন আই জি সাহেবের বাংলোয় দেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় আই জি সাহেবের বাংলোয় বসে এই জগদীশের হাতে তৈরি করা চা খেয়েছিল তারা।

টেবিলটা লম্বায় যথেষ্ট দীর্ঘ হলেও প্রস্থে ততটা প্রশস্ত নয়। ফলে জগদীশের হাত দুটো টেবিলের দু-পাশে ঝুলছে।

নেপাল দেখল ঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ঘরে উপস্থিত সঙ্গী সহ বেদপ্রকাশের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। এই ঘাম যে উত্তাপজনিত নয়, মানসিক উদ্বেগে এবং দুশ্চিন্তারই ফসল। বুঝতে অসুবিধা হলো না নেপালের। সে আরও নিশ্চিত হল বেদপ্রকাশের পায়চারী করার ভঙ্গি দেখে। অস্থির পায়ে ঘরের ভেতর এলমেল ভাবে পায়চারি করছে বেদপ্রকাশ আর ঘনঘন হাতের কালো রঙের লাঠিটাকে ডানহাতের মুঠোয় ধরে বাম করতলের ওপর আঘাত করে চলেছে।

নেপালকে দেখে বেদপ্রকাশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ওহ্, তুমি এসে পড়েছ! বলতো এসব কি কাণ্ড! জিয়াউদ্দিনের কোনও হদিশ তো আমরা এখনও পর্যন্ত পেলাম না। উপরন্তু আরও একটা খুন হয়ে গেল।

নেপাল কোনও জবাব দিল না। খুঁটিয়ে দেখল জগদীশের মৃতদেহটা। বয়স দেখে মনে হচ্ছে মধ্য তিরিশের যুবক। আদিবাসী। কালো পেটানো স্বাস্থ্যের শরীর। গায়ে একটা গোলাপী রঙের স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গেঞ্জির বুকের কাছটায় কিছুটা জায়গায় কালচে সবুজাভ দাগ। অনেকটা দেওয়াল টেওয়ালে জমা শ্যাওলার যেমন রঙ হয়। কোমরে কালো রঙের ট্রাউজার। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নখে কিছুটা রক্ত জমে আছে। অসম্ভব গতিতে দৌড়াতে গিয়ে কোনও পাথরখণ্ডে হোঁচট খেলে আঙুলের মাথার কাছে যেমন ক্ষত সৃষ্টি হয়, ক্ষতটা ঠিক সেইরকম। কাল মধ্যরাতে ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছিল। এখন প্রায় বেলা দশটা। সময়টা সামান্য নয়। তাই ক্ষত মুখের রক্ত জমে গিয়ে কালচে রঙ ধরেছে। বাম পায়ের ট্রাউজারের নিচের অংশটা ছেঁড়া। কোনও কাঁটা ঝোপে ট্রাউজার ফেঁসে গেলে যেমন ছিঁড়ে যায়, তেমনি। ট্রাউজারের ছেঁড়া অংশের ওপর একটা কাঁটা বিঁধে আছে এখনও। নেপাল ঝাঁটাটা হাতে তুলে নিল। দেখল ফণিমনসার কাঁটা।

— জগদীশও জয়রামের মতোই খুন হয়েছে। ঠিক একই পদ্ধতিতে খুন। বেদপ্রকাশ মৃত জগদীশের মাথাটা হাত দিয়ে পাশ ফিরিয়ে নেপালকে দেখাল। বলল, — ঠিক মাথার পেছনে নল ঠেকিয়ে গুলি করেছে কালপ্রিট। তার ওপর যেখানে সেখানে নয়। একেবারে আই জি সাহেবের বাংলোয়। আই জি সাহেব ভীষণ শকড্। ওর সামনে আমি আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব না মিস্টার রায়।

— শকড্ হওয়ার কথাই। নেপাল বিড়বিড় করে বলল— একের পর এক বিশ্বস্ত সঙ্গী যদি খুন হয়ে যায়, তাহলে কে না শকড্ হবে বল!

— ঠিক বলেছ মিস্টার রায়। জগদীশ আই জি সাহেবের অতি বিশ্বস্ত এবং খাস আদমী ছিল। বেদপ্রকাশ কথাটা বলার পরেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল— জগদীশ যে আই জি সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মী ছিল, তুমি জানলে কেমন করে ব্রাদার?

— কেমন করে আর জানব! নেপাল শ্লেষের হাসি হেসে বলল— আই জি সাহেবের বাংলোয় সর্বমোট ছ'জন পুলিশ কর্মী সিকিউরিটি পারপাস পোস্টেড আছে। এদের মধ্যে তিনজন প্রপার সিকিউরিটির দায়িত্বে আছে। একজন মালির কাজ করে। একজন বাজার সরকার। আর একজন কুক। মানুষ তো বিশ্বস্ত জনকেই রান্নার দায়িত্ব দেয়। তাই না ডি আই জি সাহেব!

— সত্যি, রান্না করতে কখনও অনিচ্ছা প্রকাশ করত না জগদীশ। সে তুমি যত রাতেই আই জি সাহেবের বাংলোয় যাও না কেন, যা খেতে চাইবে সেটাই রেঁধে দিত জগদীশ। রান্নার হাতটাও ছিল অসাধারণ। বেদপ্রকাশ কিছুক্ষণের জন্য টেনশন মুক্ত হয়ে জগদীশের গুণগুলি স্মরণ করছিল।

— কেবল রান্না কেন, মাঝরাতে ঝোপজঙ্গলে ছুটে বেড়াতে বললেও জগদীশ হাসিমুখেই মালিকের সেই নির্দেশ পালন করত। নেপাল শ্লেষ জড়ানো হাসি হাসল— সরল আদিবাসীদের নিয়ে ঠাট্টা করার রোগটা তো এখনও আমাদের ছেড়ে যায়নি বেদপ্রকাশ। কথাটা বলার পরেই নেপাল দেখল, বেদপ্রকাশের চোখে মুখে দারুণ এক কৌতূহল উঁকি দিয়ে উঠেছে। নেপালের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তার শেষের কথাগুলিই বেদপ্রকাশের মনে এই কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। হয়তো বেদপ্রকাশ এখনই নেপালকে জিজ্ঞেস করে বসবে— মাঝরাতে ঝোপজঙ্গলে ছুটে বেড়িয়েছে কে? জগদীশ! কে আদেশ করেছিল জগদীশকে মাঝরাতে ঝোপে জঙ্গলে ছুটে বেড়ানোর জন্য?

নেপাল জানে এজাতীয় স্বাভাবিক প্রশ্নের প্রমাণসহ কোনও উত্তর এখনও পর্যন্ত তার কাছে নেই। নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্যে দেওয়া ঠিক শোভন হবে না। তাই নেপাল দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে ফেলে বেদপ্রকাশকে বলল— বৃষ্টি থেমে গেছে ব্রাদার। এই বেলা চল তোমার আই জি সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমরা গেলে আই জি সাহেবের মনটা হয়তো কিছুটা ভাল হবে।

— তাহলে জগদীশের বডি এবার মর্গে পাঠিয়ে দিই! বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। এর মধ্যেই তো বডি শক্ত হয়ে গেছে। বাঁকতেও শুরু করেছে। আর দেরি করলে ডিক্সপোজ করতে শুরু করবে। নেপাল বলল।

— বেদপ্রকাশ তার সহকারিদের উদ্দেশ্যে বলল— লাশ মুর্দাঘর লে যাও। তারপর নেপাল এবং রুবানকে সঙ্গে নিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে বসে বেদপ্রকাশ নিচু গলায় নেপালকে বলল— মোস্ট সিগনিফিকেন্ট পয়েন্টটা কি জানো?

নেপাল সম্ভবত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। জগদীশের গোলাপী রঙের স্যাণ্ডো গেঞ্জির বুকের কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে শ্যাওলার টাটকা দাগ কেন? জগদীশ কি কাল মধ্যরাতে বুক হেঁচড়ে কোনও দেওয়াল টেওয়ালে উঠেছিল! প্রশ্নটা সরিয়ে রেখে নেপাল বেদপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করল— কোন বিষয়ের সিগনিফিকেন্ট পয়েন্টের কথা বলছো!

— এই দুটো মার্ডারের বিষয়ে বলছি। বেদপ্রকাশ বলল— জয়রাম এবং জগদীশ দু'জনকেই কিন্তু বন্দুকের নল একেবারে মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করেছে। লুকিয়ে দূর থেকে গুলি ছোঁড়েনি। এটা কেমন করে হল! ওরা কি আততায়ীকে দেখে কিছুই বোঝেনি?

— না বোঝাটাই স্বাভাবিক। নেপাল বলল— যাকে শ্রদ্ধাভাজন এবং মনিব বলে ওরা মনে করে এসেছে সে যদি এসে একেবারে শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়, তাহলে সন্দেহ জাগবে কেন মনে?

।। পনের।।

— একেবারে যথার্থই বলেছ মিস্টার রায়। জগদীশের মতো বিশ্বস্ত কর্মী আজকের দিনে যে কোনও পুলিশ সার্ভিসে যেমন বিরল, তেমনি বিরল ওর আনুগত্য। কাউকে সন্দেহ করার মতো বদ্‌গুণ একদম ছিল না ওর মধ্যে। যা বলতাম, তাই বিশ্বস্ত এবং অনুগত কর্মীর মতো পালন করত। কোনওদিন কোনও প্রশ্ন করত না জগদীশ। এমন এক কর্মীর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে আমি এতটাই ভেঙে পড়েছি যে কি বলব আপনাকে! বলতে বলতে জগতরাম শর্মা, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শোকবিহ্বল হয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। এখন বেলা দশটার ঘর পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এখন সময় সাড়ে দশটা পৌনে এগারোর কাছাকাছি। তবু জগতরাম শর্মার মধ্যে অফিসে বেরুনোর কোনও প্রস্তুতি নেই। সম্ভবত তিনি শোকাতুর হয়ে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে, এখন অফিস যাওয়ার কথা ভাবতেও পারছেন না।

আই জি সাহেব বসেছেন একটা থ্রিসিটার সোফার বাম প্রান্ত ঘেঁষে। ডান দিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। বেদপ্রকাশ আর রুবান বসেছে আই জি সাহেবের মুখোমুখি। মাঝখানে গ্লাসটপ সেন্টার টেবিল। আর আই জি সাহেবের ডানদিকে একটা সিঙ্গল সোফার ওপর বসেছে নেপাল। সবকটি সোফার কভার সম্ভবত আজ সকালেই বদলানো হয়েছে। সাদা রঙের সিফনের কভার চাপানো হয়েছে সোফায়। সেন্টার টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসেও এখন সাদা রজনীগন্ধা। বাংলোর বাগানেরই ফসল। টাটকা বলে চাপা গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরের ভেতর। সম্ভবত জগদীশের মৃত্যু শোকটাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য আই জি সাহেব সাদা রঙের ব্যবহার করেছেন। সঙ্গে সাদা রজনীগন্ধার বিষণ্ণ ঘ্রাণ শোকের ঘনত্ব আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছে।

— জগদীশ ঠিক কখন খুন হয়েছিল? নেপাল নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

আই জি সাহেব মুখের ওপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বসলেন। বাম হাতটা সোফার সাইড ওয়ালে রেখে ডান হাতটা ছড়িয়ে সোফার ওপর রাখলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন— ঠিক কখন খুন হল জগদীশ বলতে পারব না। আমি তো রাত এগারোটা নাগাদ ডিনার সেরে শুতে চলে গিয়েছিলাম। কাল আমি বেশ টায়ার্ডও ছিলাম। তাই শোওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন ছ'টা বাজে। আমি বাথরুম টাথরুম সেরে আমার বেডরুমেই বসেছিলাম। মানে আমি সকালের চা-টা যেহেতু বেডরুমে বসেই খাই— তাই জগদীশের চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু প্রায় আধঘন্টার ওপর ওয়েট করার পরে

জগদীশ যখন আমার বেড টি নিয়ে এল না, তখন মনে কেমন খটকা লাগল। ভাবলাম জগদীশ হয়তো আজ অসুস্থ। তাই এখনও ঘুমিয়ে আছে। আমি বেড রুম ছেড়ে জগদীশের শোওয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি— জগদীশ ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে। ডাকাডাকির পরেও জগদীশ যখন সাড়া দিল না, তখন ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখি ওর শরীর ঠাণ্ডা। হাতের নাড়ি নেই। জগদীশ মৃত! বলতে বলতে জগতরাম শর্মা আবার ডুকরে উঠলেন। তবে এবার দু-হাত জড়ো করে মুখ ঢাকলেন না।

— আপনার বাংলোয় তো ছ'জন পুলিশ কর্মী পোস্টেড। তিনজনকে দেখেছি বাইরে গেটে পারাহার কাজে নিযুক্ত। বাকি তিনজন কর্মীর একজন মালির কাজ করে। দ্বিতীয়জন দোকান বাজার করে। আর জগদীশ রান্না করত। নেপাল বলল।

— হ্যাঁ। জগদীশের রান্নার হাত ছিল তুলনাহীন। কাল রাতেই তো জগদীশ যে চিলি চিকেন বানিয়েছিল, তার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। ওর যা গুণ ছিল তা দিয়ে সে যে কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের কুক হতে পারত। আবার আই জি সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

— আপনি আপনার বেডরুমে বসে বসে চায়ের জন্য হয়রান হয়ে পড়েছিলেন, তখন কাউকে বেল বাজিয়ে ডেকে জগদীশের খবর নিতে না বলে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে জগদীশের ঘরে গেলেন! একজন আই জি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারের মধ্যে এতখানি মহানুভবতা কিন্তু দেশবাসী পুলিশ অফিসারদের মধ্যে দেখেনি। নেপাল হেসে হেসে প্রশ্ন করল— তারপর বলল— এদেশের নাগরিকরা কিন্তু জানে যে আই জি তো কোন ছার, একজন এস পি সাহেবও তার শরীরে বসা মশাটাকেও নিজের হাতে তাড়ায় না। হাঁক পাড়েন— কৈ হ্যায়!

— মিস্টার রায় তো কেবল মসুর জাসুসই নন, কাফি হিউমার ভি জানেন। আই জি সাহেব শোকের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। নেপালের কথা শুনে নিজেই হেসে উঠলেন। নিজের মনে বিড়বিড় করলেন— নাইস গাই, ভেরি নাইস গাই। তারপর গলা তুলে বললেন— আপনি ঠিক বলেছেন মিস্টার রায়। আমাদের পুলিশ সার্ভিসের আদব কায়দাটা এরকমই। মনে হয় যেন এক একজন পুলিশ অফিসার পাবলিক সার্ভেন্ট নয়, এক একজন জমিদার। অবশ্য আপনার ফ্রেণ্ড বেদপ্রকাশ ইজ ডিফারেন্ট। আমিও তাই। আমি বাড়িতে কখনও হাঁকডাক করি না। মিছিমিছি বেলও বাজাই না। ওসব অফিসেই রেখে আসি। বাড়িতে প্রতিটি কর্মীকে আপনা আদমি বলেই ভাবি। তাছাড়া জগদীশ তো আমার নিতান্ত স্নেহধন্যই ছিল। তাই নিজেই ওর খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

— জগদীশকে মৃত দেখে আপনি কি করলেন? নেপাল জিজ্ঞেস করল— সিকিউরিটিদের ডাকলেন?

— না, আই জি সাহেবের কোঠির ভেতরে সকলের অজান্তে একজন পুলিশ কর্মী খুন হয়ে গেছে। এই খবরটা নিশ্চয়ই আমার পুলিশ সার্ভিসের লোকদের কাছে খুব একটা গর্বের কথা নয়। জগতরাম শর্মা থেমে থেমে বললেন— তাই আমি তুরন্ত বেদপ্রকাশকে ফোন করে জানালাম। ও লাশ নিয়ে গেল ট্রানজিট ক্যাম্প অফিসে। বেদপ্রকাশই সম্ভবত আপনাকে ডেকেছেন।

— জগদীশ কি কোনও কাজে কাল মাঝরাতে আপনার বাংলো থেকে বেরিয়েছিল? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— তা তো বলতে পারব না। তবে আমি যতক্ষণ জেগেছিলাম তখনও পর্যন্ত সে বেরোয়নি। আই জি মন্তব্য করলেন।

— যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা অনুরোধ করব। নেপাল ইতস্তত করে বলল।

— উইথ প্লেজার। আই জি সাহেব বললেন— আপনি হলেন গিয়ে আমাদের খাস মেহমান। টেরোরিস্ট জিয়াউদ্দিনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই আমাদের ডি আই জি সাহেব আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন। তদন্তের প্রয়োজনে আপনি যা উচিত মনে করবেন, অবশ্যই বলবেন। নাহলে আপনি আমাদের হেল্প করবেন কেন?

— আমি একবার আপনার বেডরুমটা, মানে কাল রাতে যে বেডরুমে আপনি ঘুমিয়েছেন, আর আজ সকালেও যে বেডরুমে বসে জগদীশের বেড টি-র জন্য অপেক্ষা করছিলেন— সেই বেডরুমটা একবার দেখতে চাই। নেপাল বলল।

— নোহ হার্ম। চলুন, দেখে আসি। জগতরাম শর্মা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পা বাড়ালেন বেড রুমের দিকে।

বাংলোয় সর্বমোট চারটে বেডরুম আছে। ছুটিছাটায় আই জি সাহেবের স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা যখন রাঁচি আসেন, তখনই কেবল চারটি বেডরুম ব্যবহৃত হয়। বছরের বাকি সময়টা তিনটি বেডরুম খালিই পড়ে থাকে। নেপালকে সঙ্গে নিয়ে আই জি সাহেব নিজের ব্যবহৃত বেডরুমে প্রবেশ করল।

ডবল বেডের খাট। মোটা ফোমের গদি। তারপর বেডশিট বিছানো। মাথার দিকে দুটো বালিশ। পাশ বালিশও আছে।

— নেপাল বলল— আপনি তো ভীষণ গোছানো মানুষ! এর মধ্যেই বেড গোছানো হয়ে গেছে! বেডশিট দেখে কে বলবে, এই বেডে কাল রাতে কেউ ঘুমিয়ে ছিল! নেপাল ঘরটাকে সরেজমিনে দেখতে দেখতে বলল।

— ও কিছু নয়। আমি ঘুমানোর সময় খুব একটা পাশ ফিরি না। একপাশ ফিরে শুই। এক কাতেই ঘুম থেকে উঠি। আর ঘুম ভাঙার পর আমি নিজের হাতেই বেডশিট টানটান করে রাখি।

এপাশে একটা স্টিল আলমারি। আলমারির ডালা কাঁচের। কাঁচের ডালার ভেতর দিয়ে কয়েকটা ওষুধের শিশি চোখে পড়ল নেপালের। একটি লিকুইড অ্যান্টাসিডের শিশি। একটা সম্ভবত এনজাইমের শিশি। নিচের তাকে আরও একটা শিশি। শিশির পাশে একটা কাঁচের বিকার। বিকারের ভেতর হালকা বেগুনি রঙের তরল। বিকারে তরলটা ঢালার সময় কিংবা বিকারে ডোবানো কোনও বস্তুকে বাইরে আনার সময় হয়তো কয়েক ফোঁটা তরল আলমারির তাকের ওপর, ঘরের মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল। সেই তরলের টানে ইতিমধ্যেই কিছু কালো কাঠপিঁপড়ে এসে জুটেছে। নেপালের ভুরু

কোঁচকালো। সকলের অলক্ষে নেপাল মেঝেয় তখনও পর্যন্ত লেগে থাকা তরলটিকে নিজের রুমাল মেঝেয় ঘঁষে রুমালে তুলে পকেটে চালান করে দিল।

— থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইওর কাইণ্ড কো-অপারেশন। এবার যাওয়া যাক। নেপাল বলল।

— এটা তো আমাদের ফর্জ। আই জি সাহেব বললেন— আর কতদিন ওয়েট করব?

নেপাল আই জি সাহেব যে সোফায় বসেছিলেন এবং যেখানে এতক্ষণ ডানহাতের তালুর ভার রেখেছিলেন, সে জায়গাটা দেখল। দুটো কালো রঙের কাঠপিঁপড়ে জড়ো হয়েছে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল— খুব বেশি দিন নয় স্যার।

।। ষোল।।

যথাসময়ে লালপুর চকের হোটেল রাজস্থানের নিচের শপিং কমপ্লেক্সে রুবানকে নিয়ে হাজির হল নেপাল। সিটি স্টুডিওতে পৌঁছে নেপাল দেখল দোকানের মালিক নেপালকে দেখেই প্রস্তুত হয়েছিল। নেপাল কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই মালিক ভদ্রলোকটি একটি পেটমোটা খাম এগিয়ে দিল নেপালের দিকে। বলল— প্রিন্টগুলি ভাল এসেছে স্যার। নেগেটিভগুলোও সঙ্গে আছে। দেখে নিন।

নেপাল আর খামের মুখ খুলে ফটোগ্রাফগুলি যাচাই করে দেখল না। এমন ভিড়ের মধ্যে দেখার কোনও অর্থ হয় না। কেবলমাত্র কতগুলি মাটির ওপর জুতোর ছাপের ফটো তুলে সেই ফটো আবার পয়সা খরচ করে কেউ ডেভেলপ করায়— এটা যে কোনও ব্যক্তির কাছেই অস্বাভাবিক লাগতেই পারে। সেই অস্বাভাবিকতা থেকে কৌতূহল জাগতে পারে। সেই কৌতূহল হয়তো শত্রুপক্ষকে সতর্ক করে তুলতে পারে। এতে নেপালের কাজের ক্ষতি।

— আর কত দিতে হবে? নেপাল খামটা রুবানের হাতে দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বের করল।

— কাল দুশো টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলেন। মালিক ক্যাশমেমো দেখে বলল— আর আড়াই শো দিন।

নেপাল টাকা মিটিয়ে দিয়ে স্টুডিও থেকে বেরুনোর জন্য পা

বাড়িয়েছিল। কিন্তু বেরুনো হল না। মালিক ভদ্রলোকটির কথা শুনে থামমে হল। মালিক চাপা গলায় বলল— ফটোগুলো সামলে রাখবেন স্যার। অসতর্ক হলে নেগেটিভ সহ ফটোগুলি কেউ ছিনতাই করে নিতে পারে।

— হঠাৎ একথা বললেন কেন মিস্টার....।

— রঘুবংশী কোড়ে। মালিক হাসল— হমে রাঁচিওয়ালে রঘুবংশী বলেই ডাকে।

— ধন্যবাদ। মিস্টার কোড়ে। আপনার চেতাওনির কারণটা জানতে পারি? কতগুলি ফুট প্রিন্টের মামুলি ফটো ছিনতাই করতে কেউ চাইবে কেন?

— ওই ফটোগ্রাফগুলি তো মামুলি নয় স্যার। মামুলি ফুটপ্রিন্ট হলে আপনি নিশ্চয় কষ্ট করে সেই রামগড় পাহাড়ের পিছনে কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টে গিয়ে ফটো খিঁচতেন না। রঘুবংশী বলল।

— আপনি জানলেন কেমন করে যে আমি কানহাইয়া টং ফরেস্টে গিয়ে এই দাগগুলির ফটো তুলেছি? নেপাল যথেষ্ট বিস্মিত বোধ করেছিল।

— এটা আর এমন কি কঠিন কাজ! রঘুবংশী হাসল। তারপর বলল— কাল আপনি যখন নেগেটিভগুলো নিয়ে এলেন, তখন আমি আপনার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আপনার ডানপায়ের হিল ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা কাদা লেগে আছে। আর কাটাদার রঙ সাদা। ভেজা চুনাপাথরের ওপর হাঁটলে যেমন দাগ পড়ে যায়। ওই দাগটাও সেরকম। আর এটা কে না জানে যে, মাটির ওপর ওইরকম চুনাপাথরের লেয়ার কেবল রামগড় পাহাড়ের পেছনের জঙ্গলেই আছে। কারণ ওখানেই তো এরাজ্যের সবচেয়ে বড় চুনাপাথরের মাইনটা আছে।

— মানতেই হবে যে আপনার চোখ আছে। নেপাল সপ্রশংস হাসি হাসল। বলল— আপনি কি ডিটেকটিভ ছিলেন কোনওদিন?

— মনে মনে হাসল রঘুবংশী কোড়ে। — আমার গুরু হচ্ছেন শার্লক হোমস। উত্তর দিয়ে রঘুবংশী রুবানের দিকে হাতে ইশারা করে নেপালকে জিজেস করল— আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিশ্চয়!

— ওয়াটসন। নেপাল কৌতুকের হাসি হাসল। তারপর বলল— থ্যাঙ্কস ফর ইওর ভ্যালুয়েবেল অ্যাডভাইস মিস্টার কোড়ে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওয়াটসনের হাত থেকে ফটোগ্রাফের খামটাকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে লালপুর চক থেকে একটা খালি অটো পেয়ে নেপাল রুবানকে নিয়ে অটোয় উঠে বসল। তারপর অটো চালককে বলল— কাঁটাতলি কলোনী চল। একটু জলদি।

মিনিট দশের মধ্যে নেপাল কাঁটাতলি কলোনীর প্রমথেশ ঘোষের মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি পৌঁছে গেল। অটোর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেপাল রুবানকে নিয়ে প্রমথেশবাবুর বাড়ির দরজায় ডোর বেল বাজালো।

একটু পরেই দরজা খুলে দিলেন প্রমথেশবাবু। বললেন— আসুন মিস্টার রায়। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

নেপাল আর রুবান একটা সোফায় বসল। উল্টো দিকের সোফায় বসলেন প্রমথেশবাবু। বললেন— আজও আমার বাড়ি এখন একদম খালি। আজ তো দশহরা। তাই জামাইয়ের ছুটি। মেয়ে-জামাই আর নাতনি গেছে ক্যান্টনমেন্ট ময়দানে রামলীলার অনুষ্ঠান দেখতে। রাঁচি শহরের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট ময়দানেই সবচেয়ে বড় রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর মেঘনাদ বানানো হয়। আর একটু পরেই ওগুলো জ্বালানো হবে। দেখবেন তখন রাঁচির আকাশে রঙ বেরঙের আতসবাজির শোভা।

— রিপোর্টটা এসেছে? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— এসেছে। ঠিক পাঁচটা নাগাদ আমার কাছে আপনার রুমাল আর রুমালে লাগা লিকুইডের রিপোর্ট পৌঁছে গেছে। সেই থেকে আমি ছটফট করছি। কখন আপনি আসবেন। প্রমথেশবাবু বললেন।

— রিপোর্ট দেখেছেন? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— দেখেছি। ছোট করে উত্তর দিলেন প্রমথেশবাবু। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে নিজের লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ড্রয়ার খুলে রুমার আর একটা খাম বের করলেন। তারপর আবার সোফায় ফিরে এসে বসলেন— রুমালটা তো আপনার?

— হ্যাঁ। নেপাল বলল— কি আছে রিপোর্টে?

— রুমালে লাগানো লিকুইডটা আপনার রুমালে এলো কি করে?

— ওটা ঠিক এই মুহূর্তে আপনার কাছে ডিসক্লোজ করছি না। দুই একদিনের মধ্যেই আপনি জানতে পারবেন। তার চেয়ে আপনি বলুন, তরলটা কি এবং কোন কাজে ব্যবহার করা হয়? নেপাল হাসল,অস্বস্তির হাসি।

— সে তো ঠিক কথা। আপনার তদন্তের গোপনীয়তা আপনি বাইরে ডিসক্লোজ করবেন কেন? প্রমথেশবাবু বললেন— আমি প্রশ্নটা করেছিলাম, কারণ এই লিকুইডটা তো বাজারে পাওয়া যায় না। আর কোন গৃহস্থের বাড়িতেও রাখার কথা নয়। এটি কোনও মিউজিয়াম টিউজিয়ামেই থাকার কথা। এই লিকুইড কোনও চর্মজাতীয় বস্তুকে যেমন ধরুন, কোন পশুর চামড়া কিংবা নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের হাড় কিংবা চামড়া প্রিজারভেশনের জন্য লিকুইডটা ব্যবহার করা হয়। অবশ্য আর্কিওলজিক্যাল গবেষণার কাজেও এটা ব্যবহৃত হয়। কার্বন টেস্টে এই তরল রাসায়নিকটা লাগে।

— ক্লোরোপ্রোপিওন্যালডিহাডি! রুবান বলে উঠল— সি এল সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ ও। আসলে অ্যাসিট্যালডিহাইড-এর একটি ডেরিবেটিভ। তাই না!

— ঠিক ধরেছ। প্রমথেশবাবু সন্তোষ জানালেন। বললেন— লিকুইডের টেস্ট কিছুটা মিস্ট্রি। ওপেন স্পেসে কয়েক ড্রপ লিকুইড পড়লে খুব তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে এসে যাবে জায়গাটায়।

— কেবল পুরনো চামড়া প্রিজারভেশনের কাজেই লাগে? নেপাল বলল— এমন তো হতে পারে, মানুষের আর্টিফিসিয়াল কোন অঙ্গের সারফেস মসৃণ রাখার জন্যও এই লিকুইড ব্যবহার করা হয়।

— না। তেমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। প্রমথেশবাবু বললেন— প্রথমত, মানুষের প্রতিস্থাপিত কৃত্রিম অঙ্গের সারফেসে কোন জীবের চামড়া ব্যবহার করা হয় না। সেটাও তৈরি হয় কোনও

আর্টিফিশিয়াল পালমার দিয়ে। তাকে প্রিজার্ভ করার জন্য এই কেমিকেলের দরকার নেই।

— যদি প্রতিস্থাপিত অঙ্গটির বাইরের সারফেসটা জীবন্ত মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি হয়? নেপাল বলল— তাহলে কভারের চামড়াকে প্রিজার্ভ করার জন্য তো এই লিকুইডের প্রয়োজন হবে?

— তা হবে। প্রমথেশ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বললেন— তবে কৃত্রিম অঙ্গ বলতে পা কিংবা হাতকেই বোঝায়। বিশেষ করে পা। কিন্তু এত বড় একটা অঙ্গকে কভার করতে যে পরিমাণ ফ্রেশ স্কিনের দরকার পড়বে, সেই পরিমাণ স্কিন একটা মানুষের শরীর থেকে তোলা সম্ভব! না মশাই না। এটা বোধহয় বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়।

— বড় অঙ্গের কথা ভাবছো কেন? নেপাল বলল— ছোট অঙ্গের কথা ধরুন। যেমন হাতের কোনও কৃত্রিম আঙুল টাঙুলের কথা বলছি। আমার যদি কোনও কারণে কোনও এক হাতের কোনও একটি আঙুল— যে কারণেই হোক, না থাকে, তাহলে সেই আঙুলে কৃত্রিম আঙুলকে গোপন করার জন্য আমার শরীরে যে কোনও গোপন জায়গা থেকে স্কিন নিয়ে আঙুলের গায়ে কভার করে দিতে পারি। আর সেই আঙুলের স্কিন প্রিজার্ভ করার জন্য রাতে কৃত্রিম আঙুলটা খুলে ওই লিকুইডে ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়বেই।

— তাহলে ঠিক আছে। প্রমথেশবাবু বললেন— কিন্তু কৃত্রিম আঙুল গোপন করবো কেন?

— সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন। নেপাল বলল— আজ চলি। তাড়া আছে।

।। সতের ।।

হোটেলে ফিরে নেপাল সকলের আগে স্নানটা সেরে নিল। নেপাল স্নান সেরে বেরিয়ে এসে রুবানকে বলল— তুই এই বেলা বাথরুম থেকে ঘুরে আয়। তারপর ফটোগুলো নিয়ে বসবো। আমার মনে হচ্ছে এই ফটোগ্রাফগুলিই আমাদের কেসের মোস্ট ইমপর্টেন্ট টার্নিং পয়েন্ট হবে। নেপাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মাথার ভেজা চুল মুছতে মুছতে বলল— একজন স্টুডিও মালিকের চোখে যা ধরা পড়ল, একজন পেশাদার দক্ষ কালপ্রিটের চোখে যে সেটা ধরা পড়ল না, এটাই অবাক লাগছে। একেই হয়তো বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

— তুমি কি ধরা পড়ার কথা বলছো নেপালকাকা? বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল রুবান।

— স্ল্যাকড লাইম মেশানো ভেজা মাটির দাগ। নেপাল মাথার চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল— আর দেরি করিস না। চট করে স্নানটা সেরে এসে বোস।

রুবান বাথরুমের কাজ সেরে বেরিয়ে আসার পর নেপাল ইন্টারকমে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফটোগ্রাফের খামটা বের করল। বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ নিয়ে ফটোগ্রাফগুলো দেখল। তারপর রুবানকে বলল— দেখতো রুবান, স্পেশাল কিছু দেখতে পাচ্ছিস কিনা?

রুবান নেপালের হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে একটার পর একটা ফটো পরীক্ষা করে বলল— সবক'টা জুতোর ছাপ কিন্তু একই। এমনকি সাইজ পর্যন্ত। সম্ভবত একই ব্যক্তি নিজেই এলোমেলো হেঁটে জয়রামের লাশের চারদিকে অনেকগুলি পায়ের ছাপ ফেলেছে।

— ইয়েস! এর থেকেই বেদপ্রকাশেরা ধারণা করেছে, জয়রামের লাশ বহন করে এনেছিল অন্তত চারজন মানুষ। নেপাল বলল।

— কিন্তু এটা কী? রুবান বিড়বিড় করে বলল— জুতোর ডান পাটির সোলের গায়ে একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। চিহ্নটা কিন্তু বাঁ পাটির সোলে অনুপস্থিত। দেখ তো ছোটকা, কিছু বুঝতে পারছো কিনা!

নেপাল রুবানের হাত থেকে আতস কাঁচ এবং ফটোগ্রাফগুলি নিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল। রুবান ঠিক ধরেছে। প্রতিটি ফটোগ্রাফে যে একজোড়া জুতোর সোলের ছাপ ধরা পড়েছে, তার ডানপাটির সোলের নিচে একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটাই তো আরও নিশ্চিত করেছে যে প্রতিটি জুতোর ছাপ এক ব্যক্তির। তবে চিহ্নটা জুতোর সোলে খোদাই করার দরকার কি ছিল? চিহ্নটা তবে কি এমন কিছু একটার প্রতীক, যা আততায়ীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একান্তই গোপন! ফলে চিহ্নটিকে পাছে ভুলে যায় আততায়ী, সেকারণে কোনও ডায়েরি টায়েরিতে লিখে না রেখে একেবারে নিজের জুতোর সোলের গায়ে মাউন্ট করে রেখেছে।

— চিনেছি ছোটকা, চিনেছি। রুবান বলল— চিহ্নটা অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্কেত। তাই ইংরেজি বর্ণমালার 'ও' আলফাবেট দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

— অক্সিজেন। নেপাল দেখল, সত্যি সত্যি ইংরেজি আলফাবেটের 'ও' বর্ণটি চেনা যাচ্ছে।

কিন্তু অক্সিজেন গ্যাসের পারমাণবিক চিহ্নটা এমন কি গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় যে তাকে সকলের চোখ আড়াল করার জন্য আততায়ী তার ডান পায়ের জুতোর সোলে লুকিয়ে রাখার কথা বিবেচনা করেছে। তাছাড়া ইংরেজি বর্ণমালার পাঁচটি ভাওয়েলের এই চতুর্থ ভাওয়েলটিকে মনে রাখার জন্য একেবারে একান্ত গোপনীয় স্থানে লিখে রাখতে হবে— এটাও তো তেমন বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। তবে এর প্রকৃত তাৎপর্যটি কি? কোন রহস্যের সুড়ঙ্গ পথের প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়ে আছে এই একটি ইংরেজি অক্ষর! যা নাকি আবার অক্সিজেন নামক অতি পরিচিত, বহুশ্রুত একটি গ্যাসের পারমাণবিক চিহ্ন বোঝায়।

দরজায় টোকা পড়ল। ওপার থেকে কথা ভেসে এল— স্যার চা।

নেপাল বলল— দরজা খোলা আছে। তুমি ভেতরে চলে এসো।

সবুজ রঙের ট্রেতে দু-কাপ চা, সঙ্গে দুটো প্লেটে দুটো করে

গরম সমোসা নিয়ে ঘরে ঢুকল হোটেল কর্মীটি। তারপর সেন্টার টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে নেপাল এবং রুবানের দিকে চা এবং সিঙ্গাড়ার প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল— ডিনারে কি নেবেন স্যার!

এখন সিজিন টাইম। পুজোর মরশুম। তাই হোটেলে এখন বোর্ডারের সংখ্যা অনেক। ফলে ক্যানটিনের ওপর চাপও খুব। সন্ধ্যায় ডিনারের মেনু জানিয়ে না রাখলে রাত্রে খাবার সময় পছন্দসই খাদ্য নাও মিলতে পারে। আজ যখন হোটেলেই আছে রুবানরা তখন ডিনারের কথা বলে রাখাই ভাল।

— আজ কিন্তু ভেজ নেব। রুবান বলল— চিকেন খেতে খেতে জিভে চড়া পড়ে গেছে। কথা শেষ করে রুবান হোটেল কর্মীটিকে বলল— মটরপনির আর গোবি মাঞ্চুরিয়া ব্যাস!

— রাইস ইয়া চাপাটি? কর্মীটি হাতের ছোট ডায়েরিতে লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করল।

— চাপাটি। রুবান বলল।

ছেলেটি অর্ডার নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর এখন নিরেট নিস্তব্ধতা। নেপাল এবং রুবান নিঃশব্দে সিঙ্গাড়াগুলি খেয়ে শেষ করল বটে। কিন্তু তারা যে সিঙ্গাড়ার স্বাদটুকুও উপভোগ করছেনা, পরিবর্তে গভীর চিন্তার ভেতর ডুবে আছে। তাদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

একসময় চা পানও সমাপ্ত হল। নেপাল একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল— নিশ্চয় কোনও সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে ওই 'ও' অক্ষরটি। কিন্তু সংখ্যাটা কি হতে পারে?

— সংখ্যা! রুবান একরকম বেড ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। — ওটা একটা সংখ্যার চিহ্ন। অক্সিজেন গ্যাসের পারমাণবিক ভর সংখ্যা হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট ডবল নাইন ফোর নাইন ওয়ান ফাইভ। তুমি যদি পয়েন্টটা তুলে দাও, তাহলে তুমি একটা এইট ডিজিটের সংখ্যা পেয়ে যাবে। সংখ্যা তাহলে দাঁড়াবে ওয়ান ফাইভ নাইন নাইন ফোর নাইন ওয়ান ফাইভ।

— কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর সংখ্যা তো ষোল? নেপাল বলল।

— ওটা তো আসন্ন মান অনুযায়ী বলা হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যার উঁচু ক্লাশে অক্সিজেনের পারমাণবিক ভরকে ষোল ধরা হয় না। প্রকৃত মানই ধরা হয়। তাই পনের পয়েন্ট-এর পরে আরও ছয় ঘর পর্যন্ত ধরা হয়। রুবান বলল।

— বেশ। ধরে নিলাম আততায়ী পাছে ওই আট ডিজিটের সংখ্যাটা ভুলে যায়, তাই জুতোর সোলে পেস্ট করে রেখেছে। নেপাল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল— তাহলেও তো প্রশ্ন থেকে যায়, ওই সংখ্যাটাকে নিয়ে আততায়ী কি করবে?

আবার নিস্তব্ধতা নামল হোটেল ঘরে। দশহরা উৎসবের রাবণ পোড়ানোর সব শেষ হয়ে গেছে। একটু আগেও জানলা দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেই আকশে ভেসে উঠল আতসবাজির স্ফুলিঙ্গ। কখনও কখনও নানারঙের ফানুসও ভেসে যাচ্ছিল আকাশ ডিঙ্গিয়ে। এখন সব কিছু নির্জন হয়ে এসেছে। আকাশে এখন আর আতসবাজির বর্ণচ্ছটা নেই। পরিষ্কার আকাশের বুকে দশমীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে টেগর হিল।

হঠাৎ নেপাল সেলফোনে একটি নম্বর ডায়াল করল। তারপর বোতাম টিপে কানে লাগালো সেল ফোনটা। ওপার থেকে সাড়া ভেসে আসা মাত্র নেপাল বলল— বলতো ভায়া, স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বরটা কি?

ওপার থেকে নম্বরটা শুনল নেপাল। তারপর ফোন না ছেড়ে নেপাল বলল— রুবান। নম্বরটা নোট করতো।

নেপালের কথামতো রুবান লিখল— ফোর ফোর ফোর ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন নাইন ফোর নাইন ওয়ান ফাইভ।

— মাই গড! রুবান নম্বরটা লেখার পর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। প্রথমে পরপর চারটে চার। অর্থাৎ 'ও' যেহেতু ইংরেজির পাঁচটি ভাওয়েলের চতুর্থ ভাওয়েল, তাই প্রথম চারটে চার মনে রাখা খুব কঠিন নয়। তারপর অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা। অসাধারণ ঘটনা। আততায়ী নিশ্চয় খুব মেধাবী। পদার্থ বিদ্যাটা গুলে খেয়েছে।

— তুই যা ভাবছিস একদম ঠিক ভাবছিস। ভুলে যাস না প্রথমদিনই বেদপ্রকাশ আমাদের জিয়াউদ্দিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল— জিয়াউদ্দিন খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। তারপর আমেরিকা চলে যায়। ওই মাথায় কোনও স্টেটের কোনও ডিপার্টমেন্টের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরটাকে নিয়ে এভাবে জাগলারি করা একেবারে জলভাত।

কথা শেষ করে নেপাল বলল— জিয়াউদ্দিন, তুমি এতদিন কেবল ঘুঘু দেখেছো, এবার দেখ ফাঁদটা কেমন হয়।

কথা শেষ করে নেপাল আবার সেল ফোনে বেদপ্রকাশকে ধরল। তারপর বলল, কাল তোমার অফিসার এবং ফোর্সকে অ্যালার্ট করে রেখো। নাটক শেষ হবে কাল।

।। আটারো ।।

ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুবানকে সঙ্গে নিয়ে নেপাল রাতু রোডের নিউ পুলিশ ব্যারাকে হাজির হল। গেটের মুখেই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের চার ডি এস পি-র অন্যতম অফিসার দীপক চন্দ্র ঝা অপেক্ষা করছিল। নেপালকে ব্যারাকে প্রবেশ করতে দেখে দীপক এগিয়ে এল— আপনার জন্য ডি আই জি সাহেব তার চেম্বারে অপেক্ষা করছেন।

— চলুন। দেখা করি গিয়ে। নেপাল আর রুবান ডিএসপি দীপক কুমার ঝাকে অনুসরণ করে বেদপ্রকাশের চেম্বারে ঢুকল।

— কি ব্যাপার বলতো ভায়া! বেদপ্রকাশ উত্তেজনা চাপতে না পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল— হঠাৎ করে কাল রাতে

ওরকম একটা ফোন করলে কেন? কেনই বা বললে সব অফিসারদের অ্যালার্ট করে রাখতে। কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না।

— আর একটু পরেই পরিষ্কার হবে। নেপাল বলল— তার আগে তোমাদের এজেন্ট ব্যাঙ্ক এস বি আই রাঁচির ম্যানেজারকে নির্দেশ দাও তোমাদের ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকাউন্ট-এর সব রকম অনলাইন ট্র্যাংজ্যাকশন আপাতত কিছুক্ষণের জন্য সাসপেনশনে রাখার জন্য।

বেদপ্রকাশ ফোন করে রাঁচির স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজারকে বাড়িতে ধরল। তারপর নেপালের কথামতো নির্দেশ জানাল।

— বেশ। নেপাল বলল— এবার আমরা সরাসরি কাজে নেমে পড়ি। কী বল ব্রাদার!

— অবশ্যই। বেদপ্রকাশ বলল। — চল বেরিয়ে পড়ি তোমার জিয়াউদ্দিনের সন্ধানে।

— তার আগে তোমাদের আই জি সাহেবের অনুমতিটুকু নেওয়া উচিত নয় কী? নেপাল ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসিটা ধরে রেখে বলল— এত বড় একটা কাজে চলেছো, তেমন হলে ভারি এনকাউন্টারও হতে পারে। দু'পক্ষেরই দুই একজন মারাও যেতে পারে। মিডিয়া হৈচৈ ফেলে দেবে। তখন আই জি সাহেবকে তুমি কি কৈফিয়ত দেবে ডি আই জি সাহেব?

— অনুমতি নেবে কার কাছ থেকে? বেদপ্রকাশ বলল— আজ যে এত কাণ্ড হবে, সেটা তো কাল রাতে ফোনে জানাওনি। কেবল অ্যালার্ট থাকার কথা বলেছ। জানলে অন্তত কাল রাতেই আই জি সাহেবের পারমিশনটা নিয়ে রাখতাম।

— এখন নিতে অসুবিধা কোথায়? নেপাল জিজ্ঞেস করল।

— উনি তো হেড কোয়ার্টারে নেই। বেদপ্রকাশ বলল— সকালেই মিসেস-এর ফোন পেয়ে পাটনা রওনা হয়ে গেছেন। আর উনি ট্যুরে বেরিয়ে গেলে মোবাইল অফ করে রাখেন।

— কি বললে! আই জি হেডকোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে গেছেন! নেপাল প্রায় চিৎকার করে উঠল। বলল— তাহলে তো কেল্লা ফতে। চল, চল বেদপ্রকাশ, জলদি চল। নষ্ট করার মতো আর এক সেকেণ্ড সময়ও আমাদের হাতে নেই। বলতে বলতে নেপালর আর রুবান বেদপ্রকাশের কালো স্করপিওতে উঠে বসল। বেদপ্রকাশ গাড়ির চালকের পাশে বসে হাঁক দিল— বয়েজ, ফলো মি।

রাঁচি হাজারিবাগ সড়ক দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল বেদপ্রকাশের কালো গাড়িটা। পেছনে পেছনে দুটো জিপ। প্রথমটিতে বসে আছে ডি এস পি দীপক কুমার ঝা। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র পুলিশ। পরের জিপটিতে বসে আছে চন্দ্রশেখর কোড়ে। তার সঙ্গেও চারজন অস্ত্রধারী পুলিশ। বাকি দুই ডি এস পি—জেনাথন পিটার, সুরীন্দ্র সিং তাদের ফোর্স নিয়ে হেড কোয়ার্টারেই স্ট্যাণ্ডবাই হিসেবে অপেক্ষা করছে। বেদপ্রকাশের কাছ থেকে সিগনাল পেলেই তারাও মুভ করা শুরু করবে।

কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলের সামনে যখন বেদপ্রকাশের কালো গাড়িটা জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে ন'টা বেজে চল্লিশ সেকেণ্ড। ঘড়ি দেখে নেপাল স্বস্তির শ্বাস ফেলল। বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছানো গেছে। জাতীয় সড়কের ওপর তেমন যানজটও হয়নি।

স্করপিওটাকে সড়কের একপাশে দাঁড় করালো গাড়ির চালক। দেখাদেখি পেছনের দুটো জিপও রাস্তা ছেড়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেদপ্রকাশের সঙ্গে নেপাল এবং রুবানও গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। নেপাল মাটিতে নেমেই দেখল রাস্তার সড়কের এদিকের ঘাস জমির ওপর গাড়ির চাকার দাগ। দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দাগগুলো টাটকা। বড়জোর ঘন্টা তিনেক আগে এই ঘাস জমির ওপর দিয়ে কোনও চারচাকার যান গেছে। দুটো সমান্তরাল দাগ কানহাইয়া টং টিলার পাশ দিয়ে রামগড় পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে শৃঙ্গের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। ওদিক দিয়েও যে ঝিন্দারা গড়ে যাওয়া যায়, এই খবর নেপাল প্রমথেশ ঘোষের বই থেকে পেয়েছে।

নেপাল রুবান আর বেদপ্রকাশ আগে আগে। পেছনে দীপক আর চন্দ্রশেখর। তাদের পেছনে সশস্ত্র আটজন। জঙ্গলের পথ ভেঙে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলল।

প্রায় চল্লিশ মিনিট রুদ্ধশ্বাস যাত্রার পর নেপালরা রাজা ঝিন্দারাই মুণ্ডার গড়কে আবিষ্কার করল। সত্যি দেখার মতো একটি নির্মাণ শিল্প। ভাবাই যায় না, এই ঘন অরণ্যের ভেতর এরকম একটা কেল্লা সদৃশ্য প্রাসাদ থাকতে পারে। গড়ের পূবদিকের প্রাকার ভেঙে পড়েছে। হয়তো ইংরেজ গোলন্দাজ সেনাদের বর্বরতার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ওই ভগ্ন পাঁচিল। কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে বনজ লতাগুল্মের চাদরের নিচে। তবে যেটুকু অংশ এখনও অক্ষত আছে, তার দিক থেকেই চোখ ফেরানো কষ্টসাধ্য।

হঠাৎ নেপালের মনে পড়ল প্রমথেশ ঘোষের বর্ণনা। মনে পড়ল সেই ঘরের কথা। যে ঘরের কেন্দ্র থেকে বাইরের চারপাশ দেখা যায়। তবে বাইরে থেকে কেন্দ্রের ব্যক্তিকে দেখা যায় না। তাই নেপাল বলল— বেদপ্রকাশ মাটিতে শুয়ে পড়। তোমার সঙ্গীদেরও শুয়ে শুয়ে আমাদের ফলো করতে বল।

প্রায় মিনিট পনেরো বুক হেঁচড়ে চলার পর নেপাল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে গড়ের দরবার কক্ষে বন্দুকের গুলির মতো ঢুকে

পড়ল। ঢোকার পরেই নেপাল হাঁক দিল— বেদপ্রকাশ তোমাদের আই জি সাহেব জয়রাম শর্মা মহাশয়কে এখুনি রাঁচির অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। ওঁর ইমিডিয়েট এমারজেন্সি ট্রিটমেন্ট দরকার।

বেদপ্রকাশ, রুবান, দীপক কুমার এবং চন্দ্রশেখর দরবার কক্ষে ঢুকে একেবারে বিস্ময়ে হতবাক। ম্যাজিক নাকি? দু'দুজন জয়রাম শর্মা হাজির হল কেমন করে? আর দুজনেই যদি আই জি সাহেব হন,তাহলে তারা এখানে এলেন কেমন করে? আর একজন আই জি-র বাম কপালে নিজের রিভলবারের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন নেপাল? দ্বিতীয় আই জি সাহেবকে কে বা কারা ঘরের থামের সঙ্গে এমন ভাবে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে?

— ম্যাজিক নয় ভাই বেদপ্রকাশ। নেপাল বলল— তুমি তোমাদের প্রকৃত আই জিকে বাঁধন খুলে মুক্ত কর। তারপর দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করো। আর এই যে আই জি দেখছ, ইনিই হচ্ছেন তোমাদের মোস্ট ওয়ান্টেড মিস্টার জিয়াউদ্দিন। বলতে বলতে নেপাল জিয়াউদ্দিনের ঘাড়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল। ধাক্কার অভিঘাত সামলাতে না পেরে জিয়াউদ্দিন বেদপ্রকাশের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নেপাল বলল— চন্দ্রশেখর, তোমাদের নকল আই জি সাহেবকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে রাঁচি নিয়ে চল।

বিকেল বেলা কথা মতো নেপাল এবং রুবান রাতু রোডের নিউ পুলিশ ব্যারাকের কনফারেন্স রুমে হাজির হয়ে দেখল, তাদের পৌঁছানোর আগেই কনফারেন্স রুমে পৌঁছে গেছেন প্রমথেশ ঘোষ। পৌঁছে গেছে বেদপ্রকাশ এবং তার বিশেষ টাস্ক ফোর্স গ্রুপের চারজন ডি এস পি। তারা সবাই দুই সারিতে ভাগ হয়ে বসে আছে। তাদের পেছনে চারজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় বন্দী জিয়াউদ্দিন। জিয়াউদ্দিনের হাত দুটোয় লোহার হাতকড়া। চার পুলিশ কর্মী তাদের রাইফেলের মুখ জিয়াউদ্দিনের দিকে তাক করে রেখেছে।

— আমি জানি, তোমরা সকলেই ভেবে কূল পাচ্ছ না যে আজ প্রায় একমাস ধরে কুখ্যাত টেরোরিস্ট জিয়াউদ্দিন কেমন করে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তোমাদের প্রকৃত আই জি জগতরাম শর্মাকে সরিয়ে নিজেই কাজ চালিয়ে গেল। এটা অবশ্য খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। একটি রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিকে কিডন্যাপ করে অন্যত্র সরিয়ে রেখে একজন কুখ্যাত টেরোরিস্ট নিজেই আই জি সেজে প্রায় মাসাধিককাল ধরে তার যাবতীয় নাশকতামূলক কাজের পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করে গেল— এই ঘটনা একেবারে বিরল যেমন, তেমনি লজ্জারও। তবে আমি বলতে চাই, এরজন্য লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। জিয়াউদ্দিনের মতো ভয়ঙ্কর এবং ধূর্ত এক অপরাধীর কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রথমে বলে রাখি, রাঁচি-চাইবাসা জঙ্গলমহলে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ সম্প্রতি যে বেড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে জিয়াউদ্দিনের কোনও সংশ্রব নেই। এটা ঠিক যে জিয়াউদ্দিন তার অপরাধ জীবনের শুরুতে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে সময়ে জিয়াউদ্দিন বেশ কয়েকবার পাক-আফগান সীমান্তে তালিবান জঙ্গীদের কাছে প্রশিক্ষণও নিয়েছিল। তবে একসময় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে নিজেই একটি অপরাধ চক্র গড়ে তোলে। এবং নিজের দল নিয়েই সে উত্তর ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে অপরাধমূলক কার্যকলাপ শুরু করে। এভাবেই জিয়াউদ্দিন একজন ধনকুবের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

যেহেতু আজ কয়েক বছর ধরে উত্তর বিহার থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ জঙ্গল এবং পার্বত্য অঞ্চলে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বেড়ে উঠেছে এবং সেই অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসন সেই উগ্রপন্থীদের মোকাবিলায় ব্যস্ত, তাই জিয়াউদ্দিন তার অপরাধের সাম্রাজ্য হিসেবে রাঁচি শহরকে বেছে নেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল ঝাড়খণ্ড সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সারা বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ— যা নাকি কয়েক শো কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিজের সুইজারল্যাণ্ডের এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নেওয়া।

খুবই সাধু উদ্দেশ্য। জিয়াউদ্দিন নিজেই একজন কৃতি

"ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই হচ্ছে গৌণ। লোকে বলে, হৃদয় উন্মুক্ত হলে চিন্তার প্রভাব আসে। ভারতের হৃদয়ও একসময় উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে। ভারত ভারত-ই। আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াতেই কেমন শান্তি এনে দেয়।"

(৯/৪৬১)

ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় গিয়ে আরও উন্নত প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ সে লাভ করেছিল। তাই সাইবার ক্রাইমের যাবতীয় ব্যাকরণ সে গুলে খেয়ে ফেলেছিল। আমেরিকায় থাকার সময়েই সে শিখে ফেলেছিল কেমন করে লক করে রাখা কম্পিউটারের রেকর্ডরুম ওপেন করে অনলাইন ডাটা ট্রান্সফার করতে হয়। আজ থেকে প্রায় বছর সাত আট আগে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার ব্রুকলিন ব্যাঙ্ক-এর সাইবার রবারির কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে। এটাও মনে আছে যে ওই রবারির ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্রুকলিন ব্যাঙ্ক নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। সেই সাইবার রবারির নায়ক ছিল আমাদের জিয়াউদ্দিনই।

প্রকৃত জগতরাম শর্মা এবং জিয়াউদ্দিনের চেহারাগত সাদৃশ্যটা অনেকটাই কাকতলীয়। দু'জনেরই উচ্চতা সমান। দুজনের মুখাকৃতিও এক। দুজনের কণ্ঠস্বরেও আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে। তার ওপর জগতরাম শর্মা দীর্ঘদিন স্টেড ক্যাডার ডেপুটেশন সেন্ট্রাল ক্যাডারে কাজ করার জন্য ঝাড়খণ্ডের পুলিশের পদস্থ কর্তারা তার সঙ্গে তেমন পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। যেমন স্বয়ং বেদপ্রকাশ। সেও জয়রাম শর্মাকে আগে কখনও দেখেনি। ফলে জয়রামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন চেহারার কোনও মানুষ যদি জয়রামের ড্যামি হয়ে কাজ করে, তাহলে সহকর্মীদের চোখে ধুলো দেওয়া যথেষ্ট সহজ হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জিয়াউদ্দিন তাই আই জি সাহেবকে কিডন্যাপ করে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের ডেরায় রেখে নিজেই নকল আই জি সেজে আবির্ভূত হল।

এর আগে অবশ্য জিয়াউদ্দিনকে জয়পুর যেতে হয়েছিল। জয়পুরের বিখ্যাত এসকর্ট হাসপাতালে প্রায় দিন পনেরো মতো সময় তাকে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। তোমরা সবাই জানো, জয়পুরের এসকর্ট হাসপাতাল প্লাস্টিক সার্জারি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃত্রিম অঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যান্টের কাজে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। সেখানেই জিয়াউদ্দিন তার মুখের চেহারার সঙ্গে জগতরাম শর্মার মুখের যেটুকু বিসাদৃশ্য আছে, সেটুকু মেরামত করে নেয়। সেই সঙ্গে যেহেতু তার ডানহাতের তর্জনীটা বছর কয়েক আগে পুলিশের সঙ্গে এক এনকাউন্টারে বাদ গিয়েছিল, তাই সেখানে একটি নকল আঙুল প্রতিস্থাপন করিয়ে নিয়েছিল। কারণ প্রকৃত জগতরাম শর্মার দু'হাতের দশ আঙুলই বর্তমান। নকল আঙুলটি যাতে কোনও অবস্থাতেই কারও চোখে ধরা না পড়ে, এই কারণে জিয়াউদ্দিনের অনুরোধে এসকর্ট হাসপাতালের সার্জেন জিয়াউদ্দিনের বাম উরুর পেছন দিক থেকে কিছুটা চামড়া তুলে নিয়ে নকল আঙুলটিকে কভার করে দেন। আপনারা যদি এখনই জিয়াউদ্দিনের বাম উরু উন্মুক্ত করে দেখেন, তবে চামড়া অপসারণের দাগটা দেখতে পাবেন।

কিন্তু নকল আঙুলকে হাতের বাকি চারটে আঙুলের মতো স্বাভাবিক রাখতে হলে আঙুলের গায়ে জড়ানো সজীব চামড়াকে সজীব রাখা অতিবড় কঠিন কাজ। তাই হাসপাতালের ডাক্তার জিয়াউদ্দিনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দিনের চবিবশ ঘন্টার মধ্যে অন্তত আটদশ ঘন্টা সে যেন নকল আঙুলটিকে হাতের পাঞ্জা থেকে খুলে ক্লোরোপ্রোপিওন্যালডিহাইড সল্যুশনের ভেতর ডুবিয়ে রাখে। এই কারণে জগদীশ কোড়ের খুন হওয়ার সংবাদ শুনে আমি যখন নকল জগতরামের বেডরুমে ঢুকেছিলাম তখন একটি আলমারির তাকে একটি শিশি দেখি, দেখি একটি বিশেষ তরলে পূর্ণ বিকার। ওই বিকারের সল্যুশনে যে নকল জগতরাম তার ডানহাতের নকল তর্জনীটাকে সারা রাত ডুবিয়ে রাখত, এবং পরদিন সকালে আঙুলটিকে বিকার থেকে তুলে ভালো করে সল্যুশন মুক্ত করে যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে ডিউটিতে আসত।

কিন্তু সেই দিনটা বেদপ্রকাশ আমাকে তড়িঘড়ি আই জি সাহেবের বাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়েই বিপদ ঘটিয়ে বসল। আমি আই জি সাহেবের বাংলোয় ইন্সপেকশনে আসছি শুনে জগতরাম দ্রুত তার শোওয়ার ঘরের আলমারির তাকে রাখা সেই সল্যুশন ভর্তি বিকার থেকে আঙুল তুলে নিয়ে হাতের পাঞ্জায় লাগানোর সময় বিকার থেকে কয়েক ফোঁটা সেই তরল মেঝেয়, আলমারির তাকের ওপর পড়ে গিয়েছিল। যেহেতু এই সল্যুশনটির স্বাদ উগ্র মিষ্টি, এই কারণে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু কাঠপিঁপড়ে জড়ো হয়ে যায়। আমার তখনই সন্দেহ হয়। আমি তাই সকলের চোখের আড়ালে আমার রুমাল দিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা দু-চার ফোঁটা সলিউশন মুছে তুলে নেই। তারপর সেই সল্যুশনের কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় গবেষক সুপণ্ডিত প্রমথেশ ঘোষ মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। উনি তার উদ্যোগে রুমালে জড়ানো তরলটির কেমিল্যাল নাম এবং কেমিকেলটির ব্যবহার আমাকে জানিয়ে দেন। কেমিক্যালটি স্বাদে এতটাই মিষ্টি যে নকল আই জি সাহেব নকল আঙুল পরে তার ড্রইং রুমে আমাদের মিট করেছিলেন। তখন তিনি তার ডান হাতের পাঞ্জাটা কিছুক্ষণের জন্য সোফার ওপর রেখে বসেছিলেন। এই কারণে ফিরে আসার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম সোফার সেই জায়গাটায় দু-চারটে পিঁপড়ে জুটে গেছে।

— কিন্তু আমাদের রিলায়েবেল জয়রাম এবং আই জি বাংলোয় আমাদের পুলিশ কর্মী জগদীশের খুনের ঘটনাটা ঘটল কেন? কেই বা খুন করেছিল? বেদপ্রকাশ প্রশ্ন করল।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার কারণে নেপাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল— জয়রাম তোমাদের প্রকৃত সোর্স নয়। ওকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিল স্বয়ং জিয়াউদ্দিন। উদ্দেশ্য, জিয়াউদ্দিন সম্পর্কে মনগড়া মুখরোচক গল্প বলা এবং সেই সঙ্গে তোমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম জেনে নেওয়া। সেই সঙ্গে জয়রাম একটা অসাধারণ কাজও করেছিল। তোমাদের সচিবালয়ে আনাগোনা শুরু করে অ্যাকাউন্টস সেকশন থেকে তোমাদের এস বি আইয়ের অ্যাকাউন্টটা জেনে নেওয়া। যেদিন জয়রামের মুখে গল্প কাহিনী শুনে তোমরা সদলবলে কানহাইয়া টং ফরেস্টে সারাটা দিন পাহারা দিয়েছিলে, সেদিনই জয়রাম তার মালিককে অ্যাকাউন্ট নম্বরটা জানিয়ে দেয়। ফলে যেহেতু জয়রামের কাজ শেষ হয়ে যায়, তাই জিয়াউদ্দিন সাক্ষী রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টেই ওকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে। এই গুলিটাও যথেষ্ট অভিনব।

পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এম বুলেট এদেশে কেন, এশিয়ার কোনও দেশেই তৈরি হয় না। তৈরি করে সুইজারল্যাণ্ডের এক কোম্পানি। এবং বুলেটগুলি বাণিজ্যিক ভাবেও উৎপাদিত হয় না। কারণ, এই বুলেটের ক্রেতা একমাত্র আমেরিকান ফেডারেল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এর বন্দুকটাও ওই কোম্পানির তৈরি। এটি কারোর হাতে দেখলে অতি বড় গোয়েন্দারও সাধ্য হবে না এটা অনুমান করা যে এটি একটি আগ্নেয়াস্ত্র। তবে এই বুলেটের একটাই বৈশিষ্ট্য যে এই বুলেট আর দশটা বুলেটের মতো ট্রিগার টেপা মাত্র বিস্ফারিত হয় না। বুলেটের বিস্ফোরক দুটি পৃথক কম্পার্টমেন্টে রাখা হয়। পেছনের দিকের কামরায় থাকে সামান্য পরিমাণের বারুদ। সামনের কম্পার্টমেন্টে থাকে যথার্থ প্রাণঘাতী বারুদ। তাই প্রথমে বুলেটের পেছনে রাখা বারুদে অগ্নিসংযোগ করলে বিস্ফোরণের কোনও শব্দ হয় না। কেবল লক্ষ্যবস্তুর ভেতরে প্রবেশ করার মতো গতিটুকু সৃষ্টি করে ওই দহন। লক্ষ্যবস্তুর ভেতরে প্রবেশের পরেই বুলেটের দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টে মজুত বিস্ফোরকের দহন শুরু হয়। তখন পর্যাপ্ত তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয়, যা কোনও মানুষের প্রাণ নেওয়ার পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। এই কারণে জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে, জয়রামের মস্তিষ্কের সব কোষ পুড়ে গেছে। এই নাও সেই বন্দুকের ডায়াগ্রাম এবং বুলেট প্রস্তুতকারক কোম্পানীর ওয়েবসাইট নম্বর।

— আর জগদীশ! বেদপ্রকাশ পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

— খুব সোজা। নেপাল হাসল— জগদীশ তো তোমাদের পুলিশের কর্মী ছিল না। ছিল জিয়াউদ্দিনের অতি বিশ্বস্ত সাগরেদ। তোমাদের পুলিশ প্রশাসনের এমনই দুরবস্থা যে তোমরা সবাই ওপর মহলের দিকেই তাকাতে ভালবাসো। নিচু তলার এক সাধারণ কন্সটেবল তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। তোমাদের সেই উদাসীনতার সুযোগ নিয়েই জিয়াউদ্দিন নকল আই জি সেজে জগদীশকে বাংলোর ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। সেই জগদীশের ওপরেই দায়িত্ব পড়েছিল আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার। একারণেই সেদিন মাঝরাতে জগদীশ জিয়াউদ্দিনের সেই বন্দুক আর বুলেট নিয়ে হাজির হয়েছিল হোটেল সিটি প্যালেসের জানলার নিচে। গুলিটা ঠিকই করেছিল, আমি সামান্য অসতর্ক হলে হয়তো জগদীশকে মরতে হত না। কিন্তু আমি ঠিক সময় মাথা নামিয়ে নেওয়ার কারণে জগদীশের নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এবং গুলিটা হোটেল ঘরের ক্যালেণ্ডারে লেগে জ্বলে ফুরিয়ে যায়। জগদীশ ভেবেছিল আমি তাকে দেখে ফেলেছি। ফলে নিশ্চয় তাড়া করব। তাই সে মরণপণ করে ছুটেছিল। ছোটার সময় জগদীশের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভীষণ রকম জখম হয়। প্যান্টের বাঁ পায়ের কিছুটা অংশ ফণীমনসার কাঁটায় জড়িয়ে গিয়ে ফেঁসে যায়। এভাবে সে যখন বাংলোয় পৌঁছায় জিয়াউদ্দিনের সামনে নিজের ব্যর্থতাজনিত যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে তখন জিয়াউদ্দিন আর জগদীশকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

— কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরটা? বেদপ্রকাশ বলল— এটার রহস্য তো বুঝতে পারছি না।

— এটা একরকম পড়ে পাওয়া ষোল আনা বলতে পারো। নেপাল বলল— জয়রামের মৃত্যুরহস্য আমাকে এই তথ্য দেয় যে, জিয়াউদ্দিন জয়রামকে বাইরে কোথাও খুন করেনি। কারণ, জয়রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ওর মত্যুর সময় দেওয়া আছে মধ্যরাত। রাত দুটো-আড়াইটা হবে। ওইসময় কানহাইয়া টং-এর জঙ্গলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসা সম্ভব নয়। মৃত্যুটা ঘটেছে কানহাইয়া টং-এর ফরেস্টেই। অর্থাৎ অন্তত সেই রাতটা জয়রাম এবং তার মনিব জিয়াউদ্দিন ওই জঙ্গলেই যাপন করেছে। তখনই আমার মনে হয়, তাহলে ওই জঙ্গলে এমন কোনও পরিত্যক্ত ঘর দালান আছে, যাকে জিয়াউদ্দিন তার টেম্পোরারি সেন্টার বানিয়েছে। এটা মাথায় আসা মাত্র রাঢ়বঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রমথেশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে যাই। তিনি আমাকে যে গ্রন্থটি পড়বার জন্য দেন সেখানেই জানতে পারি, ওই জঙ্গলের ভেতর কোল বিদ্রোহের এক বীর যোদ্ধা রাজা ঝিন্দারা মুণ্ডার গড় আছে। সেই গড়টির একাংশ এখনও অটুট। তখনই আমি বুঝে ফেলি জিয়াউদ্দিন ওই গড়টিকেই তার কন্ট্রোল রুম হিসেবে গড়ে তুলেছে। ওখানেই সে উপযুক্ত টাওয়ার বসিয়ে স্যাটেলাইট লিঙ্ক পর্যন্ত গড়ে তুলে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ব্যাঙ্ক রবারির। এসব তো তোমরা সরেজমিনেই দেখেছো।

এবার আসি তোমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রসঙ্গে। প্রথম যেদিন বেদপ্রকাশ আমাকে নিয়ে তার আই জি সাহেবের বাংলোয় গিয়েছিল, আমাকে আই জি সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়, তখন নকল আই জি বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যেহেতু বৃষ্টি বাদলার দিন, তাই নকল আই জি-র পায়ে ছিল হাঁটু সমান উঁচু গামবুট। কালো রঙের গামবুটের টো-এর কাছে সামান্য সাদাটে রং লেগেছিল। সেই রংটা যে কোনও চুনাপাথরের এলাকার কাদার দাগ, আমার বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তাই আমি নিজেই কানহাইয়া টং-এর স্পটটা দেখতে গিয়েছিলাম। এবং প্রত্যাশা মতোই দেখলাম, সেখানে একটা মস্ত চাতাল। চাতালটা মূলতই কোনও বড় মাপের চুনাপাথরের স্তর। দীর্ঘদিন ধুলোমাটি জমা পড়ে ওপরে একটা ঘাসের আস্তরণ পড়েছে। তবে বৃষ্টি বাদলার দিনে সেই কাদামাটি সরে গিয়ে চুনাপাথরের স্তর বেরিয়ে পড়ে। পা দিয়ে দাঁড়ালে জুতোর ছাপ খুব স্পষ্ট ভাবে পড়ে। ফলে ওখানে যতগুলি জুতোর ছাপ পেয়েছিলাম, আমি সবকটির ফটো তুলেছি। ফটোগুলি ডেভেলপ করিয়ে আমি দেখলাম, সব ক'টি ছাপই একটি মানুষের জুতোর ছাপ। এবং প্রতি জোড়া ছাপের ডান পাটির সোলে একটা বিচিত্র চিহ্ন— ইংরেজি অক্ষর 'ও' আলফাবেটটি মাউন্ট করা আছে। বাকি কৃতিত্ব আমার ভাইপো কাম সহকারি রুবানের। রুবান যদি 'ও' আলফাবেটটির প্রকৃত রহস্য উদ্ধার না করে দিত, তাহলে আমি আর তোমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে উপযুক্ত সময়ে লকড্ করাতে পারতাম না।

— ঝুট। সব ঝুটা ইলজাম। ম্যায় বেকসুর হুঁ। ম্যায়হি অসলি জগতরাম। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, ঝাড়খণ্ড। তোমাদের কারোর কোনও অধিকার নেই আমাকে অ্যারেস্ট করার। পেছনের সারিতে হাতকড়া লাগিয়ে বসে থাকা জিয়াউদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু চেঁচানোই সার হল। চার সশস্ত্র প্রহরী জিয়াউদ্দিনকে ধাক্কা দিয়ে প্রিজন ভ্যানে তুলতে তুলতে বলল— কাল কোর্টে প্রমাণ দিস যে তুই আসল আই জি। শালা বেইমান, প্রিজন ভ্যান ছেড়ে দিল।

নেপাল প্রমথেশবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার দেওয়া বইটা ফেরত দিতে চাইল। প্রমথেশ ঘোষ বইটা নিলেন না। নেপালের কাঁধে হাত রেখে বললেন— ওটা তুমি তোমার কালেকশনে রেখে দাও। আমার একটা বই যে তোমাকে এত বড় এক দেশদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করতে কাজে লেগেছে, এতেই আমি গর্বিত।

যে অ্যাম্বাসাডারটি প্রমথেশবাবুকে তার কাঁটাতলি কলোনীর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, সেই গাড়িটি প্রমথেশবাবুকে তার গৃহে ছেড়ে আসার জন্য রওনা দিল।

বেদপ্রকাশ নেপালকে বলল— ব্রাদার তোমাদের ট্রেন তো রাত দশটায়। তাহলে রাতের ডিনারটা আমার বাড়িতেই অ্যারেঞ্জ করি!

— চমৎকার প্রস্তাব। নেপাল হেসে উঠল— কতদিন ভাবীজীর হাতের রান্না খাইনি।

এক এক করে সব ক'টি গাড়ি তাদের আরোহীদের নিয়ে নিউ ব্যারাক থেকে রওনা হয়ে গেল

আজ একাদশী। রাঁচির আকাশ শুক্লা একাদশীর চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ●●

লাল ফিতে

গোপালকৃষ্ণ রায়

"রাজা দুর্বল হলে আমাত্যগণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে"।

বুড়ো বটগাছটার নীচে প্রতিদিন তাকে পাওয়া যায়। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মেটে রংয়ের একটা পলিথিন সীটের ওপর বসে থাকে। হাত তিনেক লম্বা বাঁশের লাঠিটা পাশে রাখে। লাঠিটা তার দীর্ঘদিনের সহায় ও সাথী। বছর বারো আগে আশ্বিনের ঝড়ে ঘর চাপা পড়ে ডান পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। ষাট বছরের পাকা হাড় আর জোড়া লাগেনি। লাঠিতে ভর দিয়েই তাকে পথ চলতে হয়।

ভাঙ্গা ঘরটা প্রতিবেশী গোপেশ্বর কর্মকার মেরামত করে দিয়েছিল। ঘর বলতে একটা টিনের ছাপরা। ছেঁচা বাঁশের বেড়া। দরমার ঝাঁপটি দড়ি দিয়ে বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক

কিমি দূরে বটগাছের নীচে গিয়ে বসে। লোকে বলে বটগাছটা আটপুরুষের সাক্ষী। দেবগ্রামের বিধু উকিল বলে, এই বটগাছটি পলাশী যুদ্ধের একমাত্র জীবন্ত সাক্ষী।

ঝড় জল আর ছুটির দিনগুলি বাদে এই বটগাছের নীচেই ইন্দুমতীকে পাওয়া যায়। ইন্দুমতী পরামানিক। দুর্গা পরামানিকের বিধবা। টুকির মা। জন্মের বছর তিনেক পরেই টুকি মারা গেছে। সে মারা গেলেও তার নাম এখনও বেঁচে আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা এখনও ইন্দুমতীকে টুকির মা বলেই ডাকে। অবশ্য ফকিরডাঙার বয়স্ক মানুষেরা ইন্দুমতীকে দুর্গা নাপতের 'বিধবা' বলেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। তবে ভোটার তালিকায় জমি বাড়ির দলিলে ইন্দুমতী পরামানিকই লেখা আছে।

এই ইন্দুমতী পরামানিকই প্রতিদিন বটগাছের নীচে এসে বসে। পলিথিনের সীটটা বিছিয়ে বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। শুধু ইন্দুমতী নয়, প্রতিদিন বিডিও অফিসে যারা নানা কাজে আসে, তাদের সবাইকে আশ্রয় দেয় এই আড়াইশ বছরের প্রাচীন বটগাছ। বয়স আড়াই'শ বছর হলে কী হবে, এখনও শাখা-প্রশাখা সবুজ ও তারুণ্যে উজ্জ্বল। চৈত্রের দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত দেহ এই বটবৃক্ষের ছায়ায় শান্ত হয়। কৃতজ্ঞ মানুষ সম্ভবত সেজন্যেই গাছের কাণ্ডে আঁচড় কাটে না — ডাল ভাঙে না — পাতা ছেঁড়ে না।

কে যেন একবার দাদের মলমের সাইন বোর্ড লাগিয়েছিল। টিনের সাইন বোর্ড গুঁড়ির গায়ে পেরেক পুঁতে লাগিয়েছিল। পাড়ার ছোট বড় সবাই সেই সাইন বোর্ড শুধু খুলে ফেলেনি মলমের মালিককে হাতীশালা থেকে ধরে এনে বটগাছের নীচে চার ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কেউ কেউ বলেছিল ওই সাইন বোর্ডটা ওর বুকে পেরেক পুঁতে লাগিয়ে দাও। অবশ্য সাহস করে অত কঠিন শাস্তি তাকে দেয়নি। ইন্দুমতী জনতার সেই বিচার না দেখলেও অনেকের মুখে গল্প শুনেছে। সেই থেকে বট গাছটার বিরাট মোটা কান্ডে আর হাতীর পায়ের মতো ঝুরিতে কেউ আঁচড়ও কাটে না। একটা পাতাও ছেঁড়ে না। মানুষের ভালবাসায় বটগাছটি পবিত্র হয়ে উঠেছে। শুধু মানুষ নয়, নানা রকম পাখিদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল এই বটবৃক্ষ।

ইন্দুমতী গত পাঁচ বছর ধরে এই বটগাছের নীচে বসছে। বাঁশের লাঠিটা পাশে রেখে, বটগাছের বিশাল কান্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

প্রায় সকলেই ইন্দুমতীকে চেনে। কেউ ডাকে দিদিমা, কেউ বা ঠাকুমা, কেউ বা পিসি বা মাসি বলে।

— ভাল আছো, ঠাকুমা, তোমার কিছু হল? ইন্দুমতী গাছে হেলান দিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলে, কোথায় আর হল, ভাই। আমি বেঁচে থাকতে বোধহয় হবে না।

লোকটিও জানে, ইন্দুমতীর কাজ কবে হবে তা স্বয়ং ভগবানও জানেন না। গত পাঁচ বছরে তিনটি বিডিও এলেন গেলেন, কিন্তু অনেক আশা নিয়ে প্রতিদিন বিচার-অবিচারের সাক্ষী বটবৃক্ষের নীচে বসা বন্ধ হল না ইন্দুমতীর। নতুন বিডিও এলেই অনেকেই বলতো, এবার তোমার কাজ হবেই, ঠাকুমা। তোমাকে আর বটতলায় বসতে হবে না। ইন্দুমতী তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। তার মুখ আশায় উজ্জ্বলও হত না, আবার নিরাশায় ম্লান হত না। তখন তাকে মনে হত কৃষ্ণনগরের মৃত শিল্পী কার্তিক পালের তৈরি, নির্বিকার অচঞ্চল এক মূর্তি। আগে বলতেন, তোমরা তো আশা দিচ্ছো, কিন্তু হচ্ছে কোথায়?

যারা আশার কথা শুনিয়েছিল, তারা লজ্জা পায়। তারাও শুনেছে ইন্দুমতীর ফাইল নাকি অচল। র‍্যাক থেকে সেই ফাইল নামাতে সকলেই নাকি ভুলে যায়।

ইন্দুমতী বুঝতে পারে না, সরকারি অফিসে এমন কেন হয়? দিন-মাস-বছর কেটে যায় তবু ফাইল র‍্যাক থেকে নামে না। ফাইলের কী হাত-পা আছে যে নিজে থেকেই নামবে?

হঠাৎ একদিন ভীতু কণ্ঠে এই প্রশ্নটাই করে ফেলেছিল ইন্দুমতী।

প্রশ্ন শুনে অফিসের বাবুরা রে রে করে উঠেছিল।

বা-ববা বুড়ির মুখে হঠাৎ খৈ ফুটছে কেন?

কী গো ঠাকুমা, কোনও নেতা-টেতা ধরেছ নাকি?

একজন তো বলেই বসল, শোন ঠাকুমা, আমাদের চেয়ে নেতাদের পকেট বড়, বুঝলে? ঘোর, ঘোর, ঘুরতে থাক, ঠাকুমা। ঘুরে ঘুরে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তবুও ফাইল র‍্যাক থেকে নামবে না।

ব্যাজার মনে বটতলায় ফিরে গিয়েছিল ইন্দুমতী। কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, অফিসের বাবুরা এমন ব্যবহার করছে কেন? বিডিও-র সঙ্গে দেখাই করতে দিচ্ছে না।

— এই যে ঠাকুমা, ওদিকে যাবে না, সাহেব খুব ব্যস্ত।

ইন্দুমতী ম্লান মুখে বলেছিল, আরে বাপু, তোমাদের সাহেব তো প্রতিদিনই ব্যস্ত। তা বাপু আমার কাজটা কবে হবে?

— হবে ঠাকুমা হবে। বোঝ তো সরকারের হাজারো রকমের কাজ। তোমার কাজের চেয়ে অনেক জরুরি কাজ সাহেবকে করতে হয়।

আমারটা কী কাজ নয়?

ইন্দুমতীর প্রশ্নের জবাব কেউ দেয় না। কে একজন মৃদুস্বরে বলে, মালপত্র ছাড়ো ঠাকুমা। সম্ভবত মন্তব্যটা ইন্দুমতীর কানে যায় না।

আড়াই'শ বছরের প্রাচীন বটগাছটিও কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকে। অপুর চায়ের দোকান বন্ধ। মাটির উনুনটাকে সে ঢেকে রেখে যায়। গৌরীর মা স্টোভ জ্বালিয়ে আলুর চপ-বেগুনি ভাজে। মুড়িও রাখে। বাঁশের বাখারি দিয়ে গৌরীর মা লম্বা একটা বেঞ্চ বানিয়েছে। কিছু না খেলেও, যে কেউ সেখানে বসতে পারে।

গৌরাঙ্গ কাঁচের শো-কেসে তিন-চার-রকমের মিষ্টি নিয়ে আসে। তার বেলের মোরববার খুব চাহিদা। রবিবার বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলি মানুষের আনাগোনায় বটতলা গমগম করে।

ইন্দুমতীও সবার মতো রবিবার ও অন্যান্য বন্ধের দিন বটতলায় যায় না। ঘরেই শুয়ে বসে কাটায়। একদম ভাল না লাগলে, গোপেশ্বরের বাড়ি যায়। এটা প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার বলে কেউ খুশিও হয় না। আবার বিরক্তও হয় না।

গোপেশ্বরের বউ দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুমা এখানে শোও, বিশ্রাম কর।

শুলেই ইন্দুমতী ঘুমিয়ে পড়ে। সূর্য পশ্চিমে হেলে যাবার পর ঘুম থেকে ওঠে। বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, কোনও খবর এল ঠাকুমা?

ইন্দুমতী বলে, সে-ই এক কথা, সদর থেকে তোমার ফাইল আসেনি। এক কথা শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে গেল।

গোপেশ্বর হাসতে হাসতে বলে, তোমার ওই ফাইল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা আছে। আসবে কী করে?

লাল ফিতের কথা বটতলায় অপুও বলেছিল। লাল ফিতের বাঁধন যে এত মারাত্মক, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পাচ্ছে ইন্দুমতী।

অপু ছেলেটা ভাল। কিছু লেখা পড়াও জানে। প্যার্টি-ট্যাটি করে না বলে তার কপালে চাকুরি জোটেনি। চাকরি পায়নি বলে তার কোনও দুঃখ নেই। চায়ের দোকান থেকে তার আয় মোটামুটি ভালই হয়।

অপুই একদিন বলেছিল, ঠাকুমা তুমি সারাজীবন ঘুরলেও লাল ফিতের বাঁধন খুলবে না। ওই বাঁধন-টাধন খোলার জন্য কিছু পুজো দিতে হয়।

ইন্দুমতী বলে, কোথায় পুজো দিতে হবে? কোন ঠাকুরের কাছে?

অপু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, কোনও দেব-দেবীকে পুজো দিতে হবে না। ওই অফিসের মধ্যেই লোভী দৈত্য বসে থাকে। তোমার অতগুলো টাকার একটা ভাগ অফিসের দৈত্যগুলোকে না দিলে, লাল ফিতের বাঁধন কোনও দিনই খুলবে না, ঠাকুমা।

দাওয়ায় বেসে অপুর কথাগুলোই ভাবছিল ইন্দুমতী। টাকার ভাগ দিতে হবে। ভাগ না দিলে, ফাইলের ওপর ধূলো জমতেই থাকবে।

বিডিও অফিসের লোকগুলো যেন কেমন? সব সময়ই হাত পেতে বসে আছে। অপু বলেছিল, ঠাকুমা, তুমি একদিন দেবগ্রামে যাও। এম এল এ-র সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব বল।

কিন্তু এম এল এ-র কাছে যায়নি ইন্দুমতী। গোপেশ্বর বলেছিল, যেতে পার, কিন্তু তুমি কী তাঁর নাগাল পাবে? তাঁরা তো অনেক উঁচুতে বসে থাকেন, ঠাকুমা। শুধু ভোটের আগে নেমে আসেন।

একটু আগেই গোপেশ্বরের বাড়ির পিছনে সূর্য ডুবে গেছে। ইন্দুমতীর উঠোনে আঁধার একটু আগে আগেই নামে। ঘরের পিছনে বড় একটা কাঁঠাল গাছ। নারানের বাবা লাগিয়েছিল। বলেছিল, জান ইন্দু, এই গাছে হাজার কাঁঠাল ধরে। লোকে বলে হাজারি গাছ।

ইন্দুমতী বলেছিল, সবে তো লাগালে। দুর্গাদাস বলেছিল, কাঁঠাল গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। বড় হয়। ডাল-পালা মেলে। তাড়াতাড়ি বড় হলেও দুর্গাদাস কাঁঠাল খেয়ে যেতে পারেনি। যে বছর কাঁঠালের লুচি এল, সেই বছরেই মারা গেল সে। নারানের বয়স তখন দুই। টুকি তো তার দু'বছর আগেই মারা গেছে।

সত্যি হাজারি গাছ। ডালে ডালে কাঁঠাল ধরে। তবে বেশি বড় নয়। ইন্দুমতী কাঁঠাল খায় না। প্রতি বছর ফল বিক্রি করে দেয়। শত খানেক টাকা পাওয়া যায়। গোপেশ্বরই বিক্রির পরামর্শ দিয়েছিল।

এবার আলো জ্বালাতেই হয়। অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে। করমচা গাছ থেকে বেরিয়ে জোনাকিগুলো সারা উঠোনে উড়ে বেড়াচ্ছে। সারা রাতই ওরা ওড়ে। সকাল হলে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে কে জানে! ইন্দুমতী ঘরে যায়। দেয়াশালাই জ্বালিয়ে পিদিম জ্বালে। তারপর লম্ফো।

রাতে রান্না করে না ইন্দুমতী। মুড়ি খই ভিজিয়ে তাই দিয়ে রাতের আহার শেষ করে। নিজের মনেই বলে, এ সব মুড়ি ইউরিয়া মিশিয়ে দ্যাখনদারি করে। আর সে যখন মুড়ি ভাজতো, সেই মুড়ি নেবার জন্য উঠোনে লাইন পড়ে যেত। নিজের জমির ধান দিয়ে মুড়ি ভাজতো সে। এখন আর কোথায় ধান পাবে? সে জমি তো আর নেই। ব্রীজ বানাবার জন্য সরকার তার জমি নিয়ে নিয়েছে। তিন বিঘে ধানী জমি।

♠ ♠ ♠

এখন খালের মতো মনে হলেও, এটি একটি নদী। এর একটি নামও ছিল মরাগঙ্গা। মরাগঙ্গা এখন মরাগাঙ্ নামেই পরিচিত। শীতকালে হেঁটে পারাপার করা গেলেও। বর্ষাকালে যৌবন ফিরে পায়। মাস ছয়েকের জন্য। খেয়া চলে। আট-দশটি গ্রামের মানুষের খুবই অসুবিধা হয়।

পারে। সে ক্ষেত্রে জমির মূল্য অনেক কম হবে। সরল করে বলি, সরকার আপনার ওই তিন বিঘে জমি বাজার দরে কিনে নেবে।

সুযোগ পেয়ে গোপেশ্বর বলে, এখানে তো এখন কাঠা প্রতি চার হাজার টাকা বিকোচ্ছে। বিডিও বলেন, সরকার ঠাকুমাকে কাটা প্রতি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারে। কী ঠাকুমা, আপনি রাজী তো?

রাজী হয়েছিল ইন্দুমতী। ঠিক হয়েছিল, সরকার তাকে ষাট কাঠা জমির দাম তিন লক্ষ টাকা দেবে।

সরকার জমি নিয়ে নিল। বছর খানেকের মধ্যে মরাগাঙের উপর সেতু তৈরি হল। এক মন্ত্রী সেতুটির উদ্বোধন করলেন। জমি দিয়ে যাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদও জানালেন।

এসব তো পাঁচ বছর আগের কথা। সেতু হল। লোক চলাচল শুরু হল। কিন্তু এখনও ইন্দুমতী ক্ষতিপূরণের টাকা পেল না। তার ফাইল লাল ফিতের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল না।

ইন্দুমতীর উঠোনে আঁধার নেমে আসে। চাল বাছা বন্ধ করে ঘরে যায় সে। দেয়াশালাই বার করে লম্ফ জ্বালায়। লম্ফটি ঘরের এক কোণে রেখে, আবার দাওয়ায় এসে বসে। পরিস্কার আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বল জ্বল করছে।

হঠাৎ স্মৃতির গর্ভ থেকে একটা ঘটনা বেরিয়ে আসে। হাসিও পায় আবার শিহরণও জাগে। টুকির বাবা উঠোনে এসে সাইকেল থেকে নামলো। দোল পূর্ণিমা। পাড়া-পড়শির সঙ্গে সকাল-দুপুর রং খেলেছে। গা-মাথায় সাবান ঘষেছে। একটা নতুন ডুরে শাড়ি পরেছে। দাওয়ায় বসে দুর্গাদাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। সাইকেল থেকে নেমেই দুর্গাদাস ইন্দুমতীর পাশে গিয়ে বসে। মুখ ঘুরিয়ে এক ঝলকে দুর্গাদাসকে দেখে ইন্দুমতী। বলে, আবার বসলে কেন, যাও হাত মুখ ধুয়ে এস।

দুর্গাদাস ইন্দুমতীকে জড়িয়ে ধরে বলে, চল মরাগাঙের ধার থেকে ঘুরে আসি। ইন্দুমতী বলে, এই ভর সন্ধ্যায় আর মরাগাঙের ধারে যেতে হবে না।

দুর্গাদাস বলে, আমাদের জমিতে কী সুন্দর গম হয়েছে। শীষগুলো কী সুন্দর দেখতে। একবার বাতাসে নুইয়ে পড়ছে, আবার উঠছে। জ্যোৎস্না রাতে কী সুন্দর দেখায়। ইন্দুমতীর মন নরম হয়।

— চাঁদের আলোয় মাঠ ভেসে যাচ্ছে। চল না গো;

ইন্দুমতী ঠোঁট টিপে হেসে বলে চল।

দু'জনে এসে জমির ধারে দাঁড়ায় গমের শীষে শীষে চাঁদের আলো। বসন্তের মন্থর হাওয়া। দুর্গাদাস ইন্দুমতীকে জড়িয়ে ধরে।

— আঃ ছাড়ো, কেউ দেখে ফেলবে। বলেই দুর্গাদাসের বুকে আত্মসমর্পণ করে। সেই হারিয়ে যাওয়া রোমাঞ্চে রোমাঞ্চি ত হয়ে ওঠে সত্তরোর্ধ ইন্দুমতী।

কোথায় টুকির বাবা? টুকিও নেই সেও নেই। সব দুঃখ যন্ত্রণা, তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে দুজনেই এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ইন্দুমতী লম্ফ নিয়ে ঘরে যায়। ভেতর থেকে ঝাঁপটা বন্ধ করে দেয়। জল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। টাকায় হাত দেয় না ইন্দুমতী। অফিস ছুটির পর সবাই যখন ঘরে ফিরতে শুরু করে তখন পয়সাগুলো থলেয় বেঁধে ভজার ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়ায় ইন্দুমতী। খুচরোগুলো ভজাকে দিয়ে নোট নিয়ে ঘরে ফেরে।

♠♠♠

ভোরে উঠতে পারল না ইন্দুমতী। অথচ খুব ভোরে ওঠাই তার অভ্যাস। গাঁয়ে সবার আগে বিছানা ছাড়ে আবার সবার শেষে বিছানায় যায়।

বিছানায় শুলেই কী ঘুম আসতে চায়? এই সময় কে যেন স্মৃতির দরজা খুলে দেয়। সেই খোলা দরজা দিয়ে কত ঘটনা কত মানুষ হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। কারও মুখে হাসি, কারও চোখে জল। হাসি-কান্নার এক যুগল বন্দী স্পষ্ট দেখতে পায় ইন্দুমতী।

সব ঘটনা ছাপিয়ে একটা ঘটনা চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে। বাহান্ন বছর আগের ঘটনা। বাবা মা ব্যস্ত। পাড়া-প্রতিবেশীরাও ব্যস্ত। শাড়ি গয়না পরে মেয়েরা ছোটাছুটি করছে।

বর এসেছে। বুকটা দুরু দুরু করে ইন্দুমতীর।

মালা বদলের সময় বরের মুখ দেখে খুশীই হয়েছিল সে।

দৃশ্যটা হারিয়ে যায়। ইন্দুমতী ঘুমিয়ে পড়ে। সে শুনতে পায় বাইরে থেকে কারা যেন ডাকছে।

উঠতে চেষ্টা করে ইন্দুমতী। জবাব দেবারও চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কেমন যেন এক আচ্ছন্নের মধ্যে ডুবে যায়। ইন্দুমতী সবার কথাই শুনতে পাচ্ছে — কিন্তু কারও কথার জবাব দিতে পারছে না।

ঝাঁপ ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে গোপেশ্বর ও আরও কয়েকজন। যে মানুষটা রাত থাকতে ঘুম থেকে ওঠে — সেই মানুষটা এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে কেন?

ইন্দুমতীর হুঁস নেই বললেই চলে। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কেউ আর ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই স্থির করে।

ইন্দুমতীর জমির ওপর সেতু তৈরি হবার পর এই প্রথম গরুর গাড়িতে শুয়ে তার ওপর দিয়ে গেল ইন্দুমতী।

♠♠♠

প্রায় তিন সপ্তাহ পর, সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরে ইন্দুমতী। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী আরও দু'সপ্তাহ নিজের ঘরে বিশ্রাম নিয়ে বটতলায় যায়। অপু ছুটে আসে - বলে, এখন ভাল আছ ঠাকুমা?

ইন্দুমতী মৃদু হাসে বলে, তোরা সব ভাল আছিস তো?

— হ্যাঁ ঠাকুমা। শুনেছ ঠাকুমা, নতুন বিডিও এসেছে। মহিলা বিডিও। দেখতে খুব ভাল। নাম শুনলাম নন্দিতা চক্রবর্তী।

— তাই। কবে এল?

— তুমি তখন হাসপাতালে। যাও, আজই দেখা কর।

একটু চুপ করে থেকে ইন্দুমতী বলে, অফিসের নচ্ছার লোকগুলি কী আমাকে দেখা করতে দেবে?

এই ভাবনাটা অপুর মাথায়ও ছিল। সে জানে অফিসের ওই সব কেরানীবাবুরা ঠাকুমার হকের টাকার ভাগ চায়। তিন লাখের মধ্যে এক লাখই ওদের দিতে হবে। না দিলে লাল ফিতের বাঁধন খুলবে না।

অপু বলে, ভয় পেলে চলবে না ঠাকুমা। ওরা বাধা দিলে তুমি চেঁচামেচি শুরু করবে।

তোমার চেঁচামেচি শুনে নিশ্চয়ই বিডিও ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে।

ইন্দুমতী বলে, পাঁচ বছর যা করিনি এখন কী তাই করা ঠিক হবে?

অপু বলে, অনেক সহ্য করেছ, ঠাকুমা, এবার সুযোগ ছেড়ো না।

অপুর কথায় দুর্বল শরীরেও ভরসা পায় ইন্দুমতী। পায়ে পায়ে বিডিও অফিসে ঢোকে সে। অফিস ভর্তি লোক। বাইরেও হাজারো মানুষ।

ইন্দুমতী সোজা বিডিও-র চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়। একজন পিয়ন ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই বুড়ি কোথায় যাচ্ছো? মেমসাহেব খুব ব্যস্ত। ইন্দুমতী গলা আরও খানিকটা চড়িয়ে বলে, এ কথা তো পাঁচ বছর থেকে শুনছি।

বড়বাবু, ছোটবাবু সবাই ছুটে আসে। আজ আর ইন্দুমতীকে থামাকে পারে না কেউ। সে গলা তুলেই বলতে থাকে, আর কবে ফাইল খুলবে? আমি মরে যাবার পর?

চেঁচামেচি শুনে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন বিডিও নন্দিতা চক্রবর্তী।

— কী ব্যাপার এত হৈ-চৈ কেন?

কেউ কিছু বলার আগে ইন্দুমতী বলে, তুমি-ই বিচার কর মা;এই লোকগুলো পাঁচ বছর আমার ফাইল আটকে রেখেছে। আমার জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছি না। নিজের টাকা থাকতে ভিক্ষে করি। বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাতে বিব্রত বোধ করেন বিডিও নন্দিতা চক্রবর্তী। পাঁচ বছর ধরে বৃদ্ধা মানুষটি ঘুরছে।

বিডিও বলেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। পাঁচ বছর চেষ্টা করার পর, এই প্রথম ইন্দুমতী বিডিও-র চেম্বারে ঢুকতে পারল।

বটতলায় দাঁড়িয়ে অপু সবাইকে শুনিয়ে বলে, এবার নিশ্চয়ই ঠাকুমার ফাইলের লালা ফিতের বাঁধন খুলবে!

সুদৃশ্য 'দেউল' মন্দিরের বর্তমান দৈন্যদশা। রঘুনাথবাড়ি (অযোধ্যা) চন্দ্রকোণা, পঃ মেদিনীপুর।

মন্দির গড়ার 'বিশ্বকর্মা' সূত্রধর সম্প্রদায়

প্রণব রায়

পশ্চিমবাংলা ও 'বাংলাদেশের' গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য দেব-দেউল লক্ষ্য করে একটা কথা প্রায়ই সাধারণের মুখে শোনা যায়— 'এগুলো স্বয়ং বিশ্বকর্মার সৃষ্টি।' কোনও কোনও দেব-দেউল সম্পর্কে আবার স্থানীয় লোকের ধারণা, 'বিশ্বকর্মা' মাত্র এক রাতের মধ্যে সেটি তৈরি করে ফেলেন। আবার অর্ধসমাপ্ত কোনও কোনও মন্দিরকে দেখিয়ে গ্রামগঞ্জের কেউ কেউ আজও বলে থাকেন, রাত ভোর হয়ে যাওয়ায় বিশ্বকর্মা সেটি শেষ করতে পারেননি। অবশ্য মন্দির গবেষক মাত্রই জানেন, বিশ্বকর্মার প্রসঙ্গ এখানে শুধু কথার কথা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে পৌরাণিক স্থাপত্য বিশারদ বিশ্বকর্মার নাম এতই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, বাংলার নিজস্ব শৈলীতে গড়া সাদামাটা বা পোড়া মাটির কাজ করা মন্দিরগুলি যে বিশ্বকর্মা ছাড়া অন্য কারও হাতে তৈরি হতে পারে না, সে বিষয়ে তারা একরূপ নিশ্চিত। এই বদ্ধমূল ধারণা থেকেও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে অসম্ভব প্রাচীনতার কথা শোনা যায়। যেমন, একশ বছরের পুরনো কোনও মন্দিরকে এক হাজার, এমনকি দু-হাজার বছরেরও পুরনো বলে মনে করা ইত্যাদি। মন্দির সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই ধারণা বা বিশ্বাসের মূলে রয়েছে যেমন একদিকে কিংবদন্তীর নায়ক বিশ্বকর্মার কারিগরী দক্ষতার প্রবাদ, অপরপক্ষে আমাদের বাংলার এই মন্দিরগুলির অত্যদ্ভুত স্থাপত্য ভাস্কর্যকর্ম, যা মনকে ভরিয়ে দেয় তার আশ্চর্য শিল্পসুষমায়।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার অসাধারণ স্থাপত্যনৈপুণ্যের কথা

একেবারে কিংবদন্তীর পর্যায়ে না পড়লেও ঋগ্‌বেদের যুগে বাস্তুবিদ্যার 'গান্ধার', 'মধ্যদেশ' ও 'দ্রাবিড়' নামে যে তিনটি শাখার প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন, তার মধ্যে 'মধ্যদেশ' শাখার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন 'বিশ্বকর্মা' (দ্রষ্টব্য, ইণ্ডিয়ান কালচার, জানুয়ারি, ১৯৪০, পৃঃ ৩৪৭)। 'মধ্যদেশ' স্থাপত্যকে বলা হত 'সুর' বা 'ব্রহ্মণ-স্থাপত্য'। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একাশি ও বিরাশি সূক্তে বিশ্বকর্মাকে একই সঙ্গে ঋষি ও দেবতা বলা হয়েছে, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করেছিলেন। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, বিশ্বদর্শনকারী সেই দেব বিশ্বকর্মা কোনও স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ করে আকাশকে উপরে বিস্তারিত করেছিলেন। মোটামুটিভাবে ঋগ্‌বেদে বিশ্বকর্মার বিশ্বনির্মাণ নৈপুণ্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে মৎস্যপুরাণে আঠারো জন বাস্তুশাস্ত্রকার বা স্থাপত্য বিশারদের যে নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশ্বকর্মার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বকর্মার অবদান সুপ্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

বাংলাদেশে চৈতন্য পরবর্তীকালের কয়েক শতকের মধ্যে যে অজস্র ইঁট ও পাথরের মন্দির তৈরি হয়েছে, সেগুলির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ শিল্প লক্ষ্য করে কিংবদন্তী বিশ্বকর্মার কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়। আসল বিশ্বকর্মার স্বহস্ত নির্মিত কোনও দেবায়তন বা বাসগৃহ আদৌ ছিল কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের দেশে যে একসময় বহু বিশ্বকর্মার আবির্ভাব হয়েছিল, তা বর্তমান মন্দিরগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এই বিশ্বকর্মারা সুন্দর সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করলেও আজও অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। তাঁদের হাতে গড়া মন্দিরগুলি নিতান্ত অবহেলা অনাদরে আজ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এই মন্দিরগড়া বিশ্বকর্মারা হলেন আমাদের দেশের মন্দিরস্থপতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন 'সূত্রধর' জাতীয়। একসময় এঁদের উপজীবিকা ছিল মন্দির নির্মাণ; আর মূর্তি ও ফুল লতা-পাতার নক্সায় তার দেওয়াল অলংকৃত করা। সুতোর দ্বারা নিখুঁত মাপজোক করে ভিন্ন ভিন্ন রীতির মন্দির নির্মাণে তাঁরা অতিশয় দক্ষ ছিলেন। পাথর ও ইঁটের অসংখ্য মন্দির তাঁরা তৈরি করে গেছেন গ্রামগঞ্জ, শহরের নানান স্থানে। স্থাপত্য ও অলংকরণ দু'প্রকার কাজেই এঁরা পারদর্শী ছিলেন। এঁদের এক গোষ্ঠী তৈরি করতেন খোদাই কাজ করা দরজা, দরজার ফ্রেম বা সাধারণ দরজা ও কাঠের দেব-দেবীর মূর্তি। অপর এক গোষ্ঠী যাঁরা পটুয়া বা চিত্রকর নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা আঁকতেন ভেতরের মন্দির দেওয়ালে নানান বর্ণের চিত্র বা পঙ্খের রঙিন চিত্র। বাংলার মন্দিরগুলিতে (সাধারণ ও অলংকারবিহীন মন্দিরের কথা বাদ দিয়ে) তাই একাধারে লক্ষ্য করা যায় কারু ও চারু শিল্পের আশ্চর্য সমাবেশ। বস্তুত বিভিন্ন শিল্পীর যৌথ প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ে। বস্তুত এই কাজে একাধিক সূত্রধর গোষ্ঠীই বিশ্বকর্মার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সূত্রধর সম্প্রদায় যাঁরা এইসব কাজে নিযুক্ত থাকতেন, তাঁরা তাঁদের পেশাগত পদবীগুলি নামের পাশে ব্যবহার করতেন। যেমন— মিস্ত্রী, কারিগর, শিল্পকার, সূত্রধর, ছুতার ইত্যাদি। বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে এই পদবীগুলির যে তাৎপর্যই থাকুক না কেন, মন্দির সূত্রধরদের কাছে এগুলি ছিল খুবই আদরের ও গৌরবের। কিছু কিছু মন্দির লিপিতে সূত্রধরদের নামের পাশে এই পদবীগুলির উল্লেখ লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে মন্দির-শিল্পী সূত্রধরদের বসতি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বেশ কিছু মন্দিরলিপিতে এঁদের যে নাম-ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে আমরা বসতিকেন্দ্রগুলির মোটামুটি পরিচয় পাই। সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষ করে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের পূর্বার্ধে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সেসময় রাঢ় বাংলার মন্দির দেবালয়ের এক কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। যদিও মল্লরাজত্বকালে বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে ওই সময় বিচ্ছিন্নভাবে বহু মন্দির নির্মিত হয়, তবুও পূর্বোক্ত স্থানসমূহে মন্দিরের সর্বাধিক সমাবেশ আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। মন্দির সূত্রধরদের বসতিগুলি এইসব স্থানেই কেন্দ্রীভূত ছিল। বর্তমান লেখক কর্তৃক এই সম্পর্কে যে সীমিত অনুসন্ধান করা গেছে তা থেকে জানা যায়, সূত্রধর বসতি কেন্দ্রগুলি প্রধানত অবস্থিত ছিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর, কলমিজোড়, খড়ার, ক্ষীরপাই, কাশিগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর এবং মেদিনীপুরের রাজহাটি, পাথরা। এই স্থানগুলি ছাড়া আরও কোনও কোনও স্থানে সূত্রধর বসতি ছিল বলে জানা যায়। যেমন হুগলী জেলার সেনহাটি এবং হাওড়া জেলার থলিয়া রসপুর প্রভৃতি। ওইসব স্থানের বাসিন্দা সূত্রধরেরা তাঁদের নাম-ঠিকনা লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন নানান স্থানের মন্দিরলিপিতে।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে যে কয়েক ঘর মন্দির-সূত্রধরের বাস ছিল, তাঁদের মধ্যে খৃস্টপূর্ব উনিশ শতকে রামহরি মিস্ত্রির বেশ নামডাক ছিল। সোনামুখীর শ্রীধরজীর পঁচিশ চুড়োর এক মন্দির (দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং আনুমানিক উচ্চতা ৩০ ফুট) তিনি তৈরি করলেন বাংলা ১২৫২ সাল বা ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে। ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রামেরই এক ধনী তন্তুবায় কানাই রুদ্র। মন্দির সম্পূর্ণ হল। তখন মন্দিরের চারদিকে পোড়ামাটির মূর্তিফলক ও ফুল-লতা-পাতার নক্সা বসানোর কথা পাড়লেন কানাই রুদ্র হরি মিস্ত্রির কাছে (রামহরি ওই নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন)। হরি মিস্ত্রি বললেন, তাহলে রুদ্রমশাইকে আবার মাকু ধরতে হবে। (কারণ রুদ্রমশাই তন্তুবায় হলেও নিজ হাতে মাকু ধরে কাপড় বুনতেন না)। অবশেষে মন্দিরের দেওয়ালে বেশ কিছু মূর্তিফলক বসল, যদিও সেগুলি খুব সুন্দর হল না। বোধহয় কানাই রুদ্র তেমন অর্থ ব্যয় করতে পারেননি। মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় একটা লিপিও বসানো হয়—

'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ / জয়তিতরাং / শকাব্দ ১৭৬৭ বাং ১২৫২ সাল / শাকে মনিরসাব্ধীন্দুগণ্যে শ্রীধর মন্দিরং।। অভবওত্র সম্পূর্ণং পঞ্চ বিং / শতিচূড়কং।। কানাঞি রুদ্রদাসেন / তন্তুবায়েন যত্নতঃ।। নির্ম্মায়িতং বরং / সৌধং নানাচিত্র সমন্বিতং / পক্ষবানার্কগণ্যে বেশানে ম্লেচ্ছাবনীপতেঃ / হরিসূত্রধরেন বর্ণিম্মিতং তদা।' (লিপিটি ঠিক ঠিক সারি অনুসারে এইভাবে ভাগ করে দেওয়া হল)।

লিপির অর্থ হল, ১৭৬৭ শকাব্দে বা বাংলা ১২৫২ সালে পঁচিশ চুড়োর শ্রীধর মন্দির সম্পূর্ণ হল। তন্তুবায় কানাই রুদ্রদাস এই সুন্দর সৌধটি নানাচিত্র যুক্ত করে সযত্নে তৈরি করালেন। ম্লেচ্ছাবনীপতি বা মল্লাধিপতির ১১৫২ সালে বা মল্লাব্দে হরি সূত্রধর এটি নির্মাণ করেছিলেন।'

এরপর হরি মিস্ত্রির ডাক পড়ল বর্ধমান রাজার দরবারে। অম্বিকা কালনায় বর্ধমান রাজাদের দৌলতে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল। বাংলা ১২৫৬ সাল বা ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে। নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের নামে তাঁর রাণী প্যারীকুমারী প্রতাপেশ্বর শিবের দেউল প্রতিষ্ঠা করলেন। এর সামনের চারপশের দেওয়াল সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তিফলকে ছেয়ে দেওয়া হল এবং নীচের দিকে মারবেল পাথরে একটা লিপি বসানো হল। তার শেষ লাইন এখানে উদ্ধার করা হল— 'শকাব্দ ১৭৭১সন ১২৫৬ এই দেয়ুল সোনামুখী / নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রীর নির্মিত।' পৌরাণিক নানা কাহিনী, রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, বিভিন্ন দেব-দেবীর ছোট্ট ছোট্ট মূর্তির অজস্র পোড়ামাটির ফলকে ঠাসা এই মন্দির উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এক সুন্দর শিল্পসৃষ্টি। রাজপরিবারের অর্থব্যয়ের এক সার্থক দৃষ্টান্তও বটে। এই দেউল মন্দিরটির শীর্ষভাগ খাঁজকাটা গম্বুজের মতো। এই মন্দির নির্মাণের প্রায় বারো বছর আগে বাংলা ১২৪৪ বা ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে হরি মিস্ত্রি সোনামুখীর চাঁদপাড়া কামারগলিতে কতকটা ওই ধরনের এক দেউল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে কালনার দেউলের মতো এর সামনের চারপাশে এত পোড়ামাটির মূর্তিফলক বসানো হয়নি। কিন্তু মন্দিরটির প্রবেশপথের ওপর রামসীতার যে ফলকটি আছে, সেটির সঙ্গে কালনার মন্দিরের রামসীতা মূর্তির মিল আছে। এই ধরনের গম্বুজশীর্ষ অলংকরণবিহীন তিনটি মন্দির বর্তমান লেখক কর্তৃক সোনামুখীতে দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং জানা গেছে ওইগুলি রামহরির তৈরি।

সোনামুখীর দেওয়ান বাজারে হরি সূত্রধরের বসতি ছিল এবং আরও বহু সূত্রধর এখানে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে রামহরি ছাড়া তাঁর জামাতা রামগোপাল মিস্ত্রি, রামগোপালের নাতি মানিক সূত্রধর, গদাই মিস্ত্রি, ঋষি মিস্ত্রি ও ভোলা মিস্ত্রির কারিগর হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। রামগোপাল সোনামুখীর শ্যামবাজার পল্লীর সিদ্ধেশ্বরের 'পঞ্চ রত্ন' মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন বাংলা ১২৭৪ সালে বা ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে। মন্দিরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। একটি প্রশস্ত দালান মন্দিরের ওপর পঞ্চ রত্ন মন্দিরটি সন্নিবেশিত। মন্দিরস্থাপত্যের এই দৃষ্টান্ত অদৃষ্টপূর্ব না হলেও বিরল। বাইরের দেওয়ালের বাংলা লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল—

'স্বর্ণমুখী গ্রামস্থিতি / সূত্রধর বংশোৎপত্তি / কারিগর শ্রীরামগোপাল / সিদ্ধেশ্বর শিবালয় / মরুতে সমাপ্ত হয় / স্বগ্রামের লইয়া সাহায্য / গন্ধবণিক কুলধর / শ্রীব্রজমোহন ঘর / সম্পাদন করিলে কার্য / শকাব্দ সতেরশ ঊননববই পরিমিত / বারশত চুয়াত্তর সাল।'

এই মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে একটি গল্প এখনও ওই গ্রামে প্রচলিত। রামহরির জামাই রামগোপাল এই মন্দিরটি তৈরি করে শ্বশুরকে দেখালে তিনি বললেন, 'একপায়ে দাঁড়ালে লোকের যেমন অবস্থা হয়, এটিরও তাই হয়েছে।' একথা শুনে রামগোপাল একটু দমে গেলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি মন্দিরের সকলের থেকে বড়ো চূড়াটির মধ্যে শিবের একটি মূর্তি বসিয়ে দিলেন। রামহরি দেখে বললেন, 'এবার ঠিক হয়েছে।' রামগোপাল এই মন্দির ছাড়াও বুড়ো শিবতলার দোল মন্দিরও তৈরি করেছিলেন। সেটি সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পরে তৈরি হয়েছিল। রামগোপালের নাতি মানিক মিস্ত্রিও সোনামুখীতলার সোনামুখীর দালান মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন বাংলা ১৩৫৬ সালে। সংস্কারকালীন লিপিটি এই—

'পীতাম্বর হালদারের পুত্র শ্রী কিঙ্কর চন্দ্র হালদারের দ্বারা এই মন্দির পুনর্গঠিত হইল সন ১৩৫৬ সাল, ১৪ অগ্রহায়ণ দেয়াসি পূর্ণচন্দ্র দাস কারিগর শ্রী মানিকলাল সূত্রধর।'

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরেও যে মন্দির সূত্রধরদের বসতি ছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এখানকার সনাতন মিস্ত্রি বাংলা ১২৬২ সালে মেদিনীপুর জেলার বগড়ীর কৃষ্ণ রায়ের 'পঞ্চ রত্ন' মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। অবশ্য বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ অলংকৃত মন্দিরগুলি কোন শিল্পীদের তৈরি তা আজও অজানা রয়ে গেছে। এমনি আরও কত সুন্দর সুন্দর মন্দিরের স্থপতিশিল্পীর নাম কালস্রোতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এইসব শিল্পীর যথাযথ ঠিকানা আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কিছু মন্দিরলিপি আজও অক্ষত। এসব লিপির কোনও কোনওটিতে পাওয়া যাবে এঁদের অনেকের নাম-ঠিকানা ও পরিচয়। সর্বাধিক লিপিসাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে, দাসপুরে একসময় বেশ কয়েকঘর মন্দির শিল্পীর বসতি গড়ে উঠেছিল। এঁরা মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন আঠার থেকে উনিশ শতকের মধ্য। পোড়া মাটির অলংকারযুক্ত কিছু মন্দিরও এঁদের হাতে তৈরি হয়েছিল। দাসপুর গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বিস্তীর্ণ এলাকায় মন্দিরসূত্রধরদের বহু পরিবার একসময় বাস করতেন। তাঁদের পদবী ছিল শীল, দে, চন্দ, দাস, সাঁই। এই পদবীগুলির পাশে তাঁরা কখনও কখনও 'মিস্ত্রী' বা 'কারিগর' উপাধিগুলি ব্যবহার করতে ভাল-বাসতেন। বর্তমান লেখক এঁদের কয়েকজনের নাম বিভিন্ন মন্দিরের লিপি থেকে উদ্ধার করেছেন। যেমন— (১) সাফলরাম চন্দ্র মিস্ত্রী, ১৭৮১ খৃস্টাব্দে মেদিনীপুরের চেঁচুয়ায় রাধাগোবিন্দের সুন্দর অলংকৃত মন্দির নির্মাণ করেন। এই জেলার দাসপুর থানার এই মন্দিরটি পোড়ামাটি অলংকরণের এক সুন্দর নিদর্শন। (২) সাফল মিস্ত্রী শ্রী বলরাম, ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে দাসপুর থানার কাদিরপুরের দত্তদের পোড়ামাটির কারুকার্যযুক্ত সুন্দর একটি পাঁচচূড়ার মন্দির নির্মাণ করেন। (৩) গোপাল চন্দ্র (১৭৯২ খৃঃ)। (৪) শত্রুঘ্ন মিস্ত্রী (১৮০৫ খৃঃ)। (৫) লোচন চন্দ ও বৃন্দাবন চন্দ (১৮২০-১৮৪৫ খৃঃ)। (৬) হরিহর চন্দ (১৮২১-১৮২৮)। (৭) জটিল স্বরূপ মিস্ত্রী (১৮৩২ খৃঃ)। (১০) হরিদাস মিস্ত্রী (১৮৫৪-১৮৬৬)। (১১) লোধন সাঁই (১৮৫৯-খৃঃ)। (১২) বৈষ্ণব দাস মিস্ত্রী (১৮৬২ খৃঃ)। (১৩) হরিচরণ দাস

(১৮৬৭ খৃঃ)। (১৪) মাধবচন্দ্র মিস্ত্রী (১৮৬৪-১৮৭৮)। (১৫) শীতল প্রসাদ চন্দ ((১৮৭০ খৃঃ)। (১৬) কালাচাঁদ মিস্ত্রী (১৮৯৫ খৃঃ)। (১৭) রামপদ দে মিস্ত্রী। (১৮) যদুরথ শীল (১৯০২ খৃঃ)। (১৯) নবচন্দ্র মিস্ত্রী (১৯০৫)। (২০) শশীভূষণ শীল ও শিবনারায়ণ চন্দ (১৯০৭-১৯০৯ খৃঃ)। (২১) গোষ্ঠচন্দ্র মিস্ত্রী (১৯১০ খৃঃ)। (২২) মিহিরচন্দ্র মিস্ত্রী। এঁরা ছাড়া ওই অঞ্চ লের আরও বহু মিস্ত্রীর নাম আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন।

দাসপুরের এই মন্দির শিল্পীদের মধ্যে বেশি নামডাক ছিল ঠাকুরদাস শীলের। দাসপুর ও তার আশপাশের থানার কোনও কোনও গ্রামে ঠাকুরদাসের তৈরি কয়েকটি মন্দির বর্তমান। এর মধ্যে দাসপুরের পার্শ্ববর্তী ডিহি বলিহারপুর গ্রামে চক্রবর্তীদের দধিবামনের 'পঞ্চ রত্ন' (১৮৪৬ খৃঃ) ও সুরৎপুরের শীলতালর পঞ্চ রত্ন (১৮৪৯ খৃঃ) মন্দিরদুটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরদুটির সামনে পোড়ামাটির মূর্তিফলকগুলিও প্রশংসনীয়। দেউল মন্দির নির্মাণেও ঠাকুরদাস মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, পশ্চি ম মেদিনীপুরর ডেবরা থানার বলরামপুর গ্রামের মল্লিকদের সীতারামের দেউলে (১৮৬০-১৮৬১ খৃঃ)। এর কাছাকাছি শিবিরে একটি দেউলও তিনি তৈরি করেন এর একবছর আগে। কিন্তু সীতারামের 'জগমোহন' যুক্ত দেউলটিকে তিনি বোধহয় কতকটা মেদিনীপুর শহরের জগন্নাথ মন্দিরের আদলে গড়তে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ওই জগন্নাথ মন্দিরটি সীতারাম মন্দিরের কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সীতারাম মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির অনেক মূর্তি বসানো হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুকাল আগে শিল্পকীর্তি শিকারীদের দৌরাত্ম্যে সেগুলি অপসারিত হয়েছে। এই মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ একটি পদ্যলিপি থেকে জানা যায়, ঠাকুরদাস মিস্ত্রীর সঙ্গে আরও আটজন ওই মন্দিরের নির্মাণকার্যে যুক্ত ছিলেন। ১২৬৭ সালে কাজ আরম্ভ করে ৬৮' আষাঢ় মাসে মন্দিরের কাজ তাঁরা শেষ করেন। পদ্যটি ঠাকুরদাসেরই রচিত বলে মনে হয়। যদিও নিশ্চি ত করে বলা কঠিন। সেটি এখানে উদ্ধা র করা হল

'শ্রীশ্রী সিতারাম চন্দ জিউ শুন সর্বজন / করি নিবেদন / মন্দির নির্মাণ কথা / দাসপুরে বাস ঃ / মিস্ত্রী ঠাকুরদাস ঃ/ শিলপদবীতে গাঁথা ঃ/ মিস্ত্রীর সঙ্গে অশ্টজন ঃ/ করিল সুগঠন ঃ সকলে ক্ষেমতাপর্ণ ঃ/ আরম্ভ সাতশস্টী সালে ঃ/ গেল দিন হরি বলে / আসস্টীর আষাঢ়ে সংপূর্ণ ঃ। ইতি'

এই মন্দির নির্মিত হওয়ার ঠিক একচল্লিশ বছর পরে বাংলা ১৩০৯ সালে মেদিনীপুরের দাসপুর থানার জোতকেশব গ্রামে ওই সীতারাম মন্দিরের আদলে তৈরি শীতলার জগমোহনযুক্ত দেউল মন্দিরটি তৈরি করেন দাসপুরের আর এক মিস্ত্রী। নাম যদুরথ শীল। এবার যদুরথের সঙ্গে বারো জন লোক কাজ করেছিল। আরও আশ্চ র্যের এই মন্দিরের গায়ে যে পদ্যলিপিটি উৎকীর্ণ আছে তার সঙ্গে সীতারাম মন্দিরের নিম্নলিখিত পাঠ উদ্ধা র করা গেল—

'শ্রীশ্রী মনসা মাতা শ্রীশ্রী শীতলা মাতা / যুনহ সর্বজন মোন্দির নির্মাণ কথা দাসপুরে বাস / মিস্ত্রী যদুরথ সিল পদবীতে গাথা / মিস্ত্রী সঙ্গে ১২ জন কোরে মন্দিরগঠন / সকলে ক্ষেমতাপর্ণ....'

এই যদুরথ শীলের সঙ্গে ঠাকুরদাসের সম্পর্ক কী ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। তবে শোনা যায়, তিনি ঠাকুরদাসের জ্ঞাতি ছিলেন এবং সমকক্ষ শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাই জোতকেশব গ্রামের এই মন্দির তৈরির ডাক যখন যদুরথের ওপর পড়ল, তখন তিনি ঠাকুরদাসের তৈরি বলরামপুরের সেই সীতারাম মন্দিরের মতো একটি নক্সা তৈরি করে বারো জন লোককে নিয়ে কাজে নামলেন। মন্দিরও শেষ হল যথাসময়ে। যদুরথের স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল। তিনি সীতারাম মন্দিরের লিপির অনুকরণে একটি পদ্যও লিপিবদ্ধ করলেন মন্দিরের দেওয়ালে। ঠাকুরদাস তখন মারা গেছেন।

দাসপুরের মতো হুগলী জেলার সেনহাটির মন্দির শিল্পীরাও সেকালে নানাস্থানে মন্দির তৈরি করতেন। তাঁদের মধ্যে মহীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও গণেশচন্দ্র কুণ্ডুর নাম কয়েকটি মন্দির লিপিতে পাওয়া যায়। সে সময় হুগলী জেলর অন্তর্ভুক্ত খড়ার ও আলুই গ্রামের (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত, ঘাটার থানা) কয়েকটি মন্দির এঁরা তৈরি করেছিলেন। বাংলা ১২৭১ সালে (১৮৬৪ খৃঃ) খড়ারের জমিদার মাঝি পরিবারের ডাকে সেনহাটি থেকে এলেন কার্তিকচন্দ্র ও মহীন্দ্র মিস্ত্রী। সীতারামের বিরাট তেরচূড়ার মন্দিরটি এঁরা তৈরি করলেন। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির কিছু মূর্তিফলকও বসানো হল। পাশেই মাঝি পরিবারের দুর্গাদালান এবং চকমিলান বিরাট বাড়িও তৈরি হল। মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রজলাল মাঝি। সামনের দেওয়ালে একটি লিপি বসানো হল—

'শ্রীশ্রী সীতারাম জিউ শকাব্দা ১৭৮৬।১১।২৪ শ্রী ব্রজলাল মাঝি সাং / উদয়গঞ্জ পং বরদা গঠনকার শ্রী কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও শ্রী মাহীন্দ্রনাথ / মিস্ত্রী সাং সেনহাট পং জাহান / বান সন ১২৭১ সাল তাং / ২৪ চৈত্রী।'

খড়ারের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চি মে আলুই গ্রামে রূপচাঁদ ভূঞ্যার মহাদেবের 'আটচালা' মন্দির তৈরি করেন গণেশচন্দ্র কুণ্ডু ও মহীন্দ্রনাথ কুণ্ডু। মাঝিদের মন্দির তৈরির দু'বছর পরে অর্থাৎ ১২৭৪ সালে। তখন এই গ্রামগুলি ছিল হুগলী জেলায়। খড়ার-উদয়গঞ্জের পাশের গ্রাম কৃষ্ণপুর। এখানে সদ্‌গোপ রায়েরা মাঝিদের মন্দির তৈরির বার বছর পর সাহিন্দি মিস্ত্রিকে ডাকলেন তাঁদের কুলদেবী সিংহবাহিনীর একটি নয়চূড়ার মন্দির তৈরি করে দিতে। বাংলা ১২৮৪ সালে মাহিন্দি মিস্ত্রি সেই মন্দির তৈরি করলেন। সামনে কিছু পোড়ামাটির ফলকও বসানো হল। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে (বাংলা ১৩১২ সালে) সেনহাটির তিনকড়ি মিস্ত্রি মাঝিদের ওই সীতারাম মন্দিরের পাশে মৃত্যুঞ্জয় শিবের একটি 'আটচালা' রীতির মন্দির তৈরি করেছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে অপর আর একজন ছিলেন দাসপুরের শশীভূষণ মিস্ত্রি। মন্দিরের কাঠের দরজা করলেন ওই খড়ারেরই বাসিন্দা শ্রীপতিচরণ মিস্ত্রি। ওই একই বছরে পাশের শশীশেখরের 'আটচালা' মন্দিরও তিনকড়ি ও শশীভূষণ মিস্ত্রি তৈরি করেন, আর কাঠের দরজা করেন খড়ারের বনবাসী মিস্ত্রি।

দাসপুরের কাছাকাছি গ্রাম কোল্‌মিজোড়েও একসময় অনেক

মন্দিরমিস্ত্রি বসবাস করতেন। তাঁদের হাতে গড়া কিছু মন্দিরও এই অঞ্চল ও আশপাশে তৈরি হয়েছিল। মন্দিরলিপি থেকে তাঁদের কয়েকজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, রাজারাম চন্দ্র, বদন চন্দ, হরি মিস্ত্রী ও রূপচাঁদ কুণ্ডু। রাজারাম এখানকার নামকরা মিস্ত্রী ছিলেন। নিজের গ্রামে শীতলার একটি 'পঞ্চ রত্ন' মন্দির তৈরি করে তিনি কিছু দূরের গ্রাম হোসেনপুরে চৌধুরীদের গোপীনাথজীর আর একটি 'পঞ্চ রত্ন' মন্দির তৈরি করলেন বাংলা ১২৯২, ইংরেজি ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। মন্দির প্রতিষ্ঠাতা বাবু শিবপ্রসাদ চৌধুরীর নামের পাশে রাজারামের নামটিও লিপিতে সসম্মানে খোদিত হল। এর দশ বছর পরে গোপীনাথজীর একটি ন'চূড়ার রাসমঞ্চ তৈরি করলেন রাজারাম। এটির লিপিতে খোদিত হল ইংরেজি সাল ও একটি ইংরেজি শব্দ। সঠিক লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল—

'শকাব্দ ১৮১৮। শ্রীশ্রী গোপীনাথ/ জিউর শ্রীরাসমণ্ডপ।। ইং ১৮৯৬ সাল / সন ১৩০৩ সালে তাং ১৬ বৈশাখ / শ্রী মাধবচন্দ্র পলমাল কর্তৃক প্রকাশিত / শ্রী রাজারাম চন্দ্র মিস্ত্রি / By Printed সাং কলমিজোড়।'

অবশ্য লিপি পড়ে যেন মনে হয় রাজারাম শুধু দেওয়ালে 'পঙ্খে'র অলংকরণই করেছিলেন। ইংরেজি 'পেন্টেড বাই'-এর স্থলে লিপিতে 'বাই প্রিন্টেড' খোদাই করে দিয়েছেন। রাজারামের পুত্র কোল্‌মিজোড়ের বলাই মিস্ত্রীও চিত্রাঙ্কনে এবং মন্দির নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। পাঁশকুড়ার বৃন্দাবনচক গোঁসাইদের মহাপ্রভুর একটি দু'শ বছরের পুরনো 'নবরত্ন' মন্দির ভেঙে পড়লে এই বলাই মিস্ত্রীকেই ডাকা হয়েছিল নতুন মন্দির তৈরি করার জন্য। তাঁর হাতের তৈরি নতুন পাঁচচূড়া মন্দির আজ বর্তমান। বলাই মিস্ত্রী প্রতিমাও গড়তেন এবং দুর্গার মেড়ে সুন্দর ছবি আঁকতেন। তাঁর বংশধররা এখন প্রতিমা তৈরি করেন। বর্তমান লেখকের সঙ্গে বলাই মিস্ত্রির পরিচয় ছিল। পঙ্খের কাজে রাজারামের এত সুন্দর হাত ছিল যে স্বগ্রাম কোল্‌মিজোড়ের পাশাপাশি চাঁদপুরে তাঁর শেষ জীবনে পঙ্খের কাজ করা শীতলার একটি 'চাঁদনি' মন্দির তৈরি করলেন বাংলা ১৩২২ সাল বা ১৯১৫ খৃস্টাব্দে। জানা যায়, রাজারামই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু খরচ দিয়েছিলেন বাসুদেবপুর গ্রামের ধনী বাসিন্দা ললিত মোহন ঘোষ। বাইরের দেওয়ালে যে লিপিটি আছে, সেটি এখানে উদ্ধার করা হল—

'শ্রীযুত রাজারাম চন্দ মিস্ত্রী / মন্দির / সাং কলমিজোড় / সন ১৩২২ সাল।'

চন্দ্রকোণার ইলামবাজার ও রঘুনাথ বাড়ি মহল্লায় নামকরা দু'জন মন্দিরশিল্পী ছিলেন শ্রীরাম মিস্ত্রী ও ভক্তারাম দাস মিস্ত্রী। এঁরা চন্দ্রকোণার মিত্রসেনপুর ও গোবিন্দপুর মহল্লায় দুটি মন্দির তৈরি করে দূরবর্তী আনন্দপুর গ্রামে (কেশপুর থানা) বাগেদের দামোদরজীর 'নবরত্ন' মন্দির তৈরি করলেন বাংলা ১২৭৬ সাল বা ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে সুন্দর একটি 'আটচালা' রীতির মণ্ডপ তৈরি করে তার দেওয়ালে এবং গর্ভগৃহের দেওয়ালে পঙ্খের রঙিন চিত্র আঁকলেন রঘুনাথবাড়ির শ্রীরাম মিস্ত্রী। আর ইলামবাজারের ভক্তারাম দাস মিস্ত্রী করলেন গোটা মন্দির। বাইরের দেওয়ালের লিপি থেকে একথা জানা যাচ্ছে। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা গেল—

(১) 'শ্রীশ্রীদামুদর/চন্দ্র ঠাকুর জিউ/ শকাব্দা ১৭৯০ সন/ ১২৭৬ সাল এই / মোন্দিরের কক্ষ উদ্ধার / শ্রীসিরাম মিস্ত্রী / সাকিম রোঘুনাথ বাড়ি ইতি।' (২) শ্রীশ্রী দামুদর / ঠাকুর জিউ শকাব্দা /১৭৯০। ১০ সন ১২৭৬ সাল / সাং মাঘ শ্রীযুত পরিক্ষিত / বাগ মহাসএর ক্রিত শ্রী ভক্তারাম দাস মিস্ত্রী পরগনে / চন্দ্রকোণা সাঃ ইলামবাজার...'

পাঁশকুড়ার রাজহাটী গ্রামেও একসময় মন্দির স্থপতিদের কিছু বসতি ছিল। এখন এই গ্রামে তাঁদের আর কোনও চিহ্নই নেই। এখানকার উদয়চন্দ্র পতি একজন ভালো মন্দির মিস্ত্রী ছিলেন। নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে তিনি চক্রবর্তী পরিবারের তারকনাথ শিবের একটি 'আটচালা' রীতিতে সুন্দর মন্দির তৈরি করলেন বাংলা ১২৮৮ সাল বা ১৮৮১ খৃস্টাব্দে। সামনের দিকে পোড়ামাটির অনেক মূর্তিফলক বসানো হল। 'আটচালা'টির সুন্দর সুঠাম গড়ন লক্ষ্য করে উদয়চন্দ্রের কাজের প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলো অবশ্য উৎকৃষ্ট মানের না হয়েও একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ের বলা চলে না। মন্দিরলিপিতে 'উদয়চন্দ্র পতি মিস্ত্রী সাং রাজহাটী' উল্লিখিত আছে। গোবিন্দপুর থেকে প্রায় ছয়-সাত মাইল দক্ষিণে এক গণ্ডগ্রাম রাজহাটি। বর্তমানে এখানে কোনও সূত্রধর পল্লী নেই। তবে জনবসতিহীন

মন্দিরশিল্পী সূত্রধরেরা শুধুমাত্র মন্দিরেই তাঁদের কলা- কৌশল প্রকাশ করেননি, অট্টলিকা নির্মাণেও তাঁরা বিশ্বকর্মার দক্ষতা দেখিয়েছেন। ..... কিংবদন্তীর নায়ক বিশ্বকর্মার উত্তরসূরী এইসব কারিগর তাঁদের হাতে গড়া অসংখ্য মন্দির দেবালয় ও অট্টলিকা রেখে গেছেন গ্রাম বাংলা ও শহরের আনাচে কানাচে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এগুলি তৈরি করেছেন অশেষ পরিশ্রম ও যত্নে। তার অনেকগুলিই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও আজ যা টিকে আছে, তার কারিগরী ও শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

'ছুতোরপাড়া' নামে একটি পাড়া এখনও (১৯৭৮) এই গ্রামে আছে। এখানেই উদয়চন্দ্রের বসিত ছিল বলে জানা যায়। উদয়চন্দ্রের সমসাময়িক দ্বারিকনাথ মিস্ত্রীও এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঘাটালের লোছিপুর গ্রামে বাগেদের সতেরো চূড়ার এক রাসমঞ্চ তৈরি করেছিলেন গত শতকের শেষের দিকে।

মন্দিরশিল্পী সূত্রধরেরা শুধুমাত্র মন্দিরেই তাঁদের কলা- কৌশল প্রকাশ করেননি, অট্টলিকা নির্মাণেও তাঁরা বিশ্বকর্মার দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে বিশ্বকর্মার মতো একরাতে ইমারত তৈরির কিংবদন্তী নায়ক তাঁরা নন। এক একটা ইমারত তৈরি করতে একদিন বা এক বছর নয়, কম করে দশ বছর সময়ও লেগে যেত। দাসপুরের মাধবচন্দ্র মিস্ত্রী ছিলেন একজন সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী। পূর্ব মেদিনীপুরের সুদূর ময়না থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে কাঁসাই নদীর তীরে লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোনাই-এর এক দ্বিতল বিরাট দালান তিনি বাংলা ১২৭১ সালে আরম্ভ করে শেষ করেছিলেন ১২৮১ সালে। এজন্য খরচ পড়েছিল মাত্র সাড়ে দশ হাজার টাকা। গথিক রীতির গোল থাম ও লম্বা বারান্দাযুক্ত এই প্রাসাদটি রামচন্দ্রপুর গ্রামে আজও দাঁড়িয়ে আছে। প্রবেশপথের ওপর দীর্ঘ লিপিটি এই—

'শ্রীশ্রী হরিজিউচরণে স্বরনং এই পক্তা / বাটী সন ১২৭১ সালে আরম্ভ সন / ১২৮১ সালে সংপূর্ণ। হাল (?) মালিক / শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোড়ইর কৃত / সাকিন রামচন্দ্রপুর পরগণে ময়না / কারিকর শ্রীমাধবচন্দ্র মিস্তিরি সাকিন / দাসপুর পরগণে জেওয়া নগদ খরচ / দশ হাজার পাঁচশত টাকা।'

জানা যায়, এই দালান তৈরির আগে মাধবচন্দ্র পালের 'আটচালা' শিবমন্দির ও সবশেষে ঘোড়াইদের ন'চূড়ার বিশাল মন্দিরটিও তৈরি করেছিলেন। তিনি আরও পঁচিশটি স্থানে মন্দির তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়।

কিংবদন্তীর নায়ক বিশ্বকর্মার উত্তরসূরী এইসব কারিগর তাঁদের হাতে গড়া অসংখ্য মন্দির দেবালয় ও অট্টালিকা রেখে গেছেন গ্রাম বাংলা ও শহরের আনাচে কানাচে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এগুলি তৈরি করেছেন অশেষ পরিশ্রম ও যত্নে। তার অনেকগুলিই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও আজ যা টিকে আছে, তার কারিগরী ও শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এগুলির দিকে তাকিয়ে তাই সাধারণ মানুষকে আজও বলতে শোনা যায়, এসব বিশ্বকর্মার পক্ষেই সম্ভব।

টিপ্পনি ঃ—

মন্দির লিপিতে ছেদচিহ্নগুলি লিপির প্রতিসারির নির্দেশক।

বাংলার মন্দির সূত্রধর নির্মিত এক সময়ের সুদৃশ্য 'আটচালা'-রীতির মন্দিরের বর্তমান দৈন্যদশা। রঘুনাথবাড়ি, চন্দ্রকোণা।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ-

১. ডেভিড্ ম্যাক্কাচ্চন ঃ লেট্ মেডিয়াভেল টেম্পল্স অফ্ বেঙ্গল, দি এসিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা, ১৯৭২।

২. প্রণব রায় ঃ বাংলার মন্দির, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কলকাতা, ২০০৪।

৩. প্রণব রায়, ঘাটালের কথা ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, কলকাতা, ২০০৭ ও পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ।

৪. প্রণব রায়, 'ঘাটালের কথা', ২য় খণ্ড, কলকাতা ২০০৭।

৫. প্রণব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬।

৬. প্রণব রায়, মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ৩য় খণ্ড, ২০০২।

সামাজিক উপন্যাস

সুরবালার সংসার

সুমিত্রা ঘোষ

বাবার ঘরের বইয়ের আলমারি খুলে মনের মতো বইয়ের জন্য ঘাঁটাঘাঁটি করছিল দীপান্বিতা ওরফে দীপা। ঘরের একদিকের পুরো দেওয়াল জুড়ে কাঁচের শাটার লাগানো সেলফ্‌গুলো বইয়ে বইয়ে ঠাসা। ছোটবেলা থেকেই দীপা দেখেছে একটু সময় পেলেই বাবা মুখে বই গুঁজে বসে আছে। মা সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা বাবাকে বলার জন্য হাঁসফাঁস করে মরত, আর বলতে শুরু করলেও বইয়ে নিমগ্ন বাবা কিছু না শুনেই হুঁ-হাঁ করত বলে মা যেতো রেগে।

এইসব সেল্‌ফ ভরা রাশিরাশি বই বাবার সারা জীবনের সংগ্রহ। এখন সব ধুলোয় মাখামাখি। কিছু কিছু পোকায় কেটেছে। কোনওটার আবার ওপরের হার্ডকভার প্রচ্ছদটাই নেই। অথচ একটা সময় মাসের দুটো রোববার নিয়ম করে এগুলো ঝাড়ামোছা করে, পোকামারার ওষুধ স্প্রে করে কাটাতো বাবা। সবই যেন বদলে গেছে ওর বিয়ের পর থেকে। ও বাড়িতে এসে থেকে সকালে খবরের কাগজ পড়া ছাড়া বই মুখে গোঁজা বাবার চেহারাটা একদিনও দেখেনি। স্বভাবশান্ত, চুপচাপ মানুষটা যেন আরও চুপ হয়ে গেছে। দীপান্বিতার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ওর এ বাড়িতে চলে আসাটা বাবা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছে না। ও জানে ওর বাবা একটু পুরনোপন্থী। এ যুগের অনেক কিছু পছন্দ নয়, তাই মানিয়ে নিতে পারে না। মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টার ইচ্ছাকৃত অভাব রয়েছে বাবার মনে। একরকম জেদ, রিজিডিটি বলা যায়। এসব নিয়ে মেয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য না হলেও মা'র সঙ্গে হয়। কয়েকদিন কথা বলা বন্ধ থাকে দু'জনের। মা একেবারে যুগপোযোগী। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে জানে। বাবা ভাল বুঝলে চলবে, ভাল না বুঝলে ফিরে যাবে পেছনের দিকে। ভাস্করের সঙ্গে দীপার গণ্ডগোলের গোড়ার সমস্যাটা মা বোঝে, কিন্তু বাবা বুঝতে চায়ই না। কারণ বিগত চার বছরে বাবা কখনও ভাস্করের অতি রূপসী, অতি বিদূষী, অতি সফিসটিকেট মায়ের মধ্যে একটি দোষও খুঁজে পায়নি। বাবার মতে ওই মহিলার মতো ভদ্র, বিনয়ী, শ্লীল, মার্জিত, লাভিং, কেয়ারিং অ্যাণ্ড প্রগ্রেসিভ— এই এতশত অলংকার বিভূষিত 'মেয়েছেলে' আজকের যুগেই নাকি বিরল প্রজাতি। ওঁর মতো মানুষের সঙ্গে দীপার বনি-বনা না হওয়াটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ভাস্করের মা। উফ্! ঐ মানুষটার মুখ মনে পড়লেই দীপার ব্রহ্মতালুতে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ওর জীবনের যত যন্ত্রণার কারণ ভাস্করের মা। আর ওর প্রিয়তম স্বামীটি কিনা সেই মায়ের অন্ধভক্ত! শাশুড়ির সামনে নিজেকে ওর খুব ইনফিরিয়র মনে হতো।

— 'কি রে? কি করছিস? ও! বইয়ের তাকগুলো পরিষ্কার করছিস? কর কর। কাজকর্ম করলে শরীর মন দুই-ই সতেজ থাকে। আমি অনেকদিন করতে পারিনি। তুই হাত লাগিয়ে ভালই করেছিস।'

দীপার চিন্তাসূত্রে ছেদ এনে বাবা কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও বলে— 'না, বাবা। পরিষ্কার করতে টরতে আসিনি। আমি কি ওসব কখনও করেছি? এসেছিলাম কিছু একটা ইনটারেস্টিং বই খুঁজতে। কি ধুলো জমেছে— এ্যাই দ্যাখো'— বলে, কালো ধুলোয় নোংরা হাত দু-খানা মেলে ধরে।

শশাঙ্ক বলেন— 'সে তো হবেই। কতকাল আমি সাফ করিনি, খুলেও দেখিনি। পোকায় কাটলেও আশ্চর্য হবো না।'

— 'কেটেছে তো! এই দেখ, এগুলোর পাতার কোণা কেটে দিয়েছে।'

শশাঙ্ক নির্লিপ্ত মুখে বলেন— 'যতদিন ধরে রাখার মানসিকতা ছিল, ততদিন এরা সুস্থ ঝকঝকে ছিল। আগের সেই মানসিকতাই নেই এখন। আমি তো ইচ্ছে করেই ওদের পোকায় কাটতে দিয়েছি। সারাজীবনের জমানো সম্পদ নষ্ট করেছি। অথচ একসময় এদের কিনতে মাইনের একটা মোটা অংশ খরচ করতেও দ্বিধা হতো না। তোর মা ট্যাঁকট্যাঁক করে কথা শোনাতো। সিনেমা বা ফ্যাশন ম্যাগাজিন ছাড়া পুস্তক জগতে তো ও পা রাখেনি কখনও। নেশা আমার, বইও আমার, তাই পরিষ্কার করার দায়ও আমার। ওর কাছে এগুলো আবর্জনা। ফেলে দিয়ে জায়গা খালি করে দিলে শাড়ি জামা-কাপড় রাখতে পেরে খুশি হবে। সম্পর্কের মূল্য যারা জানে না তারা কাগজে ছাপানো বইয়ের মূল্য কি দেবে? — যাক গে, তুই কি বই খুঁজছিলি? ইংরেজী না বাংলা?'

— 'তোমার মোটামুটি বই তো আমার পড়া বাবা। পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ার একটু নেশা তুমি আমাকেও ধরিয়েছিলে। এখন আর পড়াই হয় না। একঘেয়ে লাভস্টোরি আর ভালো লাগে না পড়তে। বাংলা সাহিত্যের জগতে যেন একটা স্ট্যাগন্যান্ট পিরিয়ড চলছে বলে মনে হয় আমার। সেই পুরনো লেখকরা, সেই লেখার স্টাইল, এসব পেরিয়ে কোনও উত্তরণ ঘটছে না। তোমার কি মনে হয় বাবা? ভুল বললাম?'

হঠাৎ করে অনেক বছর বাদে শশাঙ্কর মনের আকাশে জমে থাকা ধূসর বিষণ্ণতা সরে যেতে থাকে, কালো কালো মেঘ যেমন সরে সরে ভেসে চলে যায় অন্য কোথাও, তেমনি করে। দীপার বিয়ের পর থেকে এসব নিয়ে কথা বলার কেউ ছিল না পাশে। দীপার শাশুড়ির নিন্দে করা ছাড়া কল্যাণীর আর কোনও কল্যাণকর্ম ছিল না। মা হয়ে মেয়েকে বিপথে পরিচালিত করে ওর জীবন নষ্ট করে ফেলল। শুধু দীপার নয়, সঙ্গে ভাস্করের মতো একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ধ্বংস করল। ওদের সুখের সংসারে আগুন লাগালো। একটা সৎশিক্ষা দেয়নি মেয়েকে বিয়ের পর থেকে, শুধু বিষমন্ত্র দিয়েছে কানে। আর মা'র দেওয়া বিষের থলি দিয়ে দীপা শাশুড়ি আর বরকে ছোবল মেরে মেরে শেষ করেছে। আবার বেড়াতে এসেছে, আবার কল্যাণী বিষাক্ত করে পাঠিয়েছে ওকে। দীপার প্রতিও সন্তুষ্ট নন শশাঙ্ক। ওই বা কেমন মেয়ে? ছোট বাচ্চা তো নয়! এম এ পাশ করেছে, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ছিল। বিচার করল না একবারও কে সৎ কে অসৎ? বুঝতে পারল না যে কল্যাণী নিজের হীনমন্যতা ঢাকতে ভাস্করের মাকে হিংসে করছে? ওমন শাশুড়িকে নিয়ে দীপার তো গর্বিত হওয়ার কথা ছিল। তা না হয়ে ও ওর মায়ের অজ্ঞানতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের সুখের ঘরে নিজেই আগুন লাগিয়ে চলে এল বাপের বাড়ি। ছিঃ! লজ্জায়, অপমানে শশাঙ্কর বুকের ভেতরটা জ্বালা করে। মুখে কিছু বলতে পারেন না বলে দহন সহন করে বেঁচে আছেন এক নিরানন্দ জীবন নিয়ে। আজ, এই মুহূর্তে দীপাকে হঠাৎ করে বিয়ের আগের দীপা বলে মনে হচ্ছে। হিংস্র নোখ-দাঁত কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। মেয়েটা সাহিত্যে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করছে। উত্তরণহীন একঘেয়েমি লাভস্টোরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে অন্য

স্বাদের বই পড়তে চাইছে। জাগ দীপা, জেগে ওঠ মা। তুই তো এত নীচ মনের মেয়ে ছিলি না! সমস্ত নীচতা, মালিন্য ঝেড়ে ফেলে আবার সুস্থ হয়ে ওঠ। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন মানসিকতা ফিরিয়ে আন। আবার আগের দীপান্বিতা হয়ে কলুষমুক্ত মন নিয়ে বেঁচে থাক মা।

মুখে শশাঙ্ক বলেন— 'একটুও ভুল বলিসনি। তুই যে এসব লক্ষ্য করেছিস এটা ভেবেই আমার ভাল লাগছে। নামের মোহ বড় ভয়ানক মোহ রে। একবার নাম হয়ে গেলেই হল, আর পায় কে? তখন প্রকাশকরাও বোঝে না, জনগণও বোঝে না ভাল লিখছে না ছাই-পাঁশ লিখছে। পুরস্কারে, সম্মানে, অহংকারে এরা লিখতে ভুলে গিয়ে চর্বিত চর্বন করতে থাকে। প্রকাশকরা মুনাফা বোঝে। ওরা জানে নামী লেখকের নামেই বই কাটবে বাজারে, ভেতরে কি আছে দেখে আমার কাজ কি? ব্যবসা করতে নেমেছি, ঘরে টাকা এলেই হল। জনগণ সত্যিকারের পাঠক নয়। ওরা হুজুগে মেতে কিছু প্রচলিত বই কিনে নিয়ে বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। ধীরেস্থিরে বসে বই পড়ার মনই তৈরি নেই ওদের অনভ্যাসের ফলে। কাজেই ওরাও ওই আঙ্গুলে গোণা, ওপরে ওঠা নামী ব্যক্তিদের বই-ই কিনবে অবশ্যই। বেছে বেছে বই কেনে আসল বোদ্ধা পাঠকরা আর কিছু গবেষণারত ছাত্ররা। এরা সংখ্যায় কম। বর্তমান সময়টাকে দেখ না তুই। আশি ছুঁই ছুঁই ভীমরতি ধরা মস্তিষ্ক থেকে আর কিছু বেরোবে না উত্তরণ ঘটাবার মতো, তবু সিংহাসন আঁকড়ে পড়ে থাকা। কুড়ি বছর বয়সে যখন এরা প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন তখন বিস্ফোরণ ঘটত লেখার ভেতর দিয়ে। চল্লিশে পৌঁছতে না পৌঁছতে অনেকেই বহু পুরস্কারে সম্মানিত। শীর্ষে অবস্থান। কুড়ি বছর বয়স থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কুড়ি বছর ধরে এঁরা লিখেছেন প্রাণের তাগিদে। তাই লেখাগুলো প্রাণবন্ত। সজাগ মাথা ক্রমাগত নতুন নতুন বিষয় নির্বাচন করেছে, উত্তরোত্তর উত্তরণ ঘটিয়েছে। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরে ঠেকে মোটামুটি পূর্ববর্তী অসাধারণ লেখাগুলোকেই ভাঙ্গিয়ে নতুন সাজে নতুন বোতলে ঢেলে বিক্রির পথ খোলা রাখা হয়েছে। কারণ, ততদিনে মাথায় মরচে ধরেছে। প্রাণের তাগিদ একফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। এখন শুধু টাকার তাগিদ। দশ হাজার লাইব্রেরী যদি দু'খানা করেও কেনে তাহলে এক ঠ্যালায় প্রতিটা বইয়ে কত টাকা পাবলিশারের ঘরে আসছে, আর কত টাকা লেখকের অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে হিসেব কর না! — এরপর সত্তর-আশিতে হাত কাঁপে, পা চলে না, ধরে ধরে চলাতে হয়— এমন যাদের নার্ভের হাল, তারা নতুন ভাবনা ভাববে কি করে বল? তবুও নতুনদের জন্য জায়গা ছাড়ব না। তবে ব্যতিক্রমও আছে বৈকি! দু-একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই স্বার্থপরতার যুগেও আছেন, যাঁরা উত্তরণ চান। তাঁরা ভাবেন নিশ্চয়ই— আমরা তো সমাজকে অনেক দিয়েছি, এবার নতুনরা দিক। জানিস, অনেকের মুখেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা শুনেছি। উনি নাকি একেবারে অনামী কোনও কবি অথবা গল্পকারের লেখা খবরের কাগজের রোববারের পাতায় কিংবা কোনও ছোটখাটো লিটল্ ম্যাগাজিনে পড়ে ভাল লাগলে দেশ পত্রিকার সম্পাদককে ফোন করে বলেন— 'কি হে, অমুক ছেলেটার লেখা অমুক কাগজে পড়লাম। খুব ভাল লিখছে। কই, তোমরা তো একখানাও ছাপালে না?' আর যায় কোথায়? জানিস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ভাল লেখকদের প্রতি এই বলিষ্ঠ মানসিকতা কত কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিককে সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে? এরা খুব ভাল লিখছে রে! পড়াব তোকে। আমি রোববারের পাতাগুলো গুছিয়ে তুলে রাখি আজকাল। পড়লে বুঝবি, হতাশ হবার কিছু নেই। এরা ধীরে হলেও সত্যিই উত্তরণ ঘটাচ্ছে।— দেখি, তুই সর। ক্যাটালগটা বের করি।'

মেয়েকে সরিয়ে নিজের হাতে তৈরি করা ক্যাটালগ বের করে পাতা ওল্টান শশাঙ্ক। একটু পরে ওইদিক ছেড়ে ডানদিকের আলমারি খুলে একটা বই বের করে আনেন। বইটা পুরনো। প্রচ্ছদ নেই। কবে ওপরের হার্ডকভার খুলে পড়ে গেছে আর বাঁধানো হয়নি। পাশের স্ট্রিপটাও নেই। পেছনের কভারও নেই। একেবারেই জীর্ণদশা। ধুলো ঝেড়ে, পাঞ্জাবির কোণা তুলে মুছে, উল্টে-পাল্টে অতি যত্নে বইটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে শশাঙ্কর মুখে স্মিত হাসি ফুটে ওঠে। মেয়ের দিকে বইটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, — 'মা'র বিয়েতে উপহার দিয়েছিল কেউ। সেই যুগে বিয়েতে বই আর রুপোর সিঁদুর কৌটো উপহার দেওয়ার চল ছিল খুব। নে, এটা পড়। ভাল লাগবে। হয়ত যে মূল্যবোধগুলো হারিয়ে ফেলেছিস, সেগুলো ফিরে পেলেও পেতে পারিস।'

কানে মূল্যবোধের কথাটা খট্ করে বাজলেও দীপা বইটা হাতে নিয়ে বলে, — 'বাবা কোন মান্ধাতার আমলের একখানা বই বের করে দিলে তুমি? ঠাকুর্মার বিয়েতে উপহার পাওয়া গত জন্মের বইও জমিয়ে রেখেছ তুমি? অত পুরনোকালের বই পড়ে ভাল লাগবে? প্রথম পাতা দু'খানাও নেই। ধুর! এ..এ.. আধখেঁচড়া লাগবে পড়তে। অন্য বই দাও।'

শশাঙ্ক বলেন,— 'ওরে, না পড়েই খারাপ লাগবে বলছিস কেন? পড়েই দ্যাখ না। পুরনো সবই খারাপ বলে ভাবিস কেন? নতুন যা কিছু তার কি সবটাই ভাল? খারাপ নেই? দীপা, পুরনো অনেক কিছুই নতুনের থেকে বেশী ভাল ছিল। তোদের আধুনিক সমাজের সবকিছু খারাপ এমন কথা বলব না আমি, তবে নতুনের মধ্যে বড্ড বেশী ভেজাল। প্রায়শই মেকী, তাই নতুনকে দুর্বল-ক্ষণভঙ্গুর বলে মনে হয় আমার। পুরনোর শিরদাঁড়া অনেক মজবুত ছিল, তাই চট্ করে কোমর ভেঙে দ হতো না। পড় না বইটা! ঠাকুর্মার আমল, তার আগের, তার আগের আমলগুলো কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করে না? পড়তে পড়তে খারাপ লাগলে ছেড়ে দিস। শুরু করার আগেই ত্যাগ করার প্রবণতা কেন তোদের?

দীপা বলে— 'এঃ! লেখকের নাম, পাবলিশার, কত সালে মুদ্রিত, কিছু জানা যাচ্ছে না কভার শুদ্ধু প্রথম পাতাগুলো না থাকায়। দেখি শেষটা পুরো আছে কিনা? হ্যাঁ আছে। তবু রক্ষে।'

শশাঙ্ক মুচকি হেসে বলেন,— 'জানিস, একসময় এই বইটা আমার খুব প্রিয় ছিল। ওই চোদ্দ পনের বছর বয়সে মাকে লুকিয়ে এটা পড়তাম, আর মনে মনে কল্পনা করতাম, আমার বিয়ে হচ্ছে। বৌয়ের বয়স আট, সে সবে ন'বছরে পা রেখেছে।'

দীপা খিলখিল করে হেসে বলল— 'চোদ্দ-পনের বছরেই তুমি বিয়ে করতে চাইতে? খুব ডেঁপো ছিলে তো! বাবা, তোমার গিন্নী এসব গোপন কথা-টথা জানে?'

—'ওরে বাবা! ওকে কি বলা যায়? ও তো শুনে তোর মতো ওমন খিল্‌খিলিয়ে হাসতেই পারত না। রসাস্বাদন করার ক্ষমতা আছে নাকি তোর মা'র? দাঁড়া, ক্যাটালগে লেখকের নামটা একবার দেখে নিই। লিখে তো রেখেছিলাম।'— শশাঙ্ক আবার ক্যাটালগ খুলে বইয়ের নম্বর খুঁজে বের করে বলেন— 'পেয়েছি। — সুরবালার সংসার - লেখিকা সুকুমারী দেবী।'

✪ ✪ ✪

বই হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে যেতেই বাবা বলেন— 'কোথায় চললি? দাঁড়া, শুয়ে ঘুমিয়ে তো হাতি হয়ে যাচ্ছিস! আজ এই সেলফ্‌গুলো সব পরিষ্কার হবে। কোমর বেঁধে হাত লাগা আমার সঙ্গে।' বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অতগুলো বইয়ের আলমারি ঝাড়াপোঁছা করে, ওষুধ স্প্রে করে গুছিয়ে তুলতে দুপুর গড়িয়েছে আজ। তারপর স্নান করে খেয়েছে ওরা। ভাজা জোয়ান মুখে দিয়ে এতক্ষণে 'সুরবালার সংসার' হাতে নিয়ে দীপা নিজের আইবুড়ো বেলার খাটটাতে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। প্রথম পাতাদুটো নেই, তাই তিন নম্বর পাতা থেকেই পড়তে শুরু করে ও বাবার কথা রাখতে। জানে এই বই বেশীদূর পড়া যাবে না। কিন্তু বাবা অত করে বল্লো। অতএব পড়ে দেখা যাক।

(পাতা নেই)..... অবশ্য সুরোর অর্থাৎ সুরবালার বয়স এখন তের। আট পূর্ণ করে ন'য়ে পা দিতেই তো বিয়ে হয়ে গেল। সে বিয়ের কথা ওর কিছুই মনে নেই। মায়েদের মুখে গল্প শুনেছে বিয়ের লগ্ন নাকি রাত বারোটার পরে ছিল। ঘুমন্ত সুরোকে কোলে তুলে বিয়ের পিঁড়িতে কোনওরকমে বসানো হয়েছিল। শুভদৃষ্টি, মালাবদল— এসব কোনওটাই সজ্ঞানে করানো যায়নি ওকে দিয়ে। ঠ্যালা মেরে মেরেও পুরো জাগ্রত করা যায়নি নিদ্রিত বালিকাকে। ওর বরের বয়স তখন চোদ্দ। সে তখন নিজ গ্রামের স্কুলে সপ্তমশ্রেণীর ছাত্র। গোঁফের রেখার দেখা মিলতেও দেরি আছে মুখে। চোদ্দ আর ন'য়, বড়ই মানানসই বয়স।

মাত্র এই ক'টা লাইন পড়েই দীপা বেশ আগ্রহী হয়ে পড়ে। যেন, টাইম মেশিনে চেপে প্রায় এক/দেড় শতাব্দী পার হয়ে বাংলার কোনও এক পল্লীগ্রামে হাজির হয়ে যায় সুরবালার বিয়ের অনুষ্ঠানে। স্বচক্ষে যেন দেখতে পায় — 'কনে চন্দন আঁকা ফুলকো লুচির মতো ফর্সা শিশু গাল, আটহাতি লালচেলী জড়ানো ছোট্ট শরীরটা পাশবালিশ আঁকড়ে বিছানায় ঘুমে অচেতন। বিয়ে কি? কেন? সে এসব কিছুই বোঝে না। তার বর কে, কেমন দেখতে, কি করে, তাও জানে না। এমনকি বরের নামটাও অজানা, তবু ওর বিয়ে হচ্ছে আজ রাতে, আর ও ঘুমে অচেতন। কেউ একজন কোলে তুলে নিয়ে পিঁড়িতে বসিয়ে ধরে রইল আর সুরবালা সেই একজনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতেই থাকল। সমবেত উলুধ্বনি আর শাঁখের শুভ নিনাদে সুরো একবার ঘুমন্ত চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তারপরেই পিঁড়িবাহকের গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথাটি রেখে শুয়ে পড়ল। যে ব্যক্তি ওর মুখে পানপাতাটি ধরে রেখেছিল তার বড়ই অসুবিধা হতে লাগল সুরো মুখখানা কাৎ করে শুতে। এই সমস্ত নানা অসুবিধাজনক অবস্থা সামলে অতঃপর পিঁড়ি ছাদনাতলায় এল।

'এদিকে ছাদনাতলায় যাঁতার ওপর দাঁড়ানো, ন'হাতি গরদের ধুতি-ওড়নি জড়ানো সারাদিনের উপবাসী চোদ্দ বছরের বালকটির ফর্সা সরু মুখখানা ক্ষিদে তৃষ্ণা আর অনিদ্রায় চুপসে গেছে। উঠোনের মাটিতে শুতে বল্লে এক্ষুণি শুয়ে পড়বে এমনই অবস্থা। সপ্তপ্রদক্ষিণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাজনদাররা প্রবল শব্দে নানা প্রকারের বাদ্য বাজাতে লাগল। তৎসঙ্গে রমণীকুল গলায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অনেকগুলো শাঁখে একসঙ্গে ফুঁ দিতে লাগল। আর একদল কলকল রবে চারিদিক আলোড়িত করে উলুধ্বনি করে চলল। এতশত শব্দের আঘাতে নিশ্চিন্ত, বন্ধ সুপ্তির দরজাটি দড়াম্ করে খুলে সুরোকে আচমকা জাগিয়ে তুলল। চোখ খুলে তাকালেও ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। নিজেকে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় শূন্যে দোদুল্যমান স্থিতিতে পেয়ে এবং ওর চারপাশে মহা হট্টরোলের জমাট ভীড় দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল— 'মাঁ! মাঁ কোঁতায়? মাঁর কাঁচে যাঁবো। ও... মাঁ.... মা গো! ত্রেঁ... ত্রেঁ....ত্রেঁ... ত্রেঁ..! এইরকম অবস্থাতেই একজন কোনওমতে সুরোর দু'হাতে বরমালাটি গলিয়ে নিজেই প্রায় বরের গলায় মালা পরিয়ে দিল। তিনবার বদল করার পর সুরোর ত্রাহিস্বরে মাঁ-মাঁ চিৎকারের মাঝে পানপাতা ধরে থাকা ব্যক্তি ঝট্ করে পাতাটি সরিয়ে নিল। পাতাটা তখন এমনিতেও ছিঁড়ে খুঁড়েই গিয়েছিল সুরোর ক্রমাগত হাত তুলে তুলে চোখ মোছার সময়েই। বর-বৌয়ের দৃষ্টির মিলন আদৌ হল না, কিন্তু পানপাতা সরে যেতেই রমণীকুল কোলাহল করে জানিয়ে দিল— 'শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে! শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে! বলে।'

দীপা হাসতে হাসতে বইটা বুকের ওপর উল্টে রেখে আরও হাসির বেগকে সামলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেচারি সুরবালার মুখখানা কল্পনায় ভেসে উঠলেই আবার হাসি এসে যায়। চন্দনে কাজলে নাকচোখের জলে অলরেডি মাখামাখি মুখখানা এক কুনকে ভরা সিঁদুর মাথায় পরার পর যে কি চিত্রবিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল কে জানে! বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিল না, বরং দোলখেলে নানা রং মেখে ভূতের মতো চেহারাই হয়েছিল নিশ্চয়। সত্যি, খুব ভাল লাগছে পড়তে। শেষ না করে ছেড়ে দেবার প্রশ্নই নেই এখন আর। বইটা তুলে ও আবার পড়তে শুরু করে।

'একমাত্র নাপতে বৌ ছাড়া বরযাত্রীতে অন্য কোনও মহিলা নেই। বর পাল্কীতে এসেছে, আর বরযাত্রীরা কিছুপথ নৌকোয়, কিছুপথ পদব্রজে এসেছে। বাসর জাগার মতো সখ দু-একজন কমবয়সী পুরুষ আর নাপতে বৌ ছাড়া আর কারও ছিল না ওপক্ষে। এপক্ষে অবশ্য মহিলাধিক্য বেশি। সুরোর ঠাকুমা-দিদিমার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বৌদি-জামাইবাবুও অনেক। তারা তো আর পায়ে হেঁটে এসে ক্লান্ত নয়। নব বর-বধূর বাসর জাগবে বলে কোমর বেঁধেছে কনেপক্ষ। বর-বধূকে সারাদিনের নিরম্বু উপবাসের পর যত্ন করে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ধব্‌ধবে সাদা চাদর পাতা ফরাসের ওপর তারা দু'জনেই এখন নিদ্রিত। ওরা তো উপলক্ষ্য মাত্র, আসল মজাটা তো লুটবে বাসরজাগুনিরা। কাল সকালে শয্যাতুলুনীর মোটা টাকাও এরাই ভাগ করে নেবে।'

'পরদিন মেয়ে বিদায়ের সময় বাড়িশুদ্ধ লোকেরা যখন কান্নাকাটি করছে, সুরো তখন মুগ্ধদৃষ্টিতে বাহারী পাল্কিখানা দেখতে ব্যস্ত। টুকটুকে লাল ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে নিজেই উঠে পড়েই দেখে বংকুবিহারী আগে থেকেই সেখানে বসে। সুরো বংকুকে চেনে না। — 'এ্যাই! এই ছেলেটা ভেলভেলেটা! তুই কে রে! এটা আমার পাল্কি। তুই নাম্। উঠেছিস ক্যানো?'

বংকুবিহারী মুখ ভেংচে বলে— 'ইঁ-ই-ই! তোর পাল্কি? জানিস, এটায় চড়েই আমি কাল এখানে এসেছিলাম বে করতে। তুই নাম্। নাম্ বলছি। কান ধরে নামিয়ে দেব রে ছুঁড়ি। ইল্লি আর কি! নাম্।'

— 'না। নামব না। এটায় আমি চড়ব। তুই নেমে যা। আবার পা ছড়িয়ে বসেছে। নাম্ না!'

— 'বেশ করব পা ছড়িয়ে বসব। তুই তো আমার বৌ। আমি যা বলব তাই করবি তুই। এখন নাম্। বাবা যদি বলে তোকে চড়তে তখন চড়বি। নাম্ এখন... নইলে'.... বংকু এক ধাক্কা মারে ওকে। ঠিক এমনি সময় পাল্কি বেহারাদের একজন এসে পর্দা সরিয়ে বলে— 'এই তো বৌরাণী! দ্যাখ কাণ্ড! উদিকে সবাই খুঁজছে আর ইনি পাল্কিতে চড়ে বসে আছেন গো! — খুঁজতে হবেনি গো আর। ইখানে উঠে বসে আছেন কত্তাবাবু! ইদিকপানে আসুন গো।'

'কত্তাবাবু তাড়াতাড়ি এসে দেখেন সত্যিই তাঁর মেয়ে আগে থেকেই পালকিতে চেপে বসে শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য তৈরি। ওদিকে দেউড়ির গোড়ায় জড়ো হওয়া মা-জেঠিমা'রা বিদায় করতে এসে কান্নাকাটির ব্যস্ততায় মেয়েকেই নজরে রাখতে পারেননি। ভেবেছেন সুরো হারিয়ে গেছে। সবাই মিলে বাড়ির ভেতরে, আদারে-পাদারে খোঁজাখুঁজি করছে। মেয়ের বাবারই হঠাৎ মনে হল— 'ওমন সাজানো পালকিটা ওকে আকর্ষণ করল না তো?'

'বাবাকে দেখেই সুরো অভিমানী গলায় বলে ওঠে— 'দেখ না বাবা, এই ছেলেটা পাল্কিতে উঠে বসে আছে। নামতে বলেছি বলে আমাকে ধাক্কা মারছে। এটা আমাদের পাল্কি তাই না বাবা? কি মিথ্যুক! বলে, এটা নাকি ওর। এটাতে চড়ে কাল ও বিয়ে করতে এসেছে। বাবা, তুমি ওর কান মুলে নামিয়ে দাও না! ও আমাকে ওর বৌও বলেছে। বলেছে, ওর কথা না শুনলে আমাকে মারবে। কান ধরে নামিয়ে দেবে।'

'ওপাশ থেকে বংকুবিহারী সুরোর বাবা মুখ খোলার আগেই তীব্র প্রতিবাদ জানায়— 'না। আমি মিথ্যে কথা বলিনি। ও মিথ্যে কথা বলছে। আমি কাল এই পাল্কিটা চড়ে এসেছিলাম। একটু আগে জ্যাঠামশাই আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে বললেন— একদম নামবি না বংকু! ঠাকুর্মা— দিদিমারা ওঁৎ পেতে আছে। কোমরের মোটা মোটা বিছেহারগুলো খুলে হাতে নিয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করছে এখন। দেখতে পেলেই তোর হাত বেঁধে ফেলবে ওই হারগুলো দিয়ে। আর বলবে — নাতজামাই ফেলো কড়ি মাখো তেল। বৌ নিয়ে যাবার দক্ষিণেটা আগে দাও, তবে তো বৌ যাবে। নামিসনি বংকু! একে তো শয্যাতুলনীর অতগুলো টাকা নিল। এখন বৌশুদ্ধ পাল্কি তোলার টাকাও চাইবে।— আমি জ্যাঠামশাইয়ের কথায় এখানে বসে আছি, ওমনি ও এসে বলে, এই ছেলেটা ভ্যালভ্যালেটা, নাম্। এটা আমার পাল্কি। ও ঝগড়া করছিল বলে ধাক্কা মেরেছি। বেশ করেছি। এ্যাই মেয়েটা, ঝগরুটেটা, আমাদের পাড়ায় যাবি? মুড়ি-মুড়কি ছড়িয়ে দেব, কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি। — বংকু নিজেও যে সুরোর চেয়ে কিছু কম যায় না, মুখ ভেংচে সেটা বুঝিয়ে দেয়। — নামবি? না ধাক্কা মেরে নামাবো? ঝগরুটে মেয়ে কোতাকার।'

'সুরোর বাবা হাসবেন না কাঁদবেন দিশে করতে পারেন না। ইতিমধ্যে তার পেছনে বরপক্ষ কনেপক্ষ এসে জড়ো হয়েছেন। বুক অব্দি লম্বা ঘোমটার আড়াল থেকে ক্রন্দনরতা মেয়েদের ফোঁসফাঁস আওয়াজ আসছে। পুরুত মশাই হুঙ্কার ছাড়েন— আর এক পলও দেরি করা যাবে না। যাত্রার শুভ মুহূর্ত তাহলে পার হয়ে যাবে। পাল্কি তোল রে!'

'সুরোর বাবা ভেতরে হাত বাড়িয়ে মেয়ে-জামাই দু'জনকে একসঙ্গে নিজের বুকে টেনে এনে দু'জনের মস্তক বরাবর চুম্বন করতে করতে বলেন— 'ও ঠিকই বলেছে মা। এই পাল্কি চড়ে ও কাল তোমাকেই বিয়ে করতে এসেছিল। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে কিছুই বুঝতে পারোনি। ওকে 'এ্যাই ছেলেটা' বলে আর কখনও বলো না। ও যে তোমার বর! তোমার স্বামী! গুরুজন! ওর কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে, মান্যি করতে হবে। এখন তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে মা। তোমার স্বামীর ঘরে, এই বংকুবিহারীর বাড়িতে। এই পালকিটা এখন তোমাদের দুজনের, বুঝলে? সবকিছু দু'জনে ভাগ করে নেবে, কেমন! আর ঝগড়া করবে না কখনও। বাবা বংকু, তোমার ধর্ম বৌকে রক্ষা করা। সুরো ছোট, সে ভুল করলে তুমি বোঝাবে বাবা।' এতক্ষণে সুরো বোধহয় কিছু একটা আন্দাজ করে। ও নেমে আসতে চেষ্টা করতেই বেহারারা পাল্কি তুলে নেয়। গুরুগম্ভীর হুম্‌হুম্ হুম্মা হুম্মা করে চলতে শুরু করে। দু'পাশে বর কর্তারা এবং বরযাত্রীরা পদব্রজে চলেন। সুরো মা-আ-

আ... বলে চিৎকার করে ডাকে। বাজনদারদের বাদ্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় ওর ডাক।'

✪ ✪ ✪

'ওই গাঁয়েতে কান্নাকাটি এই গাঁয়েতে হুলুস্থুল। সুরবালার মা'র সূয্যি ওঠে কেঁদে কেঁদে, অস্তও যায় ওর কান্না দেখে। মায়ের বুকের সঙ্গে লেপটে না থাকলে সুরো ঘুমোতে ভয় পেত। রাত্রে বাইরে করতে যাবার দরকার হলে মা লম্ফ জ্বালিয়ে নিয়ে যেত সঙ্গে করে। সুরো ভূতের ভয়ে মা'র হাতখানা ধরে থেকে বাইরে করত। সেই সুরো যে শ্বশুরবাড়িতে কি করছে? শাশুড়ি ঠাকরুন খেয়াল করে এসব করবে তো? মাছের কাঁটা বাছতে পারে না, নিজে চুল বাঁধতে পারে না, ও যে এখনও কিছুই পারে না করতে। কুলীনের ঘরের মেয়ে, গৌরীদান না করলে বংশপাতক হতে হবে। তাই তো ন-দশ বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়ে পর করে দেওয়া। মায়ের মনের কষ্ট আর কেউ কি বোঝে?'

'এদিকে বংকুবিহারীদের বাড়িতে আনন্দ উৎসব। একমাথা সিঁদুর, লাল কস্তাপাড় ফরাসডাঙ্গার তাঁতের কাপড় পরা বংকুর ঠাকুর্মা কোলে করে নাতবৌকে পাল্কি থেকে নামিয়েছেন। প্রথম নাতির বৌ, ঘরের লক্ষ্মী, তাকে তো কোলে করেই আবাহন করতে হবে। কি রং, কি রূপ এইটুকু মেয়ের! বড় হলে একেবারে মা লক্ষ্মী প্রতিমার মতোই লাগবে। গয়নায়, তত্ত্বে, বরযাত্রী আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখেননি নতুন কুটুম্বরা। নাপতে বৌয়ের মুখে বিশদ বর্ণনা শোনা হয়ে গেছে অন্দরমহলের সকলের। শুনে সকলেই হর্ষল্লোসিত। এখন অষ্টমঙ্গলা অবধি বৌ এবাড়িতে থাকবে, তারপর ধুলোপা, দ্বিরাগমন করতে যাবে বাপের বাড়ি। যাবে জোড়ে, কিন্তু বংকু আসবে একা। বৌ বড় না হওয়া অবধি অর্থাৎ রজঃস্বলা না হওয়া অব্দি দ্বিরাগমনে গিয়ে পিত্রালয়েই থাকার নিয়ম। বংকুর কোলের বোন দুগ্গা যেমন এখন এখানে আছে, তেমনই। বড় হওয়া মাত্র বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়িকে জানাবে। তখন আবার দিনক্ষণ দেখে দ্বিতীয় বিবাহের দিনস্থির হবে। দ্বিতীয় বিবাহের পর বৌ পাকাপাকিভাবে স্বামীর ঘর করতে চলে আসবে। ততদিনে শিশুকন্যাটি মোটামুটি তের থেকে পনের-ষোল বছরের আর বালকটি কুড়ি থেকে তেইশ বছরের হয়ে যায় ক্ষেত্র বিশেষে। তাই প্রথম বিবাহের ফুলশয্যার অনুষ্ঠান শুধুই নিয়ম পালন আর দ্বিতীয় বিবাহের পরের ফুলশয্যার অনুষ্ঠান ঘটাপটা-রোশনাইয়ের আলোকিত পথে বর-বধূকে প্রকৃত দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র দান। এবাড়িতে এসে প্রথম কিছুক্ষণ হকচকিয়ে থাকা সুরো সমবয়সী সঙ্গীসাথী পেয়ে এবং গুরুজনদের আদরে যত্নে, সারাদিন পুতুল খেলে নতুন পরিবেশে নিজেকে দিব্যি মিলিয়ে নিল। প্রথম রাতটা কালরাত্রি। নিজের বিবাহিতা ননদ দুগ্গা আর সমাগত আরও অনেক ননদ, মাসী-পিসীদের সঙ্গে মেঝের ঢালা বিছানায় শুয়ে ঘুমোলো ও। পরদিন ফুলশয্যার রাত। বর-কনের হাতে সুতোটুতো বাঁধা এবং অন্যান্য নিয়মবিধি পালনের পর ফুলে ঢাকা বিছানায় বালক বর আর শিশু বধূকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়ল মাসী-পিসীরা। সুরবালা নাম্নী আট পেরিয়ে সদ্য ন'য়ে পড়া কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠান এভাবেই সমাপ্ত হল।'

দীপা বইয়ে পেজমার্কারটা গুঁজে বন্ধ করে ভাবতে থাকে— কি যে একটা বিতিকিচ্ছিরি যুগ ছিল সেটা বলার নয়। ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়েকে কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য বিয়ে দিতে বাবা-মা'র বুক কাঁপত না? ভাবাই যায় না এযুগে বসে। এখনও রাজস্থান-টাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ হয় একটা দুটো— খবরে দেখেছে। তবে আপার কাস্টের গৌরীদান প্রথা নয় এগুলো। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে করে তাও নয়। লোয়ার কাস্টে শিক্ষার অভাব এই ছুট-ছাট একটা দুটো ঘটনার জন্য দায়ী। ওরা জানেই না শিশু বিবাহ যে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। টিভি-তে ছবিও দেখিয়েছে রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে। কিন্তু সে যুগে তো এটা প্রচলিত প্রথা ছিল। পাল্কি নিয়ে সুরো আর বংকুর ঝগড়া-মারামারি মনে পড়ে যেতেই হাসি পায় ওর। — নাহ্! স্বীকার করতেই হচ্ছে বাবা সত্যিই একটা ইন্টারেস্টিং বই বের করে দিয়েছে। এখন দেখা যাক, বংকু-সুরোর পরবর্তী জীবন কেমন কাটে।

২য় অধ্যায়

অফিস থেকে ফিরতে রোজই দেরি হয় ভাস্করের। আই টি সেক্টরে বড় চাকুরিওয়ালাদের এটা মস্তবড় সমস্যা। ইন্টারন্যাশন্যালী গুডউইল সৃষ্টিকারী মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানি তোমাকে পার্-এনাম কয়েক লক্ষ টাকা দেবে, যা তুমি বাপের জন্মে কল্পনাও করতে পারোনি আগে, আর তোমার রক্ত জল করে ছাড়বে না, তাই কখনও হয়? অফিসে আসাটা ঘড়ি ধরে ন'টায় হতেই হবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়াটা কর্তার ইচ্ছেতে। আজ ভেবেছিল একটু আগে বের হতে পারবে। তাহলে মা'কে নিয়ে বাইরে ডিনার করতে যেত। মা কতকাল ধরে জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ক্লাশ এইটে পড়ার সময় বাবা মারা গেল কাউকে কিছু করার সুযোগ না দিয়ে নিতান্ত কম বয়সে। একটা দুর্ঘটনা বাবাকে ছিনিয়ে নিল ওদের জীবন থেকে। একমাত্র রোজগেরে সোমত্ত ছেলের অকাল মৃত্যুতে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া দাদু-ঠাকুমাকে সামলাতে ব্যস্ত মা নিজের চরম ক্ষতির পরম শোককেও বুকের ভেতরে দমন করে রেখেছিল। সেই থেকেই তো শুধু সংগ্রাম করে গেছে। সুখ আর আনন্দ তো ছেলের ভাল রেজাল্ট দেখে পেয়েছে মা। ভগবান কৃপণের মতো ওইটুকু আনন্দই রেখেছিল মায়ের ভাগ্যে। সেই ক্লাশ এইট থেকে আজ

অবধি ওর ডব্লিউ বি সি এস মাকে ও কখনও অহংকার করতে দেখেনি। না দেখেছে ঔদ্ধত্য, না দেখেছে দাদু-ঠাকুমাকে অমর্যাদা করতে। ওর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাবা অফিস থেকে ফিরে রোজ নিয়ম করে ওকে ম্যাথস্, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়াতো। মা আর্টসের ছাত্রী ছিল। এসব পারত না। আর্টস সবজেক্টগুলো মা দেখে দিত। তখনও পর্যন্ত ও কখনও প্রাইভেট টিউশন নেয়নি। বাবা-মার পড়ানোই যথেষ্ট ছিল ক্লাশে ফার্স্ট হওয়ার জন্য। ক্লাশ নাইন থেকে ও প্রথম প্রাইভেট কোচিং নিতে বাধ্য হয়। বাবা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করত, পেনশন ছিল না। রেখে যাওয়া কিছু টাকা, পি এফ, গ্র্যাচুইটির টাকাগুলোই পেয়েছিল মা। দাদু সরকারি কর্মচারী ছিল। পেনশন পেত। মার মাইনে আর দাদুর পেনশন দিয়ে সুখে দুঃখে চলেছে ওদের সংসার। ঠাকুমার সঙ্গে কখনও মা'র কোনও ঝগড়া হতে দেখেইনি ভাস্কর। সত্যি বলতে ঠাকুমার সর্বপ্রকার সহায়তা না পেলে মা বোধহয় বাবাকে ছাড়া জীবনটা টেনে নিয়ে যেতেই পারত না। ওরও সফ্‌টওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর এম বি এ করা হত না। পারিবারিক কলহ, অশান্তি এগুলোর সঙ্গে ওর কোনও পরিচয় ছিল না নিজের বিয়ের আগে। দাদু, ঠাকুমা আর মা যেন একই বৃন্তে তিনটি পাতা যারা ওর মতো কচি পাতাটাকে খর রোদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওর মাথার ওপর নিজেদের মেলে রাখত। বার্ধক্যজনিত রোগেই প্রথমে দাদু পরে ঠাকুমা গেল। মা তখন মধ্যবয়সী। সাধারণত এই বয়সে পৌঁছে নিজের জন্মদাতা বাবা-মা মারা গেলেও মানুষ এত ভেঙ্গে পড়ে না, দাদুর মৃত্যুতে মা যেমন ভেঙ্গে পড়েছিল। History repeats itself-এর মতো মা যেমন বাবার মৃত্যুর পরে দাদু-ঠাকুমাকে নিজের বুকে শিশুর মতো যত্ন করে রেখে মহাশোকের সাগরটা পার করিয়েছিল, ঠাকুমাও ঠিক তেমনি করে দাদুর মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে পড়া মাকে ধীরে ধীরে শোকমুক্ত করেছিল। মা তখন শুধু কাঁদত আর বলত— 'আমার মাথার ওপর আর কোনও ছায়া নেই। যে কোনও সমস্যায় আমি কার কাছে যাবো? কার পরামর্শ নেব? আমি একা একা ভিকিকে জীবনে সেটেল্ করব কি করে? বাবা যে আমাকে দু'হাতে আগলে রেখেছিল। এখন কে আগলাবে? সংসারে কোনও কর্তা নেই, এই সংসারের কি হাল হবে?'

ঠাকুমা মাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলত— 'বৌমা, আমাদের অনেক পুণ্যের ফলে তোমার মতো বৌ পেয়েছিলাম মা। শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মা বলে তোমার আগে কেউ ভেবেছে কিনা জানি না। বাবা চলে গেছে, ওর যাওয়ার সময় হয়েছিল বলে। আমি তো আছি মা তোমার পাশে। কিছু লেখাপড়া আমিও শিখেছিলাম, ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। আমি দেখব তোমাকে। ওঠো মা। সময়মত খাওয়া-দাওয়া শুরু কর। ভিকিকে দেখার জন্য এখন শুধু আমরা দু'জন রয়ে গেলাম। আমাদের দু'জনকেই শরীর সুস্থ রাখতে হবে। ওঠো বৌমা।' — ঠাকুমা জোর করে মাকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতো, অফিসের টিফিনও দিয়ে দিত। আমাদের এমন সুন্দর শিক্ষার, এমন সুখ সন্তুষ্টিতে ভরা সংসারে দীপা কেন মানিয়ে নিতে পারল না? আমি তো ওকে ভালবেসে নিজেকে ধন্য বলে মনে করতাম। আর মা? মা তো ওকে সুখ দিতে পারলে আকাশ থেকে চাঁদটাকেও পেড়ে এনে ওর কোলে বসিয়ে দিতে কসুর করত না। কেন তবে দীপার মতো একটা ভাল, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে এতখানি নীচে নেমে যেতে পারে? আমাদের সহজ-সরল জীবনে আগুন জ্বালিয়ে ও কি সুখ পেল? বিয়ের তিন মাসের মধ্যে ঝগড়া শুরু করেছিল। চার বছর হতে ছেড়েই চলে গেল দু'মাস আগে।

ডোর বেলের শব্দ শুনেই রোজকার মতো মা দরজা খুলে হাসিমুখে হাত বাড়ায়— 'দে, ব্রীফকেসটা দে।' ভাস্করের ক্লান্ত হাত থেকে ব্রীফকেসটা রোজ নেওয়া চাই। যেন দরজা পেরিয়ে ঘর অব্দি ওটা নিয়ে এলে ছেলে হাঁপিয়ে যাবে। হাসি পায় ভিকির মা'র এসব কাণ্ড দেখলে, আবার মা'র এই ছোটছোট জেশচারগুলো ওর বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা মনটাতে মলমের মতো কাজ করে।

— 'তোর পাজামা-কুর্তা রেখে এসেছি বাথরুমে। চট্ করে চান করে আয়। আমি মাইক্রোওভেনে খাবার গরম করছি। যা।'

— 'না মা। একটু বসি, তারপর যাবো। দেরি তো হয়ই রোজ'— জুতো জামা খুলতে খুলতে ভিকি বলে— 'জানো, আজ একেবারে ঠিক করে রেখেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে তোমাকে নিয়ে বাইরে ডিনার করতে যাব। হলই না। কতদিন আমরা বাইরে খাইনি বলতো?'

ঠিক দু-মাস পাঁচ দিন। রাজশ্রী জানেন একজেক্টলী কতদিন ভিকি বাইরে ডিনার করতে যায়নি। সেই মার্চের তিন তারিখ যেদিন দীপান্বিতা একেবারে অকারণ মারাত্মক অসভ্যতা করে ওদের দু'জনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল ওর জংলীপনায়। নাস্তানাবুদ মা আর ছেলের মুখে দীপার বিষাক্ত জিহ্বার সামনে টিকে থাকার মতো কোনও শব্দের স্টক ছিল না। লেখাপড়া করা, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী হাসিল করা মেয়ের যে এত অশ্লীল মুখ, এত অমার্জিত বডি ল্যাংগুয়েজ হতে পারে, সেটা এদের কাছে কল্পনাতীত ছিল। নিজেই একতরফা চেঁচালো অঙ্গভঙ্গী করে, তারপর স্যুটকেস গুছিয়ে ট্যাক্সি করে বাপের বাড়ি চলে গেল। ওরা সেদিন বাইরে ডিনার খাবে বলে ঠিক করেছিল। ভিকির অপরাধ ও রাজশ্রীকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। রাজশ্রী জানতেন দীপা চায় না উনি সঙ্গে যান, তাই শরীর ভাল লাগছে না-র অজুহাত দেখিয়ে অশান্তি দূরে ঠেলে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভিকি মানতে চায়নি, — বলেছিল 'যে কোনও আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে রাখতে তুমি যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছ মা। এভাবে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। যদি আমাদের ফূর্তি করার অধিকার থাকে, তাহলে তোমারও আছে। নিজের অধিকার বিসর্জন দিয়ে আর কত বঞ্চি ত করবে নিজেকে? এক্ষুণি তৈরি হও। তুমি গেলেই যাওয়া হবে, নতুবা কেউই যাবে না।' ব্যাস! মাচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে দীপা ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল ওদের ওপর। ওর অবিশ্বাস্য অসভ্যতা দেখে দেখে মাঝে মাঝে রাজশ্রীর সন্দেহ হত ও সত্যি সত্যিই শশাঙ্কবাবুর মতো নিপাট ভাল মানুষেরই মেয়ে তো? নাকি মাথা খারাপ? বুঝতে পারতেন না উনি।

ভিকির বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, নির্দোষ ভালমানুষ ছেলেটার অসহায়ত্ব বড় বেশি যন্ত্রণাদায়ক রাজশ্রীর কাছে। বোবার শত্রু নেই— এই প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস রেখে দীপান্বিতার অযথা অপমান সহ্য করেছেন। তাঁর নিজের সৃষ্টি করা এন জি ও রসাতলে যেতে বসেছে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে। যাবেন কখন? সংসার তো দুটোই। বাড়ির সংসারও সংসার, আর 'সুরক্ষার প্রয়াস'ও সংসার। বরং বলা ভাল 'সুরক্ষার প্রয়াস' অনেক বড় সংসার। কত স্তুন্দ্বব্দ্ধন্দ্ধত্তব্ধন্দ্ব মেয়েরা যে সুরক্ষিত আশ্রয়ে আছে ওখানে! তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার যে ওঁর কাঁধে, দীপা যদি একটু বাড়ির সংসারটার হাল ধরত তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি 'সুরক্ষার প্রয়াসে' আরও বেশি কাজ করতে পারতেন। তেসরা মার্চের সেই রাত্রের পর ভিকি আজ প্রথম বাইরে খেতে যাবার কথা তুলল। তবে কি ও দীপাকে ধীরে ধীরে অগ্রাহ্য করার, মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে? না-না। সে কি করে হয়? বিয়ে কি ছেলেখেলা, যে ইচ্ছে হল করলাম, ইচ্ছে নেই খেলাঘর ভেঙ্গে দিলাম? এ হতে দিতে পারা যায় না। তিনি লক্ষ্য করেছেন ভিকিকে নিয়ে দীপান্বিতার খুব একটা সমস্যা নেই। সমস্যাটা ওঁকে নিয়ে। কোনও এক অজানা কারণে দীপা তাঁকে কুষ্ঠব্যাধির মতো নজরে দেখে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। বোবা হয়ে থেকেও লাভ হয়নি। যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা— গোছের হয়েছে। রাজশ্রী মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিলেন তারই পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হওয়া দুটো বৃদ্ধাবাসের যে কোনও একটাতে চলে যাবেন। শুধু ভিকির কাছে গোপন ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে ভয় হচ্ছিল। ও কিছুতেই মানবে না। ওর সুখের কথা ভেবে মাকে বৃদ্ধাবাসে যেতে হবে এমন প্রস্তাব ভিকির মতো ছেলেরা মেনে নিতে পারে না। দাদু-ঠাকুমা, বাবা-মা এঁদের কাছ থেকে যে সংস্কারে ও দীক্ষিত হয়েছে সেই সংস্কার যে ওর অন্তরে গভীর প্রোথিত। .... কি উপায় যে বের করি? ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে যায় রাজশ্রীর। কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে ছেলেকে তাড়া দেন— 'যা যা। স্নান করে আয়। আর কখন খাবি?'

এই বেডরুমটাতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না ভিকির। যতটা সম্ভব এভয়েড করে থাকতে পারলে যেন বাঁচে ও। দীপান্বিতা শুধু একটা স্যুটকেস নিয়ে গেছে। বাকি সবই পড়ে আছে সারা ঘরময়। চারটে বছর একসঙ্গে থাকা। ভাস্করের প্রত্যেকটা দিনের কথাই প্রায় মনে আছে। ভালবাসা, মান-অভিমান, রাগারাগি— সব। দীপা কি করে ভুলে গেল? দু'মাসের মধ্যে একটাবার দোষ স্বীকার করে ফোনও করেনি। ভাস্করও করেনি। করবে না। অপরাধী এতে প্রশ্রয় পাবে। মা বারবার ক্ষমা করে প্রশ্রয়ই দিয়েছে, কিন্তু ভিকি কিছুতেই

কোনও প্রশ্রয় দেবে না ওকে। তাতে যদি ডিভোর্স হয় তবে হোক। দীপাকে মাথা হেঁট করে সব অপরাধ লিখিতভাবে স্বীকার করে এখানে আসতে হবে, নতুবা আর আসতে হবে না। যে মেয়ে গুরুজনকে অকারণ অপমান করে মনে সুখ পায়, তাকে ক্ষমা করলে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হবেন। আশ্চর্য, তবুও ও জানে দীপাকে এতকিছুর পরেও ও ভালবাসে। রোজ রাতে এই ঘরে এসে ঢুকলেই ওর মনে হয় দীপা যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে এক্ষুণি জিজ্ঞেস করবে— 'ভিকি তুমি এসে গেছ? কখন এলে?'

দীপা রাত জেগে থাকতে পারত না। রাত দশটায় শুয়ে পড়ার অভ্যেস ছিল বাপের বাড়িতে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভাস্করের ফেরার অপেক্ষা করতে গিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। কখন ডোরবেল বেজেছে, মা-ছেলে খেয়েছে কিছুই জানতে পারেনি। খাওয়ার পর মা নিজের রুমে ঢুকে পড়ত আর ভাস্কর ওকে কোলে তুলে নিজেদের বিছানায় নিয়ে আসত। মা নিজেই শেষে বলেছিল— 'তুমি দশটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়ো দীপা। অতরাত অব্দি জেগে থাকার অভ্যেস নেই, শেষে শরীর খারাপ হবে। আমিই দরজা খুলে ওকে খেতে দিয়ে দেব। আমার জেগে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে, অসুবিধা হবে না।' দীপা হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো অফারটা লুফে নিয়েছিল। ভিকি এলে কোনও কোনও দিন নড়াচড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করত— 'কখন এলে? আমাকে ডাকোনি কেন?' উঠে এসে সেসবদিনে খাওয়ার টেবিলে বসে মাকে আর ওকে সঙ্গও দিত।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সারাদিনের ঘর্মাক্ত ক্লান্তি আর দীপার দিয়ে যাওয়া মানসিক ক্লেদ ধুতে ধুতে ভাস্কর ভাবে— মা কবে দীপাকে এতটুকুও কষ্ট দিল? ওর চলাচলের রাস্তায় পারলে বোধহয় মা গোলাপের পাঁপড়ি বিছিয়ে রেখে দিত। ভিকির বৌ, মা'র নয়নের মণি, বুকের পাঁজর। ভিকির সুখে মার সুখ, ভিকি-দীপা খুশি থাকলে মা'র বুকভরা আনন্দ। ভিকির ফেরার পথ চেয়ে অতরাত অব্দি জেগে থেকেও ঠিক সকাল ছ'টায় চায়ের ট্রে হাতে হাসি মুখে ওদের দরজায় নক্ করত। চা খেলেই পটি পেয়ে যায় ওর। একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে বাথরুম থেকে বেরোয় রোজ। কারণ, ঠিক আটটায় ওকে অফিসে রওনা হতে হয়। ড্রাইভার এসে যায় নিতে। দীপা গড়িমসি করে তখনও বিছানায় গড়াগড়ি খেত। ভিকি বের হবার ঠিক আগে উঠে ওর পার্স, রুমাল এগিয়ে দেওয়া, সারা শরীরে ডিওডোরান্ড স্প্রে করে দেওয়া ছাড়া ব্রেকফাস্ট বানানোর যে বড় একটা কাজ থাকে সেটা দিব্যি এড়িয়ে যেত। মা কিন্তু এসব নিয়ে কিছুই মনে করত না। কোনও অনুযোগ ছিল না মা'র। খুশি মনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে সকালের ব্রেকফাস্ট বানাতো, ওর দুপুরের খাবার প্যাক করত। একটা রান্নার লোক রাখার জন্য ভিকি আগেও মা'কে অনেক বলেছে, কিন্তু রাজি করাতে পারেনি। মা বলত— 'ঐ একটা জিনিস আমি কিন্তু কখনও মানব না ভিকি। ওরা সাতবাড়ি রান্না করে আসে। তাড়াহুড়োয় অখাদ্য তৈরি করে রেখে যাবে। মুখে তোলা যাবে না। তাছাড়া পরিচ্ছন্নতা বলে ওদের কোনও কিছুই নেই। ও আমি সহ্য করতে পারব না। তাছাড়া তোর জন্য নিউট্রিশাস ডায়েট ক্যালোরি মেপে আমি তৈরি করি, সেসব ওদের দ্বারা হবে? ওরা ডাল, ভাত, পটলের ডালনা, মাছের ঝোল রাঁধতে পারে। তুই লাঞ্চে ওসব নিয়ে যাবি অফিসে? মাইক্রোওভেন, ওটিজি চালাতে পারবে? আমাদের বাড়িতে বাবা-মা মারা যাবার পর রোববার ছাড়া আলুপোস্ত, মোচার ঘন্ট এসব রান্নার প্রাত্যহিকতা উঠে গেছে কবে! শুধু রোববারে রান্না করার জন্য একটা লোক রাখতে হবে? তুই-ই বল? আছে তো দুটো ঠিকে লোক! রান্না ছাড়া অন্য সব কাজই তো ওরা করে। রান্নাটা আমারই থাক বাবা! তোর বৌ এলে দু'জনে মিলে করব। একবেলা ও একবেলা আমি। দেখবি, আমার হাতে তখন সময়ই সময় হবে। আমার বয়স বাড়ছে, শরীর খারাপ হবে, এসব চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে। কাজ করলে শরীর খারাপ হয় না বরং ভাল থাকে, বুঝলি!' — অকাট্য যুক্তি দিয়ে মা ওকে চুপ করিয়ে দিত। কিন্তু ছেলের বিয়ের পর তিন মাস পরেও 'বৌ একবেলা, আমি একবেলা' জোটেনি মা'র কপালে। বৌ শাশুড়ির তৈরি করা প্রত্যেক বেলার খাবার টিভি দেখতে দেখতে খেয়েছে। একদিনও বলেনি, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না, তাহলে তো আমিও করতে পারি।'

ভাস্কর সব লক্ষ্য করত, যতক্ষণ বাড়িতে থাকত। দীপা আসার আগে বরং মা অনেকবেশি ফ্রী ছিল। ছেলেকে অফিসে পাঠিয়ে নিজে খেয়ে বেলা এগারোটায় এন জি ও, ওল্ড এজ হোম এগুলোর তদারকি করতে বেরিয়ে যেত। মা রিটায়ার করার পর থেকে এইসব সমাজসেবা করে চলছিল। দীপার দিক থেকে সাহায্যের কোনও হাত এগিয়ে আসেনি, উল্টে শুধু রান্না করা নয়, দীপাকে খাবার বেড়ে দেবার দায়টাও মা'র ওপরেই পড়ল। সকালে স্নান করত না ও। বেলা বারোটার পর বাথরুমে ঢুকে ঘষে মেজে, মাস্ক, শ্যাম্পু, পেডিকিওর করে ঘন্টাদেড়েক বাথরুমে কাটিয়ে দেড়টা পৌনে দুটোয় মাকে বলত— 'মা খেতে দাও।' সংসারে একজন সুস্থসবল মেম্বার, যে চাকুরি করতে যায় না, গৃহবধূ হয়ে বাড়িতেই থাকে, সে কোনও কাজেই হাত লাগাবে না, এতো ভারী অন্যায়। দীপা আসলে এই পরিবারকে নিজের বলে ভাবেইনি কখনও। নামীদামি অতিথির মতো থাকতে চেয়েছে। প্রথম প্রথম ভিকি ভালভাবে বলত ওকে— 'যাও দীপা, কিচেনে গিয়ে মাকে একটু হেল্প কর। বুড়ো হচ্ছে, একা একা আর কত করবে? এবার তুমি হাল ধর সংসারের। এতদিন তো হল বিয়ের। এখন আর একেবারে নতুন বৌ তো নও! মা একা সব করে এটা আমার খারাপ লাগে।'

ওর গলা জড়িয়ে ধরে মধুর হেসে দীপা বলত— 'বাববাহ্! এর মধ্যে পুরনো হয়ে গেলাম? এতদিন হয়ে গেল? মাত্র তো তিনমাস বিয়ে হয়েছে ভিকি। এখনই কিচেনে ঢুকিয়ে আমাকে বুড়ি করে দিতে চাও? আমি এত সুন্দর থাকি, ফ্রেস থাকি, এসব

তোমার ভাল লাগে না? কিচেন মানেই তেল-কালি, আগুনের আঁচ, আলুর কষ। আমার পোর্সিলীনের মতো যে স্কীনটার তুমি এত গুণগ্রাহী, সেই স্কীন নষ্ট হবে, আঙ্গুলগুলোয় দাগ হবে, নোখ ভেঙ্গে যাবে। তখন তোমার ভাল লাগবে? রাঁধুনী বৌকে আদর করতে ইচ্ছে করবে? বল?'

— 'লাগবে দীপা। আরও বেশি ভাল লাগবে। কারণ, তখন আমার মনে হবে আমাদের মা-ছেলের ছোট সংসারটাতে যাকে আদর করে আমরা আপন করব বলে নিয়ে এসেছি সেই তিন নম্বর মানুষটা এবাড়ির একজন হয়ে গেছে। সত্যিকারের আপন করে নিয়েছে আমাদের। দীপা, মা যে তোমাকে এত ভালবাসে তার প্রতিদানে তোমারও যে কিছু দেওয়া কর্তব্য মাকে একথা ভুলে যেওনা প্লীজ। মা তোমার কোনও ত্রুটি রাখে না। অনেক ভাগ্য থাকলে মা'র মতো শাশুড়ি হয়।'

— 'কিন্তু আমি তো রান্নাবান্না ঘরকন্না কোনওদিন করিই নি! বাড়িতে মা করত, কাজের মাসী করত। কি করে পারব বল?'

— 'পারা পরে হবে। এ্যাটলিস্ট তুমি কিচেনে গিয়ে মা'র পাশে দাঁড়াতে তো পারো! বলতে তো পারো, মা আমাকে একটু একটু করে শিখিয়ে দাও! সবাই কি সব শিখে আসে? আস্তে আস্তে শিখে নেয়। মা তো কত খুশি হবে তুমি শিখতে চাইলে।'

— 'তুমি মা'কে একটু বেশিই ভালবাস, তাই মা'র খুশিটা দেখছ, আমার খুশির পরোয়া নেই।'

— 'এ কি বলছ তুমি! মা'কে ভালবাসব না? তুমি তোমার মাকে ভালবাস না? আর, তোমার সব খুশির পরোয়ার ঠিকা তো আমি একা নই, মা আরও বেশি নিয়ে বসে আছে। এরপরও তুমি এসব কথা বলবে? ছিঃ, দীপা। আর কখনও তুলনামূলক কথা বোল না। মা তাঁর জায়গায়, তুমি তোমার জায়গায়। তোমাদের দু'জনের খুশির দায়িত্বই আমার। আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। কিন্তু তোমাকেও তোমার দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

— 'ঠিক আছে বাবা। দেখব চেষ্টা করে। হলো তো?'

— 'আমি ওয়াচ ডগের মতো লক্ষ্য রাখব।' — বলে হেসেছিল ভাস্কর।

এক সপ্তাহ লক্ষ্য করে দেখল ভাস্কর। দীপা ওর কথা রাখেনি। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। স্বভাবশান্ত ভাস্করেরও একই কথা বারবার বলে কথা কাটাকাটি করতে খারাপ লাগে। রোববার দিনটা ও সারাক্ষণ নিজেই মা'র পাশেপাশে রইল। কিচেনে হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দিল, গল্প করে সঙ্গ দান করল মাকে। দীপা টিভি দেখতে দেখতে সবই লক্ষ্য করল, মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো করে রেখে। শাশুড়ির নামে গুছিয়ে শতশত মিথ্যে কথা লাগিয়েও ভিকিকে কাবু করা গেল না।

দুপুরে শুতে এসে ভাস্করকে বলল অনুযোগের গলায়— 'সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন। আজ মনে করেছিলাম সকালে তোমার সঙ্গে ওবাড়ি যাব, সারাদিন থেকে রাত্রে ফিরব। তা, তুমি তো মাতৃপূজায় ব্যস্ত হয়েই কাটিয়ে দিলে দিনটা। আমার কথা কে ভাববে? আমার মাকে দেখতে যেতেই চাও না।

আগুন লেগে যায় জলে। ঢেউয়ের দোলায় ছড়িয়ে যায় আগুন অঙ্গ থেকে প্রত্যঙ্গে, প্রত্যঙ্গ থেকে চেতনায়। ভাস্কর দাঁতে দাঁত চেপে বলে— 'এখন থেকে এটাই রুটিন জেনে রাখো। সপ্তাহের একটা মাত্র ছুটির দিন আমি আমার দেবীর মতো মাকে পুজো করে কাটাব। ওবাড়ি যেতে চাও কি জাহান্নামে যেতে চাও একাই যেও, আমার সঙ্গ আশা করো না। আমি তোমার গোলাম নই যে, তোমার হুকুমে চলব। সকালে বেড-টি থেকে শুরু করে রাত্রের ডিনার পর্যন্ত সমস্ত ওই বয়স্ক মানুষটা একা একা করে আর তুমি বসে বসে খাও— লজ্জা করে না তোমার? কোন্ লাটের বাটের ঘরের মেয়ে ছিলে তুমি? এই তো শিক্ষা, ছিঃ!'

চোখে আগুন আর গলায় বিষ মাখিয়ে দীপা জবাব দিয়েছিল— 'না। একটুও লজ্জা করে না। উনি আমাদের ডিপেন্ডেন্ট। একজন ডিপেন্ডেন্ট খাওয়া-থাকার বিনিময়ে রান্না করবে, কাজ করবে, হুকুম তমিল করবে এটাই স্বাভাবিক। তার ছেলের বৌ বসে বসেই খাবে— বুঝেছ?'

চিৎকার করে উঠেছিল ভাস্কর— 'শাট্ আপ ইউ বিচ্। আর একবার মুখ খুললে আজ আমি পরিণতির কথা চিন্তা করব না, তোমার ওই মুখ চিরজীবনের জন্য বন্ধ করে দেব। আমার মা ডিপেণ্ডেন্ট? তুমি ডিপেন্ডেন্ট, তুমি! কি অবদান আছে তোমার এই পরিবারে! কার পয়সায় খাচ্ছো? কার পয়সার শ্রাদ্ধ করে রূপচর্চা করছ তুমি? এক টাকা রোজগার করার মুরোদ আছে তোমার? দু-দুবার এস এস সি দিয়ে ফেল মেরেছ। যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা? সাবধান বলে দিচ্ছি। আর একবারও যদি তোমার দিক থেকে মা'কে অপমান করার চেষ্টা দেখি, তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলব— দিস্ ইজ আ প্রমিস।'— বেরিয়ে এসেছিল ও ঘর থেকে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে। সেই থেকে দীপার অসভ্যতামি শুরু হল প্রকাশ্যে।

সেদিন দীপান্বিতা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। শান্তশিষ্ট অত্যন্ত ভদ্র ভাস্কর যে এমন অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে পারে, এটা ওর কল্পনার অতীত ছিল। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল স্বামীটি গ্রানাইট পাথরে তৈরি। রূপ যৌবন, দেহশ্রী দিয়ে একে ভাঙ্গা যাবে না। বাইরে ঠাণ্ডা বরফচূড়া দেখা গেলেও ভেতরে আগ্নেয়গিরি। তাই বোধহয় এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ভাস্কর যখন ওর সঙ্গে কথা বলল না, ও যে এবাড়িতে আছে সেটাও যেন অগ্রাহ্য করে চলল। রাত্রে মা নিজের রুমে ঢুকে গেলে বালিশ তুলে নিয়ে নন এ.সি ছোট গেস্টরুমের সিঙ্গল খাটে শুতে গেল। দীপাকে তাচ্ছিল্য সহকারে দূরে সরিয়ে রেখে। শুধু মা'র সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে দিতে লাগল দীপার কোনও মূল্যই নেই ওর কাছে। তখন দীপা নিজের বুদ্ধিতেই লো-প্রোফাইল হয়ে দিন কাটানোই শ্রেয় বলে মনে করল। এখন সকাল থেকে টিভি বন্ধ রাখে, শাশুড়ি ওঠার আগে নিজে উঠে বেড-টি বানাতে পারছে, ব্রেকফাস্টও দিব্যি

ভালই তৈরি করছে। অভিনয় করে হলেও ভাস্করের সামনে শাশুড়িকে বলছে— 'তুমি এখন থেকে এন জি ও-তে, বৃদ্ধাবাসে কাজকর্মগুলো করতে যেতে পারো তো মা। আমি তো থাকিই বাড়িতে। কোনও অসুবিধা হবে না।'

রাজশ্রী বৌয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই বিগলিত হয়ে যান। বিশ্বাস করে ফেলেন অতি সহজেই। কিন্তু ভিকি নিজের গাম্ভীর্যের মুখোশটা একচুলও নড়ায় না। দীপার আসল কদর্য রূপটা মা অতটা দেখেনি যা ও দেখেছে। এত সহজে দীপা বদলাবার মেয়ে নয়। এগুলো ওর ডিপ্লোমেটিক পলিসি। সাময়িক ভাল ব্যবহার করে ও ভিকিকে কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বোঝে ভিকি। ও সোজাসুজি মাকে বলে— 'মা, চলো, আমি অফিসে যাওয়ার সময় আজ তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। কাল থেকে তুমি কখন কখন বেরোবে বলে দিও, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। সংসার সামলাবার দায় তোমার একার নয়। সারা জীবন এসব করেও অতবড় একটা চাকরি করেছ। এখন নিজের সাধ পূর্ণ কর মা। মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে বসে আছ ওদিকে, আর এদিকে ঘরের বৌয়ের সেবা করতে করতে তোমার দিন যাচ্ছে। এবার এসব বন্ধ কর। বৌ তোমার সেবা করবে। তুমি ওর সেবাদাসী নও। তুমি আমার মা।'

রাজশ্রী ভিকির কঠোর ভাষা শুনে হকচকিয়ে যান। টেবিলে হাত রেখে চেয়ারে উপবিষ্ট কোমর থেকে হাঁটু অবধি কাঁপন থামাবার চেষ্টা করেন। এইবুঝি অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে! তাড়াতাড়ি বৌকে খুশি করার জন্য বলে ওঠেন— 'যাহঃ! কি যে বলিস! নতুন বৌ এসেছে ঘরে, ওকে একা ফেলে রেখে দু'জনেই বেরিয়ে গেলে চলে? ওদিকের কাজ ঠিকই চলছে। আজিজুল আছে, রত্না আছে। ওরা জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে। ভয়ানক ডেডিকেটেড। ডেইলী রিপোর্ট করতে ভোলে না আমাকে। আমি ইচ্ছে করেই এখন নিয়মিত যাই না রে!'

ভিকি কড়া চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে— 'এসব অজুহাত তুমি অন্য কারও কাছে দিও মা। আমার কাছে দিতে এসো না। তোমার নতুন বৌয়ের চারমাস বিয়ে হয়েছে। চার মাসে সে এই সংসারে চার মিনিটের কাজও করেনি। তুমি না ছেড়ে দিলে আগামী চল্লিশ বছর ধরে সে নতুন বৌ হয়েই থাকতে চাইবে। মন্ত্রী, বিজনেসম্যান, আর্মি অফিসার— এদের সুন্দরী, স্মার্ট, কনভেন্ট এডুকেটেড মেয়ে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার মেয়ে বাতিল করেছ একের পর এক। বলেছ, ওসব বেশি বড় ঘরের মেয়ে এসে সংসারটা দেখবে না, আমাদের আপন করতে পারবে না। আর তাই দেখেশুনে ছাপোষা পরিবার থেকে বাংলায় এম এ মেয়ে নিয়ে এসেছ তোমার পছন্দমত। আমি কোনও কথা বলিনি, কোনও আপত্তি করিনি। কিন্তু এখন আপত্তি করব। কারণ, তুমি এই সংসারে একা খাটো আর আমরা শুয়ে-বসে টিভি দেখে ফুটুনি করে খাই। এবাড়িতে অনেকে জানে না যে তোমার পেনশনের টাকাতেই এই সংসার চলে। তুমি তোমার সোওয়ালাখ টাকা মাস মাইনের ছেলের কাছ থেকে একটি টাকাও নাও না সংসার চালাবার জন্য। তোমার পছন্দ করে আনা আপারডিভিশন ক্লার্কের মেয়ে কিন্তু একবারও ভাবে না ভাস্কর ব্যানার্জীর বৌ হবার কোনও যোগ্যতাই ওর ছিল না। স্রেফ তোমার দয়ায় সে আমার বৌ হতে পেরেছে। তার কাছে তুমি আমাদের ডিপেণ্ডেন্ট মা। সে বলেছে— বাড়িতে ডিপেণ্ডেন্ট থাকলে কাজকর্ম রান্নাবান্না, হুকুম পালন— এগুলো তো করতেই হবে। মা, ছেঁড়াকাঁথা থেকে কার্পেট-এর গদিতে তুলে আনলে এরকমটাই ঘটে। তার ফল তুমি চারমাস ধরে ভুগেছ। আর নয়। তোমার সাধারণ পরিবারের সাধারণ পুত্রবধূ সংসারের কাজ করতে পারলে এখানে থাকবে নাহলে ফিরে যাবে বাপের বাড়ী। এই আমার শেষ কথা। আমি প্রেম করে বিয়ে করিনি। তুমি এনেছিলে তাই তুমিই ওর বাবাকে সমস্ত কীর্তিকলাপ জানিয়ে দেবে, আর বলবে, ভাস্কর ব্যানার্জী বাঁদরামি সহ্য করবে না। এখানে থাকতে হলে গুরুজনকে সম্মান দিয়ে মাথা নীচু করে গৃহবধূ হয়ে থাকতে হবে, নতুবা ডিভোর্সের দরজা খোলা আছে।'

ভিকির এই চেহারা রাজশ্রীর কাছেও একেবারে অপরিচিত। দীপা তাঁকে ডিপেন্ডেন্ট বলে ভাবে? তাই ও নিশ্চিন্ত আরামে থেকে আশ্রিত বিনাপয়সার বৃদ্ধ-বিশ্বাসী দাসীটির ঘাড়ে সমস্ত কাজের দায় চাপিয়ে রেখে দিয়েছে? চোখ ফেটে জল আসে রাজশ্রীর। এ কি সর্বনাশ করলেন উনি? সত্যিই তো, ভিকি নিজের পছন্দে বিয়ে করেনি। মা'র পছন্দকে মর্যাদা দিয়েছে। দীপাকে ভালও বেসেছে। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে যতবার কথা বলেছেন বিয়ের আগে, ততবার রাজশ্রী মুগ্ধ হয়েছেন মানুষটির চমৎকার ব্যবহারে। হতে পারে উনি আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন, তাতে কি? ওনার শিক্ষাদীক্ষা কথাবার্তা সবকিছুই তো উচ্চমার্গের। একমাত্র অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনও দুর্বলতা তো নেই শশাঙ্কবাবুর। অর্থনৈতিক সম্পন্নতা একসময় রাজশ্রীরও ছিল না ভিকির বাবা মারা যাবার পর। ওঁর নিজের বেতনের অঙ্কটা তখন ভারী ছিল না। শ্বশুরবাবার পেনশন না থাকলে খুবই কষ্ট পেতে হত। ধীরে ধীরে ওঁর নিজের উন্নতি হয়েছে, ভিকিও মানুষ হয়েছে ওঁর স্বপ্ন পূর্ণ করে। তখন থেকেই এবাড়িতে প্রাচুর্য এসেছে। যখন প্রাচুর্য ছিল না তখনও মনের দারিদ্র্যতা ছিল না, আজ প্রাচুর্য এসেছে বলেও অহঙ্কার আসেনি। শশাঙ্কবাবুরও অর্থপ্রাচুর্য নেই, কিন্তু মনের দারিদ্র্যও নেই। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে নিজেদের এত মিল খুঁজে পেয়ে ভেবেছিলেন, দীপান্বিতা ওর বাবার মতোই হবে নিশ্চয়ই। বাবার মতো বিনয়ী, ভদ্র, মার্জিত, অকপট সত্যবাদী!— কিন্তু একি হল? দীপার মনের ভেতর শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষ? কিন্তু কেন? কই, আজ অবধি উনি তো কোনও অনুযোগ করেনি দীপা একেবারেই কোনও কাজে হাত লাগায় না বলে? আজ ভিকির কথা শুনে মনে পড়ছে দীপা তাঁর সঙ্গে কখনও বেশি কথা বলে না। শাশুড়ি গুরুজন, এই ভাবটা ওর মধ্যে কখনও লক্ষ্য করেননি উনি। উনি নিজেই সরলমনে উপযাচক হয়ে কথা বলতে গেছেন,

গল্প করে সময় কাটাতে চেয়েছেন। কিন্তু দীপার দিক থেকে উৎসাহ দেখতে পাননি। তার মানে পুত্রবধূ করে যাকে আদর করেছেন, যত্ন করেছেন, সে তাঁকে বাড়ির কাজের লোকের বেশি সম্মান দেয়নি? মাথাটা ঝিমঝিম করে রাজশ্রীর। ভিকির জীবনটা কি করে কাটবে এমন বৌ নিয়ে? ও অসভ্যতা, অশালীন ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করবে না— বিশেষত মা'র সঙ্গে। ও যে দাদু-ঠাকুর্মা আর মা'র মধ্যে মধুর মাতা-পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক দেখে বড় হয়েছে, নিজের চরিত্র গঠন করেছে। কি করবেন রাজশ্রী? একমাত্র কল্‌জের টুকরো ছেলের জীবনে মানসিক বিপর্যয় তিনিই ডেকে এনেছেন ভুল করে। সর্বনাশ করে ফেলেছেন। মাথা টিপে ধরে চোখ বন্ধ করে মনে মনে ছেলের জীবন নষ্ট হবার জন্য নিজেকে দায়ী করে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে থাকেন রাজশ্রী। ভেবে পান না, ওঁর ওপরে দীপার আক্রোশের কারণটা কী? দীপা তো মেঘ না-চাইতে জল পাওয়ার মতো ভিকির মতো দুর্ধর্ষ ছেলেকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে। কোনও সুখের অভাব নেই ওর। তাহলে এ কোন্ অসুখে ভুগছে ও! রাজশ্রী তো ওর কোনও ব্যাপারে নাগ গলান না, কোনও স্বাধীনতায় বাধা দেন না! তাহলে ওঁর ওপর এত রাগ, এত ঘৃণা কেন দীপার? বিনা কারণে নিজের হাতে সুখের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে কেন? ও তো নির্বোধ নয়— ভিকি তো রাগ দেখিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গিয়েছিল। দীপা রেগে লাল মুখ করে বসেছিল ডাইনিং টেবিলেই। কখন যে ও উঠে চলে গেছে টের পাননি। রাজশ্রী আপন ভাবনা, মাথার যন্ত্রণায়, ভয়ে, চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

৩য় অধ্যায়

'সুরবালার সংসার' পড়তে পড়তে একেবারে গোধূলি লগ্নে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপা। মা যখন ওকে ডেকে তুলল, তখন সাড়ে সাতটা। সাড়ে সাতটায় একটা বাংলা সিরিয়াল দেখে ও। সেজন্যই মা ডাকতে এসেছে— 'কি রে! ওঠ্! তোর সিরিয়াল তো শুরু হতে চলল। দেখবি না?'

— 'ক'টা বাজে?'— আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞেস করে দীপা।

— 'সাতটা পঁচিশ। অবেলায় এত ঘুমোয় কেউ? গা ম্যাজ ম্যাজ করবে, রাতে ঘুম আসবে না দেখিস। উঠে পড়। চা খা উঠে এসে। ঘুম ছেড়ে যাবে।'

ওদের বাড়িতে সাজানো ড্রইংরুম নেই। বাড়িটাও নিজেদের নয়। বাবার বইয়ের আলমারিওলা রুমটাতে একটা সিঙ্গল খাটে বাবা একা শোয়। ওর একটা রুম আছে। আর বাবা-মা'র বিয়ের খাট-আলমারি শুদ্ধু সবচেয়ে বড় ঘরটায় মা শোয়। বাবা অনেকরাত অবধি বইটই পড়ে বলে মা'র আলো জ্বালা থাকলে ঘুমের অসুবিধা হয়, তাই বহু দিন ধরেই এই ব্যবস্থা। আগেকার আমলের দোতলা বাড়ির একতলাটা বাবা ভাড়া নিয়ে অনেককাল ধরে আছে। বাড়িওয়ালা সুভাষ মজুমদার পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে এ বাড়িটা পেয়েছিলেন। সুভাষকাকু বাবারই বয়সী। দুজনের সম্পর্ক গলায়গলায় বন্ধুত্বের। সাধারণত বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রায় বিরল। শোবার ঘরগুলো আর রান্নাঘরের মাঝখানে একটুখানি দালান। সেখানে খাবার টেবিল। দীপা চোখেমুখে জল দিয়ে খাবার টেবিলে এসে দেখে বাবা চা খাচ্ছে। ওকে দেখে মুচকি হেসে শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করেন— 'বইটা কি তুলে দেব সেল্‌ফে? তোর ভাল লাগছে না নিশ্চয়ই?'

দীপা বুঝতে পারে ও যে সন্ধ্যে হব হব সময় পর্যন্ত 'সুরবালার সংসারে' ডুবেছিল, বাবা সেটা জানে বলেই ইচ্ছে করে ওকে ঠুকছে। বলল— 'তুমি তুলে দিলে আমি কি আর বের করতে পারব না? থ্যাঙ্ক ইউ বাবা। খুব মজা লাগছে পড়তে। এক এক জায়গায় হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। আগেকার দিনের মানুষরা ছিলও বটে! ওইটুকু বাচ্চা ছেলে-মেয়ের কেউ বিয়ে দেয়? পাল্কি নিয়ে মারামারি করছে। উফ্!'

— 'এখন পাল্কি নিয়ে মারামারি করেই তো একটু একটু করে বড় হবে। তখন আর ঝগড়া করবেই না। জানিস তো ওই বংকু....

— 'না-না! বলে দিও না। যাহঃ! তুমি না দারুণ খারাপ। ওমনি আগে কি হবে বলে দিয়ে সব রহস্যে জল ঢালতে যাচ্ছিলে তাই না?'

শশাঙ্ক হেসে ফেলে বলেন— 'ধরে ফেলেছিস? জানিস, আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন একটা দারুণ হিন্দী সিনেমা হয়েছিল— 'বিশ সাল বাদ'। বিশ্বজিতের, এই তোদের প্রসেনজিতের বাবা;নায়ক ছিল। মারাত্মক থ্রিলিং বই। পদেপদে রহস্য। একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে বোঝাই যায়নি আসল ব্যাপার। ইংরেজীতে 'সাইকো'র থেকেও ভাল হয়েছিল ওই সিনেমাটা। এক শনিবারে আমার বন্ধুরা আমার হাতে টাকা দিয়ে বলল— 'এ্যাই শশাঙ্ক, তোর বাড়ির কাছের হলে চলছে 'বিশ সাল বাদ'। ভীষণ ভীড়, টিকিট পাওয়া মুশকিল। তুই-ই পারিস লাইন দিয়ে রোববারের ছ'টা-ন'টার শোতে আমাদের টিকিট কেটে রাখতে।'

আমি বললাম — বেশ তো কেটে রাখব। কিন্তু, সারাদিন লাইনে দাঁড়াবো ওমনি ওমনি নাকি? তোরা সবাই চাঁদা তুলে আমার টিকিটের পয়সাটা দে, তবে হবে। ওরা রাজি। তখন টিকিট এক টাকা চার আনায় পাওয়া যেত। ঝপাঝপ পাঁচজনে চার আনা করে ফেলল।

রোববার সকাল দশটায় লাইনে দাঁড়ালাম। আমারটা ম্যাটিনি শোতে আর ওদের পাঁচজনের ছ'টা-ন'টার শোতে কাটলাম। বাড়ি এসে চান করে খেয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সিনেমা হলে বসে 'বিশ সাল

বাদ' দেখে বের হলাম। সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল। লাস্ট সিনের আগে কারও ক্ষমতা নেই যে বুঝবে কে খুনগুলো করছে। আমার বন্ধুরা পাঁচজনই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই বলল— 'কি রে টিকিট পেয়েছিস?'

বললাম— 'শালা, কালঘাম ছুটে গেছে এই গরমে লাইন মারতে। এই নে।'— পাঁচজনের হাতে একটা একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে ছ'টার শো শুরু হওয়ার অপেক্ষায় গল্প করতে লাগলাম। যথাসময়ে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে হলের গেট অব্দি গেলাম। ওরা যখন ভেতরে ঢুকছে তখন বললাম— 'এ্যাই শোন্, ওই বিশ্বজিতই খুনী। — বলেই পেছন ফিরে দৌড় দৌড় আর দৌড়।'

জানতাম ওমন সাংঘাতিক রহস্যে ঘেরা সিনেমাটার পেটফোলা বেলুনটাতে আলপিনের খোঁচা মেরে সব হাওয়া বের করে দিয়েছি। পরদিন কলেজে গেলে চাঁদা তুলে টিকিটের পয়সা দেবার মতই চাঁদা তুলে পেটাবে। দু'দিন দাড়ি না কামিয়ে কলেজ কামাই করে বসে রইলাম। তিনদিনের দিন কলেজে যেতেই আস্তিন গুটিয়ে পাঁচ মূর্তিমান এগিয়ে এল। দু'হাত পেছনে সরে গিয়ে শুকনো ভাঙ্গা গলায় বললাম— 'ছুঁস না, ছুঁস না। পক্স হয়েছে। আর বি-র ক্লাশটা করব বলে কষ্ট করে এসেছি।'

দীপা হেসে লুটোপুটি। ওর মা'র চা-ছলকে পড়ল কাপড়ে হাসতে হাসতে। মা বলল— 'তোমার পেটে এত রস ছিল আগে টের পাইনি তো কোনওদিন। আমি তো রামগড়ুরের ছানার মতোই দেখেছি তোমাকে।'

বাবা চট্‌জলদি উত্তর দিল— 'রস থাকবে না কেন, যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তোমার ওই ঝগড়ুটে বাজে বাংলার পাঁচের মতো মুখখানা দেখে রস শুকিয়ে যেত।'

দীপা তখনও হেসে চলেছে। কোনওমতে বলল— 'এ্যাই, এমন একটা মজার ব্যাপারের পর এখন কিন্তু তোমরা ঝগড়া শুরু করো না। ইস্, বেচারাদের 'বিশ সাল বাদ' শুরু হওয়ার আগেই তো শেষ হয়ে গেল!'

শশাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন— 'ওটা তো সিনেমা ছিল দীপা! শুরু হওয়ার আগে শেষ হলেও ক্ষতি বিশেষ নয়। কিন্তু বদমাইস লোকের প্ররোচনায় বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যারা একটা কল্পনাতীত সুন্দর জীবন পেয়ে সেটা নষ্ট করার জন্য উঠেপড়ে লাগে তারা শুধু নিজের ক্ষতি করে না, সঙ্গে আরও পাঁচজন নিরপরাধ মানুষের জীবন নষ্ট করার মতো বড় ক্ষতি করে দেয়। এদেরও ক্রিমিনাল বলে। জীবন শুরুর আগেই স্বেচ্ছায় জীবন শেষ করে দেবার অপরাধে অপরাধীদেরও ফাঁসি দেওয়া উচিত। নিদেন পক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া তো উচিৎই উচিৎ।'

দীপার মা ফোঁস করে উঠেন— 'এটা তুমি কাকে শোনাচ্ছ? মেয়েকে না আমাকে?'

— 'ধরে নাও দু'জনকেই। তবে মেয়েকে প্ররোচিত করে নষ্ট করার অপরাধে তোমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।'— বলে শশাঙ্ক স্থান ত্যাগ করে গট্‌গট্ করে চলে যান।

দীপার মা কান্নাকান্না গলায় মেয়েকে সাক্ষী মেনে বলেন— 'দেখলি তো? কি জিনিস নিয়ে যে আমি ঘর করলাম সারাজীবন সে শুধু আমিই জানি। একটা কাজেও আমাকে সাপোর্ট করল না কখনও। সব দোষ আমার। কোথাকার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে? ওমন স্মার্ট বেয়ান দেখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

দীপার বিস্বাদ লাগছিল এসব আলোচনা। রাগও হচ্ছিল। উঠতে উঠতে বলে গেল— 'বাবা কখনও মিথ্যে কথা বলে না। আর সত্য যত কটুই হোক মুখের ওপর বলতেও ভয় পায় না। বাবা আমাদের মতো কুটিল চরিত্রের মানুষই নয়। চিরকাল দেখলাম তো, স্বচ্ছ, সৎ, পরিষ্কার একজন মানুষ।'

✪ ✪ ✪

সিরিয়ালটা আর দেখাই হল না চায়ের কাপে তুফান উঠে যাওয়ার ফলে। পরবর্তী হিন্দী-বাংলা সিরিয়ালগুলোও আর দেখার মুড নেই। দীপা নিজের ঘরে এসে আবার 'সুরবালার সংসার' নিয়ে পড়তে শুরু করল। একটু পড়ে বুঝল যে ও শুধু চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে, মাথায় কিছু ঢুকছে না। মাথা জুড়ে একটু আগে বাবার বলা কথাগুলো ঘোরাফেরা করছে। বাবা কত ভালবাসত ওকে। একটা মাত্র মেয়ে বলে নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়েও ছোটবেলায় ওর আবদার মিটিয়েছে। বড় হবার পর ও নিজেই আব্দার করত না। অভাব কোনওদিনই ছিল না ওদের। সুখে স্বচ্ছন্দেই কেটেছে মেয়েবেলাটা। তবে হ্যাঁ, লাক্সারী আইটেম জোটেনি একটা রঙিন টিভি ছাড়া। ওর অনেক বন্ধুদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে গিয়ে মাথা ঘুরে যেত ওদের জিনিসপত্র দেখে। দীপা যেত, কিন্তু সেইসব বড়লোক বন্ধুদের নিজের বাড়িতে কখনও ডেকে আনেনি। কেমন এক হীনমন্যতা বোধ ছিল ওর মধ্যে। বাবা ইচ্ছে করলে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারত। মা অনেকবার বলেছে, কিন্তু বাবা কানে নিত না কথাটা। উল্টে বলত—'কি হবে পায়রার খোপের মতো একটা ফ্ল্যাট কিনে? এখানে কিসের অসুবিধা হচ্ছে তোমার? এতগুলো ছোট-বড় মিলিয়ে ঘর, দালান, বারান্দা সামনে পেছনে ছোট দু-ফালি জমি ফ্ল্যাটে পাবে তুমি? সবচেয়ে বড় কথা, সুভাষের মতো বাড়িওয়ালা। যে কোনও প্রয়োজনে নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি করে করতে পারে। পাবে এরকম বন্ধু? ঘরে মরে পড়ে থাকলেও পাশের ফ্ল্যাট থেকে জিজ্ঞেস করতে আসবে না— কি দাদা, মরে গেছেন? শোনো, ফ্ল্যাট কালচারে আমার খুব অরুচি, ওটা আমাকে খাওয়াতে এসো না। মেয়েটার বিয়ের জন্য টাকা-পয়সা রাখতে দাও। এখানে খুব আরামে আছি আমরা।'

দীপা জানত ওকে দেখতে খুবই সুন্দরী। বাবা-মা দুজনকেই দেখতে ভাল। দু'জনের সব ভাল ছিরিছাঁদগুলো নিয়ে ও জন্মেছে। মনে মনে এক রাজপুত্রকে স্বামী করে পাওয়ার স্বপ্ন দেখত। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপমুগ্ধ কোনও ছেলেকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ওরা যে ওরই মতো সাধারণ ছেলে। অসাধারণ কেউ

আসবে জীবনে এই আশায় বিশ্বাস ছিল ওর। সে দেখতে সুন্দর হবে, বাড়ি-গাড়ি সবরকম মডার্ন এমিনিটিই থাকবে তার ঘরে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু মহলে স্বগর্বে চলাফেরা করবে ও ওমন বরের সঙ্গে। অহংকারে মাথা উঁচু রাখবে। সে হয়ত ড্রিঙ্ক করবে, হয়ত সামান্য চারিত্রিক বিচ্যুতিও ঘটবে কখনো সখনো, তাতে কি যায় আসে? বড়লোক পুরুষদের এরকম একটু দোষ থাকে। ওসব মেনে নেওয়া যায়।

বাবা কিন্তু ওর মতো করে ভাবত না। বাবা বলত, আমরা ছা-পোষা মানুষ। নিজেদের মতো ঘরের ছেলে হবে, সৎ চরিত্র, সুচাকুরে, পরিবারটি ভদ্র— ব্যাস আর কি চাই? পরিশ্রমী ভাল ছেলে নিজের গুণে উন্নতি করবে। ব্যবসায়ী পরিবারে মেয়েকে দেব না আমি। সাধারণ মানুষের মেয়ে সাধারণ ঘরেই সুখে থাকবে। পয়সা থাকলেই সুখ হয় এমনটা নয়।

ঈশ্বর বোধহয় বাবার আর ওর দু'জনের মনের কথাই শুনেছিলেন। তা না হলে ভাস্করের সঙ্গে ওর বিয়ে হত না। বিনা পণে, বিনা যৌতুকে ভাস্করের মা ওকে বৌ করে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা সাধারণ পরিবার নয়, অসাধারণই। কিন্তু অসাধারণত্বের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, ছিল না অহঙ্কার। মডার্ন এমিনিটিজে ঠাসা নিজেদের অত সুন্দর ছিমছাম বাড়িতে বাস করেও ওরা নিজেদের সাধারণের দলেই ফেলে রাখতে পছন্দ করত। এতই বাহুল্যবর্জিত জীবন যাপন ছিল ভাস্কর আর ওর মায়ের। দীপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে বরদান দিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রহীতার ভূমিকায় আমি কিছুই ধরে রাখতে পারিনি। আমাকে পছন্দ করেছে আই বি এম-এর অতবড় অফিসারের মা, যার ছেলে মাসে লাখ টাকার ওপরে মাইনে পায়— একথা শুনে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসেছিল। বাবা তো সকলের সামনে আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিল সুভাষকাকুকে জড়িয়ে ধরে। বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে আমি কল্পনায় স্বামী আর শাশুড়িকে সুখী করার সবরকম পথগুলো রিহার্সাল দিতাম রোজ। কিন্তু যা করব বলে ভেবেছিলাম, ঠিক তার উল্টোটাই করলাম। কারণ মা আমাকে উল্টোটা করতে শিখিয়ে পাঠালো। এখন বাবা আমাকে আর ভালবাসে না, ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে ফাঁসিকাঠে লটকানো উচিত বলে মনে করে। এখন বাবা আমাকে ঘেন্না করে। আমি ভাল মেয়ে ছিলাম। মা'র প্ররোচনায় খারাপ মেয়ে হয়েছি। সব হারিয়ে নিঃস্ব, পরিচয়হীন হয়ে বেঁচে আছি শুধু মা'র কু-পরামর্শে। যেসব অশালীন কুৎসিত ব্যবহার আমি করেছি, সেসবই আমার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কি করে করতে পারলাম আমি? মা বলে বলে মগজ ধোলাই করে দিয়েছিল আমার— 'ভাস্করের মা কিন্তু মোটেই সুবিধেজনক হবে না দীপা। ডব্লিউ বি সি এস মহিলা মহা জাঁদরেল হবেই। অতবড় সরকারি পদে কাজ করেছে দেমাকে মাটিতে পা পড়বে না, দেখে নিস তুই। যে মেয়েছেলে নানারকম সরকারি ঝামেলা ঘেঁটেছে, সে তো কুচক্রী হবেই। হতে বাধ্য। বিনা পণে, বিনা যৌতুকে ওরকম মূল্যবান ছেলের বিয়ে দিতে কেউ রাজি হয় আজকাল? সাধারণ ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পরে পায়ের তলায় থ্যাঁতলাবে বলে বুঝলি? দেখলি না সেদিন, দেনা-পাওনার কথা উঠতেই হাত তুলে তোর বাবাকে থামিয়ে দিল?— না, আমাদের কিচ্ছু চাই না শশাঙ্কবাবু। আপনি এমন সুন্দর আস্তো একটা মেয়ে দিয়ে দিচ্ছেন, এরপর দেবার আর কি বাকি থাকে বলুন?— ঢং! সব ওর ঢং বুঝলি? অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আছে একেবারে। তাছাড়া ছেলেকে তো একেবারে কব্জায় ধরে রেখেছে রে! ছেলেও একেবারে মা বলতে অজ্ঞান। — 'মা কত কষ্ট করে মানুষ করেছে, বুড়ো দাদু-ঠাকুর্মার সেবা করে অফিস করেছে'— আ-হা-হা! মায়ের গর্বে বুক একেবারে দশহাত। হুঁঃ! দাদু-ঠাকুর্মার সেবা করেছে! বললেই হল! তোর বাবা বিশ্বাস করেছে এসব কথা, কিন্তু আমি করিনি। আমার বাপু মা'টাকে মোটেই পছন্দ নয়।'

দীপা জিজ্ঞেস করেছিল ভয়ে ভয়ে— 'মা, তুমি কি চাও না এখানে আমার বিয়ে হোক?'

মা লম্বা জিভ কেটে বলেছিল— 'বালাই ষাট! এমন জামাই আর পাব নাকি যে আমি চাইব না এখানে তোর বিয়ে হোক? তোর জেঠিমা, পিসিদের বুকের ভেতরে হিংসের দাবানল জ্বলবে ভাস্করের সঙ্গে তোর বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে। সেটাই কি আমার কম লাভ? ওদের কার মেয়েটার এমন বিয়ে হয়েছে রে! ভারী তো ব্যাঙ্কের চাকুরে নয়ত হাইস্কুলের মাস্টার কিংবা বড়জোর এখনও দাঁড়াতে না পারা জুনিয়র উকিল জামাই— সবাই এনেছে। কোথায় ভাস্কর আর কোথায় ওরা? ছ্যা, ছ্যা! আসলে, মা'টাকে নিয়েই চিন্তা হচ্ছে। শক্ত হাতে ধরে রেখেছে এতকাল, সহজে কি ছাড়বে নিজের আধিপত্য?.... দেখ দীপা, যদি সত্যি সত্যি নিজের স্বাধীনতা চাস, যদি নিজের খুশিমত চলতে চাস, ইচ্ছেমত ভোগদখল করতে চাস, তাহলে কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই শাশুড়িটাকে জব্দ করে রাখতে হবে। .... বল্লো তো রান্নার লোক রাখা পছন্দ করে না। চিরকাল নিজে রান্না করেছে। তুই যেন আবার সাহায্য করতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়িস না। ওকে দিয়ে...

দীপা মাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল— 'এখানে তো মা তোমাকে সাহায্য না করলে রেগে যাও। ওখানে ওনাকে সাহায্য করতে বারণ করছ কেন? তুমি ঠাকুর্মাকে দেখনি বলে?'

দীপার মা মুখভঙ্গী করে কপাল চাপড়ে বলেছিল— 'হায় কপাল! কি বুদ্ধি আমার মেয়ের! ওরে, আমি হলাম মা, আর ওটা হল শাশুড়ি। শাশুড়ি কখনও মা'র মতো হয়? শোন্, সোওয়া লাখ টাকা মাসমাইনের বর তোর, তুই রাঁধতে যাবি কেন? ও এতকাল করেছে এখনও করবে। সরকারি অফিসার ছিল ততদিন নাহয় ইজ্জতদার ছিল। এখন তো রিটায়ার্ড। ছেলের মুখাপেক্ষী। তুই ভাস্করকে পটিয়ে তোর দল ভারী করবি। এমন জ্বালাবি মা'টাকে যে, নিজে নাকি কোথায় বৃদ্ধাশ্রম-টম কিসব করেছে সেখানে চলে যেতে যেন বাধ্য হয়। ব্যাস, তারপর শুধু তুই আর ভাস্কর। গরমকালে তোদের এ সি বাড়িতে আমি গিয়ে থাকব।

আঃ! ভাবতেও ভাল লাগছে আমার। তোর ঠাকুর্মাকে দেখব কেন? সে কি আমার মা? ও তো শাশুড়ি ছিল।'

দিনের পর দিন মা যখন এভাবে মগজ ধোলাই করছিল, তখন বাবা একেবারে অন্য সুরে কথা বলত। বাবা বলত— 'আমার সারা জীবনের পুণ্যের ফল এত দিনে ভগবান দিলেন অবশেষে। ভাস্করের মতো একটা মহামূল্যবান হীরে, রাজশ্রীদেবীর মতো বেয়ান। মানে সবদিক থেকে সেরা পরিবার, সেরা জামাই, সেরা বেয়ান, একসঙ্গে এতো পাইয়ে দিলেন ভগবান। আমার যেন বিশ্বাস করতে ভয় হয়। স্বপ্ন দেখছি না তো? তা, হ্যাঁরে দীপা, তুই খুশি তো?'

দীপান্বিতা সলজ্জ মাথা নেড়ে বলেছিল— 'হ্যাঁ বাবা। এতটা পাবো আমিও কল্পনা করতে পারিনি। ওরা অনেক উঁচু স্তরের মানুষ। আমি সেখানে মানিয়ে নিতে পারব তো বাবা?'

শশাঙ্ক বলেছিলেন— 'দেখ, মা-ছেলের ছোট্ট একটুখানি সংসার ওদের। দ্যাওর নেই, ননদ নেই, অন্য আর কেউই নেই। ভাস্কর তো তোর নিজের পার্সোনাল প্রপার্টি হবে, ওকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে জয় করতে পারবি তুই। সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আসল হল ওর রত্নগর্ভা মা। কমবয়সে স্বামীকে হারিয়েছে, কত সংগ্রাম করে এমন একটা হীরের টুকরো ছেলেকে তৈরি করেছে। বড় সাধ করে আমাদের মতো নগণ্য পরিবার থেকে বৌ নির্বাচন করেছে। তুই তোর শাশুড়িকে জয় করতে পারলেই ভাস্কর তোর বশ্যতা স্বীকার করে থাকবে। ওঁকে মা বলে মনে করবি— শাশুড়ি নয়। শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য মানুষ, তাই শ্রদ্ধা করবি। সব কথা শুনে চলবি, যাতে আমাকে কখনও তোর বিরুদ্ধে কোনও নালিশ শুনতে না হয়। ওঁকে আমি চিনেছি রে দীপা। উনি একডালা ভালবাসা, স্নেহ-মমতা নিয়ে বসে আছেন তোর জন্য। তুইও প্রতিদানে দু'ডালা ভালবাসা দিবি। দেখিস, সংসার কত সুখের হবে তোর। কি রে পারবি না?'

দীপা বলেছিল— 'পারব বাবা।'

এসব শুনে মা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠেছিল — 'ন্যাকা! যাও ওঘরে। বেশি ভালমানুষীর জ্ঞান দিতে এসো না। দু'ডালা ভালবাসা দেবে? ছাই ঢেলে দিতে শেখাও শাশুড়ির পাতে।'

বাবা চলে যেতে যেতে বলে গিয়েছিল— 'জেনেশুনে তোর মা'র দেওয়া বিষ পান করিস না দীপা।'

আমি তবুও বাবার দেওয়া অমৃত ফেলে মা'র দেওয়া বিষই পান করেছিলাম। সেই বিষের ছোবলে ওদের জ্বালিয়েছি, নিজেও জ্বলেছি। বাবা ঠিকই বলেছে, আমি একজন ক্রিমিনাল। আমাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো কম শাস্তি হবে।

✪ ✪ ✪

সন্ধ্যে থেকে 'সুরবালার সংসার' বিছানায় ওর পাশেই পড়ে থেকেছে। আত্মবিশ্লেষণে, ফেলে আসা জীবনের আলো-আঁধারিতে ঘুরে মরেছে ওর মন। বইটা তুলে পড়ার মতো উৎসাহও চলে

গিয়েছিল। এখন আবার তুলে নিল হাতে। কি হবে আর পুরনো কথা ভেবে? দু'মাস আগে নিজেই তো গুমোর দেখিয়ে নীড় ভেঙ্গে চলে এসেছি। না আমি ফোন করেছি, না ভাস্কর খোঁজ নিয়েছে। সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। দেখি বইটা পড়ে বালিকা বধূ সুরবালা কেমন করে সংসার করেছিল। ওর তো অনেক বড় সংসার ছিল।

'সুরো আর বংকু অষ্টমঙ্গলায় গেল দ্বিরাগমন করতে। আড়াই দিন পর বংকুকে ফিরে আসতে হবে, কারণ দ্বিরাগমনে জামাতার তিনরাত্রি শ্বশুরবাড়ি বাস নিষিদ্ধ। অতএব বংকুবিহারী আড়াইদিন শ্বশুরবাড়িতে আদর যত্ন সহকারে বাস করে ওই সুসজ্জিত পাল্কিটাতে করেই ফিরে এল। সুরো রয়ে গেল পিত্রালয়ে বড় হবার অপেক্ষায়।

সদ্য ন'বছরে পড়া বালিকা বাপের বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্বশুরবাড়ির পাঠ পড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছিল পাঠশালার পাঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে। রোজ ভোর বেলায় কাক ডাকার আগে মা তাকে জাগিয়ে দিত ঠেলেঠুলে— 'ও সুরো, ওঠ মা। আগে ঘাটে গিয়ে বাসি কাপড় কেচে আয়। তারপর ঠাকুরঘরে পেন্নাম করে দাদু-ঠাকুর্মার ঘরে গিয়ে তাঁদের পেন্নাম করবি গড় হয়ে। তারপর তোর বাবাকে আর আমাকে করবি। এই ভাবেই গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে দিন শুরু করতে হয়। নে-নে ওঠ।'

সুরোর দু'চোখে তখন ভোরের ঘুমের আঠা জড়ানো। উঠতে চাইত না। বলত— 'আর একটু পরে উঠব মা। সূয্যি ওঠেনি তো এখনও।'

মা বলত— 'শোনো মেয়ের কতা! ওরে, সূয্যি ওঠার পর ঘরের বৌয়ের উঠতে নেই। দেবতারা রাগ করেন, লোকে নিন্দে করে। ওঠ্ মা।'

সুরো ঘুমের ঘোরে অনুনয় করত— 'আর একটুখানি ঘুমোই না মা। এত অন্ধকারে পুকুরে নাইতে যেতে ভয় করে মা। বাঁশবাগানটাতে ভূত আছে।'

মা কিছুতেই কান দিত না। বলত—'তুই কি একা যাবি? আমিও তো নাইব তোর সঙ্গে। এসব অবেবস করতে হবে সুরো। অবেবস কল্লেই সব কাজ সহজ হয়ে যায়। আমার মা আমাকে শিখিয়েছিল তাই কোনও কষ্ট হয়নি শ্বশুরবাড়ি এসে। আর আমার জন্য আমার বাবা-মা'র বদনামও হয়নি। তুই, তো দেখছি বেয়াই বাড়িতে আমাদের বদনাম করেই ছাড়বি। ওরা বলবে অতবড় ধিঙ্গী মেয়েকে মা মাগীটা কিছু শিখিয়ে পাঠায়নি। উঠে পড় মা। এখান থেকে সব শিখে যাবার জন্যই তো মেয়েদের বাপের বাড়িতে থাকার নিয়ম। তুই বড় হতে হতে সব কাজকম্ম শিখে নিবি। দেখবি, দ্বিতীয় বিয়ের পর যখন পাকাপাকি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে যাবি, তখন শাশুড়ি তোর কাজেকম্মে, আচার আচরণে কত খুশি হবে। কত সুখ্যেতি করবে। আদর করবে। এখন ওঠ্ মা। বেলা যে বাড়ছে।'

অতএব, সুরোকে উঠতেই হয়। প্রায়ান্ধকার পুকুরের কালো জলে নাইতেও হয় মা'র সঙ্গে।

সময়টা গোরাসাহেব ইংরেজদের। এদেশের বাদামী, কালো মানুষদের ওরা নেটিভ বলে। নিরক্ষর জ্ঞানে প্রবল তাচ্ছিল্য করে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কলোনিয়েল সাম্রাজ্য বিস্তার করে ব্যাটারা খুব মুশকিলে পড়েছে। কারণ অতবড় উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যবসা করতে যে শিক্ষিত লোকবল দরকার সেটা তো ওদের নেই। তাহলে তো নিজেদের ছোট দেশটাকে জনশূন্য করে এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দিতে হয়। সেটা অসম্ভব ব্যাপার। ওরা বুদ্ধিমান, তাই ঠিক করল এদেশের কালো-কালো নেটিভগুলোকেই লেখাপড়া শিখিয়ে মোটামুটি ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে অফিসগুলো চালাতে হবে। ছোট শহরগুলোতে হাইস্কুল, কলেজ তৈরি হতে লাগল। গ্রামগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিয়ে দিল স্থানীয় জমিদার বা বর্ধিষ্ণু চাষী-ব্যবসায়ীদের অর্থে। যারা টাকা-পয়সা ঢেলে পাঠশালা খুললেন নিজেদের স্বর্গীয় মাতা-পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে মাতা-পিতার নামে, তারা ইংরেজ প্রভুদের সুনজরে থাকার সুযোগ পেয়ে ধন্য, কৃতার্থ হলেন। তবে গ্রামের ছেলেমেয়েরা লাভবানই হল। অন্তত মা-ঠাকুর্মাদের মতো নিরক্ষর হতে হল না। অক্ষরজ্ঞান তো হলই, মোটা ভাষা, মোটা হাতের লেখায় বানান ভুলে ভরা চিঠিটুকু লিখতে, সাঁজোকাচা ধোপানীর হিসেবটুকু রাখতে অন্তত শিখতে পারল বাংলার গ্রামীণ মেয়েরা।

সুরবালাদের গ্রামের জমিদার কেশবনারায়ণ রায়চৌধুরী ইংরেজ ডেপুটিকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যে নিজমাতা ঠাকুরাণীর নামে 'মোক্ষদাবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে গ্রামে ওই একটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাতে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পাঠক্রমে সহশিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। পরবর্তী পাঠক্রম না থাকার জন্য পুত্র-কন্যা উভয় ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্যার্থীর তৃতীয় শ্রেণীতেই শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। স্বচ্ছল পিতামাতারা অনেকেই নিকটবর্তী শহরে উচ্চবিদ্যালয়ে পুত্রদের ভর্তি করে, বাসভাড়া করে উচ্চশিক্ষা লাভের পথ পরিষ্কার করেন, কিন্তু সকলে তা করতে পারে না। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে। জমিদার কেশবনারায়ণ ইচ্ছে করলেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে একটি উচ্চবিদ্যালয় তৈরি করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষও বটে। তবে, তার মুশকিলও আছে। উচ্চবিদ্যালয়টি কেবল ছেলেদের জন্য করতে হবে। সেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রামের লোকেরা মানবে না। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা একসাথে সতের-আঠারোর মারাত্মক বয়সটাতে পৌঁছাবে। অঘটন ঘটতে কতক্ষণ? কেশবনারায়ণ সমাজের মাথা, তিনি এমনটা ঘটতে দিতে পারেন না। তাদের রক্ষণশীল সমাজে ন-দশ বছর বয়সের মধ্যে কন্যাকে গৌরীদান করার পরম্পরা বিদ্যমান। সেইসব কন্যারা পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ রজঃস্বলা না হওয়া পর্যন্ত পিত্রালয়ে বাস করে শ্বশুরবাড়ির গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে। নিজের স্বামীকে ওরা চেনেই না, দেখেও না

সচরাচর। মায়ের পরিয়ে দেওয়া আটহাতি কাপড়, মায়ের লাগিয়ে দেওয়া সিঁথির সিঁদুর, পায়ের আলতা, নাকে নোলক, হাতে শুধু লোহা-পলা, বালা (শাঁখায় কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে অষ্টমঙ্গলা অবধি কোনও মতে হাতে রাখা হত যাতে ভেঙ্গে না যায়। অষ্টমঙ্গলার পর সেই কাপড়জড়ানো শাঁখা খুলে ঠাকুরের আসনে গচ্ছিত রাখা হত। দ্বিতীয় বিবাহের সময় সেই শাঁখা কন্যা আবার হাতে পরত। ততদিনে সে শাঁখার মর্ম বুঝে সেটিকে রক্ষা করার যত্ন নিজেই নিত) ওপর হাতের বাজুতে বালার চেয়েও ভারী, মোটামোটা বাজুবন্ধ অথবা আর্মলেট পরে বিদ্যালয়ে এলেও তখনও ওরা অবোধ শিশুই থাকে। তাই তৃতীয় শ্রেণী অবধি সহশিক্ষা ব্যবস্থায় কেউই আপত্তি করে না। কিন্তু দশহাতি-এগারো হাতি কাপড়ে অঙ্গ ঢাকা শুরু হলেই বিপদের সম্ভাবনা। না জেনে বুঝেই প্রেমজ ভাবনার উদয় হতে পারে মনে। এব্যাপারে কেশবনারায়ণ ঝুঁকি নিতে নারাজ। শেষকালে রামের বৌ সীতার বরের প্রেমে পড়ুক আর সমাজ অধঃপাতে যাক আর কি?'

দীপা প্রবল হাসির দমক সামলাতে দু-হাঁটু মুড়ে, দু-হাতে পেট চেপে পাশ ফিরে শোয়। পড়তে পড়তে মনের মেঘ তো কখন কেটে গিয়েছিল, এখন — 'রামের বৌ সীতার বরের প্রেমে পড়ুক আর কি'— পড়ে ঝরঝর করে যেন বৃষ্টি নেমে সব ময়লা ধুয়ে দিল। সত্যি, ভাবাই যায় না সেই কোন যুগে কে এক সুকুমারী দেবী এমন মজার মজার কথা লিখে বইটাকে সুখপাঠ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

'সুরবালার বয়স এখন বারো প্রায় হয় হয়। সে 'মোক্ষদাবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে যায়। মাস্টারমশাই সুখদারঞ্জন ওর বাবাকে বলেছেন— 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা লেখাপড়ায় খুব ভাল। বুদ্ধিমতীও বটে। ওকে একটু চেষ্টা করলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়ানো যেত। ওর শ্বশুরালয় এই ব্যাপারে সহায়তা করলে এই গ্রামের একটা মেয়ে প্রকৃত শিক্ষিতা হয়েছে বলে আমরা গর্ববোধ করতে পারতাম।'

সুরোর বাবা আঁতকে উঠে বলেছেন— 'বলেন কি মাস্টারমশাই! মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কি এই প্রস্তাব দেওয়া যায়? গ্রামাঞ্চলের মানুষ তো কলিকাতা শহরের মতো আলোকপ্রাপ্ত হয়নি এখনও। ওর বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়াটা যে ওরা বারণ করে বন্ধ করে দেননি আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। তবু চিঠিপত্র লেখার বিদ্যেটুকু অর্জন করেছে তো মেয়েটা। তাই বা কম কি? সুখদা মাস্টার আদর্শবাদী মানুষ সকলেই জানে। লোকের ভাল ছাড়া মন্দ কখনও চান না। দার পরিগ্রহ করেননি। সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সন্তানসম ভালবাসেন। তৃতীয় শ্রেণীর পরেও যেসব মেধাবী ছেলেরা আরও পড়তে চায়, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে শহরের উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে পারে না, সুখদা মাস্টার সেইসব ছেলেদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনে পড়ান। মাস্টারমশাইকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। যদিও গ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে— মাস্টারমশাই নাকি ইংরেজ ভাগাও দলের লোক। তবে একথাটা প্রকাশ্যে কেউ আলোচনা করে না। সুখদারঞ্জন রাজরোষে পড়ুন এটা এগ্রামের মানুষ তো চায়ই না, বোধহয় গ্রামের কাকপক্ষীও চায় না।

সুরোর বাবার কথা শুনে মাস্টারমশাই বললেন— 'বিলক্ষণ! শ্বশুরবাড়ি আপত্তি করলে সুরবালার প্রাথমিক শিক্ষাও হতো না। আমি তো বলব ওঁরা অনেক উদারপন্থী। তা, জামাই-বাবাজী তো বর্তমানে কলিকাতায় উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠরত। তিনি ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ঘরে বসেই আরও পড়াতে পারেন। আসলে, এদেশটাতে স্ত্রীশিক্ষার বড় প্রয়োজন। নারী যত দিন না অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে ততদিন আমাদের সমাজ পিছিয়েই থাকবে।'

সুরোর বাবা বলেন— 'আজ্ঞে, আপনার কথাটা আমিও জানি। কিন্তু সমাজপতিরা নিয়মকানুন না বদলালে অদূর ভবিষ্যতে স্ত্রীশিক্ষা প্রভূত বিস্তার লাভ করবে বলে মনে হয় না।'

— 'করবে, করবে। আমি বা আপনি হয়ত দেখে যেতে পারব না, কিন্তু একদিন আসবে যখন প্রত্যন্ত গ্রামেও ঘরে ঘরে নারীরা শিক্ষিতা হবেন। নারী সমস্ত শক্তির আধার। শক্তিরূপিণী দুর্গার অংশ। এমন দিনও আসতে পারে যে নারী এই ভারতবর্ষ শাসন করবে।'— সুখদামাস্টারের চোখদুটো দেখে সুরোর বাবার গা ছমছম করে। মাস্টার যেন এখানে দাঁড়িয়ে নেই। সে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া দূরের কথা, কল্পনাও করা যায় না— মাস্টার যেন সেই ভবিষ্যতে চলে গেছেন। সুরোর বাবা তাড়াতাড়ি বলেন— 'আমি...

— 'অবশ্যই! এগোন আপনি। আমিও যাই।'

মেধাবী ছাত্রী সুরোবালা আগ্রহ সহকারে পাঠশালার পাঠ মুখস্থ করতে বসে রোজ, কিন্তু পদেপদে মা ডাকতে থাকে— 'অ সুরো, এদিকপানে আয়, মা। চট্ করে পুকুরে ডুব দিয়ে এসে ঠাকুরের বাসনগুলো বেশ ঝক্‌ঝকে করে মেজে রাখ তো। ঠাকুর্মা একটু পরেই পুজো করতে বসবেন।'

বাসন মেজে রেখে এসে আবার পড়তে বসে তো মা আবার ডাকে— 'কোতায় গেলি? তোকে বলেছি না আমি যখন রান্না করব তখন পাশে থাকবি? রোজ একপদ রান্না করলে তবে তো শিখবি। আয় রে! মাছের অম্বলটা নিজের হাতে করবি আয়।'

— 'অ সুরো ঠার্কুদা-ঠাকুর্মার মশারী খাটিয়ে দিয়ে আয়। ওনাদের খাওয়ার সময় বাতাস করলি না?'

— 'অ সুরো ঠাকুর্মার পিকদানিটা খাটের পাশে রেখে আয়। দাদুকে হুঁকো জ্বালিয়ে দিয়েছিলি তো?'

— 'রোজ রাতে শুতে গেলে ঠাকুর্মার পা টিপে দিতে বলেছি না! ওখানে গিয়ে শাশুড়ি-ঠাকুর্মা দু'জনের পা টিপতে হবে রোজ রাতে। দেখিসনি এতকাল মা'র পা আমি টিপে দিয়েছি? এখন তুই টিপে টিপে অবেবস কর। যা, ঘুমিয়ে পড়া অব্দি টিপবি। বুঝলি?'

— 'যা না মা, বাবার ধুতি-জামা ভাল করে কেচে শুকুতে দিয়ে দে না। শ্বশুরেরটা কাচতে হবে না?'

— 'ঝোল করার আগে মাছ, আলু-ফুলকপি আর বড়ি ভেজে দিতে ভুলিস না।'

— 'আজ রোববার মনে আছে? সব বিছানার চাদর, বালিশ-পাশ বালিশের খোলগুলো খুলে রাখ। ধোপানী এলে আলগোছে ফেলে দিবি। ছুঁসনি যেন। দেখিস বেশী ক্ষার যেন না ঢালে।'

— 'ভোরে নেয়ে এসে ঠাকুর পেন্নাম করার আগে ঠাকুর ঘর মুছে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়েছিলি?'

— 'কই রে, হাত-পাখাটা নিয়ে আসবি তো। ঠাকুর্দা আর বাবা খেতে বসবে যে এক্ষুণি।'

— 'অ সুরো, গোয়ালে দেখে আয় তো ধুনি জ্বালিয়ে ধোঁওয়া দেওয়া হয়েছে কিনা! মশায় কামড়াবে যে গরু বাছুরকে।'

এইভাবে পুকুরে হুটোপুটি করার সময়, ভাইবোন মিলে উঠোনে খড়ি দিয়ে দাগ টেনে এক্কাদোক্কা খেলার সময়, দুপুরে কয়েদবেল মেখে তারিয়ে তারিয়ে খাবার সুখে, বিকেলে আমগাছের ডাল থেকে লটকানো দড়ির দোলনায় দোল খাবার সময়, সকাল বিকেলে পড়া, অংক কষার সময়, সব হারিয়ে যেতে থাকে সুরোবালার জীবন থেকে মা'র ক্রমাগত ডাকের চোটে। মা'র নিজের বুক ফেটে যায় ওইটুকু মেয়েটার জীবন থেকে বাল্যের সমস্ত সুধা নিংড়ে নিতে। কিন্তু এটাই নিয়ম। মা'র মাও এমনি করেই মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির জন্য তৈরি করেছে, মা আবার বড়মেয়ে সুরবালাকে তৈরি করছে। রাত্রে সবাই শুয়ে পড়ার পর মা-মেয়ে শুতে আসে। সুরোকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মা বলে— 'তোর যে বিয়ে হয়ে গেছে সুরো। ও বাড়ির বড় বৌ তুই। তোর যে অনেক দায়িত্ব, অনেক কর্তব্য মা। আর ক'দিন পর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে পাকাপাকি থাকার জন্য। ওরা দয়া করে পাঠালে আসতে পারবি এখানে বেড়াতে, না পাঠালে আসতেও পারবি না। এখন থেকে ওটাই যে তোর বাড়ি। এটা দু'দিনের বেড়ানোর জায়গা। ওবাড়িতে সবাইকে, এমনকি গাই-বাছুরকেও যত্ন করতে হবে, সুখে-শান্তিতে রাখতে হবে যে তোকে। কেউ বকলে বা কটুকথা বললে কখনও পাল্টা কথা বলবি না। বোবা হয়ে থাকবি। ওই যে, বলে না বোবার শত্রু নেই? সত্যিই দেখবি, তুই মুখেমুখে জবাব না দিয়ে সহ্য করলে যে বকেছে তারই পরে কষ্ট হবে। ভাববে— আহাঃ, ছেলেমানুষ, কেন বকলাম তখন? দেখিস, পরে কত আদর করবে। সুরো, যে সয় সে রয়। তোকেও সইতে হবে মা। মেয়েমানুষের এটাই ধর্ম। আমরা শ্বশুরবাড়ির জন্যই জন্মাই, শ্বশুরবাড়িতেই মরি।'

দ্বীপান্বিতা পজ দেয়। বইটা উল্টে বুকের ওপর রেখে বিস্মিত ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে ওর মন। এ কি করে সম্ভব হতো? কিন্তু হতো তো বটেই! জন্মদাত্রী মা কি নিষ্ঠুর হয়ে নিজের আত্মজাকে তৈরি করতে করতে পারত শ্বশুরবাড়ির গাই-বাছুরকেও সুখে শান্তিতে রাখার জন্য? কি করে, কোন প্রাণে মেয়েকে বলতে পারত— 'ওরে, আমি শুধু তোর জন্মদেওয়া মা, তোর আসল মা তো ওই বাড়িতে। তার সঙ্গেই সারা জীবন কাটাতে হবে তোকে। আমি মারলেও যেমন একটু পরেই আবার মা-মা বলে ছুটে আসিস, সে মারলেও একটু পরে আবার মা-মা বলে ওর কাছে যাবি। তবেই না সে তোকে ভালবাসবে। আমি তোকে জন্ম দিয়েছি বাপের বাড়িতে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ে থাকার জন্য নয়। শ্বশুরবাড়ির বাগানে গোলাপ হয়ে ফুটবি বলে। তোর সুগন্ধে সংসার মাতাল হয়ে থাকবে বলে। তোকে কাজকর্ম শেখাচ্ছি শ্বশুরবাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন হয়ে সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াবি বলে। দেখিস না, নতুন বৌ ঘরে এলে শাশুড়িমা দুধে-আলতায় পা দু'খানা ধুয়ে দেয়? কেন বলতো? কারণ, নতুন বৌকে লক্ষ্মীঠাকরুন জ্ঞানে বরণ করে শাশুড়ি, তোকে তাই লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে ওবাড়িতে আজীবন। তুই কখনও হাজার রাগ অভিমান হলেও বাপের বাড়ি চলে আসার কথা মনে আনবি না। তুই চলে এলে যে ওদের সংসার লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে মা।'

আমার চবিবশ বছর বয়সে ভাস্করের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এখন আমি আঠাশ বছরের। শ্বশুরবাড়িতে চূড়ান্ত অসভ্যতার নমুনা রেখে চলে এসেছি বাপের বাড়ি। একটি দিনের জন্যও ভাবিনি ওইবাড়ির মা আমারই মা। বিয়ের আগে আমার জন্মদাত্রী মা আমাকে বলেনি কখনও— 'ওটাই এখন থেকে তোর নিজের বাড়ি দীপা। একমাত্র মা ছাড়া ভাস্করদের বাড়িতে আর তো কেউ নেই। ওর মা সারাজীবন চাকরি করে সংসার সামলেছে। এই বয়সে একটু সুখ-শান্তি-আরাম পেতে তো ইচ্ছে করতেই পারে। সেজন্যই তো লোকে ছেলের বিয়ে দেয়। তুই ভদ্রমহিলাকে শান্তিতে রাখলে তোর বরও খুশি থাকবে, সংসারও সুখের হবে।'— মা আমাকে বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ি আর শাশুড়িকে ছোবল মারার জন্য শুধু বিষ দিয়ে দিয়ে বিষকন্যা বানিয়ে পাঠিয়েছিল ওদের সুখের সংসারটাকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেবার জন্য। আমার নিজস্ব সততাটুকুও আমার মা গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে বিষবৃক্ষ রোপণ করে দিয়েছিল। আমি অতবড় মেয়ে হয়েও বুঝতে পারিনি, মা আমার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। মা'কে বিশ্বাস করে কতবড় ভুল করেছি, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সুরবালার মা সুরোকে শ্বশুরবাড়ির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য মগজ ধোলাই করত আর আমার মা শাশুড়িকে অত্যাচার করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মগজ ধোলাই করত— আমাকে আবার নতুন করে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে হবে। এখন বুঝতে পারছি, বাবা বেছে বেছে কেন ঠাকুর্মার বিয়েতে পাওয়া উপহার এই বইটা আমাকে পড়তে দিয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়

'সুরবালা দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে বড় হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিবাহের

সময়ও নির্ধারণ হল। সুরোর মা এখন রাঁধতে-বাড়তে, শুতে-বসতে কাঁদে। প্রথম সন্তান বেশি কাছের হয়। তাছাড়া ও বড় বাধ্য মেয়ে। পাঁচটি বছর নির্বিবাদে কথা শুনে চলেছে, কাজকর্ম, সেলাইবোনাই শিখেছে। এবার যাদের ধন তাদের ফিরিয়ে দেবার সময় এসেছে। তাই কাঁদে সুরোর মা।

দ্বিতীয় বিবাহ সাধারণত জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কুটুমদের নিয়ে সম্পন্ন করা হয়। গাঁশুদ্ধু নিমন্ত্রণ দ্বিতীয়বারে আর হয় না। জামাতা বংকুবিহারী এন্ট্রান্স পাশ দিয়ে এখন কলেজে পড়ছেন। এখন দু'জনেই পূর্ণবয়স্ক। চোদ্দ বছরের সুরবালার হৃদয়ে সুদর্শন স্বামী শ্রীযুক্ত বংকুবিহারীকে দেখামাত্র প্রেমের পদ্মটি পাঁপড়ি মেলেছে। ওপর দিকে বংকুবিহারীও কলিকাতার মেসবাড়িতে বিবাহিত বন্ধুদের নিকট থেকে নবদম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পর্কিত তথ্যাদি জেনে এইসময় পরিপক্ক হয়েছে। সুরবালা নামক রূপসী স্ত্রীকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার আগ্রহে এখন তার প্রতীক্ষা।

দ্বিতীয় বিবাহে মাস্টারমশাই সুখদারঞ্জন বিনা নিমন্ত্রণেই এসে জামাতাকে আশীর্বাদ করলেন এবং প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে সুরবালার মেধা, জামাতা নিজে যেন সুরবালার শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেমন মনোভাব, জামাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিদেশী শাসকদের শাসনের প্রতিক্রিয়া কেমন— ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করে খুশি খুশি মুখে বিদায় নিলেন। সুরোর এই শিক্ষিত স্বামীটির বুকের জমিতে স্বদেশপ্রেম আর নারীশিক্ষার প্রয়োজনের মূল্যবান দুটি বীজ বপন করা বড়ই দরকার ছিল। সফল হয়েছে অনাহুত হয়েও তাঁর চলে আসা। জামাতা নিজে যত্নবান হবেন সুরোর লেখাপড়ার বিষয়ে। কথা দিয়েছেন।'

'সুরবালার সংসার' পেজমার্কার গুঁজে একবার শুধু খেতে গেল দীপা। বাবা হাসি হাসি মুখে বলে— 'মনে হচ্ছে তুই আজই শেষ করবি বইটা! যে ভাবে কুইকফিক্সের মতো সেঁটে গেছিস ভোর হবার আগেই শেষ হয়ে যাবে। বেশি মোটা নয় তো ওটা। তোর নিজের জন্য দরকারি অংশটা এতক্ষণে পড়া হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। ঠিক কিনা?

দীপা নীরবে বসে খেতে থাকে মাথা নত করে। বাবার কথার উত্তর দিতেও মন যেন চায় না। বাবাই আবার বলে— 'ভাবছিস তো? ভাব দীপা, খুব মন দিয়ে পড় আর ভাব। ভাবতে ভাবতে একসময় উত্তর পেয়ে যাবি।'

দীপা এবার মুখ তুলে বাবার দিকে তাকায়। কি বিষণ্ণ মুখ মেয়ের! শশাঙ্কর বুক মুচড়ে ওঠে। দীপা বলে— 'হ্যাঁ বাবা, আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ! তুমি বইটা জোর করে না ধরালে ভাববার অবসরই তো ছিল না। তুমি বলেছিলে— পড়ে তো দ্যাখ! হয়ত জীবনটাই বদলে যাবে। ঠিক বলেছ তুমি। আমার যা ভাবার ভেবে নিয়েছি। সিদ্ধান্তও নিতে পেরেছি। জীবনটা এবারে ঠিক পথে বদলে যাবে বাবা। আর তোমার চিন্তার কারণ

নেই।'

✪ ✪ ✪

— 'হ্যাঁরে ভিকি! আজও যাবার সময় পাসনি বলে দে! একটা ফোন করারও কি সময় হয় না তোর?' রাজশ্রী প্রতিদিন ছেলেকে স্মরণ করিয়ে দেন দীপাকে ফোন করতে, একবার ওবাড়ি যেতে, কিন্তু জেদী ছেলে ছলছুতোয় নিজেও এড়িয়ে যায় আর মাকেও মাথার দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে রেখেছে মা যেন নিজে ফোনও না করে, ওবাড়িতেও না যায়।

ভিকি জুতো খুলতে খুলতে বলে— 'রোজ এক কথা বল কেন? বুঝতেই পারছ আমি গায়ে পড়ে যোগাযোগ করব না। এতে ওকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। নিজে যেদিন বুঝবে কতটা অপরাধ করেছে, সেদিন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যদি এসে ক্ষমা চায় তখন ক্ষমা করো মা। আগবাড়িয়ে কিছু করতে যেও না। ওর মতো মেয়েরা তোমার বা আমার মহত্বের মূল্য দেবে না। আগবাড়িয়ে ক্ষমা পাওয়া ওর বার্থরাইট বলে মনে করবে। এবং প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠে এরপর তোমার গায়ে হাত তুলবে। গত চার বছর ধরে যতবার ও ইতরের মতো ব্যবহার করেছে, ততবারই আমি ওকে শাসন করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি শুধু তোমার জন্য। তুমি অপমানিত হয়েছ আর তুমিই ক্ষমা করে করে ওকে বাড়িয়েছ। এবার সেটা আর হবে না মা। আমি হতে দেব না।'

রাজশ্রী তবুও প্রতিবাদ করেন— 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ির একমাত্র বৌ দু'মাস ধরে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকলে লোকে আমাদেরই সন্দেহ করবে, দোষ দেবে। এদিকটা ভেবেছিস? বলবে, শাশুড়ি বৌকে মানিয়ে নিতে পারেনি। কিংবা বলবে, ওই ভাস্কর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। এখনকার যুগটাই তো বৌদের খারাপ পথে যেতে অনুপ্রাণিত করছে। তার সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে জুটেছে একপেশে আইন-কানুন। বধূ যে আমাদের ওপরে নির্যাতন করে চলেছে সেসব কেউ বিশ্বাস করবে না। উল্টে বধূ নির্যাতনের ফাঁসে আমরাই আটকে যাবো। এসব ভেবেই সব অত্যাচার সহ্য করি, ওকে ফিরিয়ে আনতে বলি।'

ভিকি ঈষৎ হাসি মুখ করে বলে— 'অত সোজা নয় মা! ওকে এসব কথা প্রমাণ করতে হবে যা ও কখনোই করতে পারবে না। গীতাপিসি আর সোমাদি ঠাকুর্মার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। ওরা কাজের লোক নেই আর। এই পরিবারের আপনজন হয়ে গেছে। গীতাপিসি আমার ছোটবেলায় এবাড়ি ঝাড়ুপোছা করতে ঢুকেছিল। বুড়ি হয়ে সববাড়ি ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারেনি। কষ্ট হয়, তবুও মায়ায় বাঁধা পড়ে আছে বলে আসে এখনও। সোমাদি অনেক পরে এলেও প্রায় চোদ্দ বছর তো ওরও হল। ওরা সব দেখে, সব জানে মা। তোমার বৌমাটি ওদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করেনি।— 'কাজের লোক কাজের লোকের মতো থাকবে'— এসব ডায়লগ ওরা ভুলে যাবে না — বুঝেছ! ঠাকুমা কখনও যা বলেনি, তুমি

তো বলনি, সেসব মর্মে আঘাত দেওয়া কথা ওদের আদরের ভিকির বৌ শুনিয়েছে ওদেরকে। তাছাড়া ওকে নিয়ে আমি তিনটে বাঁধা হোটেলে লাঞ্চ বা ডিনার করতে যেতাম। তুমিও কখনও কখনও সঙ্গে থেকেছ। এখনও বাইরের কোনও ডেলিগেট এলে লাঞ্চ করাতে ওই তিনটে হোটেলের যে কোনও একটাতেই নিয়ে যাই। ফ্লোর ম্যানেজার থেকে সার্ভিং বয়রা সবাই আমাকে ভাল করে চেনে। যে গেস্ট তার বৌকে নিয়ে, কখনও বৌ এবং মাকে একসঙ্গে নিয়ে এত কাল ধরে একটা বিশেষ নম্বরের টেবিল রিজার্ভ করে খেয়েছে, যার সঙ্গে ওর বৌ ছাড়া অন্য কোনও
সঙ্গিনীকে আজও অবধি দেখল না— তারাও দরকারে মুখ খুলবে মা। ... ওসব ফালতু ভয় ছেড়ে দাও তো! অন্যায় আমরা করিনি যে ভয়ে ভয়ে পায়ে ধরে ওকে আনতে চলে যাব। যে অন্যায় করেছে ভয় সে পাক।'

ভিকি যা বলল, সবই মানেন রাজশ্রী, তবুও মন কেমন করে একমাত্র ছেলেটার এইটুকু বয়সে বিবাহিত জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে দেখে। উনি জোড়াতাপ্পি মেরে রিপু করে যেভাবেই হোক চালাতে চান, কিন্তু ছেলে ছেঁড়া-ফাটা জীবন চায় না। সম্পূর্ণ নিটোল জীবনের প্রত্যাশী সে। দীপা যদি বদলে যেত কোনও মিরাকল দ্বারা? শশাঙ্কবাবুর মতো পারফেক্ট জেনটেলম্যান যদি মেয়েকে বুঝিয়ে, শাসন করে, কঠোর হয়ে বলতে পারতেন— 'তোমার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা আমি এ্যাপ্রিসিয়েট করছি না। তুমি ওখানে ফিরে যাও।' তাহলে ভাল হত। এইসব নানা 'যদি'র জালে আটকে পড়ে ছেলের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের দুর্ভাবনায় আজকাল 'সুরক্ষার প্রয়াস'-এর অফিস ফাইল দেখতে, সই করতে ভুলে যান। বৃদ্ধাশ্রমের বাজেটে হিসেবের গরমিল করে বসেন। আজিজুলের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সব ভুলভাল। আবার নতুন করে করতে হয়। রান্না করার সময়ও প্রায় তারই বয়সী গীতার চোখ খোলা থাকে বলে পোস্ত ভেবে বাটিতে সুজি ঢেলে বাটতে দিয়েও রক্ষা পান। দীপার মুণ্ডুপাত করতে করতে গীতা নিজেই সুজি ঢেলে রেখে পোস্ত বের করে বটে। বাটার তালে তালে মুখও চলতে থাকে— 'অসভ্য মেয়ে! আমরা পর, ঝিয়ের কাজ করি, ঝিয়ের মতো থাকতে হবে? এ্যাঁ! এতবড় আসপদ্দা? যার বাড়িঘর সে সারাজীবন আদর করে ধরে রাখল বলে সববাড়ির কাজ ছেড়ে বুড়ো বয়সেও তার পায়ের তলায় ঠাঁই নিয়ে পড়ে রইলুম। — আসতে হবে না তোকে। বৌদি আর ভিকিকে আগেও আমরাই দেখেছি, এখনও যতদিন বেঁচে থাকব আমরাই দেখব। বৌদির মাথাটাই খারাপ করে দিচ্ছে? পোস্ত ভেবে সুজি দিচ্ছে, চিনি ভেবে নুন দিচ্ছে। কি হবে ভগবান? আমাদের ভিকির মতো সোনার টুকরো ছেলের কপালে তুমি একটা গোখরো সাপ গছালে?'

সোমার ইস্তিরী করা শেষ। কিচেনে স্ব-ইচ্ছেতেই কাকিমাকে বাড়তি সাহায্য করে রোজ। গীতার উদ্দেশ্যে বলল— 'অত ভেবো না পিসি। আমি তো অনেক ফ্ল্যাটে-বাড়িতে যাই, লক্ষ্য রাখছি সব মেয়েগুলোর ওপর। ভাল একখানা পেলেই ভিকিদাদার সঙ্গে রেজিসটিরি করিয়ে দেব। দীপা বৌদি তখন পস্তাবে। বেশ হবে।'

রাজশ্রী বকুনি লাগাল এবার— 'তোরা থামবি? কিছু বুঝিস না জানিস না শুধু কচকচ্ করা।'

সোমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়— 'খুব বুঝি। তোমার মতো মানুষের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে নিজের চোখে দেখেছি। খুব পাজি। পাজি বৌ কত দেখলাম, তাবলে ওর মতো আর একটিও নেই।'

✪ ✪ ✪

'সুরবালার সংসার' শেষ হল রাত দেড়টার সময়। বই শেষ হল, কিন্তু সুরবালা নাম্নী উপন্যাসের নায়িকা যেন জীবন্ত হয়ে দীপার চোখের সামনে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। সে যেন দীপাকে বলতে লাগল— 'এ তুমি কি করেছ গো মেয়ে? এমন সুখ পায়ে দলে যদি বাপের বাড়িতেই থাকবে তাহলে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলে কেন? তোমাদের এই যুগে মেয়েদের কত স্বাধীনতা। বলে দিলেই পারতে বিয়ে করবে না। শ্বশুরবাড়ি পরের বাড়ি, সেখানে পরকে আপন করা পোষাবে না। কেউ তো তোমাদের জোর করে বিয়ে দিতে পারে না বাপু! আমাদের সময়ে মতামত কেউ জানতেও চাইত না, আর মতামত দেবার বয়সও হতো না। তার আগেই পরের বাড়ি চলে আসতে হতো, পরকে আপন করে সুখে-দুঃখে এক সঙ্গে সারাজীবন কাটাবো বলে। আমাদের ছিল শক্ত গিঁটে ধরে রাখা, আর তোমাদের হল পল্‌কা গেরোয় ছেড়ে দেওয়া। কি পেলে গো মেয়ে? কি লাভ হল তোমার ওমন চমৎকার স্বামী-শাশুড়িকে হেনস্থা করে? আজ আমার ভাবতে লজ্জা করছে, সুখদারঞ্জন মাস্টারমশাইয়ের আদর্শে দীক্ষা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বৌমানুষ হয়ে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য একরকম যুদ্ধই করেছিলাম সমাজপতিদের বিরুদ্ধে গিয়ে। একশো বছর পরে শিক্ষিত মেয়েরা আমার মুখে চুনকালি লেপে দেবে ভাবতেও পারিনি। আগে জানলে তোমার মতো শিক্ষিত নারী তৈরি করতে যেতুমই না।'

সুরো যেন দীপার ভেতরে ঢুকে পড়ে ছটফট করছে বেরিয়ে যাবার জন্য। বলছে, — 'উঃ! কি পচা গলিত শব তোমরা! কি ভয়ানক পুঁতিগন্ধময় হৃদয়। আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ বলে দাও। আমি তোমার নরক চেতনায় থাকতে পারছি না। বিশুদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে দাও আমাকে।'

দীপার গলা শুকিয়ে কাঠ। জল খাবার জন্য দালানে এসে দেখে বাবা ডাইনিং টেবিলে বসে বই পড়ছে। আশ্চর্য হয়ে বলে— 'তুমি ঘুমোওনি? এতরাত অব্দি জেগে বই পড়ছ?'

শশাঙ্ক হেসে বলেন— 'কেন? তুইও তো পড়ছিলি?'

জলটা ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে দীপা বলল—' আজ রাতে শেষ

করব বলেছিলাম তো! প্রায় একশো বছরের বেশি আগের সময় নিয়ে লেখা গল্প। সাধারণ গ্রামীণ মানুষদের নিয়ে কি বলিষ্ঠ চরিত্র চিত্রন। সুরোর মা, বংকুবিহারী, বংকুর বোন দুর্গার মেয়ে রাইকিশোরী, সুরোর শাশুড়ি কাত্যায়নীদেবী, সুখদারঞ্জন, সর্বপোরি সুরবালা। বাবা, আমি খুব মেরিটরিয়াস ছাত্রী নই, বেশি পড়তামও না, নেহাৎ পরীক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু দরকার ততটুকু ছাড়া। তবুও যাই হোক, বাংলায় এম এ-টা পাশ তো করেছিলাম! এই অসাধারণ লেখিকা সুকুমারী দেবীর উল্লেখ কোথাও পাইনি। এসব বই বাংলার সিলেবাসে রাখা উচিত কলেজে। অনার্সে নয়। ক'জন আর অনার্স নিয়ে পড়ে? পাশকোর্সে রাখলে মেয়েরা হয়ত অন্যরকম ভাবতে শিখতো।'

শশাঙ্ক নিজের বইটা বন্ধ করে দু'হাতের চোটোয় থুতনি রেখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন— 'তুই বল! আমার শুনতে ভাল লাগছে।'

দীপা আমতা আমতা করে বলে— 'আমি আর কি বলব? তুমি চোদ্দ বছর বয়স থেকে এটা পড়েছ। তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে। .... আগেকার দিনের লোকেদের কথা দিলে কথা রাখার প্রবণতা ছিল, এখন আমরা যা করছি না প্রায়। কবে বংকু মাস্টার সুখদারঞ্জনকে কথা দিয়েছিল সুরবালাকে যতটা সম্ভব পড়াবে, সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। বংকুর তখন কতটুকই বা বয়স? কিন্তু ভুলে যায়নি মাস্টারমশাইকে দেওয়া কথা। সুরবালা কোনওদিন পরীক্ষায় বসতে পারেনি, কিন্তু বি এ ক্লাশের পড়া অব্দি তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল বংকু।'

দীপা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। শশাঙ্ক হাসির কোনও কারণ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল— 'কি হল, হাসছিস কেন?'

হাসি থামিয়ে দীপা বলে— 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ স্বামী রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়া মিটলে স্ত্রীকে পড়াতে বসেছে বি এ ক্লাশের ইংরেজীর পাঠ। সুরবালা তখন চতুর্থ সন্তানের জননী হতে চলেছে। বংকু যত টেনিসন বোঝায়, আটমাসের গর্ভবতী সুরোর গর্ভের সন্তান পেটের ভেতর পা তুলে টেনিস বলে জোরে লাথি মারে ফুটবলের মতো। মা ঘুমোলে সেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। তা নয়, বাপ এখন টেনিসন পড়াতে বসল!— বংকু আর সুরো যেন মেড ফর ইচ আদার ছিল— তাই না বাবা? যা কিছু করেছে দু'জনে মিলে করেছে। কি দারুণ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, কি আস্থা পরস্পরের প্রতি। বাল্যবিধবা ভাগ্নী রাইকিশোরীর বিয়ের ব্যবস্থা করে সমাজপতিদের দ্বারা একঘরে করার ষড়যন্ত্র বানচাল করা থেকে শুরু করে বিদেশী দ্রব্যে আগুন লাগিয়ে ইংরেজের কর্মচারী নেটিভ বাঙালী পুলিশের লাঠির বাড়ি দু'জনে একসঙ্গেই খেয়েছে। সুখদামাস্টার শুধু দেখে যেতে পারেননি তাঁর প্রিয় ছাত্রী সুরবালা টেনিসন পড়ছে। অতিপ্রিয় রেশমী কাঁচের চুড়ি, বিদেশী শাড়ি, প্রসাধন সামগ্রী আগুনে পোড়াচ্ছে। রাজদ্রোহের অপরাধে বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশ। আর খোঁজ পাওয়া গেল না।'— দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে দীপার নাক দিয়ে। বাবা-মেয়ে কেউ সময়ের হিসাব রাখে না। ঘড়ি দেখে না। ওরা দু'জনেই সেইযুগে, সেই সময়ে হারিয়ে গেছে। শশাঙ্ক কেমন যেন আত্মগত গলায় বলেন— 'থামিস না। বল, আরও বল। শুনি আমি।'

— সুরবালার মা আর শাশুড়ি কাকে যে বেশি নম্বর দেব, বেশি শ্রদ্ধা করব বুঝতেই পারলাম না বাবা। মা যেমন করে শ্বশুরবাড়ির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তৈরি করেছিল, শাশুড়ি কাত্যায়নী নিজে নিরক্ষর হয়ে সেই যুগে পুত্রবধূকে লেখাপড়া করার সুযোগ দিয়েছে। সেই সময়ে নাকি কলম ধরলে মেয়েদের পাপ হত, আর কাগজে লিখে ফেল্লে তো মহাপাপ। কাত্যায়নী সমাজের চোখের আড়ালে বন্ধ ঘরে বৌকে লিখতে বলেছেন। দু'জনের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ ছিল। দরজা খোলার আগে শাশুড়ি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করত। বৌ বুঝতে পারত প্রতিবেশী কোনও মহিলা বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন।— তারপর সেই 'স্বদেশী পরো, বিদেশী ছাড়ো'র সময়টাতে তোমার মনে আছে বাবা, কাত্যায়নী সুরোর নাক অব্দি টানা ঘোমটাটা মাথার মাঝখানে এনে দিয়ে বলল— 'এত লম্বা ঘোমটা টেনে বাড়ির অন্দমহলের ভেতরে থেকে তুমি স্বদেশের কাজ করবে বড়বৌমা? তোমাকে যে বংকুর হাতে হাত রেখে পথে পথে, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতে হবে মা। স্ত্রীশিক্ষাও তোমাকেই দিতে হবে। স্বদেশীর মন্ত্রও মেয়েদের কানে তোমাকেই শোনাতে হবে। ঘুমন্ত গ্রামটাকে জাগাতে হবে তোমায়।

ঘোমটায় চোখ ঢাকা থাকলে দেখবে কি করে আর অন্যকেই বা পথ দেখাবে কি করে? তোমার মাথার ওপরে বংকু আছে, তার ওপরে শ্বশুর আছেন, তার ওপরে আকাশে চন্দ্র-সূর্য আছে। এখন আর অত লম্বা ঘোমটার সময় নয়। এখন কোমরে আঁচল বাঁধার সময় বৌমা।'

শশাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন— 'এই পাব্ আর ডিস্কোথেকের কালচারের যুগে এসব বই কেউ পড়বে না রে! এই উপন্যাসটা আমার ওয়ান অফ দ্যা বেস্ট ভাললাগা উপন্যাস ছিল বরাবর। তাই তোকে জোর করেছিলাম পড়ার জন্য। তোরও যে এতটাই ভাল লাগবে এযুগের মেয়ে হয়ে ভাবতে পারিনি। জানিস, সুকুমারী দেবীর জন্য আমার দুঃখ হয়। এ যুগে জন্মালে ওর নাম-যশ হতো। পুরস্কৃত হতেন অনবদ্য লেখার জন্য। সে যুগে তো অতশত ব্যাপার ছিল না, তাই কেউ চেনে না। অনামী হয়ে রইলেন।'

দীপা মাথা নীচু করে ধীরে গলায় বলে— 'না বাবা। মরণোত্তর হলেও উনি পুরস্কৃত হলেন। আমার মতো অসভ্য, ইতর একটা মেয়ের খোল-নলচে বদলে মানুষ করে দিলেন উনি ওঁর বইয়ের মাধ্যমে। এ কি ওঁর কম বড় পুরস্কার? ওঁর বিদেহী আত্মাকে আমি প্রণাম জানাই আমার অন্ধ চোখে আলো দেবার জন্য। তোমাকেও প্রণাম বাবা। তুমি জেনেশুনেই বাধ্য করেছিলে বইটা পড়তে। চোদ্দ বছরের বালিকা সকালবেলা বাড়ির সব গুরুজনদের প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে দিন শুরু করত। আর আমি শাশুড়ির তৈরি বেড-টি খেয়ে বেলা ন'টা অব্দি বিছানায় জেগে জেগে গড়াগড়ি খেতাম। ন'টায় উঠে ব্রাশটাশ করে টিভি খুলে বসতাম। শাশুড়ি ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেতেন। — তুমি তো জানো না বাবা, আমি কি কি করেছি আমার শাশুড়ির সঙ্গে। সব শুনলে ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে তোমার। ভাববে— এমন একটা কালনাগিনীকে কেন জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলোনি। ওনাকে আমি আমার ডিপেণ্ডেন্ট বলেছি। বলেছি, ডিপেণ্ডেন্টরা তো সর্বত্রই বাড়ির কাজ করে, তোয়াজ করে চলে, হুকুম তামিল করে। উনিও সেরকমই করবেন।'

শশাঙ্ক ফ্যাকাশে মুখে দু-আঙুল দুটো কানের গর্তে ঢুকিয়ে বলেন, — 'না, না। আমি শুনতে চাই না। তুই থাম। আমার.... আমার মেয়ে.... ছিঃ ছিঃ... শুনবো না।

দীপা ধীর কণ্ঠে বলে— 'না বাবা। শুনতে তোমাকে হবেই। তোমার মেয়ে কতটা নীচে নেমেছিল, কি কদর্য দুর্ব্যবহার করেছে, ওই নিরপরাধ ভাল মানুষ মহিলাকে কি অত্যাচার, কি অপমান করেছে চার বছর ধরে— সব শুনতে হবে। বাবা, উনি নীরবে নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন আমার আর ভিকির সুখের কথা ভেবে। একটি দিনের জন্যও প্রতিবাদ করেননি। কখনও বলেননি— আমি তোমার ডিপেণ্ডেন্ট নই। আজও আমার পেনশনের টাকায় খরচ চলে। সোওয়া লাখ টাকা মাইনের ছেলের

কাছ থেকে সংসার খরচ বলে একটি পয়সাও আমি নিই না। আমি তো এত খারাপ মেয়ে ছিলাম না বাবা! কেন এত নীচে নামলাম? কেমন করে নামলাম? ভিকির বিদূষী মাকে টেনে পাঁকে নামাবার চেষ্টা করেছি। উনি পাঁকে নামা তো দূরের কথা, বারবার আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে নিজেকে আরও আরও ওপরে তুলে নিলেন। ভিকি প্রতিবাদ করত, এমনকি না পোষালে ডিভোর্স দিয়ে দিতেও বলেছে। কিন্তু যার ওপরে আমার জ্বালা সেই মহিয়সী মহিলা একটা কটু কথাও কখনও বলেননি। ভিকিকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। সব সমস্যা ওই নির্বিরোধী, সহনশীল শাশুড়িকে নিয়ে, যিনি আমার এত অপমান, অত্যাচার সয়েও আমাকেই সুখে রাখার প্রচেষ্টায় দিনপাত করেছেন। ভিকিকেই বলেছেন, ও মা'র হয়ে আমাকে কটুকথা বলতো বলে।'

'তোমাকে আমি জোর করে সব শোনালাম বাবা। এ আমার অপরাধের স্বীকারোক্তি। হাজার হলেও আমি তোমার একমাত্র মেয়ে। আমার ওপর দুর্বলতা থাকবেই তোমার, এটাই স্বাভাবিক। হয়ত কখনও তোমার মনে হতেও পারে যে, ভিকির মা এবং ভিকি আমাকে কিছু না কিছু আঘাত করেছে, মানসিক কষ্ট দিয়েছে তাই আমি চলে এসেছি। সেটা যে সত্যি নয় আমার নিজের মুখ থেকে আমার কীর্তিকলাপ না শুনলে তুমি কি করে সন্দেহমুক্ত হবে বল? তাই তোমাকে আসল সত্য কথাগুলো জানালাম, যাতে কল্যাণী চ্যাটার্জী আমার শাশুড়ি আর ভিকির নামে তোমার কাছে গুছিয়ে বদনাম না করতে পারে। বাবা, চোদ্দ বছরের সুরো অতবড় বিশাল পরিবারে বড়বৌ হয়ে এসে প্রত্যেককে আপন করে নিতে পেরেছিল, এমনকি গাই-বাছুর, হাঁস-ময়না পাখিটাকেও। আর আমি চবিবশ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, নিজের মুরোদের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী-শাশুড়ি পেয়ে ওই ছোট পরিবারটাকে আপন করতে পারিনি। কেন জানো? কারণ, সুরোর মা ওকে দিয়ে তপস্যা করিয়ে নিয়েছিল শ্বশুরবাড়িকে আপন করার শিক্ষায়। আর কল্যাণী চ্যাটার্জী তোমার আড়ালে চবিবশ বছরের এম এ পাশ মেয়ের মগজ ধোলাই করেছিল ভিকির মা'র বিরুদ্ধে কানে বিষমন্ত্র দিয়ে দিয়ে। রোজ বলতো— 'বিয়েটা হয়ে গেলেই তোর প্রথম কাজ হবে ওই শাশুড়িটাকে আগে জব্দ করা। এমন করে মানসিক অত্যাচার করবি, যাতে মেয়েছেলেটা ওর নিজের খোঁড়া কবরে গিয়ে ঢোকে। ওই যে বৃদ্ধাশ্রম বানিয়ে সমাজে নাম কিনছে, ওই বৃদ্ধাশ্রমেই যাতে চলে যায় সেটাই হবে তোর প্রথম ব্রত পালন। ও চলে গেলে তোর এসি বাড়িতে গরমকালটা আমি গিয়ে থাকব ঠাণ্ডা আরামে।'— আমাকে ক্ষমা করো বাবা, ওই মহিলাকে আর কোনওদিন আমি মা বলে হয়ত ডাকতে পারব না। সুরোর মা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, গর্ভে ধারণ করে কষ্ট করে জন্মটা দিয়ে দিলেই মা হওয়া যায় না। মা হওয়া বড় কঠিন কাজ, যা কল্যাণী চ্যাটার্জী হতে পারেনি। সে যুগের বাল্যবিবাহকে সাপোর্ট করা যায় না, কিন্তু মায়েদের শিক্ষা-সংস্কার অনবদ্য যা আমার মা'র নেই। এযুগে আদৌ কোনও মা প্রকৃত সৎশিক্ষা দেয় কিনা জানি না। ভোরে যান চলাচল শুরু হলেই আমি আমার বাড়িতে মা আর ভিকির কাছে ফিরে যাব। আমার সমস্ত অন্যায় অপরাধ স্বীকার করে মা'র পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলব— 'আমি ভুল করেছি। তুমি তো আমার মা! মেয়ের ভুল ক্ষমা করে দাও প্লীজ! আর এরকম ভুল এজীবনে কখনও হবে না, কথা দিচ্ছি।'— আমি জানি উনি ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষা করেই আছেন। মুশকিল হবে ভিকিকে বোঝাতে। ও আমার যে রূপ দেখেছে, সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না।— বাবা, তুমি এই বইটা আমাকে নিয়ে যেতে দেবে? আমি এটা ওকে পড়ে শোনাবো। বলব— 'এই বইটা আমাকে বদলে দিয়েছে ভিকি। ছোট্ট মেয়ে সুরবালা আমার ভেতরের সমস্ত অশুভ চেতনাকে ধুয়ে শুভ করেছে। আমি তোমার বিলাসিত জীবনে ফিরে আসবো এই মন নিয়ে আসিনি। মা আর তোমাকে আপন করে নেবার জন্য পবিত্র মন নিয়ে এসেছি। শুধু একটা সুযোগ দাও নিজেকে প্রমাণিত করার জন্য।'— বাপের বাড়িতে আর কখনও আসব না আমি। বাবা, তুমি যেও আমাদের কাছে। দেখে এসো, তোমার দীপা ভুল করে তোমার উঁচু মাথাটা নত করে দিয়েছিল, সেই দীপাই তোমার মাথা অনেক উঁচু করে দিতে পেরেছে এবার। প্রমিস!'

— 'যা মা, নিজের ঘরে ফিরে যা। আমি বাবা হয়ে বলছি, সত্যিই আর বিষ গিলতে এখানে তুই আসিস না। আশীর্বাদ করি আর কোনও দিন যেন ভুল করেও ভুল করিস না। ওদের সুখী কর দীপা।'

বিশ্বের প্রথম সাইনবোর্ড।

ধোলাবিরা

সৌমেন নিয়োগী

ইতিহাসের সিন্ধু সভ্যতার বৃত্তান্ত ও তার উন্নত মানের নাগরিক সভ্যতার ব্যাপারে যখন থেকে জেনেছি, মনের কোণে ছিল এক সুপ্ত বাসনা, সেই সুদূর অতীতের স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে চাক্ষুষ দেখার। বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার প্রথম কেন্দ্র মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পা যেখানে এখন যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই সেই হরপ্পার সমসাময়িক যুগের প্রত্ন-নিদর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র 'ধোলাবিরা' সম্বন্ধে যখন আমরা অবগত হই, তখন ইচ্ছে আরও দ্রুতভাবে ত্বরান্বিত হয়, কখন কবে ও কিভাবে সেই হরপ্পার নগর সভ্যতার সময়কার স্মৃতি বিজড়িত ধোলাবিরাকে দেখতে যাব।

'ধোলাবিরা' যাবার পরিকল্পনা করেন আমার এক কাকা প্রদীপ চক্রবর্তী, যিনি ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর দৌলতে আমরা গুজরাটে কচ্ছের রণ এলাকার প্রবেশদ্বার গান্ধীধামে পৌঁছাই এবং অত্যন্ত সুব্যবস্থাপনায় আমরা ভূজের সাংসদ মাননীয় পুষ্পদাম গাডবীর-এর অতিথি হিসাবে ধোলাবিরায় পৌঁছাই। ধোলাবিরার অবস্থান গ্রেট রণ অফ কচ্ছের মধ্যে, যা একটি লবণাক্ত মরুভূমি। যেদিকে তাকাই ধূ-ধূ করছে শুধু মাইলের পর মাইল সাদা লবন, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় পাহাড় ছাড়া এ হেন দিগন্ত বিস্তৃত শ্বেত শুভ্রতা দেখে। এ মরীচিকা নয়, ঘোরভাবে বাস্তব, এক লবনাক্ত মরুভূমি। 'গ্রেট রণ অফ কচ্ছ', যা পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশকে ভারতের সঙ্গে পৃথক করেছে। তাই ধোলাবিরার রাস্তা ভারতের একদম সীমান্তবর্তী এলাকা, কিছুটা এগোলেই আন্তর্জাতিক সীমারেখা। এখানকার ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম। বর্ষায় প্লাবিত হওয়া জল বাষ্পীকরণের পদ্ধতিতে মাইলের পর মাইল লবনের কেলাস উৎপন্ন করে। এককালে আধুনিক রাস্তা নির্মাণের আগে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন

পশ্চিম দিকের জলাধার, ধোলাবিরা।

ছিল তা অনুভব করলাম মাটিতে পা রাখা মাত্রই। দেখতে কঠিন সমতল মনে হলেও দেহের চাপ ধারণ ক্ষমতা একদমই নেই। যার ফলে পা-গুলি সঙ্গে সঙ্গে কোনও পঙ্কজ জলাভূমির প্রবেশের ন্যায় ভস করে ঢুকে গেল। এই মরুভূমির বিশেষ আকর্ষণ হল, 'এশিয়াটিক ওয়াইল্ড এ্যাস', যা অবশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু দেখতে পাই ফ্লেমিংগোর দল ও কৃষ্ণসার হরিণের। গান্ধীধাম থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা যখন প্রখর রোদ্দুরকে উপেক্ষা করে ধোলাবিরায় পৌঁছাই তখন মনে হল স্বপ্ন যেন বাস্তব। আমরা যখন ইতিহাসে পড়েছি, তখন শুধুমাত্র সিন্ধু নদীর অববাহিকায় অবস্থিত মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পা সম্বন্ধে জেনেছিলাম। পরবর্তীকালে গবেষণা ও খননের দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, বৈদিক সরস্বতী নদীকে নিয়ে যে 'সপ্তসিন্ধুর' কথা ঋকবেদে উল্লেখ আছে তাদের অববাহিকাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন সুউচ্চ এক নগর ভিত্তিক সভ্যতা, যার ব্যাপ্তি ছিল সেই সুদূর ইরান সীমান্ত থেকে শুরু করে ভারত ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়। খনন ও গবেষণার দ্বারা এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত স্থানের সংখ্যা ২০০০-এরও বেশি, যার মধ্যে ধোলাবিরা একটি অন্যতম কেন্দ্র। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ স্থানের খনন ও গবেষণা শুরু হয় ১৯৫০ সালের পর থেকে। যার ফলস্বরূপ ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে এই হরপ্পা নগরী ধোলাবিরা প্রথম আবিষ্কার করেন জগৎপতি যোশী। তথাপি এ এস আই (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া)-এর খনন শুরু হয় ১৯৯০ সালে ডঃ আর এস বিস্টের তত্ত্বাবধানে। যার ফলে উন্মুক্ত হয় হরপ্পা যুগের এই ঐতিহাসিক প্রত্ন নিদর্শন কেন্দ্র 'ধোলাবিরা'।

গুজরাটের কচ্ছের গ্রেট রাণের মধ্যে একটি পৃথক দ্বীপ 'খাদীরের' কোণ বরাবর অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম হল ধোলাবিরা। এটি কচ্ছ জেলার 'ভাচাও' তালুকের অন্তর্গত একটি স্থান। এই প্রাচীন স্থানটি 'কোডাটা' অর্থাৎ বৃহৎ দুর্গ, যা আনুমানিক একশ হেক্টর জায়গা নিয়ে, প্রায় অর্ধেকেরও বেশী সুপরিখা দ্বারা সুরক্ষিত একটি হরপ্পা নগরী। এই কেন্দ্রটি উত্তরে 'মনসার' ও দক্ষিণে 'মনহার' দুটি ঋতুবৃত্তিক নালা বা নদীর দ্বারা আবৃত।

১৯৯০ সালের পর থেকে খনন কাজের উৎকর্ষতায় ধীরে ধীরে ধোলাবিরায় নগরভিত্তিক সভ্যতার একটি প্রমুখ ও বৃহত্তর প্রত্ন নিদর্শন কেন্দ্র রূপে ফুটে উঠেছে, যার ফল স্বরূপ গবেষকদের কাছে এটি যেমন মূল্যবান তেমনি ভারতের উত্তরসূরী ও তার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

ধোলাবিলার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল তার উন্নতমানের নগরীকরণ পদ্ধতি, স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতা, আধ্যাত্মিক স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন এবং এক অসাধারণ জলসংরক্ষণ ও বন্টন প্রণালী। এর দ্বারা প্রথম ভারতীয় নগর সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও সময়ের সঙ্গে উত্থান ও পতন লক্ষণীয়। এ এস আই কর্তৃক খননের ফলে মোট সাতটি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিদর্শনের দ্বারা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম নগর ভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ ও পতন পর্যবেক্ষণ করা যায় ধোলাবিরার প্রাপ্ত কেন্দ্র থেকে।

সর্বপ্রথম পর্যায়ে উৎপত্তি হল একেবারে মাটির স্তর থেকে, সেখানে বসবাসকারীরা জানতেন তামার কাজ, নগর ও স্থাপত্য কৌশল, সেরামিকের কাজ, পাথর ও লিথিকের কাজ ইত্যাদি। তারা মোটামুটি ১১ মিটার পুরু ভিতের উপর দুর্গ নির্মাণ করেছিল, প্রমাণ আকারের মাটির মণ্ড দিয়ে নির্মিত ইঁট দিয়ে তারা গৃহ নির্মাণ করেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দুর্গের উন্নতি সাধন, সেরামিকের কাজের বৃদ্ধি ও সৌন্দর্যকরণ পদ্ধতিগুলির উন্নতি হয়।

তৃতীয় স্তরে ধোলাবিরার কাজ-কর্মের এক নতুন ভাবনার উদয়

ধোলাবিরা— সরকারি বিজ্ঞপ্তির পাশে লেখক।

লক্ষণীয়। যেমন ছোট ছোট বসতিগুলি ক্রমে হঠাৎ নগরে পরিণত হওয়া, যার মধ্যে দুটি দুর্গের প্রাচীর দিয়ে বিভাজনও করা হয়। উন্নত জলাধার নির্মাণ এবং সমগ্র এলাকাটি বহিঃপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এই দুর্গাকার প্রাচীর বেষ্টিত যে নগর তা দুটি অংশে বিভাজিত— ক্যাসেল ও বেইলি। এই তৃতীয় স্তরের শেষের দিকে কেন্দ্রটি সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের রোষানলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা লক্ষ্য করা যায়, সেই নির্মাণে বিরাট পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতির কাজ মেরামতি করার সময়। ঠিক এই সময় কেন্দ্রটির পূর্বদিকে নগর বৃদ্ধি করণের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের জন্য মাঠ ও জলাধার নির্মাণ করা হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে উৎকর্ষতার শিখরে উঠে স্থাপত্য নির্মাণ— দুর্গের প্রাচীরকরণ, জলসংরক্ষণ ও বন্টন প্রণালীর প্রভূত বিস্তার লাভ করে। সম্ভবত নগর দুর্গের উত্তরদিকে প্রধান দ্বারের উপর পৃথিবীর সর্বপ্রথম দশটি অক্ষরবিশিষ্ট সাইনবোর্ড নির্মাণ করা হয়।

এইভাবে উৎকর্ষতার শিখরে হরপ্পা শৈলীর সমস্ত উপাদানই ধোলাবিরায় বর্তমান। যেমন সিল, টেরাকোটা, তামা, সোনা, শঙ্খ ইত্যাদির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ধোলাবিরা একটি সামন্তরিকের আকারে নগর, যা ৭৭১প্র ৬৭১ মিটার একটি পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মূলত কেন্দ্রটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত— (১) নগর দুর্গ, (২) মধ্য নগর, (৩) নিম্ন নগর।

(১) নগর দুর্গ— এটি ৩৩৩ মিটার বাই ১৫০ মিটার একটি উচ্চতলের উপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর অবস্থিত এবং যথাক্রমে দুটো অংশ নিয়ে গঠিত। (ক) দুর্গ বা ক্যাসল, (খ) দুর্গের বহির্ভাগ।

দুর্গ ছিল মূলত উচ্চশ্রেণীর বা শাসকগোষ্ঠীর বাসস্থান ও তাদের রক্ষার্থে বা সুরক্ষার জন্য ছিল দুটি প্রাচীর। উত্তরদিকে অবস্থিত মধ্য নগর ছিল সুরক্ষিত, পরিখাযুক্ত এবং এটি মূল নগর দুর্গ থেকে একটি বিশাল সমাবেশ উদ্যানের দ্বারা বিভক্ত।

এই সমাবেশ উদ্যানটির আকৃতি ছিল ৩০০ মিটার বাই ৫০ মিটার। গভীরতা ১০০ মিটার। এবং যা তখনকার দিনে ১০,০০০ সংখ্যক মানুষের স্থান গ্রহণ ও সমাবেশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। এর দ্বারা এটি যথার্থ ভাবে অনুমানযোগ্য, ধোলাবিরা বেশ জনবহুল স্থান রূপে অতীতে পরিচিত ছিল।

ধোলাবিরা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তার জল সংরক্ষণ ও বন্টন পদ্ধতির জন্য।

সেখানে বছরে বৃষ্টির গড় ৪০০ মিলিমিটার থেকে কম এবং যা খরাকবলিত এলাকা বলে চিহ্নিত। সেই রকম একটি স্থানে কী করে এইরূপ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল তা সত্যিই এক বিস্ময়। সেই সুদূর অতীতে খরাকবলিত এলাকাতে কিভাবে নগর স্থাপন ও বসবাস সম্ভব করা যায়, তার জন্য ধোলাবিরাবাসীরা নির্মাণ করেছিলেন বিরাট আকারের জলাধার। এই জলাধারের দ্বারা তারা বর্ষার জল সংরক্ষণ করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা ও কৃষি-সেচের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মোট ১৬টি জলাধারের দ্বারা গোটা নগরটিকেও তারা চারিদিক থেকে সুরক্ষিত করেছিলেন। এপর্যন্ত খননে প্রাপ্ত যে বিরাট জলাধারটি উন্মোচিত হয়েছে, তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট ৭৪ মিটার বাই ২৯ মিটার বাই ১০ মিটার, যা প্রায় ২১৪৬০ বর্গমিটার জল ধারণ করতে সক্ষম ছিল। ধোলাবিরার খনন কাজের এখনও অনেক কিছু অপ্রকাশিত। যা আরও গবেষণা ও খননের জন্য অপেক্ষা করছে— সেই সুদূর অতীতে ধোলাবিরাবাসীরা নগর গঠনের উৎকর্ষতার ইতিহাসকে উন্মোচন করার জন্য। তবে ধোলাবিরা কেন্দ্রটির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। (১) উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন এই তিন স্তরের নগর পরিকল্পনা, নগর মধ্যস্থ জায়গায় বড় বড় খোলা জায়গার অবস্থান। (২) জল সংগ্রহ , বন্টন প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব। (৩) প্রস্তর ও স্তম্ভ এবং কিছু বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রত্যেকটি ভালো পালিশ যুক্ত। (৪) এক ফুটের বেশী উঁচু লিপি চিহ্ন পাথর কেটে বানিয়ে নয়টি কাঠের ফলকের উপর সাজিয়ে বিশ্বের প্রথম সাইনবোর্ড।

এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই ধোলাবিরার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। সভ্যতার উৎকর্ষতার শিখরে উঠে পরবর্তী পর্যায়ে এই বিশাল নগরী ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে আরম্ভ করে, যা এই কেন্দ্রটি পরবর্তী পঞ্চ ম থেকে সপ্তম স্তরের খনন বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত। এইভাবে ধোলাবিরায় যে উন্নতমানের নগর ভিত্তিক সভ্যতার এক সরল উদ্ভব হয়ে বিকাশের শীর্ষে পৌঁছানোর পর কালের গতিতে তা ধীরে ধীরে নাগরিক শূন্য হতে আরম্ভ করে, অবশেষে লুপ্ত পরিত্যক্ত স্থানে রূপায়িত হয়।

ধোলাবিরা এক হরপ্পা নগরীর পূর্ণ আবিষ্কার ও তার থেকে ভারতীয় ইতিহাসের সময় নির্ধারণ আমাদের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্বেষণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই এই ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করার সৌভাগ্য হওয়ায় আমি সত্যিই তৃপ্ত ও আমার ভারত ভ্রমণের স্থানের তালিকায় ও অভিজ্ঞতায় ধোলাবিরার উদ্দেশ্যে যাত্রা সত্যিই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নোয়াখালির চৌমুহনী ঘাট।

অসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

চৌমুহনী নৌকাঘাটায়

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। ৬৩ বছর কেটে গেছে, কিন্তু মনে হয় কালকের ঘটনা।

১৯৪৬সালের বিশ কি একুশে অক্টোবর। সর্বনাশা দাঙ্গার দিন পাঁচ-ছয় পর হবে। নোয়াখালি থেকে আসাম পালিয়ে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বড়দের সঙ্গে বের হলাম। নৌকা করে চৌমুহনী এলাম ট্রেন ধরার জন্য। এর আগে পাঁচ-দশ মাইল দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ছাড়া বেশি দূরে কোথাও যাওয়া হয়নি। তাও বর্ষার দিনে নৌকা, শুকনোর দিনে শ্রীচরণযুগল ভরসা।

তখন পর্যন্ত ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য হয়নি। চৌমুহনী এলে সতৃষ্ণ নয়নে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কখন ট্রেন কু-উ-উ ঝিক্‌ঝিক করতে করতে মাইজদি থেকে আঁইটগাবাড়ি পোল পেরিয়ে কিংবা বজ্‌রার দিক থেকে বাগানের ফাঁক দিয়ে ছুটে স্টেশনের দিকে আসবে, তা দেখার জন্য দু'এক ঘন্টা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকেছি। তার জন্য দেরি হতো বলে বড়দের বকাবকিও খেতে হয়েছে।

নিয়তি হয়তো তখন অলক্ষ্যে নিষ্ঠুর হাসি হেসেছিল। আর বলেছিল, — দাঁড়া, এমন গাড়ি চড়া চড়াব যে জন্মে তা কখনও ভুলবি না। সত্যিই তাই, আজও সেই ট্রেনে চড়া ভুলিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দরজায় ঠাকুর ঘরে প্রণাম করলাম। দিঘির পাড়ে কালীতলায় মাথা ঠেকালাম। মনে মনে বললাম— মাগো, এই কি তোমার মনে ছিল? আমাদের বাড়িঘর ছাড়া করে কোথায় নিয়ে চললে? কোথায় আসাম, কেমন দেশ কিছুই জানি না। আর ফিরে আসব কিনা তাও জানি না। আশপাশের বাড়িগুলি প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা ক্ষেতখামার পুকুর-বাগান বাড়ি-ঘর কারও জন্য

কোনও মায়া নেই। পাঁচ দশ টাকায় দুধালি গাই, হালের বলদ বেচে দিচ্ছে। কাঁসা পিতল বিকাচ্ছে জলের দরে। বাড়ির চারপাশে যত্নে লাগানো আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল, বেল-জাম্বুরা-পেয়ারা গাছের পাতা বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঝিরঝিরে বৃষ্টির জল পড়ছে— যেন বিয়োগ ব্যথার অশ্রুপাত।

সমগ্র পরিবেশে একটা বিষণ্ণ বিমর্ষ ভাব। দশদিনের মধ্যে যেন মানুষের মনের সব আনন্দরস শুষে নিয়েছে। চারদিক সবুজে শ্যামলে সমাচ্ছন্ন। খাল-বিল- পুকুর-দীঘি জলে টইটম্বুর। জলে মাছে থক্‌থক। হাঁটু জলে কোমরজলে সবুজ ধানগাছের বিছানা পাতা যেন। ধানগাছের গলায় থোড় এসেছে, কিছুদিনের মধ্যে শিষ বেরোবে। নারকেল গাছ ফলভারে ভারাক্রান্ত, সবুজ কচি ডাবের চাপে মাথাভারি। সুপুরী গাছের মাথায় মাথায় পিঁড়ে পিঁড়ে কমলা রঙের ছোপ পড়েছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার কারও ফুরসত নেই।

চারদিকে প্রকৃতির রাজ্যে এই ভরন্ত পুরন্ত ও ফলন্ত পরিবেশে হিন্দুদের মনেই শুধু শূন্যতার হাহাকার। একমাত্র রব পালাও, পালাও, যদি বাঁচতে চাও পালাও।

নৌকা থেকে নামলাম চৌমুহনী নৌকাঘাটে। ঘাটে বেশি নৌকা নেই। লোক চলাচল প্রায় বন্ধ। এখানে ওখানে নৌকারোহীদের খুন হবার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাসী মাঝির নৌকায় চড়নদার হয়ে দুর্গা নাম জপতে জপতে কিছু কিছু হিন্দু স্টেশনের দিকে ছুটছে।

দাঙ্গাবিধবস্ত নোয়াখালির দিকে ট্রেনের চলাচল অনিয়মিত। আমাদের তখন পালিয়ে যাবার তাগাদা। অথচ ট্রেনের দেখা নেই। চৌমুহনী বাজারেও সন্ত্রস্তভাব। সাহাদের বড় বড় দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। দাঙ্গাবিধবস্ত এলাকার লোক তখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু দাঙ্গামুক্ত পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনে চারদিক গিজগিজ করছে। সবার মুখে রায়টের কথা। আতঙ্কে আসাম আগরতলা ও কলকাতার দিকে ছুটছে।

হঠাৎ ঝমঝম শব্দে একখানা ঝক্‌মকে ট্রেন এসে থামল। ট্রেন ভর্তি সৈন্যসামন্ত। বোধহয় এই প্রথম সেনাবাহিনী এল। ইউরোপীয়ান সেনাধ্যক্ষ ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকান। কথা বলার লোক খুঁজছেন যেন। স্টেশনে অপেক্ষমান ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে গেলেন জামিরতলী গ্রামের যাদববাবু, দারোগা। তখন অবসরপ্রাপ্ত। তাঁকে চিনতাম। তিনিও বোধহয় দেশ ছাড়ছেন। ফর্সা লম্বা চেহারা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় উচ্চতায় সাহেবের সমান সমান। দুজনে ইংরেজিতে কিসব কথাবার্তা বললেন। তারপর গাড়ি বাঁশি বাজিয়ে মাইজদির দিকে চলে গেল।

আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তখনও দেখা নেই। আমি বড়দের কাছছাড়া হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নৌকাঘাটায় এলাম। দু-একটি করে নৌকা ঘাটে এসে লাগছে, আর কিছু উদ্‌ভ্রান্ত লোক দৌড়ে গিয়ে তার আরোহীদের কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করছে— এরিও আপনেরা কইথুন আইছেন;এরিও করপাড়ার খপর জানেন কি, এরিও সোনাচাকার সংবাদ কইতে পারেন কি?

প্রত্যুত্তরে শুধু না, না, জানি না। কইতাম পারি না। এই আরোহীরা আমাদের মতোই দাঙ্গাপীড়িত এলাকার কাছাকাছি থেকে আসা লোক। তাই পালাবার পথ পেয়েছে।

আর যারা জিজ্ঞাসা করছে তারাও নোয়াখালিবাসী। নোয়াখালির বাইরে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিল। দাঙ্গার খবর শুনে পরিবার পরিজনের কুশল-সংবাদ জানতে ছুটে এসেছে। কিন্তু চৌমুহনী থেকে রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর ও বেগমগঞ্জ থানার দাঙ্গাবিধবস্ত গ্রামগুলিতে তখন যাবার কোনও পথ নেই। রাস্তা কেটে দিয়েছে, পুল সাঁকো ভেঙ্গে ফেলেছে। লোকজনের যাতায়াত বন্ধ। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিছিন্ন।

যে লোকগুলি আপনজনের কুশল সংবাদের জন্য আকুল হয়ে নৌকাঘাটে অপেক্ষা করছে, তাদের মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। বারবার না, না, জানি না, কইতাম পরিনা শুনতে শুনতে অনেকেই ভেঙে পড়েছে। হতাশায় কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে, কেউ ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ভগ্নকণ্ঠে বিড়বিড় করছে— বাবাও, তোমরা কোথায়;মাগো, তোমরা কেমন আছ;মনুরে, তোরা বাঁচি আছস্ নি?

শুনেছি সে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সব কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। সেই নৌকাঘাট আর নেই, এমনকি নোয়াখালিতে চৈরমারা (লগি ঠেলা) নৌকাও নাকি এখন চোখে পড়ে না। কিন্তু আমি চোখ বুজলে সেই নৌকাঘাট, মাঝিদের হাঁকাহাকি, ঘাটের বিপরীতে বিভিন্ন কোম্পানির এজেন্ট, বাঁশপাড়ার সাহাদের বিশাল গদী, পোস্ট অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত আমার মাতুল— সব আমার চোখে জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে।

আর কানে বাজে— এরিও করপাড়ার খপর জানেন কি? মনুরে, তোরা বাঁচি আছস্ নি? তারপর চাপা কণ্ঠের সেই গোঙানি,— নাই, নাই! কেও বাঁচিজ নাই, বলে হু-হু কান্না। এই চৌমুহনী নৌকাঘাট থেকেই ১৯৪৬ সালের ৮ নভেম্বর গান্ধীজী তাঁর ঐতিহাসিক নোয়াখালি পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন।

আমি অতি শৈশবে পিতাকে হারিয়েছি। আমাদের গ্রামে ভাল স্কুল ছিল না। লেখাপড়ার সুবিধার জন্য আমার দাদু-দিদা ও মামারা পরামর্শ করে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া স্থির করেন। আমাদের বাড়ি থেকে মামাবাড়ির দূরত্ব গ্রীষ্মে তিন মাইল, বর্ষায় আট মাইল। পুত্র শোকাতুর ঠাকুর্দা আমাকে হাঁটিয়ে এনে মামাবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান। মায়ের চোখের জলে আমি বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম। বাড়িতে রইলেন মা, ছোট ভাই ও ঠাকুর্দা।

মামার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গ গীতিকা খ্যাত সিন্দুরকাইত (বাবুপুর) চৌধুরী বাড়ি। দীর্ঘ নয় বছর মামাবাড়িতে থাকার ফলে মামার বাড়িই আমার নিজবাড়ি বলে গণ্য হয়ে যায়।

সে বছর (১৯৪৬) চারদিকের পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলে মা প্রতি বছরের মতো পূজায় মামাবাড়িতে আসেননি। কারণ, ইতিমধ্যেই হিন্দুদের পক্ষে নৌকায় যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীপূজার দিন (১০ অক্টোবর) থেকে তো জেলার এক বিরাট এলাকায় হিন্দুরা মুসলমান প্রতিবেশীদের হাতে খুন-জখম, লুঠপাট, ঘরবাড়ি পোড়ানো, মঠ-মন্দির ধ্বংস, ধর্মান্তর ও নারী নির্যাতনের

শিকার হয়েছে। চারদিক থেকে যখন এসব বীভৎস ঘটনার সংবাদ আসতে থাকে, তখন মামারা আর দেশে থাকা নিরাপদ মনে করেন না। অসমে ডিগবয়ে তাদের ব্যবসা আছে, সেখানে গিয়ে আপাতত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এদিকে মা-ভাইয়ের কোনও সংবাদ পাচ্ছি না। আমি তাদের ছেড়ে যাব না বলে গোঁ ধরে কাঁদতে থাকলে মামারা বললেন— ভগবান তোর মা-ভাইকে রক্ষা করবেন। ভগবান না করুন, তাদের কোনও ক্ষতি হলে আর তুইও দেশে থেকে যদি প্রাণে মারা যাস, তাহলে বংশে তো কেউ বেঁচে থাকবে না। তুই আমাদের সঙ্গে চল। তখন আর কি করা। বড় মামা (মনোরঞ্জন পাল) আমাদের নিয়ে বের হলেন। বাড়ি রইলেন শুধু মেজমামা (অশ্বিনীকুমার পাল)। আমরা চৌমুহনী স্টেশনে এসে পৌঁছালাম।

মা কামাখ্যার দেশে

মিলিটারি ট্রেন মাইজদির দিকে যাবার পর মাইজদি থেকে আসামগামী ট্রেন এসে চৌমুহনী স্টেশনে থামল। স্টেশনে পলায়নপর মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি বকাবকি করে বোঁচকাপুঁটলি নিয়ে ট্রেনে ওঠা গেল। পূর্ণ হল ট্রেনে চড়ার বহুদিনের অপূর্ণ সাধ। তবে সে সাধ যে এমন বিষণ্ণ বিস্বাদে পূর্ণ হবে তা কি কখনও ভেবেছি? ট্রেনে সবার মুখে শুধু রায়টের কথা, অত্যাচারের লোমহর্ষক বিবরণ। সেসব শুনছি আর আতঙ্কে শিহরিত হচ্ছি। আমাদেরও যদি সে দুরবস্থায় পড়তে হতো?

একের পর এক স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। কিছু কিছু নাম এখনও মনে পড়ে। বজরা, সোনাইমুড়ি, নাথেরপেটুয়া লাকসাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কমলাসাগর, আখাউড়া, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ইত্যাদি।

কিছুদিনের মধ্যেই যে এগুলি পাকিস্তান নামক বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে, তা ভাবিনি।

দেড়দিন পর বদরপুর জংশনে (অসম) এসে গাড়ি থামল। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট জেলা ছেড়ে আসামের বদরপুরে। লাকসাম স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন চোখে পড়তে থাকে। নারকেল, সুপারি বাগান অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, মাঠে আর হাঁটু জল কোমরজল তেমন নেই। সমতল জমির মাঝে মাঝে উঁচু ঢিপি চোখে পড়ে। মাঝেমাঝে ছোটখাটো নদী পড়লেও শিরা-উপশিরার মতো খাল-নালা তেমন নেই। তবে শ্রীহট্ট জেলার দিগন্তপ্রসারী 'হাওর' দেখা গেছে গাড়ি থেকে। চোখে পড়েছে চা-বাগান, অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে কমলা লেবুর গাছ আর বহু দূরে ঘন মেঘবর্ণ পাতকই পাহাড়ের শিখরলহরী— যেগুলিকে আমার মেঘ বলে ভ্রম হয়েছিল। জীবনে প্রথম পাহাড় দর্শন।

বাবু হয়ে বসার বদলে উবু হয়ে বসে

বাড়ি ছাড়ার পর আর পেটে দানা পড়েনি। প্ল্যাটফর্মেই স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ী সমিতি থেকে শরণার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। এই স্টেশনে গাড়ি বেশিক্ষণ থামবে। পাহাড় লাইনে ঢুকবে বলে আগে পিছে ইঞ্জিন লাগানা হবে, একটি টানবে, আরেকটি ঠেলবে। এসব ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। এই অবসরে সবাই নিচে নেমে খেতে বসল। বসল মানে উবু হয়ে বসল। সামনে পাতার উপর মোটা চালের ভাত, হড়হড়ে ডাল ও পাঁচমিশেলি একটা ঘ্যাঁট। তাই দিয়ে উদর পূর্তি। মনে পড়ল, ৪৮ ঘন্টা আগে নিজ বাড়িতে কাঠের পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় ঘরের ভাত, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরুর দুধে হাত চেটে খাবারের কথা। চোখের জল কি বাধা মানে!

পাহাড় লাইনে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। ছোট বড় ৩৬টি সুড়ঙ্গ পড়ে এই লাইনে। তার ভেতর ঢুকলে বিশ্বভুবন অন্ধকার, কয়লাপোড়া ধোঁয়ার গন্ধ। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলে আবার প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া। ইংরাজ রাজত্বের রেল ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা ও দক্ষতার অপূর্ব নিদর্শন এই সুড়ঙ্গ পথগুলি। লাইনের একপাশে উত্তুঙ্গ পাহাড়, অপরপাশে অতল খাদ। তাকাতে ভয় করে। গভীর অরণ্য কাকে বলে তাও জীবনে প্রথম দেখা হল। মাঝে মাঝে অর্ধোলঙ্গ নাগা বা কুকীদের মাছ ধরা বা ধারালো দা হাতে পশুর খোঁজে জঙ্গলে বিচরণ। হাফলং স্টেশনটি দেখে মনে হল যেন পটে আঁকা ছবি। এই পাহাড় লাইনে ভ্রমণ সাময়িকভাবে সমস্ত দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দিয়েছিল। ট্রেন লামডিং জংশনে এসে সমতলে থামল ও এগিয়ে চলল।

তৈল শহর ডিগবয়ে

পথ যেন আর শেষ হচ্ছে না। দূরত্ব তো কম নয়। হাজার মাইলের মতো। তার উপর প্রত্যেকটি স্টেশনেই থামতে হচ্ছে। অবশেষে তিনদিনের দিন দুপুরের পর তিনসুকিয়া জংশনে ট্রেন থামল। এখানেও স্থানীয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা শরণার্থীদের জন্য বদরপুরের মতোই খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। তিনসুকিয়াতে গাড়ি বদল করে ডিগবয়গামী গাড়িতে চাপলাম। এবং সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় ডিগবয় স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে শহরের কোলে মাঠের মাঝখানে এক চালাঘরে ঠাঁই হল— এক বাঙালি ডাক্তারের পুরনো চালাঘরকে সারিয়ে-সুরিয়ে থাকার ব্যবস্থা।

জীবনে এই প্রথম শিল্পনগরী দর্শন। আসাম অয়েল কোম্পানির ইংরেজ মালিকগণ ছোট ছোট টিলা ও গাছপালায় ঘেরা ছোট তৈলসমৃদ্ধ শহরটিকে সৌন্দর্যসমৃদ্ধ করে গড়েছে। কোম্পানি এরিয়ার বাইরে বস্তি এলাকা যেমন হয়ে থাকে তেমনই।

ডিগবয়ে মাস আড়াই ছিলাম। দেশ থেকে মা-ভাইয়ের কুশল সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু লেখাপড়া সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনে মনে ছটফট করছি। তার উপর আসামে সিদ্ধ চাল মেলে না। একে অনভ্যস্ত আতপ চালের ভাত, তরিতরকারি দুর্ঘট; আর মাছ মিলে না বললেই চলে— কারণ ডিগবয়ের কাছাকাছি পাহাড়ি এলাকায় খালবিল-পুকুর-নদী নেই। পাহাড়ের খাদ গর্ত নালা থেকে যেসব মাছ আসে সেগুলি খাবারও অভ্যাস নেই। সুতরাং তৃপ্তি মতো খাওয়াও হয় না।

মন চল ভগ্ন নিকেতনে

ইতিমধ্যে গান্ধীজী নোয়াখালিতে পাদ-পরিক্রমা শুরু করেছেন। খানিকটা শান্তি ও স্বস্তির ভাব ফিরে এসেছে। সুতরাং একদিন ছোট মেসো ও আরও ২-১ জন মিলে দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। এবং তিনদিন পর ফের চৌমুহনী স্টেশনে নামলাম। রাত হয়ে গেছে, সুতরাং বাড়ির পথে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে, স্টেশনের পেছনে নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে হিন্দুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ঁযোগেন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে নোয়াখালি থেকে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী অনেক লোকের সমাবেশ। গুড়-মুড়ি খেয়ে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ির পথ ধরলাম। ৭ নভেম্বর গান্ধীজীও এই বাসায় রাত্রিযাপন করেছিলেন।

বাড়ি ও গ্রামের দশা আর কহতব্য নয়। লক্ষ্মী-শ্রী যেন কেউ মুছে নিয়েছে। ভাঙা ঘর ভাঙা সংসার। অনেক বাড়ি জনশূন্য, অনেক ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। দেখে মন ভেঙে গেল। ক'দিন পর শুনতে পেলাম, গান্ধীজী তাঁর পাদ-পরিক্রমায় তিন-চার মাইল দূরবর্তী আমিষাপাড়া গ্রামে আসবেন। গ্রামের কেউ কেউ তাঁকে দেখতে গেলেন। আমি প্রাণ থেকে কোনও সাড়া পেলাম। না। গত তিন মাসের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আমার মহাপুরুষ মহাত্মা দেখার সাধ উবে গেছে। একদিন বাড়ি গিয়ে মা-ভাইদের দেখে এলাম।

স্কুলে গেলাম। তার অবস্থা আরও করুণ। ত্রিশ জন হিন্দু সহপাঠীর সংখ্যা আট-দশ জনে এসে ঠেকেছে। যারা চলে গেছে দু-একজন ছাড়া কেউ ফিরে এল না। ক'জন মাস্টারমশাইও দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। শিক্ষক বলতে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, সহকারি প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, পণ্ডিত মশাই জগদীশ ভট্টাচার্য ও সহকারী শিক্ষক হেমেন্দ্রলাল দত্ত মশাই। কোনও পরীক্ষা ছাড়াই সপ্তম শ্রেণীর সবাইকে অষ্টম শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হল। তাতে আনন্দের চেয়ে দুঃখই হল বেশি। কোনও প্রতিযোগিতা নেই, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগাকুল আলোচনা নেই, প্রথম স্থান দখলে রাখা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই।

দেশে থেকে বিদেশী হলাম

অবশেষে এল ১৪ আগস্ট। স্বাধীনতা তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন। বন্দে মাতরম্ ভুলে আল্লা-হু-আকবর বলার দিন, ভারত মাতা কি জয়, গান্ধীজী কি জয়, নেতাজী কি জয় ধ্বনির বদলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্না জিন্দাবাদ দেবার দিন। সোনার বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হল। কৃত্রিম হাসিহাসি মুখে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আমরা উল্লাস প্রকাশ করলাম। মুসলিম সহপাঠীরা উৎসাহে আবেগের জোয়ারে ভাসছে। আমরা খালের ধারের কচুরিপানার মতো স্থির হয়ে আছি। আমরা ভারতীয় থেকে পাকিস্তানী হলাম।

ভাঙাচোরা মন আর খাপছাড়া পড়াশোনায় অষ্টম শ্রেণী শেষ করে নবম শ্রেণীতে উঠলাম। এবার শুরু হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস। বাংলা সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন। হিন্দু লেখক কবিদের রচনা চৌদ্দ আনাই বাদ। ইংরেজি সিলেবাসের "David Copperfield" বাদ দিয়ে সে জায়গায় "Vicar of Wakefield" হয়েছে। "Rapid Reader" ছিল "Oriental Tales", সেটি বাতিল করে "Pillars of Pakistan"। তাতে মহাত্মা জিন্না, মহাকবি ইকবাল, মহানায়ক লিয়াকত আলি খান ইত্যাদি রচনা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট। দাঙ্গার দগ্‌দগে ঘায়ের ওপর এগুলিকে নুনের ছিঁটে বলেই বোধ হল। এসব বই না কিনেই ক্লাশ করতে থাকি।

লেখাপড়া শিকেয় ঃ স্কুলের সন্ধানে হরিনা-চালতাতলী

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ পড়া থামিয়ে প্রধান শিক্ষক উপেনবাবু বললেন, "This is my last class with you. I am leaving the school today". — বলেই ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন। জানতে পারলাম তিনি ত্রিপুরা জেলার হরিনা-চালতাতলি হাইস্কুলে যোগদান করবেন। তাঁর পরিবারবর্গকে ইতিপূর্বেই চাঁদপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। মাত্র একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক দিয়ে কি করে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের পড়াশোনা চলবে? মামারা বললেন— উপেনবাবু যে হরিনা-চালতাতলি স্কুলে গেছেন সেখানে একসময় ঘরে ঘরে ছেলেদের লজিং-এ (খাওয়া-থাকা) রাখার ব্যবস্থা ছিল। একবার গিয়ে মাস্টারমশাইকে বলে দেখ, সেরকম কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা। তা হলে সে স্কুলেই ভর্তি হয়ে যা।

অচেনা জায়গা। কিছুই জানি না। চৌমুহনী থেকে ট্রেনে চাঁদপুরে নামলাম। পদ্মা-মেঘনার সংযোগস্থলে বিরাট গঞ্জ, ট্রেন-স্টীমার সংযোগস্থল। আগে কখনও নদীই দেখিনি, চাঁদপুরে মেঘনার বিস্তৃতি ভয় পাবার মতো। কিন্তু হরিনার স্টীমার ছেড়ে গেছে। তাই নৌকা করে মেঘনার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে হরিনা স্টীমার ঘাটে নেমে লোককে জিজ্ঞাসা করে করে চালতাতলি গ্রামে মাস্টার মশাইয়ের কোয়ার্টারে পৌঁছালাম। কিন্তু মাস্টারমশাই সেখানে ছিলেন না। তিনি চাঁদপুরে বাসায় আছেন। কোয়ার্টারে তাঁর তিন ছেলে ছিল। তাদের সঙ্গে সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন স্টীমার ধরে চাঁদপুরে এসে উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

তিনি হতাশা প্রকাশ করে বললেন— চালতাতলি গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি সব দেশ ছেড়ে চলে গেছে। যারা আছে, তাদের লজিং দিয়ে ছাত্র রাখার ক্ষমতা নেই। তিনিও যে কতদিন ওখানে থাকবেন তার ঠিক নেই। ওই স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন তাঁরই ভায়রাভাই অক্ষয় চক্রবর্তী। হাঙ্গামার পর তিনি স্কুল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছেন। সুতরাং বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এভাবে নৌকা, গাড়ি, স্টীমারে যাতায়াতের ফলে সে বয়সেও আমার মনে হয়েছে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মাথা উঁচু করে চলার দিন শেষ হয়েছে। মুসলমানরা যে দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা, হিন্দুরা তাদের কাছে জিম্মি স্বরূপ (রক্ষিত জীব), সেকথা তাদের হাবভাবে কথাবার্তায় বোঝা যায়।

লেখাপড়া তো শিকেয় ওঠার জোগাড়। তখন মামারা পরামর্শ

করে স্থির করলেন, পশ্চিমবঙ্গে তো উদ্বাস্তু ছাত্রদের নিয়ে কিছু ক্যাম্প স্কুল চালু হয়েছে। সেরকম স্কুলে পড়ার চেষ্টা করলে কেমন হয়! যেমন চিন্তা তেমন কাজ। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়াই স্থির হল।

আমাদের নিজ বাড়ির ঠাকুর্দা সম্পর্কীয় দুইজন নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীতে গিয়েছেন বসবাসের জায়গা দেখতে। কারণ, আমাদের বাড়িতে যে বেশিদিন থাকা যাবে না, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত। মামাদের সিদ্ধান্ত হল, আমিও সেখানে চলে যাই। বড় মামা কয়দিন পরে গিয়ে আমার পড়ার ব্যবস্থা করবেন।

বিদায় দাও মা ফিরে আসব না

সুতরাং আবার সেই চৌমুহনী স্টেশন। মামার বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও সুখময় জীবন থেকে চিরবিদায়। মা-ভাই দেশের বাড়িতেই রইল। সেজমামা তাদের খোঁজ-খবর রাখবেন। তত্ত্বতালাশ করবেন। মামারা স্টেশনে এসে আমাকে রানাঘাটের একখানা টিকেট কিনে দিয়ে বললেন— এই গাড়ি সোজা চাঁদপুর যাবে। চাঁদপুরে সব লোক নেমে যাবে। তাদের পেছন পেছন গিয়ে অপেক্ষমান স্টীমারে উঠে পড়বি। সাত-আট ঘন্টায় স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছবে। সব লোক স্টীমার থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে উঠবে। তাদের সঙ্গে তুইও উঠে পড়বি। সেই ট্রেন রানাঘাটে পৌঁছলে সেখানে নেমে যাবি। পরে লালগোলার ট্রেনে উঠে বেথুয়াডহরী স্টেশনে নেমে চিচুড়িয়া গ্রামে গেলে তোর বাড়ির লোকজনের দেখা পাবি।

ট্রেন এল। আমি উদগত অশ্রু গোপন করে ট্রেনে উঠলাম। ছিন্ন হল জন্মভূমির সঙ্গে আমার নাড়ীর বন্ধন। শুরু হল জীবনপথে আমার একটা চলার পর্ব। পরনে একটি হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট। এই আমার সম্বল। আর কোমরে গোঁজা বিশটি টাকা।

মামাদের নির্দেশমতো চাঁদপুরে এসে স্টীমারে উঠলাম। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ এক আনন্দদায়ক ভ্রমণ। পদ্মার দুইপাশে মনভুলানো দৃশ্য। লৌহজং, ভাগ্যকুল, তারপাশা, সুরেশ্বর ইত্যাদি স্টীমার স্টেশনগুলির নাম আজও মনে পড়ে।

গোয়ালন্দে এসে ট্রেনে উঠব কি সূঁচ ফোটাবার বা পিঁপড়ে গলারও সাধ্য নেই। আস্ত মানুষ তো দূরের কথা। হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি যথাসর্বস্ব নিয়ে দলে দলে পালাচ্ছে। ওদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। নিরুপায় হয়ে অন্য অনেকের মতো হ্যাণ্ডেল ধরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে পড়ি। ঢাকা কি চিটাগাং মেইল দুরন্ত বেগে ছুটছে। পুরো ফরিদপুর ও নদীয়া জেলা অতিক্রম করে (কত মাইল জানি না) ছয়-সাত ঘন্টা পর রানাঘাটে এসে পৌঁছালাম। পথে কতবার যে হাত ফস্কে পড়ে মরার অবস্থা হয়েছিল তা আর বলার নয়। নেহাত কপাল জোরে বেঁচে গেছি।

পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেই গলাধাক্কা

বিধবস্ত অবস্থায় রানাঘাটে এসে নামলাম। গেটে চেকার টিকিট নিয়ে নিল। দীর্ঘ যাত্রায় স্টীমারে একটি শসা ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। লালগোলা ট্রেন আসতে তিন-চার ঘন্টা দেরি। কিছুক্ষণ বসে কিছুক্ষণ হেঁটে সময় কাটতে থাকে। একসময় একবার প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ঢুকে যাই। প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই যে সঙ্গে টিকিট থাকা দরকার সেসব জানা ছিল না। আর একখানা ট্রেন এল। তার প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গেই বের হতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধল। চেকার টিকিট চেয়ে বসল। আমি যত বলি এই গাড়িতে আসিনি, আগের গাড়িতে এসেছি এবং টিকিট দিয়ে দিয়েছি— কে কার কথা শোনে! আমাকে ধরে চেকারদের ঘরে নিয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসাবাদ ও ধমকধামক দিয়ে টাকা বের করতে বলল। শরীরের এখানে ওখানে টাকার খোঁজ করতে লাগল। আমি বলি আমার কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই। আর প্রাণপণে চেষ্টা করছি কোমরে দড়ির প্যান্টের ফোকরে গুঁজে রাখা একমাত্র সম্বল বিশটি টাকার খোঁজ যেন কিছুতেই না পায়। ধমকধামকে যখন কাজ হল না, তখন চেকারটি রেগেমেগে — যত্তসব রিফিউজির বাচ্চা জ্বালাতে আসে— বলে গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। বসে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

পুণ্যভূমি ধন রে নদীয়া ঃ বেথুয়াডহরী-চিচুড়িয়া

রাত ভোর হল। লালগোলার গাড়ি এল। টিকিট কেটে উঠে পড়লাম। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর দুপাশে তাকিয়ে তো আক্কেল গুড়ুম। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পূর্ববঙ্গের মোহময়ী দৃশ্যের বদলে শুকনা খট্‌খটে ঝোপ জঙ্গল উলুবনে ঢাকা মাটি। বিষাক্ত সাপের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। চুর্নীর ক্ষীণধারা বাদে আর কোনও নদী-নালা,খাল-বিলের চিহ্নমাত্র নেই। দূরে দূরে কিছু খড়ের চালের বাড়ি। তাতে রোগক্লিষ্ট পুষ্টিহীন লোকের আনাগোনা। দেখে আমার মন ভেঙে গেল। কি সোনার দেশ ছেড়ে কি পোড়া দেশে এলাম! শুধু মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য পুণ্যস্পর্শপূতঃ এই একমাত্র সান্ত্বনা।

বেথুয়াডহরী স্টেশনে নামলাম। দু-পাঁচজনলোক নামল। তারা এদিক ওদিক সটকে গেল। কোথায় চিচুড়িয়া গ্রাম তা জিজ্ঞাসা করার লোক নেই। টিপ্‌টিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ যেন দেবদূতের মতোই আবির্ভূত হলেন আমার দুই ঠাকুর্দার একজন— মনোমোহন সিংহ। তিনি আমাকে দেখে অবাক হলেন এবং সব শুনে বললেন— চল আমার সঙ্গে। তারপর মাইল দেড়েকের মতো গভীর ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে শিয়ালের মতো পথ খুঁজে খুঁজে হাজির হলাম চিচুড়িয়া। সেখানে দেখতে পেলাম আরেক ঠাকুর্দা— অশ্বিনী কুমার সিংহ ও তাঁদের মামাতো ভাই ধীরেন্দ্র রাউতকে। তাঁরা কাঠা দশেক জমি কিনে একখানা খড়ের ঘর তৈরি করে বাস করছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশ থেকে পরিবারবর্গকে আনার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। এখন আমাকে নিয়ে চার মরদের সংসার।

জয়কালী কলকাত্তাওয়ালী ঃ স্কুলের খোঁজে করঞ্জলী

আমার পড়াশোনা সবই বন্ধ। মাস দেড়েক পর বড় মামা এলেন চিচুড়িয়া এবং আমাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায় উদ্বাস্তু স্কুলের

খোঁজে। আমার প্রথম কলকাতা দর্শন। এতদিন কলকাতার যে ছবি এঁকেছিলাম মনে মনে, সেই না-দেখা কলকাতার সঙ্গে দেখা কলকাতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কেশব সেন স্ট্রীটে এক উড়িয়া হোটেলে আহার এবং এক পরিচিত নোয়াখালিবাসীর দর্জি দোকানে শয়ন, আর স্কুলের অন্বেষণে ঘোরাফেরা। বাটানগর ও বজবজে মাতুলকুলের আত্মীয়দের বাড়ি যাওয়া হল। কোনও ব্যবস্থা হল না। খবর পাওয়া গেল লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুরে এরকম একটি ক্যাম্প স্কুল ছিল, কিন্তু সেটি বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর খবর পেলাম ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ পথে করঞ্জলী হাইস্কুলে উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য এধরনের ব্যবস্থা আছে। চললাম করঞ্জলীর উদ্দেশ্যে। লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে নেমে হেঁটে কুলপি ও সেখান থেকে করঞ্জলি যাওয়া যায়। বর্ষার সন্ধ্যায় স্টেশনে নেমে তো দিশাহারা অবস্থা। কোথায় কোনদিকে যাব জানি না। এখানেও ভগবান সহায়। করঞ্জলি ঘোষেদের বাড়ির এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আমাদের অভয় দিয়ে বললেন— চলুন, আমার সঙ্গে। ওই অন্ধকার রাতে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে হোঁচট খেতে খেতে স্কুলে গিয়ে পৌঁছালাম। কত মাইল হেঁটেছি জানি না। তখনও ডায়মণ্ড হারবার-কাকদ্বীপ রাস্তা তৈরি হয়নি।

সেখানে গিয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সব শুনে বললেন— রাত হয়েছে, এখন তো ছেলেদের সঙ্গে খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে কথা হবে। জনা চল্লিশেক উদ্বাস্তু ছাত্র বোর্ডিং-এ থেকে ওই স্কুলে পড়ছে। এরা বেশিরভাগ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা থেকে এসেছে। মেজেয় শুয়ে হাত-বালিশে রাত কাটালাম।

সকালবেলা প্রধান শিক্ষক অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। জানতে পারলাম, তিনি আমার দেশের স্কুলের প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের— যিনি বর্তমানে অক্ষয়বাবুর পরিত্যক্ত হরিনা-চালতাতলি হাইস্কুলে যোগদান করেছেন— ভায়রাভাই। তিনি আমাকে একখানা দরখাস্ত লিখতে বললেন। লিখলামও। পড়ে মনে হল খুসি হয়েছেন। কিন্তু তারপরেই দুঃসংবাদ। তিনি মামাকে বললেন— আপনার ভাগ্নেকে নিতে পারলে খুসিই হতাম। কিন্তু এখানে যেসব উদ্বাস্তু ছেলে পড়াশোনা করছে, তাদের খরচ জোগাচ্ছে কলকাতার 'রায়বাহাদুর বদ্রীদাস হালওয়াশিয়া ট্রাস্ট'। দাঙ্গার সময় থেকেই তারা এদের খাওয়া-পড়ার খরচ দিচ্ছে। এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে, গোলমালও থেমে গেছে। তাই তারা আর নতুন কোনও ছাত্র নিতে ইচ্ছুক নয়। বর্তমান ছেলেগুলোর পড়াশোনা শেষ হলেই তারা অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেবে। তাই আপনার ভাগ্নেকে নিতে পারছি না। দরখাস্ত রইল। যদি ভবিষ্যতে আবার ট্রাস্টিরা সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে খবর দেবো।

সুতরাং বিফল মনোরথ হয়ে মামা-ভাগ্নে আবার কলকাতার পথ ধরলাম। পথে মামা বারংবার দাস্ত করতে করতে কাবু হয়ে পড়েন। কলকাতা ফিরে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হন। হতাশায় মন ভেঙে পড়ল।

অবশেষে রাম-সীতার নামধন্য সীতারামপুরে ঠাঁই

তারপর খবর পাওয়া গেল ডায়মণ্ড হারবার লাইনে হোটর স্টেশন থেকে প্রায় ছ-মাইল ভেতরে সীতারামপুর গ্রামে উদ্বাস্তু ছেলেদের নিয়ে এক স্কুল চালু হয়েছে। এবং বেনিয়াটোলা লেনের কোনও এক বাড়িতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজনের বাসা আছে। খুঁজে পেতে সেই ঠিকানা এবং ভদ্রলোককে বের করলাম। ভদ্রলোকের নাম অবনী মোহন মজুমদার। বাড়ি ছিল কুখ্যাত রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর গ্রামে। তিনি নির্যাতিত কংগ্রেস কর্মী। দাঙ্গার সময় তাঁদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত হয়। গান্ধীজী পাদ-পরিক্রমাকালে তাঁদের বাড়িতে একদিন ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সপরিবারে এদিকে চলে আসেন এবং সীতারামপুরের বাসিন্দা রঙ্গলাল মণ্ডল নামে আরেক কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে মিলে সেই গ্রামে উদ্বাস্তু ছেলেদের নিয়ে একটি স্কুল চালু করেছেন। ইতিমধ্যেই শ'খানেক ছাত্র সেখানে পৌঁছে গেছে। কয়েকজন মাস্টারমশাইও নিযুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। মামার সঙ্গে কথাবার্তায় যখন জানলেন, আমরা রামগঞ্জ থানার পার্শ্ববর্তী বেগমগঞ্জ থানার সিন্দুরকাইত-বাবুপুরের অধিবাসী, তখন আলাপ পরিচয়ে কোনও অসুবিধা হল না।

অবনীবাবু মামাকে বললেন— আপনারা ভালো দিনেই এসেছেন। আমি আগামীকাল আরও কিছু ছাত্র এবং নবনিযুক্ত হেডমাস্টারকে নিয়ে সীতারামপুরে যাব। আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে সকাল আটটায় শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনে আসবেন। তার সঙ্গে একটা মাদুর, একখানা কম্বল ও একটি হারিকেন কিনে দিবেন।

ভাবলাম এতদিন পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দেশিত জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে হাজির হলাম। দেখলাম অবনীবাবু এবং হেডমাস্টারমশাইও হাজির। মামা আমার জন্য হোটর স্টেশনের টিকিট কিনে আমাকে অবনীবাবু ও হেডমাস্টার মহাশয়দের জিম্মায় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিদায় হলেন। এবং দু-একদিনের মধ্যেই নোয়াখালি ফিরে গেলেন।

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে হোটর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে নৌকায় গেলাম ঝিনকিহাটে। বাকি মাইল খানেক পথ বোঝাবোঁচকা কাঁধে হেঁটে গিয়ে পৌঁছালাম সীতারামপুরে।

জল-কাদার দেশের ছেলে। নদীয়ার ঝোপজঙ্গল ও রুক্ষ প্রকৃতিতে মন বিষিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাদামাটির পথ, মাঠে জল, খালে নৌকা এবং নারকেল সুপারি বাগানের প্রাচুর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঠিক যেন নোয়াখালির প্রতিচ্ছবি। আর একটু বেশি পরিমাণে খালখন্দ, খালিজুলি, পুল-সাঁকো, নৌকা-সাম্পান এবং যত্রতত্র মাছ মারার সাজ সরঞ্জাম পাতা থাকলেই ছেড়ে আসা নোয়াখালি মনে হতো। তবু দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনের ক্ষত অনেকটা প্রশমিত করেছিল।

সীতারামপুরে গিয়ে তো পৌঁছলাম, কিন্তু স্কুল কোথায়? ছেলেরা কারো বারান্দায়, কারো বৈঠকখানায়, কারো গোয়ালঘরে বা গোলাঘরে ঠাঁই নিয়েছে। মাস্টারমশাইরা সবাই বাস্তুহারা। ছোট একটা ঘরে গাদাগাদি করে আছেন। ছেলেরা যেখানে আছে, সেখানেই ক্লাশ

চলছে। কিছুদিন পর স্থানীয় এম ই স্কুলে ক্লাশ নেবার ব্যবস্থা হল। পূর্ববঙ্গের সাত আটটি জেলার শতাধিক ছাত্র সেখানে জায়গা পেয়েছিল।

প্রধান শিক্ষক নিবারণচন্দ্র দে মশাই ছিলেন নোয়াখালি জেলার দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত রামগঞ্জ থানা সংলগ্ন রামগঞ্জ-মধুপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতা ও প্রশাসক হিসেবে সুনাম ছিল। তিনি লেগে গেলেন ঘরবাড়িহীন সীতারামপুর শিক্ষা নিকেতন স্কুলের অনুমোদন আদায়ের কাজে। উদ্বাস্তুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুল বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে দেরি হল না। ছাত্র-শিক্ষকদের আহারের জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর থেকে মাসিক সাহায্যও মঞ্জুর হল। স্কুল গৃহ তৈরির জন্য ঢেউ টিন এবং কাঠও পাওয়া গেল এবং ঘর তৈরির কাজ শুরু হল। ছাত্ররা মনের আনন্দে সেসব টিন, কয়লা, কাঠ আমতলা বা হোটর স্টেশন থেকে বয়ে আনা, স্কুলগৃহের জন্য মাটি কাটা ও রান্নার কাঠ ফাঁড়ার কাজে লেগে গেল। দু'বেলা শতাধিক লোকের রান্নার ব্যবস্থা করা তো সোজা কথা নয়।

প্রধান শিক্ষক নিবারণবাবুর মহত্ত্ব

রান্না হয়ে গেলে ঘন্টা পড়ত। ছাত্ররা যে যার আস্তানা থেকে থালা বাজাতে বাজাতে একটা হোগলার ছাউনির নিচে উবু হয়ে বসে পড়ত। ভাত, ডাল, ঘ্যাঁট, কখনও কাঁচকলা ভাজি। মাঝে মাঝে পুঁটিমাছ বা কুচো চিংড়ির মিশ্রণ। প্রতিদিন একই ধরনের খাবার, কিন্তু পেটপুরে খেতে পাচ্ছি তাতেই আনন্দ।

মাস্টারমশাইদের জন্য আলাদা রান্না করতেন একজন শিক্ষক। সেখানে ঝালঝোল অম্বলের ব্যবস্থা। প্রধান শিক্ষক নিবারণবাবু আমায় ডেকে বললেন— তুই তোদের রান্না থেকে আমার খাবারটা এনে দিস। তোদের সামনে মাস্টারদের ওই স্পেশাল রান্না আমার মুখে রুচবে না।

নিজেদের পায়ে কুড়াল ঃ উদ্ধারকর্তা হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ও সর্দার জীবন সিং

এভাবেই বছরখানেক চলল। তারপর গোয়ালে ক'টি দুষ্ট গরুর আবির্ভাব ঘটল। আমিও সে দলে সামিল হলাম। বুঝতে পারিনি যে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারলাম। ক্যাম্প পরিচালনা ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে গোপনে সরকারি কর্তাদের কাছে নালিশ করা হল। তার ফলে বন্ধ হয়ে গেল সরকারি সাহায্য, নিভে গেল রান্নাঘরের উনুন। ছাত্ররা যে দিকে পারল ছিটকে গেল। কোলাহল মুখরিত ক্যাম্প খাঁ খাঁ করতে লাগল। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট আর কাকে বলে! পড়ে রইল মাত্র এগারো জন। তার মধ্যে গোপন চিঠিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী এই অধম। বাকি দশজন নিরীহ বেচারা এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে না। আমার ওপর মূল কর্মকর্তা রঙ্গলালবাবুর সে কি রাগ! সব বেটাকে ছেড়ে বেঁটে বেটাকে ধর আর কি! অন্যরা তো সবাই পগার পার। আমাকে তিনি গুলি করে মারবেন বলে ভয় দেখাতে লাগলেন। আমি ভ্যাবাকান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘটনা যাই ঘটুক, রঙ্গলালবাবু ও অবনীবাবুর ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের জন্যই আমি পায়ের নিচে মাটি পেয়েছি।

রান্নাবান্না তো বন্ধ। আমরা এগারো জন নিজেদের কাছে টাকা-পাঁচ সিকা করে যা ছিল, তা দিয়ে পাটশাক-ভাত, লতিসিদ্ধ-ভাত, মুড়ি-নারকেল (চুরি করতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া) খেয়ে রিক্তহস্ত এবং দুদিনের উপোসী হয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর খাবারের দোকানের সামনে পড়ে জিভ চাটছি। হঠাৎ ডালহৌসী স্কোয়ারে নোয়াখালির শিল্পপতি নগেন্দ্রনাথ দাসের এশিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সপে জেলার একমাত্র হিন্দু এম এল এ (তখন পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার) প্রয়াত হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে চিনতাম। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে 'কংগ্রেস প্রার্থী হারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরীকে ভোট দিন' বলে চেঁচিয়েছি। তিনি আমাদের দুর্দশার কথা শুনে নিয়ে গেলেন হ্যারিসন রোডে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সফরসঙ্গী কর্নেল (আই এন এ) জীবন সিংহের কাছে।

নোয়াখালি থাকতেই তাঁর নাম শুনেছি। আজ সাক্ষাৎ দর্শন। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী শুভ্র শ্মশ্রুকেশ ও পাগড়ী শোভিত সর্দারজীকে দেখলে ভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। হারাণবাবুর কাছে আমাদের দুর্দশার কথা শুনে সর্দারজী বললেন— ছেলেরা যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ কি? আমি বললাম, আমাদের প্রধান শিক্ষক নিবারণবাবু কলকাতাতেই আছেন, তাঁকে নিয়ে আসতে পারি। সর্দারজী সম্মতি দিলে আমি সঙ্গীদের সীতারামপুর পাঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সেপ স্ট্রীটে মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি। তিনিও ইতিমধ্যে সীতারামপুর স্কুল ছেড়ে চলে এসেছেন। তাঁর মুখ থেকে সর্দারজী আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন এবং সবক'টি ছেলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে একটা বিস্তৃত স্টেটমেন্ট তৈরি করে আনতে বললেন। আমি তখন ছুটলাম সীতারামপুরে।

হোটর স্টেশনে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত প্রায় ন'টা। স্টেশন থেকে সীতারামপুর ছ'মাইল। আষাঢ় মাস। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। কর্দমাক্ত রাস্তা। ঝোপজঙ্গল, ধানখেত, সুপারিবাগান, শ্মশানের পাশ দিয়ে খর্বকায় ছেলেটি দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে। একটি লোকের সঙ্গে দেখা নেই। একটু আলোর রেখা চোখে পড়ে না। হাত মেললে হাত দেখা যায় না এমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মাথায় সুপারিগাছের ঠোক্কর খেয়েছি কয়েকবার। দূরে দেখা যায় শ্মশানের আগুন। ভেসে আসে বলোহরি-হরিবোল ধ্বনি। সে সময় ওই এলাকায় মড়ক লেগেছিল। সেদিন আমার শরীরে যেন কিছু ভর করেছিল। ভয়ডর যেন একেবারে দূরীভূত হয়েছিল। এখন সে রাতের কথা মনে হলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

বিদায় সীতারামপুর ঃ চলো যাই সন্তোষপুর গান্ধী আশ্রম

অবশেষে রাত প্রায় এগারোটায় ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সবাইকে জাগিয়ে স্টেটমেন্ট তৈরি করে পরদিন ভোরের ট্রেনে কলকাতা এসে মাস্টারমশাইকে নিয়ে সর্দারজীর কাছে গেলাম। তিনি স্টেটমেন্ট

পড়ে খুশি হয়ে বললেন—

'দেখ, আমি সন্তোষপুরে (মোল্লার গেটের কাছে) মিলিটারির পরিত্যক্ত কয়টি ঘর পেয়েছি। সেখানে 'গান্ধী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তা ঘটনাচক্রে তোমরা যখন এসে পড়েছ, তোমাদের দিয়েই কাজ শুরু করব। তোমরা অমুক দিন বিছানাপত্র নিয়ে চলে এসো।'

এই সুখবর নিয়ে ছুটলাম সীতারামপুর এবং নির্দিষ্ট দিনে সর্দারজীর সামনে সবাই হাজির হলাম। সেখানে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বিধুভূষণ দাশগুপ্তের হেফাজতে সন্তোষপুরে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা পুনর্বাসিত হলাম।

আমাদের এগারোজনকে নিয়ে সন্তোষপুর গান্ধী ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা হল। তত্ত্বাবধায়ক বিধুবাবু গান্ধীবাদী এবং হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি।

নঙ্গীতে নলিনীবাবুর স্কুলে

আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল। এবার পড়াশোনার ব্যবস্থা। নিবারণবাবু বললেন— চল, বাটানগর যাই। সেখানে আমাদের নলিনীবাবু (খিলপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নলিনীরঞ্জন মিত্র) একটা স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন শুনেছি। একথা জেনে মন আনন্দে নেচে উঠল। নলিনীবাবু ও নিবারণবাবু পূর্ব পরিচিত। দাঙ্গার আগে তাঁরা তিন মাইলের ব্যবধানে যথাক্রমে খিলপাড়া ও রামগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নলিনীবাবু শিক্ষকতা ছাড়াও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজসেবী এবং এবিটিএ-র নোয়াখালি শাখার সম্পাদক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। দাঙ্গায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন। সে বিরাট কাহিনী। একদিন নিবারণবাবু আমাকে নিয়ে বাটানগরে এলেন এবং খুঁজে পেতে নলিনীবাবুর বাসায় পৌঁছলেন। ফেলে আসা দিনের সুখ-দুঃখের কথার পর আমাদের দুর্দশার কথা উঠল। দুজনে আমাকে নিয়ে নিকটবর্তী বাড়িতে স্কুলের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিনা কাগজপত্রে নঙ্গী হাইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। নিবারণবাবু কলকাতায় ফিরে গেলেন, আমি গান্ধী আশ্রমে গিয়ে অন্যান্য সহপাঠীদের সুখবর জানালাম।

পরদিন ক্লাশ চলাকালে আমরা ক'জন ছাত্র পিলপিল করে দশম শ্রেণীর পেছনের দিকের বেঞ্চে বসে পড়লাম। আমিই দলপতি। আমাদের খালিপদ; কাপড় কালা, ক্ষৌ-রি বাড়া, দেখতে লাগে লক্ষ্মীছাড়া দশা। সামনের বেঞ্চে র সুবেশ ছাত্রমণ্ডলী আমাদের দেখে অবাক। হংসমধ্যে এসব বক এলো কোত্থেকে! আশ্রমে এক তরকারি ভাত খেয়ে আমরা ট্রেনে নঙ্গী গিয়ে ক্লাশ করি। মোটামুটি থিতু হয়ে বসা গেল। মাছ-মাংস! নৈব নৈব চ। শুধু বিট-গাজর, ভেণ্ডী-বরবটি। তাও জলে সিদ্ধ, নুন ছিটিয়ে।

কপাল মন্দ ঃ খাবার বন্ধ ঃ গান্ধী বিরূপ

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়ছে না। মাসখানেক পর সর্দারজী বললেন— দেখ, আমি গান্ধীবাদী। আমি চাই না হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে আসুক। তোমরা লেখাপড়া শেষ করে পাকিস্তানে ফিরে যাবে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। অন্যান্য সঙ্গীরা বলল— এখন তো লিখে দিই, পরে যা হবার হবে।

কিন্তু আমার যেমন মোটা বুদ্ধি, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। আমি আর দেশে ফিরে যাব না। মুসলমান পরিবেষ্টিত বাড়িতে আমার মা-ভাইও বেশিদিন থাকতে পারবে না। বাড়ির লোকজন ইতিমধ্যেই সরতে শুরু করেছে। সুতরাং আমি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলাম। ফলং— আশ্রমে আমার খাবার বন্ধ হল। আমাকে আশ্রম

নলিনীরঞ্জন মিত্র

> "নলিনীবাবু বললেন— তোর তো সারাদিনই ট্রেনে আসা-যাওয়ায় কেটে যায়। পড়িস কখন? সামনে পরীক্ষা। তুই আমার বাসায় চলে আয়। ঊষারঞ্জনের (মাস্টার মশাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সেও পরীক্ষার্থী) সঙ্গে পড়াশোনা করবি, আমিও কিছু কিছু দেখিয়ে দিতে পারব।"

ছাড়তে হবে।

ডাল-ভাত আমার জুটলে তোরও জুটবে— নিবারণবাবু

দু'দিন উপোস থাকার পর এখবর মাস্টারমশাই নিবারণবাবুর কর্ণগোচর হল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সব শুনে বললেন— "তুই ছোটাছুটি করে আশ্রমে সবার থাকার ব্যবস্থা করলি, আর তোকেই কিনা সেখান থেকে তাড়াল! যাক, যা হবার হয়েছে। বিছানাপত্র নিয়ে আমার এখানে চলে আয়। ডাল-ভাত দুটো আমার জুটলে তোরও জুটবে।"

মাস্টারমশাইয়ের এই কথাগুলি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আজও আমার কানে বাজে। প্রকৃতপক্ষে সীতারামপুর স্কুল ছেড়ে এসে তিনিও তখন বেকার। জ্যেষ্ঠপুত্র ডিভিসি-তে সামান্য মাইনের কর্মচারী। তার আয়েই সংসার চলছে। যা হোক, কলকাতার প্রিন্সেপ স্ট্রীটে নিবারণবাবুর বাসায় (পরবর্তীকালে রাসবিহারী এভিনিউতে তাঁর জামাই নৃপেন দাসের বাসায় একত্রে) থাকি, আর বিনা টিকিটে ট্রেনে এসে নঙ্গী স্কুলে পড়ি।

এবার নলিনীবাবুর আশ্রয়ে

এসব দুর্যোগের মধ্যেও পড়াশোনায় আমার নিষ্ঠা ও টার্মিনাল পরীক্ষায় ভালো ফল করায় মাস্টার মশাইদের সবারই আমার উপর কৃপাদৃষ্টি। হেডমাস্টার মশাই নলিনীবাবু বললেন— তোর তো সারাদিনই ট্রেনে আসা-যাওয়ায় কেটে যায়। পড়িস কখন? সামনে পরীক্ষা। তুই আমার বাসায় চলে আয়। ঊষারঞ্জনের (মাস্টার মশাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সেও পরীক্ষার্থী) সঙ্গে পড়াশোনা করবি, আমিও কিছু কিছু দেখিয়ে দিতে পারব।"

সুতরাং আবার পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাটানগরে। তিনি তখন চ্যাটার্জী পাড়ায় বীরেশ গুপ্ত মশাইয়ের বাড়িতে ভাড়াটে। টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফল করে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসলাম (১৯৫১)। আমি ও ঊষারঞ্জন দু'জনই প্রথম বিভাগে পাশ করলাম। স্কুলে এই প্রথম দু'জন ছাত্র প্রথম বিভাগে পাশ করল। সবাই খুসি, আমরাও গর্বিত।

ইতিমধ্যে আরেক দুর্ঘটনা। স্কুল কমিটির সঙ্গে মতভেদের জেরে মাস্টারমশাই পদত্যাগ করলেন। সুতরাং তাঁর বাসায় আর থাকা চলে না। কিছুদিন সম্পর্কীয় খুড়াদের এবং সম্পর্কীয় বোনের বাসায় কাটালাম। এক ক্লাবের দৌলতে কিছুদিন মুষ্টিভিক্ষা জুটল। কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা কোথাও হচ্ছে না। ওদিকে কলেজে ভর্তির তারিখ শেষ হতে চলেছে। সহপাঠী বন্ধুরা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হচ্ছে, অথচ আমি পড়ে আছি।

শান্তিবাবুর ধর্মের হোটেলে

বাটানগরে শান্তিময় মজুমদার একজন বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বাটা কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী। বাড়ি ছিল নোয়াখালি জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে। পরণে মোটা খদ্দরের পোষাক। ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি বিশিষ্ট ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজসেবায় অগ্রণী। বাটানগরে মা-বাপ, ভাই-বোন-ভাগ্নে, শ্বশুর-শ্যালক, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তাঁর বৃহৎ সংসার। প্রতিবেলায় ২০-২২ জনের পাতা পড়ে। সকালে উনুন জ্বললে তা যেন আর নেভে না। পাকিস্তান থেকেও অনবরত আত্মীয়-অনাত্মীয়রা এসে পাতা পেতে বসে পড়ছে। যেই আসুক তাকে বলেন, এরে দুগা খাই যা (ওহে দুটো খেয়ে যাও)। কেউ কেউ বলত ধর্মের হোটেল। অক্লান্ত অম্লান বদনে মাসীমা (শান্তিবাবুর মা) রান্না করে যাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন।

নলিনীবাবু এবং বীরেশ গুপ্ত (বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী) মশাই শান্তিবাবুকে বললেন— শান্তি, একটা ভালো ছেলে থাকা খাওয়ার অসুবিধায় কলেজে পড়তে পারছে না। তোমার ভাই-ভাগ্নেদের পড়ানোর জন্য ওকে রাখলে, তার কলেজের পড়াটা চলতে পারে। তোমাদের সবাই একমুঠো করে ভাত দিলেই তো ওর পেট চলে যাবে। তুমি দীনেশকে তোমাদের সঙ্গে রেখে দাও না।

শান্তিবাবু এই দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে রাজি হয়ে যান। আমি তাঁর কোয়ার্টারে এসে তার ভাই-ভাগ্নেদের পড়া দেখিয়ে দিতাম এবং খেয়েদেয়ে সেজ ভাই মিন্টুদার সঙ্গে লাইন বাড়িতে এসে শয্যা নিতাম। আমাকে নিয়ে ভগবানের 'ট্রাপিজ' খেলা এতদিনে যেন শেষ হল।

বাটানগরে পেটের খোরাক মনের খোরাক দুই-ই জুটেছে

কলেজে ভর্তি হলাম। সেক্ষেত্রেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেসব কথা আপাতত উহ্য থাক। তবে শান্তিবাবুর পরিবারে চার বছর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবার ফলেই আমার বি-এ পাশ ও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছে। একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করলে নিমকহারামি হবে। আমার এসব দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের কথা মা অথবা মামাদের কখনও জানাইনি।

আর এই বাটানগরে অবস্থানকালেই আমার সাহিত্য সাধনার হাতে খড়ি। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, 'কৃশানু' সম্পাদনা এবং পুস্তক রচনার প্রেরণা জাগে। আর এই সূত্রে এক বিরাট বন্ধু মহল গড়ে ওঠে। সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অসাধারণ পরচিকীর্ষু ও মানবতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আজকাল বিরল দৃষ্ট। আমার এসব হিতৈষী ও শুভার্থীরা আজ কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমি তাঁদের সরব উপস্থিতি মর্মে মর্মে অনুভব করি। আমার স্মরণে মননে তাঁরা চিরজীবী হয়ে আছেন।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

চণ্ডী লাহিড়ী

ভিক্ষা এই সেদিনও ছিল একটি ইনডাস্ট্রি। দশ পনেরো বছর আগেও পথের ধারে মুখ ঢেকে মা বসে, সামনে ঘুমন্ত শিশু, চটের ওপর কিছু খুচরো পয়সা পড়ে। এরকম দৃশ্য গ্র্যাণ্ড হোটেল, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল ইত্যাদির সামনে প্রায়ই দেখা যেত। শিশুটিকে চুরি করা হয়েছে আর জি কর বা মেডিকেল কলেজ থেকে। মা ভাড়া খাটেন। আটঘন্টা ডিউটি অর্থাৎ অসুস্থ শিশুটিকে দেখিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য বরাদ্দ দু'মুঠো ভাত এবং নগদ একটি টাকা। হোটেলের দারোয়ান ও পুলিশকে ঘুষ, মায়ের দৈনিক একটাকা দিয়ে বাকি টাকা কোম্পানীর। হেড অফিস অন্ধ্র। সাহেব গ্র্যাণ্ড হোটেলে এলে যে ভিখারীর দল 'বেগার স্যার, বেগার, নো ফুড স্যার'— বলে সাহেবের পিছনে ঘুরবে— তাদের স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। সাহেব কত দিল সেটা নজর রাখছে আড়ালে বসে একজন। খাতায় সব লেখা হচ্ছে।

এখন শিশু পাচারের ওপর কড়া নজর। গ্র্যাণ্ড হোটেলও তাদের হোটেলের সামনের দিকটি পরিচ্ছন্ন রাখতে চান। ভিখারী বসলে হোটেলের সুনাম নষ্ট হবে। এমনিতে কলকাতার হোটেলের সুনাম নেই।

ভিক্ষার সঙ্গে আমাদের মান-অপমানের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেটা

প্রথম যিনি বুঝেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। মার্কিন দেশে রকফেলার, রথচাইল্ড, ফোর্ড ইত্যাদিরা দুহাতে রোজগার করে মৃত্যুর আগে উইল করে সব টাকা দেশকে দিয়ে যান। এটা সে দেশের রীতি। মার্কিন দেশে কেউ ভিক্ষা করে না। প্রায় প্রতিটি নামী বিশ্ববিদ্যালয় ধনকুবেরদের দানে গড়ে উঠেছে। কৌটো নাচিয়ে ভিক্ষা করে নয়। রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠেছে ভিক্ষার টাকায় নয়। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা আগে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। টাকা চাইতে হয়নি, এসে গিয়েছে এবং এখনও আসছে।

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে আউল বাউল সাঁই দরবেশ সবাই ভিক্ষাজীবী। কেউ ঘর বাঁধে না। সন্তান জন্মায়। সেই সন্তান বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। দুমুঠো ভিক্ষা গৃহস্থ দেবেই। ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়। স্বয়ং নারায়ণ একাধিকবার ভিখারী সেজেছেন। ভিখারী নিজেই নারায়ণ। ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে ধর্মকে যোগ করে যেসব প্রচার অপব্যাখ্যা বঙ্গভূমিতে হয়েছে, যে বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, বিবেকানন্দ একলা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পাঞ্জাবে শিখ হিন্দু আর্যসমাজী সবই আছে। নেই কোনও ভিখারী। হিমাচলে বহু গ্রামে আমি সপরিবারে ঘুরেছি। ভিক্ষাবৃত্তিকে তারা ঘৃণা করে। তামিলনাড়ুতে পক্ষীতীর্থে কোনও ভিখারী চোখে পড়েনি। মহাবালেশ্বরে ছ'জন ভিখারীর পাঁচজন অন্ধ্রের, একজন বাঙালী।

রাঢ়বঙ্গ (বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া) থেকে পশ্চিমে সমগ্র বিহার গত এক হাজার বছরে দশ হাজারবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। অতিবৃষ্টিতে সবই ভেসেছে, অনাবৃষ্টিতে ফসল একেবারেই হয়নি। খরার সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে সব মনুষ্যত্ব এই অঞ্চলের মানুষ হারিয়েছিল। আমার সম্পাদিত (বসন্তকে ১৮৭২-৭৩) খরা ও দুর্ভিক্ষ বিহারকে কিভাবে নিঃস্ব করেছিল, তার খবর আছে। এই ভৌগোলিক কারণটা মাথায় রাখলে বঙ্গদেশে ভিক্ষাবৃত্তির আধিক্যের কারণটা বোঝা যাবে। আজ যে মদগর্বী মানুষটি দামী মোটরের জানালা থেকে দশ টাকার নোট ভিক্ষা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন, সেই সদ্যধনী বাঙালীবাবুটি জানেন না, তাঁর অতি অতি অতি বৃদ্ধ পিতামহ পিতামহী একদা পথে পথে ভিক্ষা করতেন। তিনি এটুকুও জানেন না, তাঁর সেই দূর অতীতের পিতামহ-পিতামহী বিবাহিত ছিলেন না।

অন্ধ্রে এমন কিছু প্রাচীন আদিবাসী রয়ে গেছে, যাঁরা আদৌ কৃষিকর্ম শেখেননি। সরকারি স্তরে চেষ্টা হয়নি এমন নয়। পশু-পাখি শিকার করতে তারা অভ্যস্ত। প্রতি বছর কলকাতার ময়দানে এসে আশ্রয় নিয়ে কাঠবিড়ালি মেরে খেত। কলকাতা কাঠবিড়ালিশূন্য করে দিয়েছিল তারা। রাজভবনের সামনের সেই বিখ্যাত ইঁদুর-কেন্দ্রে হানা দিয়ে গভীর রাতে ইঁদুর ধরে পুড়িয়ে খেয়েছিল। দোষ দিই না তাদের।

সেকালের কথা থাক। একালের কথায় ফিরে আসি।

ইতিহাসের সূচনা পর্বেই দেখি, রাজা পুরু বন্দী রূপে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সামনে আনীত। আলেকজাণ্ডার প্রশ্ন করলেন— বন্দী, তুমি আমার কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর?

পরাজিত সম্রাট পুরু মনে মনে জানেন, তিনি পরাজিত। জাত মান সবই তিনি খুইয়েছেন ভিখারি হারুর মতো। তবু মাথা নত করে উচ্চকণ্ঠে বললেন— একজন রাজার কাছে আর এক রাজা যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে।

ভিক্ষা আমাদের সনাতন ঐতিহ্য। চাণক্য একবার সত্যি কথাটা বলে ফেলেছিলেন— বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। ভিক্ষা করে লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়া যায় না। কেরাণীগিরি করেই কি লক্ষ্মী পাওয়া যায়। চাণক্য বাঙ্গালী নয়। মধ্য ভারতের লোক। তাঁর কথা কানে তুলে বাণিজ্যে মন দেবার কোনও প্রয়োজন বাঙ্গালী বোধ করেনি।

যে ভিক্ষা করতে একবার পথে নেমেছে তার তো মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী— পায়ের শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই।

পনেরো বছর আগে ঘটনা। বর্ধমানের দিকে কোনও এক গ্রামে যাচ্ছি। পুজোর দিনগুলো একটু নিরিবিলিতে কাটাবো। ট্রেনে খুব ভীড়— অধিকাংশ নিত্যযাত্রী। সেই ভীড়ের মধ্যেই এক জীর্ণশীর্ণ যুবক চেঁচিয়ে হাঁক দিল— আজ মহাষষ্ঠী। শেষ সুযোগ। শেষ সুযোগ।

এই অদ্ভুত ঘোষণা কানে যেতেই যাত্রীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলেন— হারু পাগলা। সবাই তাকে চেনে, সবাই তাকে প্রশ্রয় দেয়। আজ শেষ সুযোগ।

হারু পাগলা দশ পয়সা পর্যন্ত নামবে। অন্যদিন ২৫ পয়সার নীচে ভিক্ষা গ্রহণ করে না। আজ মহাষষ্ঠীর পুণ্যদিনে যাত্রীদের পুণ্যার্জনের একটা দুর্লভ সুযোগ দেবার জন্য, নিজের লোকসান হবে জেনেও হারু দশ পয়সায় নেমেছে।

যেখানে মাত্র পাঁচ পয়সা পেলেই সব ভিখারী ধন্য হয়, সেখানে হারু দশ পয়সার কম গ্রহণ করবে না। হারুর যুক্তি অকাট্য— ভিক্ষা করা মানেই তো সম্মান হারানো। পেট ভরবে না অথচ সম্মানহানি হবে, এমন বেহিসাবী কাণ্ড সে করতে রাজি নয়। হারু ভারতের ইতিহাসে খাও-দাও আর ফুর্তি কর— দার্শনিক এগ্রিকিরাসের এই তত্ত্ব সে পড়েনি। তবু গাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে গাড়িওয়ালাদের মতোই আহার করছে।

আমার নিজের চেহারার মধ্যে কোথাও একটা ভিখারীর অধম দৈন্য আছে। প্রায়ই লক্ষ্য করি, ট্রামে-বাসে ভিখারীরা আমার দুপাশের যাত্রীর কাছে হাত পাতে। আমার কাছে হাত পাতেনি। ব্যাপারটা আমার অহংবোধে আঘাত করে। হাতের মুঠোয় পয়সা রেখে দিয়েছি, কিন্তু ভিখারী ভিক্ষা চায়নি। ভিখারীও আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আরও আশ্চর্য, রাস্তার কুকুর আমায় দেখলেই কাছে

কোটো নাচিয়ে ভিক্ষা, বাবু কালচারের নতুন সংস্করণ

এসে লেজ নাড়ে। অচেনা পাড়াতেও।

বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সন্তানরা উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্র পরে হাতে বেলকাঠের দণ্ড নিয়ে 'ভবতু ভিক্ষাং দেহি' বলে ভিক্ষা চান। এই ভিক্ষা আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই দিতে আসেন। কিন্তু অব্রাহ্মণদের কৌশলে দূরে ঠেকিয়ে রাখা হতো। দ্বিজ শব্দটির অর্থ দুবার জন্মলাভ। মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম এবং সন্ন্যাসী হিসাবে নতুন এক জন্ম।

কেরাণীর লজ্জা নামক একটা কাঁচের জামা আছে। সর্বদাই সেটা ভেঙ্গে যাবার ভয়। ঈশ্বরের সাধনা করতে হলে নাকি লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিনটিকেই বিসর্জন দিতে হয়। ভিক্ষার সাধনায় সফল হতে হলেও নাকি এই তিনটি বিসর্জন অবশ্য পালনীয়।

পার্ক স্ট্রীটের এক ভিখারীকে দেখেছি, গাড়ির আরোহী ছাড়া পদাতিক কারও কাছে হাত পাততো না। গাড়ির আরোহীরা ওর নির্দয় হানাদারী থেকে বাঁচার জন্য পয়সা হাতের মুঠোয় রেডি রাখতেন। লোকটিকে একদিন আবিষ্কার করলাম। পার্ক স্ট্রীট ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের জংশনস্থলের এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে। ঠিক আমার সামনের টেবিলে। আমি এই আধা অভিজাত হোটেলে পরের পয়সায় খাচ্ছি। আমার সামনের লোকটি আমার নজর কাড়ার কারণ— একসঙ্গে দই ইলিশ, পাবদা মাছের অর্ডার দিয়েছিল। সেই বিশ বছর আগেও একসঙ্গে দই ইলিশ এবং আঠারো ইঞ্চি মাপের পাবদা মাছের অর্ডার ছিল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

একেবারে নতুন জামাইয়ের মতো পাত সাজিয়ে খাবার ব্যবস্থা। এতটুকুই তাঁরা খাবেন। এরই নাম মাধুকরী। না পেলে উপবাসে থাকবেন। সাধন-ভজনটাই লক্ষ্য। দেহটা টিকিয়ে রাখার জন্য, ভিক্ষা করে সময় নষ্ট করতে চান না তাঁরা। দেহটা তুচ্ছ। একে প্রশ্রয় না দিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় সময়টা ব্যয় কর— এই প্রত্যয়ে অবিচল থেকে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করতে পারেন কেবল উচ্চকোটির সাধকরা। নেড়ানেড়ির দলের লক্ষ্য ভিক্ষা, ঈশ্বরচিন্তা তাদের উপলক্ষ। চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব হওয়া খুব শক্ত। আমার সৌভাগ্য, চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণবকে খুব সামনে থেকে শৈশবে

দেখেছি। শরীর ধারণের জন্য নিম্নতম প্রয়োজন ছাড়া এইসব সাধক কিছু গ্রহণ করেন না।

আমি যুক্তি দিয়ে অব্রাহ্মণদের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ কেন নিষিদ্ধ সেটা আজও বুঝতে পারি না। আমার এক বন্ধু ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন— আগে ছিলাম বাপের ছেলে। এখন হলাম ভিখারীর ছেলে।

মাত্র কয়েকদিন আগে, দক্ষিণ কলকাতার এক উপনয়নে হাজির ছিলাম। ছেলের বাপ বড় কোম্পানির একজিকিউটিভ। ছেলে নেড়া মাথায় জিনস্ পরে মার্কিন দেশ থেকে আগত কোম্পানির অফিসারদের কাছে ভিক্ষা নিচ্ছে। আত্মীয় স্বজনদের কাছে কোনও ভিক্ষা নেওয়া নব-ব্রাহ্মণের কাছে অপমানকর।

ভিক্ষাবৃত্তিকে মহান দার্শনিক মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। সামান্য এক কণা হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য শিখি বৈষ্ণবীকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। শিখি তাঁর অতি প্রিয় শিষ্যা। বৃন্দাবন মথুরায় এখনও বহু বৈষ্ণব আছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে মাত্র পাঁচটি বাড়িতে ভিক্ষা করতে যান। যা পেলেন, যতটুকু পেলেন ততটুকুই তাঁরা খাবেন।

কেবল ভিক্ষা করা নয়। ভিক্ষা দেওয়া এক মহাপুণ্যের ব্যাপার। এদেশে ভিখারী ও ঈশ্বর সমান। ভিখারীকে বিমুখ করতে নেই। দুর্বাসা এসেছিলেন কণ্ব মুনির আশ্রমে। হাঁক দিয়েছিলেন— অয়ম্ অয়ম্ ভো বলে। শকুন্তলা সে সময় অন্য চিন্তায় মগ্ন। সেজন্য শকুন্তলার জীবন হল অভিশপ্ত।

অহংকার হয়েছিল বলি রাজার। স্বয়ং ভগবান বামন অবতার হয়ে ভিক্ষা চাইলেন বলির কাছে। বলির অহংকার চূর্ণ হল।

ঐতিহাসিককালেও দেখি রাজা হর্ষবর্ধন প্রয়াগের মেলায় সর্বস্ব দান করে কটিবস্ত্র পরে ঘরে ফিরেছেন। মনে হয় হর্ষবর্ধনের আমলে ভিখারীরা খুব লোভী ছিল। অল্পে তুষ্ট হত না তারা। কেউ চাইত সম্রাটের মূল্যবান পোষাক, কেউ স্বর্ণ-অঙ্গুরী, কেউ রত্নখচিত কর্ণভূষণ। রাজা কাউকে বিমুখ করতেন না। লেংটি পরে বা বাইবেলোক্ত ডুমুর পাতায় লজ্জাস্থান ঢেকে রাজা হর্ষবর্ধন ঘরে ফিরতেন।

ভিখারীদের মধ্যে কেউ কেউ খুব বাকপটু। এক ভিখারী চা খাবে। সেটি বলার ভাষা হল— একটা টাকা দেবেন বাবু। চা পেয়েছি। বিস্কুট কিনে খাব। খালি পেটে তো চা খেতে নেই।

দুই ভিখারিণীর বাক্যালাপ। বিশ বছর আগে শোনা— পুলিশকে এক টেকা, ফুটপাথ ভাড়া দু টেকা, বাচ্চাটার ভাড়া দু টেকা— সবাইকে দিয়ে হাতে তো কিছুই থাকে না।

শিব্রামদা এক মজার ভিখারীর গল্প শুনিয়েছিলেন— মা আজ পান্তা খাবো না। আমার জন্মদিন। একটু পায়েস দেবেন।

এর চেয়েও কৌতুককর ঘটনা অপেক্ষা করেছিল। যে লোকটি কালো চশমা পরে অন্ধ সেজে শ্যামবাজারে ভিক্ষে চাইত। তাকে একদিন আবিষ্কার করলাম পার্ক স্ট্রীটে। অন্য ভূমিকায়—

— বাবা মারা গেছে। শ্রাদ্ধের জন্য ভিক্ষা চাই।

বললাম— তোমায় তো আমি চিনি। শ্যামবাজারে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করতে।

লোকটি কেঁদে ফেলল। — বাবু, কালো চশমা চুরি হয়ে গেছে। তাই জলজ্যান্ত বাপটাকে মারতে হল।

এখন কুষ্ঠ রোগীদের শহরে ভিক্ষা করতে দেওয়া হয় না। কারণ রোগ ছড়ায়। হাতে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাপড়, মোবাইল গ্রিজ ঢেলে এমনভাবে ঘায়ের রস এবং রক্ত তৈরি করা হয়েছে, যেন মনে হবে সত্যিই কুষ্ঠ রোগী। হাতটা এমনভাবে এগিয়ে ধরবে সে আপনার নাকের কাছে, দুর্গন্ধে হয় নিজে পালাবেন, নয় সত্বর ভিখারীকে পয়সা দিয়ে বিদায় করবেন।

মৃতদেহ খাটিয়ায় তুলে আত্মীয়রা বলহরি ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে চলেছে। পিছনে পিল পিল করে ছুটছে ভিখারীর দল। খৈ আর পয়সা ছড়ানো হচ্ছে। এ দৃশ্য কোনও বড় শহরেই এখন আর দেখা যায় না। ভিখারী কোথায়?

ইনফর্মার কমেছে।

কলকাতার বহু ভিখারী পুলিশের সোর্স। ভিক্ষাটা গৌণ।

স্বপ্নের ঘর-বাড়ি

ডঃ দীপক চন্দ্র

অহনা সফট্‌ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। মাসে ছ'অঙ্কের স্যালারি পায়। টেক হোম স্যালারিও ছ'অঙ্ক থেকে যায়। চাকরী সূত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। সেখানে বাড়ি-গাড়ি সব করেছে। বয়স তিরিশ। সারাদিন অফিস করে যখন ঘরে ফেরে তখন বড় বোর্ লাগে। দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বাড়িতে সে একা থাকে। অত বড় বাড়িতে একা থাকা ডিসগাসটিং। কথা বলার কোনও মানুষ নেই। টিভিটা সর্বক্ষণ একা একা বক বক করে।

অহনার সব আছে কেবল কথা বলার মানুষ নেই। ইদানীং একজন সঙ্গীর অভাবটা ভীষণভাবে অনুভব করে। কাছের একজন মানুষের জন্য মনটা ছটফট করে। এই

মানুষটা অবশ্য তার নিজের হবে। যার ওপর তার একার অধিকার। যাকে পেলে মন আনন্দে ভরে যাবে। যে তার সঙ্গে সুখ- দুঃখের শেয়ার করবে। তার জন্য ফিল্ করবে। তার অনুপস্থিতির জন্য মিস্ করবে। এমন একজন সঙ্গীর ভাবনায় মনটা রাঙিয়ে থাকে।

মা-বাবা বিয়ের জন্য এক সময় উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু সে সময়টা কেরিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। বিয়ের ভাবনাটা মাথায় ছিল না। বিয়েটাকে তখন মনে হত বন্ধন। একটা কিছু অঘটন ঘটে গেলেই আটকে পড়তে হবে তার ফাঁসে। তখন কেরিয়ারটাই বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু অহনা কেরিয়ারের সঙ্গে কোনও আপস করতে রাজি ছিল না। এখন অবশ্য অলাদা কথা, ভাল চাকরী করছে। মাইনেও ভাল পাচ্ছে। এবার নিজের জন্য বিয়েটা করবে ভাবনা। কারণ, কেরিয়ার চাকরী তাকে অনেক কিছু দিয়েছে আবার অনেক কিছু দেয়নি, এ জীবনের আসল মানেটা মিলিত হওয়া।

এক অনাবিল ভাল লাগা নিয়ে জীবনের মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্য এক জীবনের স্বাদ পাওয়ার মাদকতাই আলাদা। আদর করা আদর খাওয়া ব্যাপারটার মতো রোমান্টিকতম ব্যাপারটা না হলে জীবন পরিপূর্ণ হয় না। বিয়ে ছাড়া একজন মানুষের সবটুকু পাওয়া এ জীবনে সম্পূর্ণ হয় না।

মনের ইচ্ছেটা মা'কে বলতে খুব লজ্জা পায় অহনা। বাবা প্রতীক, মা উদিতার কাছে তার বিয়ের চ্যাপটারটা অনেকদিন আগেই ক্লোজ হয়ে গেছে। এখন তারা আর ভাবনা-চিন্তা করে না। কারণ তার মতো মেয়ের পাত্র যোগাড় করা খুব কঠিন। ছ'অঙ্কের মাইনে পাওয়া পাত্রীকে বিয়ে করা পাত্রের সংখ্যা এমনিতে কম। অহনার এডুকেশনও পাত্র পাওয়ার অন্তরায়। যাদের পাওয়া যায় তারা ডানা কাটা পরী চায়। হাই এডুকেশন, হাই স্যালারি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কী ঝঞ্ঝাট প্রতীক, উদিতা ভাল করে জানে। আবার অল্প আয়ের ছেলে কিংবা মেয়ের চেয়ে লেস কোয়ালিফিকেশনের ছেলে তো মেয়ের বায়োডাটা দেখে ছুটে পালায়। সমানে সমানে না হলে মেয়েও বা বিয়ে করবে কেন? অহনার বিয়ে দেওয়া সত্যি এক সমস্যা। প্রতীক অবশ্য যে কোনও বর্ণের ভাষাভাষীর উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্র-পাত্রীর কলমে বেশ কয়েকবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু মেয়ে দেখার পরে সম্বন্ধ আর এগোয়নি।

মেয়ের হাই এডুকেশন, হাই স্যালারি কোনওটাই বিয়েতে কাজে লাগে না। মেয়ের দেহশ্রী এবং গায়ের রঙই হল পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি। অহনার সেই ঘাটতি পূরণ করবে কি দিয়ে? প্রতীক ও উদিতার পাত্র খোঁজাই সার হয়।

অহনার মুখশ্রী দর্শনীয় নয়। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো না হলেও বেশ ময়লা। দোহারা চেহারা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। চাবুকের মতো টানটান শরীরে বুকখানা পাহাড়ের দুটি চূড়ার মতো। হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু তার মুখের গড়ন মেরে দিয়েছে। সহজে হার মানার মেয়ে নয় অহনা। মনে মনে বলে, যে মুখশ্রীর ওপর তার নিজের হাত নেই, সেই মুখশ্রী আর গায়ের রঙ হল তার বিয়ের পথে কাঁটা।

সত্যিই কি তাই? তার চেয়েও দেখতে খারাপ মেয়ে সুন্দর সুন্দর বর পায়। সেক্ষেত্রে বাবারা ছেলে কেনে। তার ক্ষেত্রে তো সে কথা খাটে না। টাকাটা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। ছয় অঙ্কের আয়টাও তার বিয়ের ব্যাপারে কিছু নয়? ছেলের বাবা-মা তার কাছে টাকা চাইবে কি? সে তো সোনার ডিম পাড়া হাঁস। সারা জীবন ধরে তাল তাল টাকা জোগাবে। এতবড় কামধেনুরও বর জোটে না? আসলে হিসেবী বাবা-মা'রা তার মতো মেয়ের দিকে ঝোঁকে না। মানুষের চরিত্রটা এক মস্ত ধাঁধাঁ বলে মনে হয় অহনার। কমপ্যুটারকে পুরোপুরি বোঝা যায়, চিরদিন সে নির্ভুল উত্তর দেয়। কিন্তু মানুষের ভিতরের অনেকখানি মানুষ চিরদিনই ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে প্রায়শই ভুল হয়। সবই সত্য। সময়ও থেমে নেই। জীবনের বেলাও পড়ে আসছে। এত ভিড়ের ভেতর কোথাও কি তার জন্য একটা ছেলে ভগবান ঠিক করে রাখেনি?

বারান্দায় বসে ভাবছিল অহনা, মেয়েদের এডুকেশন, স্যালারি এসবের দাম আছে, আবার নেই। কিন্তু বিয়ের কনে হলে সুন্দরী তাকে হতেই হবে। অন্তত মুখশ্রী ভালো হওয়া চাই। নইলে মেয়ের রোজগার দেখে বিয়ে করতে চায় না। ছেলেও যেখানে ভালো রোজগার করে সেখানে তো টাকাকে বিয়ে করছে না সে। একজন মেয়েকে বিয়ে করছে। যাকে দেখলে মন জুড়িয়ে যায়, হৃদয় প্রফুল্লিত হয়। ভেতরটা খুশিতে ভরে যায় তাকেই তো বিয়ে করে। মুখশ্রী ছাড়া অহনার সব আছে। ওই একটা ব্যাপারে ভগবান তার প্রতি কৃপণ বড়। একারণেই বিয়ের সম্বন্ধটা বারংবার ভেস্তে যাচ্ছে। ভাল লাগার বন্ধনে দুটি হৃদয় বাঁধা পড়লেই তবে বিয়ে হয়, ঘর হয়, নইলে নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে করত সমানে সমানে না হলে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা হয় না। এখন কিন্তু মনের ভেতর আর অন্য হাওয়া বইছে। হাই-ফাই আর কোনও ব্যাপার নয়। ভালবাসার সমুদ্রে অবগাহন করার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। বিয়েটা যদি আনন্দই না হয়ে ওঠে। যদি ব্রত না হয়, পুজো না হয় তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। নিজের ভাবনায় বেহুঁশ হয়ে অহনা ভাবছিল স্বামী-স্ত্রী দুই মেরুর বাসিন্দা কিন্তু এক জায়গায় দু'জনে ভালবাসার

পরম প্রার্থনায় পরস্পরে ভরে ওঠে। শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ছবি ভাসছিল তার দু'চোখের পর্দায়। খুব ইচ্ছে করেছিল কল্পনার অবয়বহীন পুরুষকে বুকের কাছে টেনে নিতে। তাঁর ঠোঁট দুটিকে নিজের ঠোঁটে নিষ্পেষিত করে যত রাগ, অনুরাগ সব শুষে নিয়ে নীলপদ্মের মতো প্রেমকে ফুটিয়ে তুলতে।

ফোন বেজে ওঠায় অহনার ঘোরটা কেটে গেল। হ্যালো বলতেই, পুরুষালি গলায় বলল, ম্যাডাম মেয়ে তো দেখলুম, সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী মেয়েও হার মেনে যায়। মুখের শ্রী পালটানোর জন্য প্লাস্টিক সার্জারী করলে ভালো হয়।

পাত্রপক্ষের বাবার স্পর্ধায় অহনার মুখ জ্বালা করতে লাগল। জ্বালা ধরা গলায় বলল : আপনার মতো ইতর লোকের পরামর্শ কি চাওয়া হয়েছিল? অনধিকার চর্চার অধিকার আপনাকে কে দিল?

আহা ম্যাডাম রাগ করেন কেন? মেয়ে দেখে মতামত জানানোর কথা ছিল। আমাদের ওপিনিয়নটা খোলা মনে জানালাম।

লাইনটা কেটে দিয়ে অহনা নিজের মনে গজর গজর করতে লাগল। বিয়ের মনটাই তার মরে গেল। মনে মনে শপথ করল বিয়ে করলে কার্তিকের মতো ছেলে বিয়ে করবে। নইলে সারা জীবন আইবুড়ো থাকবে। নিজের বর নিজে নির্বাচন করবে। শুরু হলো ইন্টারনেটে মাতৃমনিয়াল ওয়েবসাইটে পাত্র খোঁজা। এখানে পাত্রের বাবা-মা নেই। ছেলের সঙ্গে সরাসরি চ্যাট করে জেনে নেওয়া যায়। কার কি পছন্দ। কিসে আনন্দ, তার লাইফস্টাইল কি, হবি কি? — এসব করতে করতে একদিন অঙ্কুশকে পেয়ে গেল।

অঙ্কুশ ছেলে হিসেবে খুব ভাল। আমেরিকায় থাকে। হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। তার চেয়েও বেশি স্যালারি। হ্যান্ডসাম দেখতে। যেমন গায়ের রঙ তেমনি মুখশ্রী। কিন্তু ছেলেটি একটু উড়নচন্ডী প্রকৃতির। ফলে যা রোজগার করে তাতে কুলোয় না। মাসের শেষে ধার করতে হয়। আসলে তার জীবনদর্শন আর পাঁচজনের মতো নয়, একটু স্বতন্ত্র। খাও-দাও স্ফূর্তি কর। রোজগারটা সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, ভোগের জন্য — যত পার এনজয় কর। টাকা জমানোর পক্ষপাতী সে নয়। সবটাই ভোগের জন্য খরচ করে। ভোগেই আনন্দ ভোগেই সুখ। অহনা তাকে বোঝায় ভোগের কী শেষ আছে? যত পাও তত চাও। আগুনের শিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী। যত ঘি ঢালবে তত দাউ দাউ করে জ্বলবে। এর কোনও নিবৃত্তি নেই। একটা চির অতৃপ্তি নিয়ে শুধু ছটফট করা। অহনা ভেবে দেখল, এরকম ছেলেকে জীবনের পার্টনার করা ভাল। বড় অঙ্কের আয়ের যে অহঙ্কারই তার থাকুক। মাস গেলে বৌ'র কাছে হাত পাততে হবে। তার আঁচলেই বাঁধা থাকবে। টু-ফুঁ করবে না। ঘুড়ি যেমন লাটাইতে বাধা, সেও তার কাছে বাঁধা পড়বে। অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস। বদলাতে সময় লাগে। কিন্তু কোনও খারাপ অভ্যাস অঙ্কুশের নেই। সুরা-নারী কোনটাতে আসক্ত নয়। দামী দামী জিনিস কেনা এবং দু'দিন বাদে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলার বিলাসিতায় প্রচুর টাকা খরচ হয়। টাকা খরচ করাই তার হবি। দূরে কোথাও আউটিং লেনে গাড়িতে নয়, প্লেনের সুযোগ থাকলে প্লেনেই যাওয়া আসা করে। এভাবেই টাকার অপব্যয় করে। অহনা মনে মনে স্থির করল, অঙ্কুশকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। অঙ্কুশও রাজি। কথায় কথায় অঙ্কুশ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা অহনা, তুমি চাকরীটা কর তা নিজের জন্যও তো বটেই। কিন্তু তোমার টাকা কি শুধু তোমারই?

অহনা বলেছিল, আমি যা রোজগার করি তা পরিবারের ভালোর জন্য। টাকা রোজগার করে পরিবারকে যদি হাসি খুশিতে রাখতে না পারলাম সে টাকা আয় করার মানে কি? সবার মুখের তৃপ্তির হাসিটুকু যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দেখে যেতে পারি।

তখনই অঙ্কুশ ই-মেল করে ফটো পাঠান। অহনাও পাল্টা ফটো পাঠাল তাকে। বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল এভাবে। অঙ্কুশই প্রথম বলল, আমরা দু'জন ভালো বন্ধু হতে পারি। আবার চাইলে ভালো দম্পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারি। তোমার আমার মধ্যে বেশ একটা মিল আছে। অমিলটা হল শেলীর স্কাইলার্ক আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো। একজন শুধু চায় নীল আকাশ আর অবাধে উড়ে বেড়ানোর সুখ। আর অন্যজন মানে তুমি হলে ওয়ার্ডওয়ার্থের স্কাইলার্ক। উড়বার জন্য যেমন নীল আকাশ চাই আবার নীড় বাঁধার জন্য পৃথিবীকেও চাই। একজন ইনকমপ্লিট ম্যান অন্যজন কমপ্লিট ম্যান। অহনা উড়ে বেড়ানোর মস্ত আকাশ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সর্বক্ষণ।

অহনা লিখল উড়বার বয়স তোমার। যত পার উড়ে যাও। যখন ডানা ক্লান্ত হবে তখন বিশ্রামের জন্য নিজেই গাছের ডালে বসবে। তখন আমার রূপকথার রাজকুমার পক্ষীরাজের ঘোড়া চেপে সাতসাগর তেরো নদী পার হয়ে আমায় নিতে আসবে। তোমার পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চাপার জন্য আমিও উন্মুখ হয়ে আছি। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে এসে আমায় বরণ করে নাও অঙ্কুশ।

মনের মনটা যে অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে অনুভব করল অহনা। যখন আর খোলা নেই ব্যাপারটা। সবটা সুন্দরভাবে গুটিয়ে আনার ভাবনা। একটা দিন দেখে বিয়ের কথা

পাকা করা। তার আগে অঙ্কুশের বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলা। অঙ্কুশও চায় দু'পক্ষের অভিভাবক মিলে বিয়ের কথা-বার্তা চূড়ান্ত করুক।

উদিতাকে সব বলল অহনা। খুব যে খুশি হল সে তা নয়। ছেলের অশান্ত প্রকৃতি, চঞ্চ ল স্বভাব, টাকা-কড়ির ব্যাপারে বেহিসেবিপনা উদিতাকে চিন্তিত করল। বেশ একটা সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে বলল, আমি আর কী বলব? সারা জীবন এমন ছেলের সঙ্গে ঘর করতে পারবি মনে হলে বিয়ে কর।

তোমার কী মনে হয় মা?

কী বলি বলত? উড়নচন্ডী ছেলেকে বিয়ে করে কতটা বাঁধতে পারবি সে তুই জানিস। এসব ছেলে আনপ্রেডিক্টেবল। খামখেয়ালে চলে। কখন কি মর্জি হবে কে জানে? তুমি যথেষ্ট সাবালক। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে। তুমিই বোঝ। আমি হাঁ-না কিছুই বলব না।

আমার অঙ্কটা একটু অন্যরকম। বেহিসেবি হওয়াটা আমার কাছে প্লাসপয়েন্ট। মাস শেষ হওয়ার আগে হাতখালি হয়ে যাবে, তখন আমার কাছে হাত পাততে হবে। আমার উপর যত নির্ভর করবে ততই অঙ্কুশকে আমার হাতের মুঠোয় থাকতে হবে।

তোমার অঙ্ক ঠিক আছে। কিন্তু তাকে আটকানোর জন্য এটা ভালো টোপ। কিন্তু সে তো গিলতে নাও পারে। দেখা গেল, উল্টে তুমি ব্যুমেরাং হয়ে গেলে। তোমার দুর্বলতাকে ব্রহ্মাস্ত্র করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। তোমার মুঠোয় না থেকে তুমিই ওর মুঠোর মধ্যে থাকবে। যেমন খুশি তোমাকে নাচাবে।

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে অহনা হতাশ গলায় বলল : তাহলে কী হবে মা? আমি কী করব? অঙ্কুশকে আমি কথা দিয়েছি।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কার অঙ্কের কি উত্তর আগে থেকে বলা যায়? এটা শুধু কথার কথা। আবার যা ভাবছি তা নাও হতে পারে। বিয়ের পরে ছেলে-মেয়ে উভয়েই পাল্টে যায়। অঙ্কুশও যে বদলাবে না কে বলতে পারে? বিয়ে হল একটা রিস্ক গেম। সেটা মাথায় রেখেই বিয়ে করতে হয়। ও নিয়ে তোমার অত ভাবার কিছু নেই। ভাববে কেন? আমরা তো আছি। আজই তোমার বাবাকে অঙ্কুশদের বাড়িতে সুখবর জানিয়ে ফোন করতে বলব।

অঙ্কুশের ফটো আগেই দেখেছিল। উদিতার বর হয়ে বিয়ে করতে যখন এল, দেখে চোখ ফেরাতে পারল না। অহনা ঠিকই বলেছিল, স্বর্গের জ্যান্ত কার্তিক ঠাকুর আমার বর। সাঁওতালী মেয়ের মতো কালো দাঁত উঁচু মেয়ের এমন বর হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। অহনার পাত্র জোগাড় করতে তারা স্বামী-স্ত্রী হিমশিম খাচ্ছিল। কিন্তু অহনা নিজের বর নিজেই বাছলো সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে। বরটি এদেশের ছেলে হলে কি হবে, এদেশের ছেলেদের মধ্যে তাকে ধরল না বলে দেশের বাইরে গেল। উদিতাও এমনটি চেয়েছিল। সাতটা নয়, পাঁচটা নয় একটা জামাই। লোকের সঙ্গে গর্ব করে বলার মতো যেন হয়। অঙ্কুশ তার মান রেখেছে। তাকে একটা আলাদা স্ট্যাটাস দিয়েছে। তার কথা বলতে উদিতা আত্মহারা হয়ে পড়ে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তাকে নিয়ে। বলতে বলতে মাত্রা হারিয়ে ফেলে।

উদিতার ছেলে নেই। অঙ্কুশই তার ছেলে। ছেলের মতো ছেলে। রূপে, গুণে, যশে, মানে, অর্থে, বিত্তে সে অতুলনীয়। এমন ছেলেকে জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা। এখন নিজের সৌভাগ্যের গর্বে গর্বিত সে।

অহনাকে চাক্ষুষ দেখেনি অঙ্কুশ। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রথম দেখল। স্বপ্নের মেয়েকে ইন্টারনেটে দেখে যে ভালো লেগেছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করার সময় সেই ভালোলাগাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। মুহূর্তে মুখখানা তার অন্ধকার হল। কেমন একটা বিরূপতায় মনটা ছেয়ে রইল। সই সাবুদের পালা শেষ হয়ে গেলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার দু'জনের দু'হাত এক করে দিয়ে বলল এখন থেকে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। তোমরা ইচ্ ফর আদার - একে অপরের জন্য।

অহনা অঙ্কুশের কানে কানে একটু বেশি বলল : তোমার এই হাত দুটো আমি ভরে দেব। কিচ্ছু ভেব না। কেবল তোমার হাতখানা আমার হাতের ওপর এভাবেই ধরা থাকুক চিরকাল। তা হলেই হবে। এবার বল, তুমি আমারই।

অঙ্কুশের মলিন মুখখানা সহসা হেসে ওঠল। মনে হল চাঁদ হাসল ওর মুখে। মনে মনে বলল, আমার মতো সোনার চাঁদের সঙ্গে তাই তোমার মতো রূপোলী চাঁদের বিয়ে হল। সেটা সব নয়। মন বলে একটা জিনিস থাকেই। মন তো তারের বাজনার মতো। তার ঢিলে হয়ে গেলে সুরে বাজে না আর। ভাবনাটা সেজন্য। কথাগুলো মুখ ফুটে বলতে পারেনি। গলার কাছে কী যেন তার একটা দলা পাকিয়েছিল।

বিয়ে করবে বলে অঙ্কুশ নতুন চাকরী নিয়ে ভারতে এল। লিয়েনে এসেছিল। ভাল লাগলে থেকে যাবে নইলে ফিরে যাবে পুরনো কর্মস্থলে। অহনা যদি যেতে চায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। নইলে মাসে মাসে পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে আসবে তার কাছে। বিয়ের আগে এটাই ছিল অহনার একমাত্র শর্ত। অঙ্কুশের যাওয়া আসার সব খরচ তার। চাকরী তো তার সুখের জন্য, আনন্দের জন্য। তার জীবনে সত্যিকারের গভীর আনন্দ অঙ্কুশ ছাড়া কিছুই নেই। তার জন্য কিছু করতে

পারাই হলো তার পুজো।

দেরিতে হলেও অহনা বুঝল, অঙ্কুশ তাকে চায় না। আবার ঘৃণা করে তাও নয়। তাকে ভালো লাগে না। তার প্রতি আসক্ত সে নয়। তার মধ্যে আদর করা, আদর খাওয়ার মতো রোমান্টিক ব্যাপারগুলোও নেই। তাই তাকে এড়িয়ে চলে। তার মতো দেখতে সুন্দর নয় বলেই হয় তো মনে ধরেনি। এটা যে অহনার কত বড় দুঃখ অঙ্কুশ তার খোঁজ নিল না। আসলে অঙ্কুশের মধ্যে পুরুষটাই কম ছিল। তাই অহনাকে খুশি করার জন্য আর পাঁচজন পুরুষের মতো বলল না, মেয়েরা বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি। মেয়েরা এমন এক জীব — যাকে ভালবাসতে ভাল লাগে, যাকে কাছে না পেলে জীবনটা বড় শূন্য অর্থহীন মনে হয়। একেবারে নিজের মতো করে আদর করতে, বিচিত্র শিহরণে সারা শরীর রোমাঞ্চি ত হয়ে ওঠে। তার মুখে এমন কথা শোনা হল না অহনার। অথচ, তার মেয়ে বন্ধুরা বলে পুরুষের ছোঁয়া পেলে স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনার উচ্চ স্রোত মোমের মতো গলে গলে পড়ে। এরকম কোনও অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়নি অহনা।

অঙ্কুশ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ি থাকে না বললেই হয়। পাছে অহনার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয় তাই অফিস থেকে রাত করে ফেরে। এত শ্রান্ত ও ক্লান্ত থাকে যে খেয়েই শুয়ে পড়ে পরের দিন ভোরের ফ্লাইট ধরবে বলে। মাসের ছাবিবশ দিন ট্যুরে থাকে। এদেশ সেদেশ করে বেড়ায়। তার মধ্যে অহনার কথা ভাবার সময় কোথায় তার?

এক বছর বিয়ে হল তবু দুটো ভালবাসার কথা বলে অঙ্কুশ তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেনি। স্পর্শ না করেও বলতে পারত ভুসকালো সাঁওতালী মেয়ের মতো তোমার আঁটসাঁট শরীরের রোমান্স আমার বুকে যে কী বিচিত্র শিহরণ জাগায় তুমি জান না। তোমার কালো ঠোঁটের ফাঁকে মুলোর মতো সাদা সাদা দাঁত সারিবদ্ধ বুকের পাতির মতো রমণীয়। এটুকু প্রকাশের ক্ষমতাও অঙ্কুশের নেই। অথচ এটুকু পেলেই খুশিতে ভরে ওঠত অহনা। তাহলেই অনাদরের গ্লানিটা মনে লাগত না। অপমানের কাঁটাটা তাতে কম হতো।

দেহমনের যৌবনোচিত চাহিদা মেটাতে একদিনও মিলিত হয়নি তারা। স্বামী-স্ত্রীর কোনও ধর্ম পালন করেনি। অথচ, মা হওয়ার কত স্বপ্ন নিয়ে বিয়ে করেছিল অহনা। অঙ্কুশের অনিচ্ছায় স্বপ্নের সুন্দর বীজ ওঁয়া ওঁয়া করে ভূমিষ্ঠ হল না। পাছে এসব হয় তাই স্পর্শ পর্যন্ত করত না তাকে। বাচ্চা-কাচ্চা, কাঁথা, দুধ খাওয়ানো এসব ছিল তার কাছে বিচ্ছিরি আন-রোমান্টিক। শুধু এই অজুহাত দেখিয়ে অহনার ইচ্ছেটাকে ধামা চাপা দিত।

কামতাড়িত হয়ে অহনাই অভিযোগ করেন; সন্তান না চাইতে পার, কিন্তু সহবাস তো করতে পার। আমারও তো ইচ্ছে হয়। বিয়ে করেছি সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকার জন্য নয়। কিন্তু তুমি ভীষণ নিস্পৃহ। তোমার শরীরে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। তুমি কেমন পুরুষ? আমার কাছে তুমি কি চাও বল তো।

কিচ্ছু না। শুধু মিষ্টি প্রীতির বাঁধনে বাঁধা থাকতে চাই।

তোমার কি ব্যাপার বলো তো? তোমার শরীরের যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে তো? কাম নেই এমন পুরুষ হয়? কাম হচ্ছে শারীরিক সুস্থতার লক্ষণ। তোমার শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হয়। পাছে তোমার অক্ষমতা ধরা পড়ে তাই তুমি সহবাস পর্যন্ত কর না। ইচ্ছেও হয় না তোমার। অথচ, নানা উপায়ে আমি তোমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয় নির্বীর্যের জ্বালা

নিয়ে তুমি দৌড়ে বেড়াচ্ছো। অক্ষমতার লজ্জা লুকোতে আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। এদেশ সে দেশ করছে।

অঙ্কুশ বলল না, বলল : আমার সুন্দর সুখের জন্য আনন্দের জন্য যা কিছু ইচ্ছে তা দমন করার মধ্যেও যে গভীরতম সুখ নিহিত থাকে তুমি তা জান না। তোমার প্রসন্ন মুখে যে আশ্চর্য মুগ্ধ প্রেমের ছবি ফুটে ওঠে তার দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতে ভীষণ ভাললাগে।

তোমার কথা আমি বুঝি না। জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাকে অপ্রাপ্তিতে গড়িয়ে দিয়ে কী সুখ হয় তুমি জান। যা কিছু তোমার দীর্ঘদিনের চেষ্টা। পরিশ্রম দিয়ে তিল তিল করে জমিয়ে তুলেছ। যা কিছু তোমার সর্বৈব, আত্মশ্লাঘার, তার উত্তরাধিকারী না থাকলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। তোমার সমস্ত আমিত্ব তখন অনস্তিত্বে পৌঁছায়। সেই বোধ থাকলে এমন পাগলামি করতে না।

মিষ্টি করে বলল অঙ্কুশ। বলল : ছকে বাঁধা জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও মজা নেই। এমন ভাবধারার পুরুষ আদৌ পুরুষ কিনা সে সম্বন্ধে তোমার গভীর সন্দেহ জাগে, কিন্তু আমি একটু অন্যরকম ছন্নছাড়া হয়ে জীবন কাটালাম।

তোমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার, কিন্তু তোমার খামখেয়ালির জন্য আমার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে দিতে পার না। তোমার মধ্যে পুরুষমানুষটা কম বলে স্ত্রীর কাছে হাত পাততে লজ্জা পাও না; কিন্তু তার ইচ্ছেতে সাড়া দিতে শরম হয়। বলিহারি তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান।

তুমি অনেক কিছু ভাবতে পার। কিন্তু আমার মধ্যে একজন সন্ন্যাসী আছে। আসক্তিতে তার মন নেই। কোনও কিছুতে তার চিত্ত বাঁধা পড়ে না। ঘরের প্রতিও তার টান নেই। অভ্যাসের ঘরে তালা বন্ধ করে ক'জন নিজেকে বৈরাগী করতে পারে?

বিয়ের আগে সে কথা বলনি কেন?

আমি তো বলেছি, সব দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'। সেই ঘরটা যে কোথায় আমি নিজেও জানি না। তাই আমার মধ্যে একজন চিরপথিক আছে। সে আমাকে ঘরে থাকতে দেয় না। আমি চঞ্চ ল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।

এসব ভাবাবেগের কথা শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু এমন মানুষ নিয়ে সত্যি ঘর করা যায় না।

ডার্লিং, আমাকে সামনে বেঁধ না। তোমার খাঁচায় আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। সব সময় মুক্তির জন্য ছটফট করছি। পৃথিবীতে আমি এক ছন্নছাড়া। আমার সব থেকেও কিছু নেই।

একথাগুলো আগে বললে তো নিজেকে সামলে নিতাম।

ম্লান হেসে বলল অঙ্কুশ। তোমার মায়ার ফাঁদে কেমন করে যে ধরা পড়লাম নিজেও জানি না। ভাবলাম, মায়ের পুজোয় নৈবেদ্য পেয়ে দেবতা বুঝি ঘর বাঁধা মন দিয়েছে। তাই রাজি হয়ে গেলাম। এ আমার নিয়তি। তুমি আমি চাইলেও নিয়তির বন্ধন এড়াতে পারতাম না। ও আমাদের ভাগ্যফল।

তেজের সঙ্গে অহনা বলল : ভাগ্যফল তো আমরাই তৈরি করি, তাই না? স্বপ্ন ছিল মনের মতো একজন স্বামী পাব। যে আমার জন্য ফিল্ করবে, আমার ভাল মন্দ নিয়ে ভাববে, আমার সব কিছু শেয়ার করবে। আমার অভাবটা পাওয়ায় ভরে দেবে। কিন্তু কিছুই পূরণ হল না। একটা বছর এক ছাদের নীচে বাস করলাম। কিন্তু কি পেলাম তোমার কাছে? প্রেম, ভালোবাসা, আদর, সন্তান কিচ্ছু না। শুধু বিবাহিত এটুকুই বলতে পারি।

একজন মেয়ের মা হওয়াটাই সব নয়। অনেক বড় সামাজিক কর্তব্য করেও মহৎ মানুষ হয়ে যেতে পারে।

অহনার ভীষণ কান্না পেল। গলা ধরে গেল। বলল : সবার আগে আমি একটি মেয়ে। মায়ের জাত। সন্তান ধারণ করা, জন্ম দেওয়া, প্রতিপালন করা এবং তাকে সুস্থ, সুন্দর, পরিপূর্ণ একজন মানুষ করে সমাজকে উপহার দেওয়া হল আমার মহান সামাজিক কর্তব্য। স্বামী তার সহযোগী, তার মহান সামাজিক কর্তব্য পালনের শরিক। তোমার মধ্যে সে ইচ্ছেটা নেই। একবারও বোঝ না একটা মেয়ের মা হতে না পারাটা তার কত লজ্জার। তাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হয়। তোমার বাবা-মা আমাকে দুষছে, তাদের সন্দেহ নারীর দোষেই সন্তান আসে না। কিন্তু দোষটা যে আমার নয়, তাদের নির্বীর্য সন্তানের সংসার করতে নেমে যে সন্ন্যাসী হয়ে আছে। স্ত্রীকেই তার সবচেয়ে ভয়। যন্ত্রটাই তার বিকল। এসব কথা কাকে বলব? নিজের মাকেও বলা যায় না। এমন কি বন্ধুদেরও বলতে লজ্জা হয়। কী করে বলব বিয়ের পরে কামশীতলতার কারণে আমাদের দৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি।

অঙ্কুশ কি বা বলবে। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল : আমি শীঘ্রই স্টেটসে যাচ্ছি। তুমিও চল।

লাভ কিছু আছে।

লোকসানও তো কিছু নেই। স্টেটসে তোমাদের কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আছে। ওখানে ট্রান্সফার নাও। তারপর পছন্দের মতো চাকরী পেলে পুরনোটা ছেড়ে দিও। দু'জনে থেকে যাব।

অহনা কোনও ভূমিকা না করে বলল : যেতে পারি যদি সন্তান দিতে পার।

অঙ্কুশ সবিস্ময়ে বলল : অহনা।

অবাক হয়ো না অঙ্কুশ। সব বিবাহিত নারী সন্তান চায়। কারণ

সংসার ও সমাজের কাছে তারা দায়বদ্ধ। একজন শিশু না হলে সংসারটা সংসার হয়ে ওঠে না। তাকে ছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও সেতু তৈরি হয় না। সে যে আনন্দ, বাঁচার স্বপ্ন, জীবনের প্রত্যাশা।

অঙ্কুশ ঘাড় নাড়ে। অহনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার খুব কাছে। হঠাৎ অঙ্কুশের মধ্যে যেন কী ঘটে গেল। হঠাৎই অহনাকে জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। চোখ বন্ধ করে চুমু খেল। তার রুক্ষ, উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল অহনার নরম ঠোঁটে সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততা! অহনার মনে হল দীর্ঘ তপ্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি নামল। ভালো লাগার সুখে, আনন্দে তৃপ্তিতে তার ভেতরটা ভরে উঠতে লাগল দ্রুত।

মুখে বলল অহনা : আঃ। লাগে। ছাড় না। তুমি যেন কী।

অঙ্কুশের দু'হাঁটু থরথর করে কাঁপছিল। শরীরের মধ্যে যে এত তাপ জমা ছিল তা জানা ছিল না ওর নিজেরও। অহনাকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল : অহনা আমি তোমারই।

অহনা হাসে। জয়ের হাসি। তারও শরীরের কোষে কোষে তখন আগুন। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় অঙ্কুশকে বুকে টেনে নিয়ে নিজেকে অনাবৃত করল। অঙ্কুশের অবস্থা ভয় পাওয়া কাঠবিড়ালীর মতো। ভয় মিশ্রিত উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। মিষ্টি করে বলল : প্লিজ অহনা। শরীরের মধ্যে টেনে এনে এমন সুন্দর মিষ্টি সম্পর্কটা তেতো করে দিও না। শরীরের মধ্যে সত্যি কিছু নেই। শরীরী উত্তেজনার কাছে মানব-মানবী বড় অসহায়। তুমি এই ইচ্ছাহীন মনহীন শরীরহীন মানুষটাকে পাবে না।

অঙ্কুশের চোখের দিকে চোখ পড়তেই অহনার কী যেন হয়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। তারপর বালিশে মুখ দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বালিশের মধ্যে তার ইচ্ছে ও স্বপ্নের জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণ।

।। দ্বিতীয় পর্ব।।

ছ'বছর পর।

এদেশ-ওদেশ করে ক্লান্ত হয়ে অঙ্কুশ স্বদেশে ফিরল। অহনা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে তাকে আনতে গেল। গাড়িতে অহনার পাশে বসে অঙ্কুশ বলল : ডার্লিং উড়ার সাধ মিটেছে। আর ভালো লাগে না। ডানা জোড়া সত্যিই ক্লান্ত। দাঁড়ের পাখি দাঁড়ে ফিরল।

অহনা নিজের মনে গাড়ি চালাচ্ছিল। পথের ওপর চোখ রেখে বলল : খাঁচার পাখি তো তুমি নও। খাঁচার কিংবা দাঁড়ের মোহ তোমার থাকার কথা না।

কে বলল, আমার জীবন খাঁচা তো তুমি। পালাতে চেয়েও পালাতে পারলাম কৈ?

ধরা দিতে চাও না বলে আমিও তোমার দোর আগলে বসে নেই। জোর করে প্রেম ভালবাসা হয় না। তুমি তো আমায় ভালবাসনি। অসুন্দর বলে ঘৃণা কর। তবু তোমার এক ফোঁটা ঔরসে ঘৃণার রক্ত মাংসের এক ওঁয়া ওঁয়া রক্তের দানা গর্ভে নিয়ে ধন্য হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটুকুও পেলাম না। ওইটুকুর অভাবে মা হওয়া আটকে রইল। অবশ্য অন্য কোনও পুরুষের সাহায্যে মা হতে পারতাম। কিন্তু শিক্ষা, রুচি, সংস্কারের জন্য পারিনি। প্রবৃত্তিও হয়নি। আজ চারবছর ধরে তুমি বিদেশে আছ। তোমার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক, দৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভারী অদ্ভুত তাই না?

আমি বড় স্বার্থপর। খালি মনে হয় তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে।

গাড়িটা হাউসিং কমপ্লেক্সের মধ্যে সটান ঢুকে দাঁড়াল। অহনা বলল : মালপত্তর নিয়ে তুমি লিফটে ওঠ। ততক্ষণে গাড়িটা পার্ক করে আমি যাচ্ছি।

অহনার কোমর জড়িয়ে ধরে অঙ্কুশ ঘরে ঢুকল। আমার ডার্লিং বলে তাকে একটা চুমুও দিল। দু'হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে উপর্যুপরি চুমু খেল। অহনা তাকে জোর করে সরিয়ে দিল। বলল : ছাড়! তোমার এসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগছে না। লাগছে।

অঙ্কুশ আদুরে গলায় বলল : মাই সুইট ডার্লিং!

বড় বড় চোখ করে অহনাকে দেখতে লাগল অঙ্কুশ। কিন্তু অহনার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। সে ভীষণ নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত থাকল। অভিমান উথলে উঠল তার গলায়। বলল : তোমার মধ্যে এত উচ্ছ্বাস আগে দেখিনি, আমাকে সুন্দর দেখতে নয় বলে তোমায় ভালো লাগেনি। আদর করা তো দূরে থাক গায়ে হাত পর্যন্ত রাখনি। আমাকে বিয়ে করলে কেন? এই বিয়েকে মন দিয়ে মেনে নিতে পারনি বলে প্রতিনিয়ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল তোমার মধ্যে, প্রথম প্রথম বুঝিনি কার সঙ্গে কোথায় তোমার লড়াই? কিন্তু এখন সব পরিস্কার হয়ে গেছে। আমার টাকাটা তোমার খুব দরকার ছিল। থাক ওসব কথা। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠবে।

সম্মোহনী স্বরে ডাকল অঙ্কুশ : অহনা!

ওই মায়াবী ডাক শুনে অহনাও চমকাল। ওই ডাক কেমন যেন আচ্ছন্ন করল তাকে। ওর মুগ্ধ দু'চোখের ওপর চোখ রেখে অঙ্কুশ বলল : সবদিন একভাবে সূর্যোদয় হয় না। আমার মনেও দিন বদলের হাওয়া লাগতে পারে। সেটা বিজ্ঞানের জন্যই সম্ভব

হয়। বিজ্ঞানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'না' যে কখন 'হ্যাঁ' হয়ে যায় বিজ্ঞানই জানে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমার এখন অন্য জন্ম হল। এখন সব ঠিক আছে। তাই তীব্রভাবে একটা মানসিক চাহিদা অনুভব করি। আমার অনেক অপূর্ণতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল মানবশিশুর জন্য একটা আকূতি। দেরিতে হলেও সে অনুভূতিটা আমাকে ঘরমুখো করল। বলতে পার তোমার আমার মধ্যে যে দেয়ালটা ছিল তা আর নেই। এভাবে মানুষই কেবল বদলাতে পারে নিজেকে।

অবাক চোখে অঙ্কুশের দিকে তাকিয়ে অহনা তার মনের জরিপ করতে লাগল। মানসিক টানটা তার সত্যি কতখানি আন্তরিক এবং বাস্তব। অনেক বছর পরে তাদের সম্পর্কটা বোধ হয় নানা বাঁকের মুখে আজ একটা সুন্দর মানবিক সম্পর্কের মোড় নিয়েছে। নতুন প্রাণের ভাষা তো নতুন হবে। প্রেম প্রেম খেলায় ভালো লাগা, ভালোবাসার কত কথা বলে তাতে সম্পর্কটা রোজ সুন্দর হয় মানবিক আবেগের রসায়নে।

একটা ঘুমঘুম ভাবের মধ্যে ছিল অহনা। ঘুমটা খুব গভীর নয়, হাল্কা। তবে ঘুম জড়ানো চোখের তারায় দেখতে পাচ্ছিল লক্ষ লক্ষ ব্যাঙাচি কিলবিল করছে। জরায়ুর মধ্যে একটা নদী। সেই নদীটা ওরা সাঁতরে চলেছে। যেই ডিম্বাশয় হাতের কাছে পেল, অমনি ধরল তাদের। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। হাড় মাংস সব সৃষ্টি হল। বেশ একটা ঝড় ওঠেছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর থেমে গেল। মনে হল কোথাও যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে। তৃষ্ণার্ত জরায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল। জল পেয়ে দ্রুত নধর হয়ে উঠল। যেন ভরাট ভেজা ভেজা এক সবুজ প্রান্তর। শরীরটা আরও ভারি ভারি বোধ হল। মনে হল বুকটাও দুধের নদী হয়ে গেছে। আর তার পাশে শুয়ে আছে ছোট্ট ফুট ফুটে একটা মেয়ে। স্বাভাবিক প্রবণতায় পয়োধর খুঁজছিল নধর বুকের সব রসটুকু শুষে নেওয়ার জন্য।

বেলা হয়ে যেতে অঙ্কুশই তার ঘুম ভাঙাল। বলল : ক'টা বাজে জান? অন্যদিন এসময় সব কাজ হয়ে যায় তোমার। আজ শুরু করনি এখনও। কাম অন, অহনা, অঙ্কুশ হাতখানা অহনার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল : তাড়াতাড়ি কর। অফিসে যাবে না?

অঙ্কুশের তাড়ায় ভোরের সুন্দর স্বপ্নের মাদকতাটাই কেটে গেল তার। বলল : তুমি বড় বেরসিক। দিলে তো আমার স্বপ্নের রোমান্সটা ছিন্নভিন্ন করে?

স্বপ্ন?

এবার তাহলে বীজ পুঁতে দিতে পেরেছি তো?

পেরেছ? অবাক হওয়ার কী আছে? ভোরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না, জান?

আমার ডানাদুটো ছাঁটতে চেয়েছিলে, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তো?

কেন তুমি খুশি নও?

যুগযুগান্তরের এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে অঙ্কুশ অহনার গায়ের ওপর শরীরটা এগিয়ে দিয়ে বলল : জান একটা ছোট্ট শিশু হয়ে মায়ের বুকের খুব কাছে শুয়ে আছি আমি।যে মা কোনওদিন সন্তান পছন্দ করত না সে মা কেমন একটা মায়া মমতায় আমাকে বুকে টেনে নিয়ে স্তন দিচ্ছিল। আর আমি পরম নির্ভয়ে দু'চোখ বুজে আগাম তৃপ্তিতে মাতৃ সুধারস পানে বিভোর হয়ে গেছি।

হাতের ওপর মাথা রেখে অহনা অঙ্কুশের দিকে তাকিয়ে বলল : অপূর্ব। দু'জনের স্বপ্নে একটা অদ্ভুত মিল আছে। আশ্চর্য লাগছে — একদিন সন্তানের কথা বললে ছুটে পালাতে, এখন পিতা হওয়ার সুন্দর স্বপ্নে মশগুল।

স্বপ্ন দেখার জন্য অনেক ডাক্তারের সঙ্গে মিট করেছি। ইংল্যান্ডের এক হরমোন চিকিৎসক আমাকে মনোবিদের কাছে পাঠান। পুরুষত্বের প্রতি আমার একটা লুকোনো ঘৃণা ছিল। মেয়ে হয়ে না জন্মানোর জন্য আমার খুব কষ্ট ছিল। দেহে মনে পুরুষ হয়েও কোনও মেয়ের সঙ্গে রতিক্রিয়া করার সময় আমার সব উৎসাহ দপ করে নিভে যেত। এখন সেটা গেছে। গেছে বলেই এক্সটেনশনের বীজটা পুঁতে দিতে সফল হয়েছি।

অহনা প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল : ছাড় তো ওসব কথা। আমার বুঝি লজ্জা করে না। এখন বাবা হতে কেমন লাগছে বল।

কী বলব বলো? তবে আমার পায়ে তুমি শিকল পরাতে পেরেছ। অমন করে বল না। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। এই অ্যাকসিডেন্টটা না হলে তুমি বাবা হতে না বুঝলে মশাই। তোমার এক ফোঁটা বীর্যের কী ভীষণ শক্তি। ওইটুকু না হলে একটা মেয়ে মাথা ঠুকে মরলেও কিছু হবে না। বীজটি পুরুষের কাছে জিম্মা রেখে ভগবান মেয়ে মানুষকে তার কৃপাপ্রার্থী করে রেখেছে।

ওইটুকুর জোরে পুরুষ মানুষ কদর পায় তোমাদের কাছে। নইলে, এ সংসারে তার কানাকড়ি দাম নেই। মা হয়ে এখন তোমার কেমন লাগছে।

বলব কেন? তারপর একটু পরেই অঙ্কুশের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, মনে হচ্ছে এতদিন পরে স্বপ্নের ঘর-বাড়ি পেলাম।

ঘুম জড়ানো চোখে অহনা কাজের লোককে চা করতে বলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর অঙ্কুশকে ধরে বসল। ✪

পদার্থবিদ্যা— জড় থেকে চৈতন্য

সুমিত চক্রবর্তী

"The only possible alternative is simply to keep to the immediate experience that consciousness is a singular of which the plural is unknown; that there is only one thing and that what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing, produced by a deception (the Indian Maya); the same illusion is produced in a gallery of mirrors, and in the same way Gaurishankar and Mt. Everest turned out to be the same peak seen from different valleys."

(Erwin Schrodinger, Q by N. C. Panda, Maya in Physics, p.237)

গ্যালিলিও

নিউটন

আমরা যাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞানের যুগ বলি, তার শুরু হয়েছিল মোটামুটি আজ থেকে চারশ বছর আগে। এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যায় গণিত শাস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ করলেন গ্যালিলিও। তিনি সফলভাবে প্রমাণ করেন, প্রকৃতি গণিতের অনুশাসন স্বীকার করেই চলে। তাঁর সময় থেকেই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার যাত্রা শুরু। তাঁকে অনুসরণ করেই নিউটন সৃষ্টি করলেন গতিবিদ্যার তিনটি এবং মহাকর্ষের একটি অবিস্মরণীয় সূত্র। বিজ্ঞান শাস্ত্রে পরবর্তী তিনশ বছর হল নিউটনের যুগ। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা যেমন রসায়ন, জীববিদ্যা থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসাশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান তো বটেই, এমনকি যেগুলিকে আমরা সমাজবিজ্ঞান বলি যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বা দর্শনেও প্রয়োগ হতে লাগল নিউটনের বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণাগুলি, যাদের উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর বিজ্ঞানশাস্ত্রকে গড়ে তুলেছিলেন) সংক্ষেপে সেগুলি হল:

১. ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব অস্তিত্ব আছে দর্শন বা চৈতন্য নিরপেক্ষ ভাবে। দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড অচেতন জড়পদার্থ, যা কেবল গতিবিদ্যার তিনটি এবং মহাকর্ষ সূত্রের একটি নিয়মের অধীনে থেকেই ক্রিয়াশীল হতে পারে। সুতরাং সমগ্র বিশ্ব একটি যন্ত্র মাত্র।

২. মহাকাশ অনাদি, অনন্ত, নিরপেক্ষ, চিরস্থির এবং পরম শূন্য। এই স্থির এবং শূন্য মহাকাশে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে মহাকাশকে কিছু মাত্র প্রভাবিত না করে।

৩. সময় অনাদি, অনন্ত এবং সর্বনিরপেক্ষ। সে বয়ে চলে তার নিজস্ব নিয়মে এবং ধ্রুব গতিতে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে। এই গতিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

৪. কার্যকারণ সম্পর্ক প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। সময়ের সাপেক্ষে প্রথমে কারণের আবির্ভাব ঘটে এবং তার পরেই কার্য দেখা দেয়। এর বিপরীতটি কখনও ঘটা সম্ভব নয়।

৫. বিশ্বের মূল উপাদান হল বিশাল সংখ্যক অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা। এই বস্তুকণাগুলি অক্ষয়, অব্যয়, অচ্ছিদ্র, দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। স্থির মহাকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি সর্বদাই গতিশীল।

৬. উপরের সিদ্ধান্তগুলির একটি অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্ত হল নিশ্চয়তাবাদ। অন্ততঃ তত্ত্বগত ভাবেও দূরতম অতীত এবং সুদূর ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা বা জানা সম্ভব।

৭. সমস্ত বিশ্বের যে কোন বিন্দুতে যে কোন দর্শকের জন্যই সময়ের ধারণাটি ধ্রুবক।

৮. মহাকর্ষ শক্তি বিশাল দূরত্বেও ভরযুক্ত বস্তুকণার উপর তাৎক্ষণিক ভাবে কাজ করে।

পরবর্তী তিনশ বছর ধরে নিউটনীয় বিজ্ঞানের ছিল অপ্রতিহত প্রতাপ। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মানুষের চিন্তা ও কর্ম সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিল নিউটনীয় দর্শনের দ্বারা। বাস্তবেও দেখা যায়, তখন পর্যন্ত জ্ঞাত বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি তত্ত্ব নিউটনের অনুশাসন প্রায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে। এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় গতিবিদ্যা, যাকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা গেল না নিউটনীয় তত্ত্ব দিয়ে। উনবিংশ শতকের শেষে বিজ্ঞান এসে দাঁড়াল এক যুগসন্ধিক্ষণে। ইথারের অস্তিত্ব বিষয়ে মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা, তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার, পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন, লোরেঞ্জ-ফিটজেরাল্ড আবিষ্কৃত পদার্থের সংকোচন বিষয়ক তত্ত্ব, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদ, আলোক-তড়িৎ প্রভাব ইত্যাদি নানা প্রাকৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধ্রুপদী বা নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা সম্মুখীন হলো এক বিশাল ভূকম্পনের।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর তিনটি প্রবন্ধে আমাদের পরিচিত নিউটনীয় বিশ্বের আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে দিলেন। আমরা প্রবেশ করলাম এক অদ্ভুত 'আপেক্ষিক এবং চতুর্মাত্রিক' জগতে। বৈজ্ঞানিকেরা বুঝলেন, নিউটনের জগৎ বা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। এই জগতের উপরে এবং গভীরে আছে আরও অন্য অনেক জগৎ, যারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত। আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রে বললেন,

১. বিশ্বের যে কোনও স্থানে দর্শক নিরপেক্ষভাবে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি একই।

২. মহাশূন্যে আলোকের গতিবেগ সর্বদাই ধ্রুবক। আলোকের কণিকা হল ফোটন।

আমরা সংক্ষেপে দেখি তাঁর তত্ত্ব নিউটনীয় বিশ্বে কি ভূকম্পের সৃষ্টি করল।

১. তিনি বললেন, দেশ এবং কাল দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বাধীন ধারণা নয়। এইদুটি মিলিয়ে একটি অখণ্ড সত্তা হল 'দেশকালসন্ততি'।

২. বিশ্ব ত্রিমাত্রিক নয়, চতুর্মাত্রিক। এই চতুর্থমাত্রাটি হল কাল বা সময়।

৩. দেশ বা মহাকাশ শূন্য নয়, এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

৪. কোন বস্তুকণা আলোকের কাছাকাছি গতিতে চললে স্থিরভূমিতে দাঁড়ানো দর্শকের কাছে তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে, ভর বৃদ্ধি পাবে এবং সময় ধীরলয়ে চলবে। ফলে দেখা গেল, বস্তু বা দেশকাল দর্শক নিরপেক্ষ কোনও চরম ধারণা নয়, দর্শক ভেদে এটি পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অনেক বৈজ্ঞানিকদের বর্তমান মত হল — দেশকাল বোধটি মানুষের মনেরই সৃষ্টি, মানসিক ক্রিয়া ছাড়া দেশকালের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

৫. ভরযুক্ত কোনও বস্তুর গতি আলোর সমান হতে পারে না। স্বীকার করা হল, স্থির অবস্থায় ফোটনের ভর শূন্য। কিন্তু মহাশূন্যে গতিশীল অবস্থায় ফোটনের ভর সৃষ্টি হয়।

৬. বস্তুকণা এবং শক্তি একই মূল সত্যের দুটি ভিন্ন রূপ। ভরের নিত্যতা সূত্র এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র আসলে একই তত্ত্ব, সেটি হল ভর-শক্তির নিত্যতা সূত্র।

৭. মহাশূন্যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হয় অতিক্ষুদ্র শক্তিকণিকার আকারে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ফোটন। সমস্ত তড়িৎচুম্বকীয় শক্তিই মহাশূন্যে শক্তিকণিকার আকারে প্রবাহিত হতে পারে। এর দ্বারা গ্যালিলিও-নিউটনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় গতিবিদ্যাকে একটিমাত্র তত্ত্বের অধীনে আনা সম্ভব হল।

মহাকর্ষ শক্তির ব্যাখ্যায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইন সৃষ্টি করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের। চতুর্মাত্রিক বিশ্বে ইউক্লিডের ধ্রুপদী জ্যামিতি প্রয়োগ করা যায় না, এখানে প্রয়োগ করতে হবে রীম্যান জ্যামিতি, যার আবিষ্কর্তা ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউস এবং তাঁর শিষ্য রীম্যান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁরা এই জ্যামিতির নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিশুদ্ধ গাণিতিক ধারণা হিসাবে। প্রকৃতিতে এই জ্যামিতির কোন উদাহরণ থাকতে পারে, তা তাঁরাও কল্পনা করেননি। বিংশ শতকের প্রথমে আইনস্টাইন এবং মিনকৌস্কি প্রমাণ করলেন, চতুর্মাত্রিক বিশ্ব রীম্যান জ্যামিতির শাসন স্বীকার করে চলে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কয়েকটি সিদ্ধান্ত এরকম:

১. চতুর্মাত্রিক বিশ্ব সমতল নয়, গুরুভার বস্তুর প্রভাবে এটি স্থানে স্থানে বক্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দেশকালকে একটি টানটান অবস্থায় থাকা রবারের চাদরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার কোনও বিশেষ বিন্দুতে ভারী বস্তু অবস্থান করলে চাদরটির সেই স্থানে একটি গভীরতার সৃষ্টি হবে।

২. এই চতুর্মাত্রিক দেশকালের মধ্য দিয়ে চলবার সময় ভরযুক্ত কণা এই বক্রতাকে অনুসরণ করে। সাধারণভাবে কোনও বস্তুকণা দেশকালের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে অগ্রসর হওয়ার সময় ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের পথটিকে অনুসরণ করে, যা সমতলক্ষেত্রে একটি সরলরেখা। কিন্তু চতুর্মাত্রিক বিশ্বে এটি একটি বক্ররেখা। পৃথিবীর স্বাভাবিক গতি হল একটি সরলরেখা, কিন্তু সূর্যের মহাকর্ষ প্রভাবক্ষেত্র

এই সরলরেখাটিকে বাঁকিয়ে একটি বদ্ধ উপবৃত্তে পরিণত করে।

৩. আমরা দেখেছি, কোন দর্শক যদি আলোর গতিতে অগ্রসর হয় তবে বহিঃস্থিত দর্শকের কাছে প্রথম দর্শকের জগতের সময়টিকে স্থির বলে মনে হবে। মহাকর্ষের প্রভাবেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটতে পারে। তীব্র মহাকর্ষযুক্ত অঞ্চলে সময়ের গতি ধীরলয়ে চলছে বলে মনে হবে। যেগুলিকে কৃষ্ণগহ্বর বলা হয়, সেগুলির অভ্যন্তরে সময়ের গতি হবে শূন্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

৪. এই চতুর্মাত্রিক বিশ্ব অনন্ত কিন্তু একটি বদ্ধ ক্ষেত্র। কোন দর্শক যদি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ক্রমাগত তার সামনের দিকে চলতে থাকে তবে কয়েকশ' বা কয়েক হাজার কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের পরিসীমা প্রদক্ষিণ করে তার যাত্রার আদিবিন্দুতে সে ফিরে আসবে। ফলে বোঝা যায়, চতুর্মাত্রিক বিশ্ব একটি বদ্ধ ক্ষেত্র।

৫. মহাকর্ষ বল এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে কোনও বস্তুকণার গতি পরিবর্তনের হার (ত্বরণ) — এই দুটি ধারণা প্রকৃতপক্ষে এক। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক্ কোন একজন চোর চুরি করে পালাবার সময় তার মাথায় একটি বিশাল ভারী বাক্স নিয়ে কয়েকতলা বাড়ির উপর থেকে লাফ দিল। মাটিতে পড়ার পর তার কি হবে, সেটি যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা মনে না রাখি, তা হলে বলা যায়, যতক্ষণ সে শূণ্যে ত্বরণযুক্ত অবস্থায় গতিশীল, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাথার উপরের বাক্সটির জন্য কোন চাপ বা ভার অনুভব করবে না। সেই মুহূর্তে তার মাথায় বাক্সের উপস্থিতি-জনিত মহাকর্ষ বল শূন্য।

৬. চতুর্মাত্রিক বিশ্বে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কোন কালবিভাগ নেই। সেখানে কেবল একটি বর্ণনাই প্রযোজ্য হতে পারে, তা হল একটি অবিনশ্বর এবং স্থির বর্তমান, একটি চরম সর্বব্যাপী অস্তিত্ব।

৭. চর্তুমাত্রিক বিশ্বে কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে কিছু থাকতে পারে না। সেখানে কারণ ও কার্য একই সঙ্গে অস্তিত্ববান্। সেখানে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ, কালাতীত এবং চরম এক অস্তিত্ব। কাজেই আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতাবাদের আবশ্যক অনুসিদ্ধান্ত হল, কার্য-কারণবাদের অবলুপ্তি, যা নিউটনীয় বিশ্বের একটি অপরিবর্তনীয় লক্ষণ।

গ্যালিলিও, নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত সকলেই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করার জন্য যে গাণিতিক সূত্রগুলির সৃষ্টি করেছেন, তার কোনটিই অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। গাণিতিক সূত্রে সময়-জ্ঞাপক রাশির মান ধনাত্মক (ভবিষ্যৎবাচক) বা ঋণাত্মক (অতীতের সূচক) যাই বসানো হক, সূত্রগুলি দুইক্ষেত্রেই সমান সত্য, সমান কার্যকরী বলে দেখা যায়। ফলে কাল সম্পর্কে আমাদের দৈনন্দিন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা) কালের গতি সর্বদাই একমুখী) তার কোন সমর্থন এই তত্ত্বগুলিতে পাওয়া যায় না।

আমরা পদার্থবিদ্ ডি ব্রগলির মন্তব্য শুনতে পারি,

"In space-time, everything which for each of us constitutes the past, the present and the future is given en bloc.... each observer, as his time passes, discovers, so to speak, new slices of space-time which appear to him as successive aspects of the material world, though in reality, the ensemble of events constituting space-time exist prior to his knowledge of them."

(Q by Fritjof Capra, The Tao of Physics, p.172)

আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই যখন বুঝতে পারি, ডি ব্রগলির মুখে আমরা শুনতে পাচ্ছি এক সুপ্রাচীন ভারতীয় ঋষির উপলব্ধির প্রতিধ্বনি। ব্যাসদেব উচ্চারণ করেছিলেন এই বাক্যটি : "এক এব ক্ষণঃ, তস্মিন্ একস্মিন্ এব ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামং অনুভবতি।"

'ক্ষণ একটিই। সেই একটি মাত্র ক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিণাম অনুভব করে থাকে।'

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বার বার উল্লেখ করেছেন এই শ্লোকটির কথা। একটি হল আমাদের দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত্রিমাত্রিক জগৎ। এখানে ক্ষণ আবির্ভূত হচ্ছে অনন্ত কালপ্রবাহরূপে। আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি, কাল প্রবাহিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে, বর্তমানের মধ্য দিয়ে। ভবিষ্যতের বর্তমানে এবং বর্তমানের অতীতে পরিবর্তিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া, এটি আমাদের মনের সৃষ্টি, মনেরই একটি ভ্রান্তিমাত্র। এটিকেই ব্যাসদেব বলছেন, পরিণাম অনুভব করা। এর আরও একটি অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হল কার্যকারণবাদ। আমরা এটাও অনুভব করি যে প্রতি মুহূর্তে কারণ পরিবর্তিত হচ্ছে কার্যে এবং পরমুহূর্তে সেই কার্য দেখা দিচ্ছে পরবর্তী আরও একটি কার্যের কারণরূপে। এই ভাবে স্থূল জগতে (বিজ্ঞানের ভাষায় যেটিকে নিউটনীয় বিশ্ব বলতে পারি) আমরা বদ্ধ হয়ে আছি কার্যকারণের একটি অনন্ত শৃঙ্খলে, যেটিও মনেরই ভ্রান্তি বা মায়া।

এর উপরে আছে আরও একটি ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ, যেটি কালাতীত ক্ষণের জগৎ। সেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, সবটাই অনাদি অনন্ত বর্তমান। সমস্ত জগৎ সেখানে অবস্থান করছে একই সঙ্গে। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতির বাইরে এই জগৎ। যাঁরা আপন সাধনার বলে আয়ত্ত করতে পারেন এই কালাতীত জগৎকে এবং নিজেরা অবস্থান করেন এই 'ক্ষণ' এর জগতে, তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। আধুনিক বিজ্ঞান আভাস পেতে আরম্ভ করেছে এই জগতের, কিন্তু তা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ গাণিতিক তত্ত্ব হিসাবে। ক্ষণের জগৎ সম্পর্কে অপরোক্ষ অনুভূতি আমাদের নেই।

বৈজ্ঞানিকেরা স্থিরনিশ্চিত, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সমগ্র সৃষ্টির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাঁরা আপাতত বিশ্বকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন— একটিকে বলা যেতে পারে নিউটনীয় বিশ্ব, যেটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আমাদের পরিচিত এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়টি বিশেষ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা সঙ্গে সমঞ্জস আইনস্টাইনীয় বৃহৎ বিশ্ব এবং তৃতীয়টি হল পরমাণু-অতীত সূক্ষ্ম জগৎ, বা কোয়ান্টাম বিশ্ব। আমরা এখন তৃতীয় জগৎটি

নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষুদ্র বস্তুকণাগুলি অবিনশ্বর। তাঁর আরও একটি সিদ্ধান্ত ছিল প্রকৃতির নিশ্চয়তাবাদ। এই দুটি সিদ্ধান্তই বিরাট ধাক্কা খেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। দেখা গেল, তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের কণিকাগুলি স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হয়ে তেজস্ক্রিয়তাশূন্য অন্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করছে। যেমন দেখা গেল, ইউরেনিয়াম পরমাণু পরিবর্তিত হচ্ছে সীসাতে, যার কোনও তেজস্ক্রিয়তা নেই। ফলে এক মৌলিক পরমাণু প্রাকৃতিক নিয়মেই অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত হচ্ছে, এগুলি অবিনশ্বর নয়। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলতে পারেন না, কোনও একটি নির্দিষ্ট পরমাণু কোন মুহূর্তে তেজস্ক্রিয়তা বিকীরণ করতে করতে তেজস্ক্রিয়তা শূন্য হয়ে অন্য পদার্থে পরিণত হবে। তাঁরা শুধু বলতে পারেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসন্ন কতগুলি পরমাণুর পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা। ফলে নিশ্চয়তাবাদের জায়গা নিতে শুরু করল পরিসংখ্যান সম্ভাবনাতত্ত্ব।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং আইনস্টাইন পরমাণু বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান সম্ভাবনা তত্ত্বের প্রয়োগ করলেন। বোহ্‌রের একটি বক্তব্য ছিল, একটি পরমাণু তখনই শক্তি বিকীরণ করতে পারে যখন তার উচ্চতর শক্তিযুক্ত কক্ষপথে অবস্থিত কোনও ইলেক্‌ট্রন নিম্নতর শক্তিযুক্ত কোনও কক্ষপথে নেমে আসে। আইনস্টাইন বললেন, তেজস্ক্রিয়তা বিকীরণের সঙ্গে এই ঘটনাটির সাদৃশ্য আছে। কোনও একটি নমুনায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে সম্ভাব্য কতগুলি পরমাণু থেকে শক্তি বিকীরিত হবে তা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কোন পরমাণু থেকে শক্তি বিকীরিত হবে তা কিছুতেই বলা যায় না। আইনস্টাইনও মানতে বাধ্য হলেন পরমাণু অভ্যন্তরের সূক্ষ্ম জগতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি বেশ বিশৃঙ্খল, কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে সেগুলির ব্যাখ্যা হয় না।

আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝেছিলেন, আলোক একই সঙ্গে কণিকা এবং তরঙ্গ উভয়ই। অর্থাৎ বস্তুকণা হল তীব্র শক্তিতরঙ্গের একটি ঘনীভূত অবস্থা, যা একটি নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। ফোটন, ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা অন্য যে কোন সূক্ষ্ম সত্তা বস্তুকণা এবং তরঙ্গ উভয়ই। এমনকী এমনও বলা যেতে পারে যে এরা বস্তু বা তরঙ্গ কোনটিই নয়, অব্যক্ত এবং ধারণাতীত কোন সত্তা যাকে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের ভাষায় কিছুতেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকেরা এখন একমত যে নিউটনীয় জগৎ এবং কোয়ান্টাম জগৎ প্রকৃতিগতভাবেই সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান এবং মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি মধ্যজগৎ বা নিউটনীয় জগতের মধ্যেই আবদ্ধ। নিউটনীয় জগতের ভাষা বা তুলনা দিয়ে কোয়ান্টাম জগৎকে ধারণা করা সম্ভব নয়। এমনকী বৈজ্ঞানিকদের ব্যবহৃত সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিও নিউটনীয় জগতের জন্যই উপযোগী, সূক্ষ্ম জগতের জন্য নয়। ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং যন্ত্রনির্ভর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই অব্যক্ত জগৎকে জানবার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

ইলেক্‌ট্রন একটি নির্দিষ্ট বস্তুকণার আকারে পরমাণু কেন্দ্রের চতুর্দিকে পাক খাচ্ছে, শ্রডিঞ্জারের মতে এই বর্ণনাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে গাণিতিক সূত্র শুধু এটুকুই বলতে পারে যে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা কোনও একটি নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেক্‌ট্রনটি থাকবার সম্ভাবনা কতটুকু। সেই জন্যই শ্রডিঞ্জার উদ্ভাবিত বিশেষ অপেক্ষকটির নাম দেওয়া হয়েছে সম্ভাবনা-তরঙ্গ। এই সম্ভাবনা প্রকাশক সমীকরণটির গাণিতিক আকৃতি এমন যে এই ধরনের সমীকরণ দ্বারা পদার্থবিদ্যায় বিভিন্ন বাস্তব তরঙ্গকে (যেমন বাদ্যযন্ত্রের টান টান করে বাঁধা কোন তারে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গ) প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সম্ভাবনা তরঙ্গ বাস্তব কোনও তরঙ্গ নয়, শুধু এটির গাণিতিক সমীকরণের আকৃতিটি বাস্তব তরঙ্গের সমীকরণের অনুরূপ। এই অপেক্ষক শুধু এই তথ্যটুকুই শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে, কোনও অঞ্চলে বা কোনও নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে ইলেক্‌ট্রনটি থাকবার সম্ভাবনা শূন্য। বাকী অঞ্চলের সবটুকু জুড়েই ইলেক্‌ট্রনের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যায়, শুধু তার অস্তিত্বের সম্ভাবনার মাত্রা কম বা বেশী। কিন্তু অস্তিত্বের মাত্রার কম বা বেশী কথাটির অর্থ কি?

প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাটি নিউটনীয় বিশ্বের ধারণা নয়, কোয়ান্টাম বিশ্বের এক সম্পূর্ণ পৃথক এবং আশ্চর্য বর্ণনা। সেখানে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের ধারণার মধ্যে কোনও পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নিউটনীয় জগতে কোনও বস্তুর বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়) ঘরের মধ্যে একটি বিড়াল হয় আছে কিম্বা নেই। অর্থাৎ সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ বা শূন্য। বাস্তব জগতে কখনও বলা যায় না, একই সঙ্গে বিড়ালটি আছে এবং নেই। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই সম্ভাবনা গণিত, সেখানে ঘরের মধ্যে একই সঙ্গে ইলেক্‌ট্রন নামক বিড়ালটি আছেও বটে, আবার নেইও বটে।

এর ব্যাখ্যা হিসাবে একদল বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য হল, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সূক্ষ্ম এবং সম্ভাবনাময় জগতের সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগ না হচ্ছে, অর্থাৎ চৈতন্যময় কোনও দর্শক তাকে প্রত্যক্ষ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় না, কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই। এইটিই হল কোয়ান্টাম বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞেয়বাদ। নিউটনীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছিল, চৈতন্যময় দর্শক বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে সেগুলিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত না করেই, কোয়ান্টাম বিশ্বে সেটি সম্ভব নয়। দর্শক সেখানে এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষাগারে ঘটনাগুলির স্রষ্টা সে নিজেই। সে-ই প্রতিমুহূর্তে নির্ধারণ করছে প্রকৃতি তার কাছে কি রূপ নিয়ে আসবে, বস্তুকণা না শক্তি। তার দৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা সে নিজেই।

শ্রডিঞ্জারের বিশ্বাস ছিল, তাঁর গাণিতিক মডেলে তিনি যে সম্ভাবনা তরঙ্গের কথা বলেছেন, সেগুলির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যেমন শব্দতরঙ্গ বা জলে উদ্ভূত তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, সম্ভাবনা তরঙ্গও সেইরকম বাস্তব। তিনি বললেন, ইলেক্‌ট্রনের মোট যে তড়িতাধান, তাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি মেঘের মতো পরমাণুর কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট

ত্রিমাত্রিক অঞ্চল জুড়ে আছে। এর মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ইলেক্ট্রনটি অবস্থান করছে, এরকম বলা যাবে না। তাঁর ধারণা ছিল, সম্ভাবনা তরঙ্গ একধরনের স্থির তরঙ্গ। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রশ্ন তুললেন, এই 'বাস্তব তরঙ্গে' ঠিক কোন বস্তুটি তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তা তাঁদের বোধগম্য হচ্ছে না। ম্যাক্স বর্ন বললেন, এটি আদৌ ইলেক্ট্রনের তড়িৎ মেঘ নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি হল কোনও একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ইলেক্ট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কতটা তার একটি গাণিতিক বর্ণনা মাত্র। অর্থাৎ এ কথা আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, ইলেক্ট্রন কণিকা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ইলেক্ট্রন মেঘ দ্বারা আবৃত ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রটির সর্বত্রই ইলেকট্রনটি আছে বলে মানতে হবে, কোথাও অস্তিত্বের মাত্রা কম, কোথাও কিছু বেশী। কিন্তু ত্রিমাত্রিক সম্ভাবনাতরঙ্গ কেবলমাত্র একটি ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি করে ইলেক্ট্রনের বৃদ্ধি হলে মাত্রাও তিনটি করে বেড়ে যাবে। যেমন কার্বনের ইলেক্ট্রনের সংখ্যা হল ১২ টি, তার সম্ভাবনাতরঙ্গের মাত্রা হবে ৩১২ বা ৩৬ টি। ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে এটি হবে ৩৯২ বা ২৭৬ মাত্রার। যেহেতু আমাদের মন ত্রিমাত্রিক বস্তুর চেয়ে বেশী ধারণা করতে পারে না, স্বভাবতই বৈজ্ঞানিকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সৃষ্টি এবং বিস্তারের সঙ্গে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁরাও রীতিমত বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিভিন্ন অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্তে। আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, শ্রডিঞ্জার সকলেই বলেছেন, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁদের আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না। তাঁরা বললেন, ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার ভিত্তিভূমিতে ভূকম্প হচ্ছে এবং তাঁদের পায়ের তলার মাটি চলতে শুরু করেছে। তাঁরা নিজেরাই সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন বিভিন্ন ধাঁধা বা হেঁয়ালির, যাতে বোঝা যায়, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়, আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে যেগুলিকে খাপ খাওয়ানো যায় না।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ স্বয়ং শ্রডিঞ্জার সৃষ্টি করলেন একটি ধাঁধা, যা বিখ্যাত হয়ে আছে 'শ্রডিঞ্জারের বিড়াল' নামে। ধরা যাক্ একটি সম্পূর্ণ বদ্ধ কক্ষের মধ্যে একটি বিড়াল, একটি বিষাক্ত গ্যাসভর্তি পাত্র এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি কণিকা আছে। এমন একটি ব্যবস্থা করা হল যে তেজস্ক্রিয় কণিকাটি যদি ক্ষয় হয়ে যায়, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীরিত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসের পাত্র ভেঙ্গে যাবে এবং বিড়ালটি মারা যাবে। কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে যদি প্রশ্ন করা হয়, বিড়ালটি জীবিত না মৃত, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা বা ধ্রুপদী নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী, দুইটি সম্ভাবনাই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, অর্থাৎ সেটি হয় জীবিত না হয় মৃত। বিড়ালটি জীবিত না মৃত, সেটি আমাদের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়, দ্রষ্টা নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র।

কিন্তু কোয়ান্টামবিদেরা এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বললেন, যতক্ষণ ঘরের দরজা খুলে কোনও চৈতন্যময় সত্তা (কোনও দর্শক) অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ না করছেন, ততক্ষণ বিড়াল সম্পর্কে কোনও কিছুই বলা সম্ভব নয়। সেটি যে জীবিত তা'ও বলা যাবে না, সেটি যে মৃত তা'ও নয়। বরং বলা যায় সেটি জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী কোন একটি অবস্থায় রয়েছে। বিড়ালটি অব্যক্ত অবর্ণনীয় বহুসংখ্যক সম্ভাবনা-তরঙ্গের মধ্যে বিরাজ করছে, যা এখনও কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা সিদ্ধান্তের রূপ নেয়নি। সেটি তখনই একটি নির্দিষ্ট ঘটনার আকার নেবে যদি সেই অব্যক্ত সম্ভাবনা-তরঙ্গের সঙ্গে কোনও বুদ্ধিমান চৈতন্যের সংযোগ ঘটে। একমাত্র সেই সময়েই বহু সংখ্যক সম্ভাবনা তরঙ্গ-গুলির অবলুপ্তি ঘটবে এবং একটিমাত্র ঘটনা নির্দিষ্ট রূপে দেখা দেবে। স্বয়ং শ্রডিঞ্জার হতভম্ব হয়ে বললেন, এরকম সিদ্ধান্ত কীভাবে স্বীকার করা সম্ভব? আমরা পরে আরও একটি ধাঁধা আলোচনা করব, যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। সেটি 'ই পি আর প্যারাডক্স' নামে বিখ্যাত।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হল হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্ব। এর মূল কথা হল, সূক্ষ্ম বস্তুকণার ক্ষেত্রে আমরা একই সঙ্গে তার অবস্থান এবং গতিবেগ (প্রকৃতপক্ষে ভরবেগ যা ভর ও বেগের গুণফল) নিশ্চিতভাবে জানতে পারি না। অন্যভাবে বললে, কোনও সূক্ষ্ম সত্তা একই সঙ্গে বস্তুকণা এবং তরঙ্গ এই উভয় আকারে প্রকাশিত হতে পারে না। হাইজেনবার্গ বললেন, প্রকৃতিকে কোন একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যও আমরা সামগ্রিকভাবে জানতে পারি, এই ধারণা ভ্রান্ত। কোয়ান্টাম জগতে অবিশ্রান্তভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই, ফলে ভবিষ্যৎকে কোনভাবেই জানা সম্ভব নয়। শুধু বলা যায়, সেখানে সূক্ষ্ম কণিকা এবং শক্তিতরঙ্গ অবিশ্রান্তভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু কোনটি কেন ঘটছে বা কোনটি ভবিষ্যতে ঘটছে চলেছে, এটি কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। যেন পরমাপ্রকৃতি নিজের হাতে একটি আবরণ টেনে দিয়েছেন সূক্ষ্ম জগতের উপরে, যা ভেদ করে মানুষ কিছুতেই সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাবে না।

হাইজেনবার্গ অজ্ঞেয়বাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা প্রকৃতিকে তার পরমার্থিক সত্তা হিসাবে কখনও জানতে পারি না। আমরা যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানতে পারি, তা হল আমাদের চৈতন্যের সঙ্গে অজ্ঞেয় পরমা প্রকৃতির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি আপেক্ষিক সত্য, যা কখনই সর্বনিরপেক্ষ পরমার্থিক সত্তা নয়। এমনকী আইনস্টাইন, যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেননি, তিনিও বলতে বাধ্য হলেন,

"Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, uniquely determined by the external world."

ওই একই বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসে নীল্‌স বোহ্‌র নিয়ে এলেন তাঁর বিখ্যাত 'কোপেনহেগেন বিশ্লেষণ'। বিংশ শতকে বৌদ্ধিক জগতে যে নূতন এবং বৈপ্লবিক ধারণাগুলি বিশাল ওলটপালট ঘটিয়েছে, তার মধ্যে বোহ্‌রের কোপেনহেগেন বিশ্লেষণ অন্যতম। কোয়ান্টামবিদেরা প্রায়শই এই ব্যাখ্যাটিকেই স্বীকার করেন। এর মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে এরকম—

১. আমাদের এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রায়শই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সমন্বয়। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একটি বস্তুর বর্ণনায় সেটি 'ক' এবং 'ক নয়', এই দুটি কথাই সত্য। এটিও সত্য যে একই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমরা দুটি সত্যই অনুভব করতে পারি না, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারে। তার সামগ্রিক পরিচয় জানতে হলে এই আপাতবিরোধী সত্যগুলি আমাদের জানতেই হবে। ফোটন কণা একই সঙ্গে বস্তুকণা এবং তরঙ্গ উভয়ই, কিন্তু আমরা একই সঙ্গে এই দুটিকে অনুভব করতে পারি না। গবেষণাগারে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেভাবে দেখতে চাই, ফোটনকে আমরা ঠিক সেভাবেই অনুভব করি। এটিকে বলা হয় বোহ্‌রের পরিপূরকতার তত্ত্ব।

২. কোয়ান্টাম জগতে নিশ্চিত সত্য বলে কিছু নেই। সেখানে সবকিছুই সম্ভাব্য এবং অনিশ্চিত। প্রকৃতির কোনও একটি অংশকে যদি আমরা নিশ্চিত জানতে চাই, তা হলে অন্য একটি অংশ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং অজ্ঞাত থেকে যাবে। যেমন আমরা যদি কোনও বিশেষ মুহূর্তে কোনও বস্তুকণার অবস্থান সম্পর্কে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত জানতে চাই, তা হলে তার গতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হবে শূন্য। ফলে আমরা বর্তমান মুহূর্তটিকেও সামগ্রিকভাবে নিশ্চিত জানতে পারি না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণা সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই অনিশ্চয়তা প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৩. কোয়ান্টাম জগতে সবকিছুই বিশৃঙ্খল, আকস্মিক এবং আপতিক। সেখানে কার্যকারণ সম্পর্কের কোনও অস্তিত্বই নেই। কোন একটি ঘটনা কখন ঘটবে এবং কিভাবে ঘটবে, তা কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। সেখানে কেবল অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলি গতিময়, পরস্পর নিরন্তর সংঘর্ষে রত, সেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। প্রতিমুহূর্তে শূন্য থেকে নূতন বস্তুকণার সৃষ্টি হচ্ছে, আবার তা লয় পেয়ে যাচ্ছে পরম শূন্য, অনন্ত এক সমুদ্রে — পদার্থবিদ্যার সাধারণ নিয়ম সেখানে অচল।

৪. কোয়ান্টামবাদ চৈতন্য নিরপেক্ষ কোনও সৃষ্টি বা বাস্তবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়ের সঙ্গে যতক্ষণ চৈতন্যের সংযোগ না হচ্ছে, ততক্ষণ সৃষ্টির কোনও অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে কোপেনহেগেন ব্যাখ্যায় দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য (বিষয়ী এবং বিষয়) এবং এদের মধ্যে সংযোগকারী সাধন বা যন্ত্রপাতির মধ্যে কোনও বিভেদ স্বীকার করা হয়নি। এমনকী একদল বৈজ্ঞানিক এরকমও বলেন, দ্রষ্টা বা চৈতন্যময় সত্তা যেভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান, প্রকৃতি সেভাবেই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। পর্যবেক্ষণাগারে যদি পরীক্ষাব্যবস্থা এরকম হয় যে আমরা ইলেক্‌ট্রনকে বস্তুকণা হিসাবে দেখতে চাই, তা হলে সেটি বস্তুকণা হিসাবেই যন্ত্রে ধরা পড়বে। আবার যদি আমরা সেটিকে শক্তিতরঙ্গ হিসাবে দেখতে চাই, তা হলে সেটি সেভাবেই দেখা দেবে। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে চৈতন্য এবং মনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইন, বোরিস পোডলস্কি এবং নাথান রোজেন (তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর থেকে সৃষ্টি হয়েছে ই পি আর কথাটি) সৃষ্টি করলেন ই পি আর প্যারাডক্স। সংক্ষেপে মূল বিষয়টি এরকম—

ধরা যাক্ কোনও একটি বিশ্বে কেবলমাত্র দুটি গতিশীল পদার্থকণিকা আছে, ক এবং খ। এ ছাড়া এই কাল্পনিক বিশ্বে আর কোন বস্তুকণা বা বলের অস্তিত্ব নেই। কোনও এক সময়) যখন এরা খুবই নিকটবর্তী) এদের মিলিত ভরবেগ এবং তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হল। ভরবেগের নিত্যতাসূত্র অনুযায়ী, বাইরে থেকে বলপ্রয়োগ করা না হলে, এই মানটি সর্বদাই ধ্রুবক থাকবে। হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তা সূত্র অনুযায়ী কোনও বস্তুকণার অবস্থান এবং ভরবেগ শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু অনিশ্চয়তাবাদ লঙ্ঘন না করেই এই দুটি বস্তুকণার মিলিত ভরবেগ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। কল্পনা করা হলো, এই মান নির্ণয়ের পরে দুটি বস্তুকণা বিপরীত মুখে যাত্রা করে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে সরে গেল, যাতে এদের দুজনের মধ্যে কোনও প্রকার শক্তির তাৎক্ষণিক আদান প্রদান সম্ভব না হয়। তার পরে, কোন এক মুহূর্তে প্রথম বস্তুকণা ক-এর ভরবেগ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হল। ই পি আর গণনায় ধরে নেওয়া হল, এর কোনও তাৎক্ষণিক প্রভাব দ্বিতীয় কণা অর্থাৎ খ এর উপর পড়বে না, কারণ শক্তিতরঙ্গ আলোকের চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। আলোকের গতিতে যাত্রা করলেও, প্রথম কণার পরিবর্তনের সংবাদ দ্বিতীয় কণায় পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যাবে। এবার প্রথমে নির্ণীত ভরবেগ সমষ্টি থেকে ক-এর ভরবেগ বাদ দিলে খ-এর ভরবেগ পাওয়া যাবে। এর অব্যবহিতপরেই, প্রথম বস্তু ক-এর অবস্থান সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা হল। এর ফলে ক-এর ভরবেগের মান অনিশ্চিত হয়ে যাবে, কিন্তু খ-এর উপর তার কোনও তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে না। ক-এর শেষ অবস্থান এবং আদিমুহূর্তে ক এবং খ এর দূরত্ব নিশ্চিত জানা থাকায় শেষমুহূর্তে খ-এর অবস্থানও সঠিক জানা যাবে। সুতরাং তিনজন বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণাপত্রে জানালেন, এই পরীক্ষায় বস্তুকণা 'খ'-এর অবস্থান এবং ভরবেগ দুটিই শতকরা একশভাগ নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব, যা অনিশ্চয়তা তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়।

এই কাল্পনিক পরীক্ষার দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। প্রথমটি হল, হাইজেনবার্গের তত্ত্বটি ভুল, কারণ দেখা যাচ্ছে, বস্তুকণার ভরবেগ এবং অবস্থান একই সঙ্গে জানা সম্ভব। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল,

অনিশ্চয়তাবাদ সত্য, কিন্তু দুইটি বস্তুকণা অসীম দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করছে। ফলে একটি বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন হলে, দ্বিতীয় কণাটিও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর মধ্যে কোনটি সত্য?

এর উত্তর দিতে এগিয়ে এলেন নীল্‌স বোহ্‌র। তিনি বললেন, এই পরীক্ষায় দুটি বস্তুকণা যতদূরেই থাকুক না কেন, এদের দুজনে মিলে এক এবং অখণ্ড সত্তা। কণিকাদুটি পরস্পরের থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও, এদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই নিবিড় এবং নিরন্তর সংযোগ আছে এবং একটি পরিবর্তিত হলে অপরটিও তাৎক্ষণিকভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে। আলোকের গতি বা শক্তির আদানপ্রদানের উপর এই পরিবর্তনটি আদৌ নির্ভরশীল নয়। নীল্‌স বোহ্‌রের গবেষণাপত্রটি পরীক্ষা করে আইনস্টাইনও এই সিদ্ধান্তটি মানতে বাধ্য হলেন, যদিও তিনি এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন নি।

নীল্‌স বোহ্‌র যা দিয়েছিলেন, সেটি হল ই পি আর ধাঁধার গাণিতিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা এই তত্ত্বের সত্যাসত্য জানতে চেষ্টা করলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বার্কবেক কলেজের ডেভিড ব্যোম নামক বৈজ্ঞানিক বললেন, কণিকার ভরবেগের পরিবর্তে তার ঘূর্ণন (spin) এবং সমবর্তন (Polaization) ধর্মকে ব্যবহার করেও পরীক্ষাটি করা যেতে পারে। আইরিশ বৈজ্ঞানিক জন বেল এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন গ্যালিলিও-নিউটন-আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তিনটি মূল ভিত্তিকে :

১. চৈতন্যময় দর্শকের অস্তিত্ব ছাড়া বিশ্বের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব কি না

২. আলোকের গতির চেয়ে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ সম্ভব কি না

৩. পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ দ্বারা ব্যতিক্রমহীন কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব কি না, অর্থাৎ কার্যকারণবাদ প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম কি না।

তিনি এ সম্পর্কে যে দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন, সেগুলি হল 'স্থানীয় বাস্তবিক' (local realistic) কারণ এবং দ্বিতীয়টি হল 'মহাজাগতিক বা সামগ্রিক ' (Universal or holistic) কারণ। প্রথমটি হল কোয়ান্টাম-পূর্ব ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তি, যেটি আমাদের পরিচিত কার্যকারণবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি বস্তু বা কণিকার চৈতন্যনিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব আছে এবং প্রতিটি ঘটনাই অমোঘ কার্যকারণসূত্রের বন্ধনে ঘটে চলেছে। ফলে অতীত থেকে সমগ্র ভবিষ্যৎ একটি অমোঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যার কোনও ব্যতিক্রম নেই।

দ্বিতীয়টির মূল কথা হল, সৃষ্টিতে কোনও সত্তার বিচ্ছিন্ন কোনও অস্তিত্ব নেই। ক্ষুদ্রতম পরমাণুজগৎ থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষব্যাপী বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এক নিরবচ্ছিন্ন এবং অখণ্ড সত্তা। এই অখণ্ড অস্তিত্বকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ধারণা করা যায় না। ফলে কোনও একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে তার কার্যকারণ সম্পর্কও ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বেল সৃষ্টি করলেন একটি গাণিতিক সূত্রের, যা 'বেলের অসমীকরণ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই সূত্রটি এমন ভাবে সৃষ্টি যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা এটির সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়। গাণিতিক সূত্রটি সম্পর্কে বলা হল, যদি দেখা যায় সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলি 'বেল অসমীকরণের তত্ত্ব'কে মেনে চলছে না, তা হলে বুঝতে হবে নীল্‌স বোহ্‌রের 'কোপেনহেগেন বিশ্লেষণ' সত্য। যদি বিপরীতটি ঘটতে দেখা যায়, তবে আইনস্টাইনের ইপিআর ধাঁধার সিদ্ধান্তই সত্য, অর্থাৎ হাইজেনবার্গের তত্ত্ব ভুল এবং নীল্‌স বোরের ব্যাখ্যাও ভুল।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার লরেন্স বার্কলি ল্যাবরেটারিতে জন ক্লসার এবং স্টুয়ার্ট ফ্রিডম্যানের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি পরীক্ষা করা হয়। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সক্লে নিউক্লিয়ার সেন্টার গবেষণা কেন্দ্রে একই পরীক্ষা করা হয়। অবশেষে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে প্যারিস-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালেন অ্যাসপেক্ট, জাঁ ডালিবার্ড এবং গেরার্ড রজার এই পরীক্ষাটি নিখুঁতভাবে সমাধা করেন, যাতে সমালোচকদের সমস্ত আপত্তি বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের গবেষণাপত্রটি ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার সিদ্ধান্তগুলি কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ নিশ্চিত প্রমাণ হল, বোহ্‌রের কোপেনহেগেন বিশ্লেষণ সত্য, আইনস্টাইনের ই পি আর ধাঁধার সিদ্ধান্তটি ভুল।

বৈজ্ঞানিকেরা একটি অপূর্ব সিদ্ধান্তে এলেন। তাঁরা বললেন, আমরা সৃষ্টিকে যে ভাবে দেখি) পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড বস্তু এবং ঘটনার সমাহার) সেই অনুভবটি মিথ্যা। বিশ্ব এক অখণ্ড, সন্তত এবং পূর্ণ অস্তিত্ব, যাকে কোন ভাবেই খণ্ড খণ্ড করা যায় না। এই আপাতপ্রতীয়মান খণ্ড জগতের গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর স্তরে আছে এক এবং দ্বিতীয়রহিত সত্তা, যেটিই প্রকৃত এবং চরম সত্য। সেখানে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। সূক্ষ্ম জগতে কোনও ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে ঘটনাগুলি ঘটছে। কিন্তু কেন ঘটছে, কার্য-কারণবাদে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, প্রকৃতির সূক্ষ্মতম অবস্থা অব্যক্ত এবং অজ্ঞেয়। সেখানে অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব, বস্তু বা শক্তি, কণিকা বা তরঙ্গ এরকম কোনও ভেদ করা যায় না। সেটি কেবল সম্ভাবনার রাজত্ব। যদি ভারতীয় শাস্ত্রের শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা হলে বলা যেতে পারে, সেটি অনন্ত-সম্ভাবনাময় কারণ-সমুদ্র। দৃশ্যমান এই বৃহৎ বিশ্বই সেখানে অব্যক্ত এবং অন্তর্লীন হয়ে আছে। যখন চৈতন্যময় দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য অর্থাৎ অব্যক্ত বর্হির্জগৎ এবং এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগের সাধন (জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাব্যবস্থা) এই তিনটির একত্র সংযোগ হয়, কেবলমাত্র তখনই স্থূল বিশ্ব প্রতীয়মান হয়। চৈতন্যশক্তি-সম্পন্ন মানুষই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকর্তা, তার চৈতন্যসত্তাকে বাদ দিয়ে স্থূল দৃশ্যমান

বহির্জগতের কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু তাই নয়, কোয়ান্টাম বিজ্ঞান বিষয়-বিষয়ী, কার্য-কারণ, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব ইত্যাদি সমস্ত প্রভেদ লুপ্ত করে দিয়েছে। নিউটনীয় বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের দ্রষ্টা হিসাবে দর্শক কথাটি ব্যবহার করা হত। কিন্তু কোয়ান্টামবিদেরা অংশীদার বা সংঘটক (Participator) কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

"In 1979, John Wheeler, speaking at a symposium in Princeton, celebrating Einstein's centenary, claimed that the precise nature of reality has to await the participation of a conscious observer. In this way, mind can be made responsible for the retro-active creation of reality - even a reality that existed before there were people.

Wheeler's astonishing modification of the Young's two-slit experiment reveals that an observer of today can be partially responsible for generating the reality of the remote past.

Quantum theory demolishes the distinction between subject and object, cause and effect, and thereby introduces a strong holistic element into our worldview." (Maya in Physics, p. 333)

বিজ্ঞানের অন্তিম গন্তব্যস্থল যে শঙ্করের মায়াবাদ, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না যখন আমরা শ্রডিঞ্জার, হাইজেনবার্গ, বোহ্‌র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালে ফ্রিৎজফ কাপরার বক্তব্য শুনতে পাই। দেখা যাক্, আর্থার এডিংটন ইন্দ্রিয়বেদ্য এই বহির্জগৎ সম্পর্কে কি বলেছিলেন এবং বেদান্তের সঙ্গে তার কী অসাধারণ মিল। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, মানুষ শরীর নয়, কিন্তু সে প্রতিমুহূর্তে মনে করে যে সে শরীরমাত্র, এবং এই বিশাল ভ্রান্তিই তার সমস্ত বন্ধন এবং দুঃখের উৎস। দেখা যাচ্ছে, আর্থার এডিংটনও বলছেন, আমাদের এই শরীরটি মায়া বা ভ্রান্তিতে স্থিত।

"The world we see and experience in everyday life is simply convenient mirrage attuned to our limited senses, an illusion conjured by our perceptions and our mind. All that is around us (including our own bodies) which appears so substantial is ultimately nothing but ephemeral networks of particle-waves whirling around at lightning speed, colliding, rebounding, disintegrating in almost total emptyness, proportionately as void as intergalactic space, void of anything except occasional dots and spots and scattered electric charges." (Eddington S A, The nature of the Physical world, Introduction, Q by Panda, Maya in Physics, p. 305)

ব্যাসদেব

আমরা আগে দেখেছি, আইনস্টাইন বলেছেন, বাইরের জগৎটি আমাদের মনেরই সৃষ্টি। মন-নিরপেক্ষ জগতের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষতঃ কোয়ান্টামপদার্থবিদেরা প্রায় সকলেই বলছেন একই কথা। ভারতীয় যোগশাস্ত্র অনুযায়ী, মানুষ মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। 'মনঃ এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ঃ'। এই জগত মনেরই সৃষ্টি, এবং আমরা নিজেরাই এই জগৎ সৃষ্টি করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন,

"সুতরাং মন চৈতন্যময় নয়, অথচ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ) মন কেবল একটি যন্ত্রমাত্র, যা দ্বারা তুমি বর্হিজগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহা আছে তাহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। উহা মনে আঘাত করে, মনও পুস্তক রূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে প্রতিঘাত করে; সুতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। ..... বাহিরে ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মুক্তা লওয়া যাক। তোমরা জান, মুক্তা কিভাবে উৎপন্ন হয়। একবিন্দু বালুকণা, কীটাণু বা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন ঐ শুক্তি ঐ বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেলতুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের কাছে এনামেল স্বরূপ; বাস্তব জগৎ ঐ বালুকণা বা অন্য কিছু। সাধারণ

লোকে কখন ইহা বুঝিতে পারিবে না;কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে এবং নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মনেরও অতীত।" (পাতঞ্জল যোগসূত্র, সমাধিপাদ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৯৯)

আমরা যেটিকে মধ্যজগৎ বা নিউটনীয় বিশ্ব বলেছি, বা আরও বৃহত্তর যে চতুর্মাত্রিক আইনস্টাইনীয় বিশ্ব —তাদের অস্তিত্বের গভীরতম ভিত্তি হল এই সূক্ষ্ম অবাঙ্মানসগোচর আপাত-বিশৃঙ্খল, কার্য-কারণ-সম্পর্কের অতীত কোয়ান্টাম জগৎ। সেখানে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে অনন্ত কণিকার। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রে আছেন চৈতন্যময় পুরুষ। সেই চৈতন্যের সঙ্গে অনন্ত সম্ভাবনাতরঙ্গযুক্ত কোয়ান্টাম জগতের সংস্পর্শেই সৃষ্টি হচ্ছে এই স্থূল দৃশ্যমান জগৎ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যে খেলা নিরন্তর চলছে এই বিশ্বে, সেটিকেই ভারতীয় ঋষিরা বলেছেন, নটরাজের নর্তনছন্দ। এক গভীরতর অর্থে আমরাই এই পৃথিবীর স্রষ্টা এবং সংহারকর্তা। চৈতন্যের সঙ্গে সংযোগে সৃষ্টি হয় বিশ্ব, সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সৃষ্টি লীন হয় কারণসমুদ্রে। এইটিই কোয়ান্টাম দর্শন, এইটিই সাংখ্য দর্শন।

প্রাচীন ঋষিদের মতই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও একই সমস্যায় পড়ছেন সৃষ্টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে। তাঁরাও বলছেন, প্রকৃত এবং পরম সত্তা অবাঙ্মানসগোচর, ভাষায় তাকে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। আমরা ওপেনহাইমারের একটি বক্তব্য দেখতে পারি—

"If we ask, for instance, whether the position of the electron remains the same, we must say 'no'; if we ask whether the electron's position changes with time, we must say 'no', if we ask whether the electron is at rest, we must say 'no', if we ask whether it is in motion, we must say 'no'. (Q in Maya in Physics, p. 304)

ফ্রিৎজফ কাপরার মত কণিকা-পদার্থবিদেরা এমন প্রশ্নও তুলছেন, ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকেরা কি ল্যাবোরেটরী ছেড়ে দিয়ে ধ্যান করতে বসবেন? অথবা প্রাচীন যোগশাস্ত্র এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণজাত যুক্তিশাস্ত্রের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব সংশ্লেষণ ঘটবে, যার দ্বারা পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধ হবে প্রাচীন এবং আধুনিক দুটি ধারাই? সম্ভবত এর উত্তর পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও অনেকদিন বা অনেক বৎসর।

তথ্যসূত্র ১. Maya in Physics — N. C. Panda. ২. Tao of Physics — Fritjof Capra. ৩. Code Name God — Mani Bhaumik ৪. Arrow of Time — Peter Coveney and Roger Highfield. ৫. **বিজিজ্ঞাসা — গোপীনাথ কবিরাজ।**

গড়মণ্ডলের হারানো ইতিবৃত্ত

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সে অনেকদিন আগেকার বৃত্তান্ত। কয়েক'শ বছর আগেকার ঘটনা তো বটেই। চোদ্দশ বিরাশি শক কিংবা তার দু-এক বছর পরের এই কথা। তখন মধ্যরাত্রি। অকুস্থল জঙ্গলগড়।

জঙ্গলগড়ের চারদিক সে রাতে নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। মহাদুর্গার মন্দিরের মাথায় দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর তার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র ছোট বড়ো তারকা। যেন এক এক কুচি হীরে। হীরেয় আবৃত্ত আকাশ।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। কেবল ওইটুকুই নয়, আকাশের দিকে ভালো করে চোখ মেললে দেখা যায়, সারা আকাশ জুড়েই যেন তারাদের খই ফুটছে। কেবল বিন্দু বিন্দু আলো। আলো আর আলো। কোনও কোনওটি স্থির আবার কোনও কোনওটি টিপ্‌ টিপ্‌ করছে। আরও ভালো করে তাকালে মনে হয়, ওই বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেপৃথিবীর দিকে, তারা কিছু যেন একটা জানতে চায় এবং জানাতেও চায়। সে এক আশ্চর্য রাত্রি।

মধ্যরাত্রির পুজো সেরে 'মহাদুর্গার' মন্দির চত্বরে অনন্তদেব মিত্র পায়চারি করছেন। আর মাঝে মাঝে ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলিকে দেখছেন। দেখছেন এবং মনে মনে আঁক কষছেন। কষেই চলেছেন।

জ্যোতিষ বিদ্যায় অনন্তদেবের দক্ষতা আছে। আকাশে তারাদের অবস্থান তিনি খুব ভালোভাবেই বোঝেন। বোঝেন গ্রহদের সঞ্চারও। এই তারকারা কীভাবে এবং কতখানি মানবজীবন, রাষ্ট্রজীবন এবং মানুষের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার অঙ্কও কিছু কিছু তার জানা। মাঝে মাঝে খড়ি পেতে আঁক কষে তিনি 'গড়মণ্ডলের' ভবিষ্যৎ ভাগ্য কেমন তা বোঝার চেষ্টা করেন।

এখানে যে 'জঙ্গলগড়ের' উল্লেখ করা হয়েছে, এটি 'গড়মণ্ডল' রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে রাজধানী থেকে বেশ দূরে।

গড়মণ্ডল হল এক বিশাল রাজ্য। তবে এই রাজ্যের বারো আনা অংশই জঙ্গলে ভরা। যেদিকে চাওয়া যায় দেখা যায় শুধু গাছ আর গাছ, কত বিচিত্র গাছই না আছে এই গড়মণ্ডলে। তা কেবল কী গাছ, কোথাও রয়েছে গভীর খাদ, উঁচু উঁচু পাহাড়ি টিলা, ছোটো ছোটো নালা, পাথুরে উৎরাই এবং অজস্র কাঁটা-ভরা ঝোপ। তা জঙ্গলে যেমন গাছগাছালির নিবিড় গলাগলি, তেমনি রয়েছে হিংস্র সব জন্তু। তা এই জঙ্গলগড়ে জন্তু-জানোয়ার একটু বেশিই, জঙ্গলগড়ের মন্দির চত্বরে মাঝে মাঝে যেমন হঠাৎ হঠাৎ শেয়াল দেখা দেয়, তেমনি চুপি চুপি এসে দেখা দিয়ে যায় নেকড়ে বাঘ। আসে ভালুকও।

তা সকলে আসে বটে, কিন্তু অনন্তদেব মিত্রকে সমীহ করে তারা ধীরে ধীরে চলে যায়।

এ পর্যন্ত জানোয়ারদের কোনও উৎপাত এখানে দেখা যায়নি। এবং তাদের উৎপাতের তেমন কোনও সুযোগও নেই। অনন্তদেব তাঁর দুই চেলাকে নিয়ে মন্দির সংলগ্ন দুটি প্রকোষ্ঠে থাকেন। জানোয়ার দেখলেই ওই চেলারা লাঠি নিয়ে তাড়া করে।

জঙ্গলের ভেতরদিকে একটি রাস্তা আছে। জঙ্গলের রাস্তা যেমন হয়, তেমনি। কোনও রকমে চলা যায়। ওই পথ ধরে আধ ক্রোশ গেলে একটি ছোটো গ্রাম মেলে। সেখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। সেখান থেকে চেলারা গিয়ে কিছু তণ্ডুল, ফলমূল এবং সব্জি সংগ্রহ করে আনে। আনে পুজোর অন্যান্য উপচারও। ব্যস, তা দিয়েই এই নির্জন জঙ্গলে কোনও রকমে আহারাদি নির্বাহ হয়।

এখন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কেনা-কাটি করতে গেলে প্রয়োজন হয় টাকাকড়িরও। তা সে টাকাকড়ির যোগান দেয় কে? অর্থের যোগান আসে ভক্তদের কাছ থেকে 'মহাদুর্গা'র নামে। জঙ্গলের পথে আরও ক্রোশ চার-পাঁচ হেঁটে গেলে পাওয়া যায় একটি বড় গঞ্জ। সেই গঞ্জে রয়েছে মেলা ব্যবসাদার। তাঁরা মহাদুর্গার নামে এবং তাঁর পুজোয় নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। চেলারা সেখানে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে আনে। ওই ব্যবসায়ী বণিকেরা কখনও কখনও গেঁহু, তণ্ডুল এবং উৎকৃষ্ট মেঠাইও পাঠিয়ে দেয়। সেগুলি যেমন পুজোর কাজে লাগে, তেমনি চেলাদের নিয়ে অনন্তদেব মিত্রের আহারাদিও সম্পন্ন হয়।

এছাড়া বছরের চৈত্র শেষে ওই মহাদুর্গার মন্দির প্রান্তরে একটি উৎসব হয়। তখন দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে মেলা লোক আসে। এবং তখন কেউই শুধু হাতে আসেন না। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমনি উপচার নিয়ে আসেন। গঞ্জের জনার্দন শেঠ আসেন হাতীর পিঠে চড়ে। চ্যাঙাড়ি ভর্তি করে আনেন মেঠাই। আনেন নতুন নতুন কাপড়। মায়ের পায়ে উজাড় করে দেন হাজার টঙ্কার দক্ষিণা। ঝুড়ি ঝুড়ি ফল। সাজি সাজি ফুল। আনেন মায়ের জন্য ফুলের সাজ। বসন। তসর-গরদ। কোনও কোনওবার মায়ের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য সোনার হার। কানা গোপাল আসে মাকে গান শোনাতে। পবন ঢুলি আসে ঢোল বাজাতে। পবন ঢুলির ছেলে বাপের সঙ্গে এসে কাঁসি বাজায়। জঙ্গলের ভেতর থেকে গোঁড়েরা আসে ধাম্‌সা বাজাতে বাজাতে। সে এক ভারি মজার কাণ্ড হয়।

চৈত্র শেষের ওই মেলাটি বেশ জমকিয়ে ওঠে। সারাদিন চলে হৈচৈ কাণ্ড।

কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতেই সব ফাঁকা। গঞ্জের জনার্দন শেঠ এক প্রহর বেলা থাকতেই হস্তীপৃষ্ঠে চেপে কেটে পড়েন।

গজেন কর্মকারও সূর্যাস্তের আগে চলে যান। তাঁর আবার ভূত-প্রেতের ভয় আছে।

তাই অন্ধকার নামতে না নামতে সব ফাঁকা। অপরাহ্নের পরেই নিশুত অন্ধকার নামে। শোনা যায় শেয়ালের ডাক। বড়ো শেয়ালের গর্জনও।

অনন্তদেব গম্ভীর হয়ে পায়চারি করেন মন্দির চত্বরে। আর তাঁর দুই চেলা হরশঙ্কর ও ভবশঙ্কর মশাল জ্বালিয়ে মন্দিরের ভেতরটি পরিষ্কার করতে থাকে। পরিষ্কার করে মন্দির চত্বরও। চৈত্র শেষের রাত্রির গভীর থেকে গভীরতর হয়।

অনন্তদেব আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রদের পাঠ নিতে বসেন। জ্যোতিষ বিদ্যার সূত্র ধরে তিনি সকলের ভাগ্য গণনা করতে থাকেন। গ্রহসঞ্চার দেখে কখনও তিনি বিরক্ত হন, উত্তেজিত হন, আবার কখনও হতাশ হয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে ধপাস করে বসে পড়েন।

এইভাবে দিন কাটে। রাত কাটে। ভারি বিচিত্র মানুষ হলেন এই অনন্তদেব মিত্র। তিনি কখনও মন্দির ছেড়ে বাইরে যান না।

চোদ্দশ আশি-বিরাশি শতকের সেই অমারাত্রিতে এই রকমই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্য গণনায় রত ছিলেন তিনি। এই রাতে একা ছিলেন তিনি মন্দির চত্বরে। চেলা হরশঙ্কর গেছে গঞ্জে। এখনও সে ফেরেনি। ভবশঙ্কর গিয়েছে আরও অনেক দূরে। তার ফেরার কথা নয়। তা এই রকমই এক পরিস্থিতি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবং মনে মনে আঁক কষতে কষতে একসময় বিরক্ত এবং কিছুটা হতাশ হয়ে অনন্তদেব যখন মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ছিলেন, ঠিক সেই সময় মন্দির চত্বরের ওপাশে হঠাৎ কোনও এক প্রাণীর নেমে আসার শব্দ পাওয়া গেল। প্রথমে খস্‌খস্‌, পরে ধুপ্‌ করে যেন পড়ে যাবার শব্দ।

'কে? কে ওখানে?' খাটো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনন্তদেব। তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। কোনও বন্যপ্রাণী হলে অন্ধকারে তার জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখা যেত। অনন্তদেব কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেলেন না। তাই আবার বলে উঠলেন, 'কে তুমি?'

অন্ধকারের ওপার থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসে, 'আমি। আমি হরশঙ্কর।'

'হরশঙ্কর! তুমি? তুমি কী আহত? কিংবা অসুস্থ? সন্ধ্যার আগে তোমার ফেরার কথা, তোমার ফিরে আসতে এত গভীর রাত হল কেন?'

এই জিজ্ঞাসার কোনও জবাব পেলেন না অনন্তদেব। বিমূঢ় বিস্ময়ে তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হরশঙ্করকে খোঁজার চেষ্টা করতে থাকলেন। মন্দিরের ভেতর থেকে প্রদীপটি নিয়ে এলেন।

পরে এই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মন্দিরের সিঁড়ির দিকে।

'প্রভু, এই হরশঙ্কর অসুস্থ নয়। আহত।'

'আহত? কোনও বন্যজন্তু বুঝি তোমাকে আক্রমণ করেছিল?'

'আঁজ্ঞে না প্রভু। এক তস্করের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমি আঘাত পেয়েছি। ব্যাটা আমার কাঁধের ঝুলি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিচ্ছিল। হঠাৎ আচমকা আক্রমণে আমি প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঝুলিটি সে কেড়ে নিতে সফল হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে পালাতে পারেনি। আমি দৌড়ে গিয়ে তার মুঠি থেকে ঝুলি কেড়ে নিয়েছি। তবে বোকামিটা হয়েছে তার পিছনে দৌড়ে যাবার পর। তা কেবল আমার ঝুলি নয়, তার একটি ঝুলিও চলে এসেছে আমার হাতে।'

'বুঝেছি। তার সঙ্গে তোমার বেশ খানিকটা লড়াই হয়েছে। আর তাতেই তুমি আঘাত পেয়েছ।'

'জী'।— দেহের আহত জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল হরশঙ্কর, 'তস্করটি খুবই বলবান ছিল। তার সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর লড়াই করা খুব সহজ ছিল না। তার ওপর চারদিক তখন অন্ধকারে ঢেকে আসছে। লোকটি কীভাবে আক্রমণ করছে, তা ঠাহর করতে পারছিলাম না।'

'তোমার হাতের লাঠিটি কী হল? তার ব্যবহার করতে পারোনি?'

'আঁজ্ঞে না। তস্করটির চকিত আক্রমণে প্রথমেই লাঠিটি ছিটকে গিয়েছিল। তাই আমাকে শুধু হাতে লড়াই করতে হয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে হরশঙ্কর মন্দিরের ওপরে উঠে এল।

মন্দিরের ভেতর থেকে বের করে আনল বড়ো একটি মশাল। মশালটি জ্বেলে সে নিজের দেহের আঘাতপ্রাপ্ত অংশগুলি পরীক্ষা করল। বলল, 'প্রভু, তস্করটি আমার শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। কোনও আঁচড়ও সে বসাতে পারেনি।'

এরপর হরশঙ্কর নিজের ঝুলিটি থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাইরে এনে পরখ করে বলল, 'প্রভু, আমার ক্রয় করা সকল দ্রব্যই অটুট আছে। তস্করটি কোনও দ্রব্যই সরাতে পারেনি।'

'ভালো। তোমার দ্রব্য ঠিক আছে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু অপর ঝুলিটি পরখ করে দ্যাখো তো, ওটির ভেতরে কী আছে? ওই ঝুলিটি তস্করের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও ওটিও কী তার অপহৃত সম্পদ, না তার একান্ত নিজস্ব।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। এটি অপহৃত সম্পদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'পরখ না করে এমন মন্তব্য করা সমীচীন নয়।'— হাসলেন অনন্তদেব, 'আগে পরখ করো। তারপর বলো।'

মশালের আলোর সামনে ঝুলিটি খুলে ফেলল হরশঙ্কর। ঢেলে ফেলল।

কিন্তু ঝুলির ভেতর তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল কয়েকটি শুকনো ফল। একটি গরদের চাদর। আর কয়েক খণ্ড তুলোট কাগজ। কাগজগুলি সযত্নে গুটিয়ে বাঁধা।

'এটা কী কাগজ? কোনও দলিল বা বিধি পত্তর নাকি?'

হরশঙ্কর তাড়াতাড়ি গোটানো কাগজগুলি খুলে ফেলল। মশালের আলোর কাছে মেলে ধরল।

মাঝারি মাপের চার টুকরো কাগজ। তিনটি কাগজে কোনও আঁচড় নেই। শুধু ছোট বড়ো তিনটি হাতের ছাপ। ছাপগুলি নিখুঁত। হাতের ছাপের কোনও অংশ অস্পষ্ট নয়। হাতের সব রেখাই স্পষ্ট। আঙুলের ছাপেও কোনও অস্পষ্টতা নেই। চতুর্থ কাগজটিতে যেন সারি সারি কয়েকটি অক্ষর। ওই অক্ষরগুলি নাগরিক নয়। যাবনিক অক্ষর। কিংবা শুধুই আঁচড়।'

'প্রভু, এখানে যা দেখছি, এগুলি আঁচড় না অক্ষর।'

'অক্ষর। আরবি ভাষার অক্ষর।'— ডানদিক থেকে লেখা।

'প্রভু, আপনি আরবি ভাষা জানেন?'

'জানি।'— কাগজটি তুলে নিয়ে অনন্তদেব পাঠ করলেন, 'জম্ জম্ জামশেদ। — গড় চৌরা।'

'নাম না শুধুই শব্দ? ওই শব্দের অর্থ কী প্রভু?'

অনন্তদেব গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বুঝতে পারছি না। মনে হয় এগুলি নিছক শব্দ নয়। এগুলি এক সাংকেতিক ভাষা।'

'আর এগুলি? হাতের ছাপ, না পাঞ্জা! এগুলি কী?'

'এগুলিও বোধহয় সাংকেতিক। এই সংকেতকে বুঝতে হলে মনস্থির করে দেখতে হবে। তবে এখানে যা কিছু রয়েছে, তা রহস্যময়। এই রহস্যময় কাগজগুলি একজন তস্কর কোথায় নিয়ে চলেছিল, তাও ভাবতে হবে। মোটকথা, ব্যাপারটি খুবই জটিল। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। এখন এসব নিয়ে চিন্তা করার আর দরকার নেই। হরশঙ্কর, তোমার জন্য ঠাকুর ঘরে কিছু প্রসাদ আছে, সেগুলি খেয়ে নিয়ে চটপট্ শয্যায় চলে যাও। আর কাগজগুলি সযত্নে রেখে দাও। কাল সকালে এ নিয়ে ভাবা যাবে।'

অনন্তদেবের হুকুম। এ হুকুম অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রভুর আদেশ মেনে চলাই অভ্যাস।

হরশঙ্করের ইচ্ছা ছিল ওই কাগজগুলিকে নিয়ে আরও একটু নাড়াচাড়া করা। একজন তস্কর এসব কাগজ কোথায় পেল? ঝুলির ভেতরে ভরে এই কাগজগুলি নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল?

হরশঙ্করের সন্দেহ হল, এই কাগজগুলির ভেতর নির্ঘাত কোনও গুপ্তধনের সংকেত রয়েছে। এই তস্করটি সম্ভবত কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে কাগজগুলির সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করে গুপ্তধন উদ্ধার করতে চলেছিল। হরশঙ্কর শুনেছে, এই গড়মণ্ডলের জঙ্গল গড়ে এক সময় বড় বড় মেলা রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁদের ছিল বিস্তর ধন-ঐশ্বর্য। যুদ্ধ করে করে তাঁদের সব বংশ আজ চৌপাট হয়ে গেছে। তবে চৌপাট হবার আগে তেনারা তাঁদের সব ধনরত্ন সিন্দুকে ভরে মাটির তলায় রেখে গেছে। ইদানীং কালে সেই সব গুপ্তধন উদ্ধারে অনেকে এই জঙ্গলে এসে নেমে পড়েছে। গঞ্জের হাটে গেলে এই সব অনেক কাহিনী হরশঙ্কর শুনতে পায়। সে শোনে আর অবাক হয়।

রাত্তির বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হরশঙ্করের মনে হল, ওই কাগজগুলি নির্ঘাত কোনও গুপ্তধনের সংকেত নিয়ে এসেছে। এই কাগজের সংকেত উদ্ধার করতে পারলে রাশি রাশি সোনার টাকা, রাশি রাশি হীরে-জহরত উদ্ধার করা যাবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে গভীর উত্তেজনায় বেচারি হরশঙ্করের ভালো ঘুম হল না। অনেক এলোমেলো স্বপ্ন সে দেখতে থাকল।

হরশঙ্কর আধো ঘুমে আধো জাগরণে জঙ্গলের ভেতর প্রতিটি মাটির স্তূপের তলায় রাশি রাশি সোনা এবং হীরা জহরত লুকিয়ে থাকার স্বপ্ন দেখতে থাকল। সে ভুলে গেল, সে মহাদুর্গার মনিবের এক নিষ্কাম সেবক। ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ করা যে তার উচিত নয়, সে আদর্শের কথা সে বেমালুম ভুলে গেল। ভুলে গেল প্রভুর উপদেশ, আদেশ।

এদিকে ওই সংকেত ভরা কাগজগুলি দেখার পর অনন্তদেবের চোখ থেকেও ঘুম উবে গেল।

মন্দিরের থামের ওপর যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল, সেই নক্ষত্রটি ঈষৎ হেলে পড়ল। পশ্চিমে আকাশপটে সেইরকমই অন্যত্র তারকাপুঞ্জ, তারা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকেই। তবে তাদের যে বিন্যাস, তাতে ভারত ভূখণ্ডের তেমন কোনও মঙ্গল আসন্ন বলে অনন্তদেবের মনে হল না। বরং বিপরীতটাই দেখতে পাচ্ছেন অনন্তদেব। পুরনো দিনের আর্যাবর্ত এখন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। উত্তর-পশ্চিম থেকে দলে দলে হানাদাররা এসে দখল করে নিচ্ছে ভারতবর্ষ। দেবালয় মন্দিরে আর পুজোআর্চা হচ্ছে না। অনেক বিখ্যাত মন্দিরকে হানাদার বর্বররা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। মন্দিরের দেব-বিগ্রহগুলির ভাঙবার চূড়ান্ত হচ্ছে। সোমনাথ মন্দিরের ভেতর যে দীর্ঘ শিবলিঙ্গটি ছিল, সেটিকে গজনীর এক সুলতান নাকি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে তার একটি টুকরো নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে, এবং সেখানে তাঁদের যে মসজিদ আছে, সেই মসজিদে ওঠার সিঁড়িতে এক টুকরো রেখে দিয়েছে 'পা-পোষ' হিসাবে। সেই পবিত্র লিঙ্গগাত্রে তারা অজু করে পা মোছে, পা ঘষে। এই নিয়ে কোথাও কোনও প্রতিবাদ নেই। কোনও দুঃখ বা অনুশোচনাও নেই। হা আর্যাবর্ত!

তা হোক না কেন আলাদা ধর্ম, তাই বলে এক ধর্মের মানুষ আরেক ধর্মের পবিত্র বিশ্বাসকে এই ভাবে পদদলিত করবে?

অনন্তদেব ওই হানাদারদের ধর্মটা যে কী তা বুঝতে পারছেন না। আজও পারেন না।

কিন্তু ওই হানাদারদের দখলেই আজ বড় বড় শহর, নগর, সবই চলে গেছে। ওই হানাদারের ভেতর সবাই যে এক মতের ছিল, তা কিন্তু নয়। তাদের ধর্মটা এক, কিন্তু মতের পার্থক্য বিস্তর। এদের ভেতর কেউ তুর্কি, কেউ পারসি, কেউ খোরাসামী, কেউ আফগানি, কেউ কাবুলি। ইদানিং মুঘল বলে একদল হানাদার এসে দিল্লি-আগ্রা দখল করে বসে আছে। তাদের চরিত্র এখনও জানেন না অনন্তদেব।

এই জঙ্গলগড়ে আসবার আগে অনন্তদেব কিছুদিন আগ্রা শহর দেখতে গিয়েছিলেন। তখনও সেখানে এই সব হানাদারদের রমরমা। তখন ওখানকার দখলদার ছিল আফগানরা। কী বিশাল বিশাল চেহারা তাদের। যেমন দীর্ঘ, তেমনি চওড়া। হাতের মুঠোগুলো যেন বাঘের থাবা। তাদের হাতে থাকত বরশা। তারা ঘুরে বেড়াত ঘোড়ায় চড়ে। দেখলে বুক কাঁপত।

সাধারণ মানুষ তাদের সামনে পড়লে তাঁদের হাতে সেই মানুষগুলির হেনস্থার শেষ থাকত না।

তা এদের ঠিক ঠিক বোঝার জন্য অনন্তদেব চেষ্টা করেছিলেন এদের ভাষা শিখতে। ভাষা না জানলে তাদের বোঝা যাবে কী করে?

এক মৌলবীর কাছে অনন্তদেব আরবি শিখতে আরম্ভ করলেন। বছর খানেক তালিম নেবার পর ওই ভাষার মাধ্যমে ওই যবন হানাদারদের সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান হল। এবং কিছু কিছু ধারণাও হল।

ওই যবন হানাদারেরা নিজেদের ধর্ম ছাড়া আর কোনও ধর্মে শ্রদ্ধাশীল নয়। হিন্দুদের ধর্মে তো নয়ই।

মসজিদ ছাড়া আর কোনও জায়গাকে ওরা ধর্মস্থান বলে গণ্য করে না। তারা চায়, ওই মসজিদ সকলের উপাসনালয় হোক।

আরব দেশের লোকেরা যা যা খায়, যা যা পোশাক পরে, এবং যেমন যেমন বিবাহ করে, যবনরা সকলেই তার আঁকাড়া অনুসরণ করে। 'কোরাণ' নামে তাদের একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। সেই ধর্মগ্রন্থ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনও ধর্মগ্রন্থের গ্রাহ্য নেই। তবে এর মধ্যেও একটি ভারি মজার ব্যাপার আছে। মদ খাওয়া এবং গানের মজলিশে যাওয়া তাদের ধর্মগ্রন্থে নিষেধ আছে, এরা কিন্তু বাস্তবে সে নিষেধ একেবারেই মানে না। বহু নিষিদ্ধ খাবারের সঙ্গে এরা অঢেল মদ্যপান করে থাকে এবং অবকাশ পেলেই এরা

গানের মজলিশ বসায়। আরও একটি বৈশিষ্ট্য এদের রয়েছে, এরা জীবনকে বাজী রেখে সবাই হতে চায় সুলতান।

সুলতান হতে না পারলে জীবন বৃথা। বৃথা যৌবন। সকলেই দৌড়ুচ্ছে সুলতান হতে।

এখন সারা ভারতজুড়ে যবনদের ভেতর 'সুলতান' হওয়ার প্রতিযোগিতা কমছে। এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের ভেতর চলে খুনোখুনি, রক্তপাত আর রক্তপাত। তা নিজেদের ভেতর যতখানি রক্তপাত চলেছে, তার চেয়ে বেশি রক্তপাত হচ্ছে অবশ্য হিন্দু নিধনে। হিন্দুদের ধনসম্পত্তি বিপন্ন। বিপন্ন হিন্দু সত্তা। এমন সংকটকাল ভারতে কখনও আসেনি। এর পরিণাম কী, তা কে বলতে পারে?

তা বছর পাঁচ-দশ ভারতের নানা জায়গায় ইতিউতি ঘুরে একান্ত বিষণ্ণ মনে অনন্তদেব এসে আশ্রয় নিলেন এই জঙ্গলগড়ে। খুঁজে পেলেন 'মহাদুর্গার' এই প্রাচীন মন্দির। কোন রাজা এই মন্দির বানিয়েছিলেন তা জানেন না অনন্তদেব। কিন্তু যিনিই বানিয়ে থাকুন, মন্দিরটি মজবুত করে বানানো। সর্বশ্রেষ্ঠ পাথর দিয়ে তৈরি। সহজে ধ্বংস হবার নয়।

অনন্তদেব যখন এলেন, তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন এই মন্দিরের সেবাইত এবং পূজারী। তিনি এক বছরের ভেতরেই দেহ রাখলেন। তা প্রথম প্রথম একা একাই থাকতে হত। কিন্তু কিছুদিন পরে জুটে গেল দুই চ্যালা হরশঙ্কর এবং ভবশঙ্কর। এখন তাদের নিয়েই থাকেন অনন্তদেব। এই নির্জন মন্দিরে তারাই তাঁর সহচর। তারাই এখন বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগ ঘটায়।

গ্রহ-নক্ষত্র ধরে জ্যোতিষ চর্চার অভ্যাস বহুদিনের। এই জ্যোর্তিষ চর্চার মধ্যে দিয়ে অনন্তদেব প্রায়শই ভারতের ভাগ্য গণনা করে থাকেন। ভারতের ভাগ্য গণনা করে প্রতিনিয়তই হতাশ হন। তিনি দেখেন, অমঙ্গলের একটি কালো মেঘ ধীরে ধীরে ভারতকে গ্রাস করছে। এই অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচবার বা রেহাই পাবার যেন কোনও উপায় নেই। তবু কী ভাবে বাঁচা সম্ভব তা নিয়ে অনন্তদেব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন না। দেবী মহাদুর্গার সামনে নানা ধরনের হোম-যজ্ঞ ইত্যাদি করেন। চেষ্টা করেন গ্রহদের তুষ্ট করতে।

'গড়মণ্ডল' রাজ্যটি যবনদের দৃষ্টি এড়িয়ে এতদিন মোটামুটি শান্তিতেই ছিল। আজও রয়েছে। জঙ্গলে ভরা দেশ, তাই এখনও তাদের লোলুপ দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের যা ইশারা, তাতে এই দেশটিরও কপালে দুর্দিন নেমে আসছে বলেই মনে হচ্ছে অনন্তদেবের। কয়েক মাস ধরেই তাঁর মনে হচ্ছে, গড়মণ্ডলের মাথার ওপর একটি কালো ছায়া পড়ছে। পড়েই চলেছে।

তা এমন সময়েই তস্করের ঝুলি থেকে বেরিয়ে এল কী না, তিনটি হাতের ছাপ এবং আরবি ভাষায় লেখা সংকেতপূর্ণ একটি নাম। উদ্বেগ বেড়ে উঠল অনন্তদেবের।

রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল না।

পরের দিন প্রত্যুষে উঠেই হাতের ছাপগুলিকে পরীক্ষা করতে বসলেন।

একটি ছাপ পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সে ছাপ কোনও রাজকুমারী বা রাজবধূর। কিংবা কোনও রানীর।

দ্বিতীয় ছাপটি অল্পবয়সী কোনও রাজকুমারীর।

তৃতীয়টি সাবালক কোনও রাজপুত্রের।

অনন্তদেব বারবার পরীক্ষা করলেন। বারবার পরীক্ষাতেও ওই একই ফল আসে।

অনন্তদেব এবার ভাবতে বসলেন, এই রানী, রাজকুমারী এবং রাজপুত্র কোন বংশের? এঁরা যবন, না কী হিন্দু রাজবংশের? অনন্তদেব তাঁর জ্যোতিষ বিদ্যা প্রয়োগ করেও কোনও উপসংহারে আসতে পারলেন না। তিনি এক অন্তহীন সমস্যার ভেতর পড়ে গেলেন।

।।দুই।।

আশমানের গ্রহ-নক্ষত্ররা সুদূর আশমানে বসে হিন্দুস্থানের নসিবে যতই কালি ঢালার চেষ্টা করুক না কেন, তারা কিন্তু হাসান মিঞার ছেলে ফরিদকে কোনওভাবেই রুখতে পারল না, কালি ঢালাতে পারছে না তার নসিবে। বরং তাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে দিতে থাকল এমন পথে, যাতে তার নসিব খুলে যায়। তা প্রথম দিকে তার জীবনে ঝুট-ঝামেলা কিছু কম এল না, কিন্তু ফরিদ তা দিব্যি কাটিয়ে উঠল। দেখে মনে হতে থাকল, আশমানের গ্রহ-নক্ষত্ররা যেন তার ওপর বেশ খুশি। তার নসিব উজ্জ্বল।

বাবা হাসান মিঞা ছিলেন এক ছোট-খাটো জায়গীরদার। হিন্দুস্থানে এমন জায়গীরদার অনেক।

রোজগারপাতি হাসান মিঞার মন্দ ছিল না। দাসী-বাঁদী এবং লোকজন তাঁর বিস্তর। খিদমদ খাটবার লোকজনেরও অভাব ছিল না হাসান মিঞার।

বেশ সুখেই তাঁর জীবন কাটার কথা। কিন্তু তা তাঁর আর হল কই? হাসান মিঞার সব সুখ কেড়েছিল তাঁর চার বিবি।

চার বিবির আট ছেলে। এদের নিয়ে লেগে রয়েছে নিত্য ঝামেলা। এদের সকলের চাহিদা এবং আবদার মেটাতে মেটাতে বেচারি মিঞা একেবারে জেরবার। চার বিবির ভেতর যেটি ছোট, সেটি ঠিক শাদি করা বিবি নয়। রক্ষিতা। বয়স কম। পটের বিবি। অনেক ছলাকলা জানে। এই বিবির কাছে হাসান মিঞার কোনও জারিজুরি খাটে না। ভারি পেয়ারের বিবি। মিঞা সাহেবের সবরকম হম্বিতম্বি এই বিবির কাছে পরাস্ত।

তা ছোট বিবির একটি বায়না আছে। প্রথমপক্ষের বড় বিবির ছেলে ফরিদ আর নিজামকে সংসার থেকে দূর করে দিতে হবে। না, কেবল সংসার থেকে নয়, পারলে তাদের মুলুক ছাড়া করতে হবে। এদের তাড়িয়ে না দিলে পটের বিবি এক ফোঁটাও পানি গ্রহণ করবেন না।

বিবির সামনে হাসান মিঞা কথা দেন, হ্যাঁ, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কথা রাখতে পারেন না। ফিরে এসে ভুলে যান।

এইভাবে গড়িয়ে যায় দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

এর ফলে ধিকিধিকি তুঁষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে অশান্তির আগুনও।

এই অগ্নিশয্যায় নিত্যদিন শুয়ে থাকেন হাসান মিঞা। এ যেন অনন্ত অগ্নিশয্যা।

এই রকম যখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, সেই সময় ফরিদ নিজেই একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল। বাপকে রেহাই দিতে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল নিজের ভাগ্যকে নিজে খুঁজে বের করতে।

শোন নদের তীরে সাসারামের যে জনপদে কেটেছিল ফরিদের শৈশব, তার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন, সেই পরিচিত পরিবেশ এবং জন্মভূমি ছেড়ে সে পশ্চিম মুলুকে পাড়ি দিল। তার ট্যাঁকে যে সমস্ত কড়ি ছিল, তাই দিয়ে সে কিনে ফেলল একটি ঘোড়া। ওই ঘোড়ায় চেপে সে নিরুদ্দেশ হল। ঘোড়া ছুটল এবং ছুটতেই থাকল।

কোথায় যে সে যাবে, জানে না ফরিদ। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। খুঁজে বের করতে হবে একটি আশ্রয়। না, কেবল আশ্রয় নয়। নিজের নসিবকে নিয়ে পরখ করে তাকে দেখতে হবে। সে নিঃসম্বল। কপর্দকহীন। ট্যাঁকে আর কোনও কানাকড়িও নেই। কিন্তু তার কাছে সেই মুহূর্তে যা রয়েছে, তা হল এক সমৃদ্ধ প্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস। আর তার সঙ্গে বাড়তি যা রয়েছে, তা হল শারীরিক ক্ষমতা। শোন নদের তীরে অনেক সে কোস্তাকুস্তি করেছে, কাছের জঙ্গলে গিয়ে হায়না শিকার করেছে এবং সাঁতার কেটে এপার-ওপার করেছে শোন নদ, দিনের পর দিন। মনের জোরের সঙ্গে শরীরের জোর যোগ হলে, তাকে রোখে কে?

ঘোড়া ছুটিয়ে, দু-একটা ছোটখাটো জনপদ, গাঁ-গঞ্জ এবং দু-একটি জঙ্গলও পার হল ফরিদ।

তবে এক দৌড়ে নয়। মাঝে মাঝে তাকে থামতে হল বইকি। থামতে হল খাবার জন্য এবং বিক্রমের জন্য। গঞ্জের ভেতর পানশালা এবং পান্থশালা। এখানে ঘোড়া বাঁধলে খাওয়া হয়, আবার বিশ্রামও হয়। ফরিদ থেমে যায় মাঝে মাঝে।

ফরিদের চেহারা এবং তার চালচলন দেখে পানশালায় তার কিছু বাড়তি খাতির দেখা গেল। পানশালার মালিক তাকে উৎকৃষ্ট পানীয় খাওয়ালো এবং তার কাছ থেকে কোনও পয়সাও নেয় না। সরাইখানাতেও ওই একই ঘটনা।

এবং এখানে বসেই ফরিদ জানতে পারল, হিন্দুস্থানে এখন পাঠান আর মুঘলদের লড়াই চলছে। কিছুদিন আগেও দিল্লির সুলতানি তখ্‌তে বসেছিলেন এক ইব্রাহিম লোদী। এঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে ছিল হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্র। বিশাল ছিল তাঁর সৈন্যবাহিনী। তাঁর অশ্বারোহী সেনারা দাপিয়ে বেড়াতো দিল্লি আর আগ্রা শহরে। লড়াই করবার জন্য পাহাড়ের মতন হাতীও ছিল তাঁর কয়েকশো। তা নয়, লোকে বলছে, কয়েক হাজার। সুলতানের সেপাইদের ভেতর দক্ষ তীরন্দাজও ছিল অজস্র। মোটকথা, সুলতান ইব্রাহিম ছিলেন অজেয়। তাঁকে টলাতে পারে, এমন ক্ষমতা হিন্দুস্থানে কারও ছিল না।

কিন্তু সেই অজেয় সুলতানই নাকি হড়কে গেলেন এক পাহাড়ি মুঘল সর্দারের কাছে।

সর্দার থেকে সেই মানুষই রাতারাতি হয়ে গেলেন বাদশা। মুঘল বাদশা। ওঁর নাম, বাবর বাদশা। দিল্লি এখন তাঁর দখলে। সুলতান ইব্রাহিম বেচারি এই মুহূর্তে কফিনবন্দী হয়ে কবরখানায় শায়িত। আর পাঠানরা হিন্দুস্থানে এখন ছত্রভঙ্গ।

এবং দিল্লি-আগ্রা এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মুঘল সেনারা। সুলতানি প্রাসাদে কায়েম হয়ে গেছেন বাবর বাদশা।

এই রকম নানা ধরনের খবর পেতে পেতে ঘোড়া ছোটায় ফরিদ। পার হয়ে চলে জল-জঙ্গল, পার হয় রুক্ষ প্রান্তর।

তা এইভাবে চলতে চলতে সে মনে মনে স্থির করে ফেলে, নসিব নিয়ে যদি পরীক্ষা করতেই হয়, তা হলে সে সেই পরীক্ষা দেবে একজন বড়ো যোদ্ধা হয়ে। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবে। কিন্তু লড়াই করব বললেই কী লড়াই করা যায়? তার জন্য তালিম দরকার। দরকার শিক্ষা-নবিশী। দরকার এমন মানুষ, যিনি হাতে-কলমে লড়াইটা শিখিয়ে দিতে পারবেন। কেবল দৈহিক শক্তির অধিকারী হলেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না। জানতে হয়, রণকৌশল। জানতে হয়, যুদ্ধের অঙ্ক। এসবই জানতে চায় এবং শিখতে চায় ফরিদ। কিন্তু এসব তাকে কে শেখাবে? কে দেবে তাকে তালিম?

ঘোড়া ছোটে, আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ফরিদ এসব ভাবতে ভাবতে যমুনা পার হয়ে পৌঁছে যায় খোদ দিল্লি মুলুকের কাছে এবং এক সময় একটি সেনা শিবিরেও ঢুকে পড়ে সে।

সেনাশিবিরে তখন মেলা তরুণ শিকারী। তাদের তালিম দেওয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে যুদ্ধের নয়া কৌশল।

একদিন সেখানে এসে হঠাৎ হাজির হলেন দীর্ঘদেহী বলশালী এক অশ্বারোহী। লাফিয়ে নামলেন তিনি ঘোড়া থেকে। মুখের অনেকখানি ঢেকে আছে ঘনকালো দাড়ি। চোখদুটিতে তীক্ষ্ণ চাহনি। ইনি যে একজন বড়িয়া মানুষ, তা বোঝা যায়।

মানুষটিকে ফরিদ খাঁ চেনে না। অস্ফুট শব্দে সে বলে উঠল, 'কে ইনি? সেনাপতি না কি?'

পাশের সেপাইটা বলে উঠল, 'তুমি একটি আস্ত আহাম্মক। ওঁকে চেনো না? ইনি হলেন জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। তাখড়াই তুর্কি। ছিলেন বিতাড়িত রাজপুরুষ। এখন হয়েছেন হিন্দুস্থানের

বাদশা! মরদের বাচ্ছা মরদ।'

'বটে! ইনিই তা হলে দিল্লির সুলতান?'

'সুলতান নয়।' ধমক দিল সেপাইটি, 'ইনি হলেন মুঘল বাদশা। সুলতান ইব্রাহিমকে খতম করে বাদশা হয়েছেন।'

কথা হচ্ছিল চাপা গলায়। ফিসফিস করে। অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়েছিলেন জাহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর বাদশা। এই চাপা ফিসফিসানি তাঁর কানে পৌঁছনোর কথা নয়। কিন্তু তা পৌঁছে গেল।

সামনের সারির সেপাইদের সামনে দিয়ে গটগট করে হেঁটে বাবর বাদশা এসে হাজির হয়ে গেলেন ফরিদ খাঁয়ের কাছে। ফরিদের ওপর তাঁর শাণিত দৃষ্টি বুলিয়ে বাবর বাদশা বললেন, 'কে তুমি? তুমি তুর্কি না মুঘল, নাকি কোনওটাই নয়?'

'আঁজ্ঞে, আমি ফরিদ খাঁ। আমার বাবা হলেন হাসান মিঞা। আমি এক পাঠান জায়গীরদারের ছেলে।'

'হ্যাঁ, তুমি যে এক পাঠান-মস্তান, তা তোমার চেহারাই জানান দিচ্ছে। কিন্তু আমি তো কোনও পাঠানকে আমার সেপাই হিসেবে রাখি না। একথা কী তুমি জান না?'

'আঁজ্ঞে না।'

ফরিদের এই জবাব শুনে জাহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর তাকে তখনই কিছু বলল না বটে, কিন্তু তিনি তলব করে পাঠালেন তাঁর সিপাহি সর্দারকে। বললেন, 'দ্যাখো, সর্দার, আমি চাই না আমার সেপাইদের ভেতর কোনও আফগান-পাঠান থাকে। আমার লড়াই এখন এই আফগান-পাঠানদের বিরুদ্ধে। এদের কবল থেকে হিন্দুস্থানকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি তার ওপর নিজের দখল কায়েম করতে চাই। ওরা এখন আমাদের শত্রুপক্ষ।'

না, এর বেশি আর কিছু তিনি বললেন না এবং তিনি যে ফরিদকে তাড়িয়ে দিলেন, তাও কিছু নয়।

তবে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে তিনি সিপাহি সর্দারকে বললেন, 'এই ছোকরার চেহারায় আগুন আছে। চোখেমুখেও রয়েছে কেমন যেন এক উদ্ধত ভাব! এই ছোকরা সুযোগ পেলে গোলমাল পাকাতে পারে।'

স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে অস্ফুটভাবে বললেন, প্রতিটি কথা কানে গেল কিন্তু ফরিদের। এই কথাগুলি তার প্রতি তিরস্কার, না ভর্ৎসনা, ঠিক ঠাহর করতে পারল না ফরিদ। তবে এই কথাগুলি তার মনে জোর নাড়া দিল। সে আশঙ্কা করল, তাকে নিয়ে বাবরবাদশা অন্য কিছু একটা করতে পারে। সুতরাং এই সেপাইদল ছেড়ে বেরিয়ে আসাই সে স্থির করল।

এবং সে সেদিন শেষরাতে দিল্লি ত্যাগ করে পুব দিকে ঘোড়া ছোটাল।

সেই ঘোড়া এসে থামল দক্ষিণ বিহারের সুলতান বাহারখান লোহানির রাজধানীতে। ইনি আফগান-পাঠান।

ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যুর পর আফগান-পাঠানরা তখন আর দিল্লি-আগ্রার দিকে তাকিয়ে থাকেন না। দিল্লির বশ্যতা গ্রাহ্য করবার দায়দায়িত্ব তখন তাঁদের ছিল না। তাই দিল্লির অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসকরা নিজেদের স্বাধীন বলেই মনে করছিলেন। দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা বাহারখান নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে বহাল তবিয়তে তখন রাজ্য শাসন করছেন। এবং ঠিক সেই সময়েই ফরিদ খাঁ এসে উপস্থিত হল তাঁর কাছে।

আর সব সুলতানরা যেমন শিকার করতে ভালোবাসেন, বাহারখান ছিলেন ঠিক তেমন ধরনের এক শিকার প্রিয় মানুষ। দক্ষিণ বিহারের অনেকখানি তখন গভীর জঙ্গলে ভরা। আর সেই জঙ্গল নানারকম হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ।

বাহারখান সেদিন তাঁর দলবল নিয়ে তখনই বের হলেন শিকারে। সুলতানরা সাধারণত শিকার করতে বের হতেন হাতীতে চড়ে।

বাহারখান কিন্তু হাতী চেপে শিকার করা পছন্দ করতেন না। তিনি শিকারে বের হতেন ঘোড়ায় চড়ে। তাঁর কোমরে থাকত তরবারি। হাতে থাকত বল্লম। বরশা। আর তূণীরে থাকত বাছাইকরা তীর। আর কাঁধের পাশে ধনুক। এই ছিল তাঁর শিকারী বেশ।

সুলতানের দলবলেরা ঠিক একইভাবে থাকত সজ্জিত।

বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল ফরিদকে। ফরিদখাঁয়ের চেহারা দেখে বাহারখান মুগ্ধ। এবং কিছুটা অভিভূতও।

'কে হে তুমি বাছা? তোমাকে যেন চেনা চেনা লাগছে!'

'আঁজ্ঞে, আমি হলাম আপনার অধীনস্থ জায়গীরদার হাসান খাঁয়ের ছেলে ফরিদ খাঁ।'

'ফরিদ খাঁ?' কথাগুলি ভেঙে-ভেঙে উচ্চারণ করলেন সুলতান। 'এ নাম কী আমি কখনও শুনেছি।'

'জী, আমার আববাজানের হুকুম মোতাবেক আপনার কাছে আমি আগে কয়েকবার এসেছি।'

'তা হবে। মনে পড়ছে না।' সুলতান বাহার চেষ্টা করলেন আগেকার দেখা ফরিদকে মনে করতে। 'তা হঠাৎ আজ আমার কাছে কেন?'

'আঁজ্ঞে, আপনার অধীনে কাজ করার সুযোগ নিতে।'

'হুম্', গম্ভীর হয়ে গেলেন সুলতান, 'তা তোমাকে কী কাজ দেই বাহার! তুমি কি শিকার করতে পার।'

'পারি হজরত। আমার এ বিষয়ে যে যোগ্যতা আছে, তা পরখ করে আপনি দেখতে পারেন।'

পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত সুলতান বাহার খান। ফরিদ খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়া হল বরশা। কোমরে বেঁধে দেওয়া হল তরবারি। কাঁধে ধনুক, তূণীরে তীর। সুলতান হুকুম করলেন, 'চলো আমার সঙ্গে। দেখি, তুমি কতখানি ওস্তাদ শিকারী। আজই পরখ হবে।'

সুলতানের প্রস্তাব শুনে ফরিদ একপায়ে খাড়া। হাসি মুখে সে সঙ্গী হয়ে গেল সুলতান বাহারখানের। সে ঘোড়ায় বসল।

এইভাবেই মুঘল সুলতানের সঙ্গে পরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল গভীর সম্পর্ক। ফরিদ খাঁকে ভারি পছন্দ সুলতানের। ফরিদ

খাঁয়ের কোনও আলস্য নেই। বাহারখান যখনই তাকে তলব করেন, তখন তার সাড়া পান। কোনও কাজ দিলে তখনই তা হাসিল করে আনে ফরিদ। দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়। সুলতানি শাসনের অনেক অলি-গলি আছে। এইসব অলি-গলিগুলি তখন সুযোগ সন্ধানী এবং ধান্ধাবাজে ভরতি। তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে করতে বেচারি বাহারখান তিতিবিরক্ত। ধান্ধাবাজরা সর্বদা নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই মানুষদের নিয়ে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে প্রতিপদে ঠোক্কর খেতে হয়। তা এমন সময় অবিশ্বাস্যভাবে পাওয়া গেল ফরিদকে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ফরিদ খাঁকে হাতে পেয়ে বাহারখানের মনে হল, তিনি যেন এক টুকরো হীরকখণ্ড হাতে পেয়ে গেছেন। ফরিদ খাঁ যে কতখানি সাহসী এবং সুলতানের কত বড় উপকারি তা হাতে হাতে একবার প্রমাণও পেয়ে গেলেন।

এবং উপকারের প্রমাণ পেলেন নিজের জীবনকে সামনে রেখে।

তা সেদিনও শিকারে বেরিয়েছিলেন সুলতান। যেমন দলবল নিয়ে বের হন, ঠিক সেই ভাবেই।

পাশে পাশে চলেছে ফরিদ খাঁ। তার কোমরে তরবারি, হাতে বল্লম। বল্লমতো নয়, শাণিত বরশা। কাঁধে ধনুক, তূণীর ভরতি তীর। শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছেন সুলতান। পাশে পাশে ফরিদ খাঁ। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর। বিপদের তেমন কোনও আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না।

তবু হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল।

অতর্কিতে একটি শের এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতান বাহারখানের ঘোড়ার ওপর। শেরের আক্রমণে ঘোড়াটি ধরাশায়ী। সুলতানও তাই। সুলতান এমনভাবে পড়ে গেলেন যে তাঁর কোনও প্রতিরোধের ক্ষমতা রইল না। তিনি কোনও অস্ত্রই ব্যবহার করতে পারছেন না। তিনি যে শেরের কবলে পড়ে গেছেন, তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না। কিন্তু তিনি অসহায়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে তিনি আল্লাহের শরণ করতে থাকলেন। চোখ বুজে ফেললেন।

কিন্তু মুহূর্তেই অঘটন ঘটল। শেরটিকে বিন্দুমাত্র আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে তার ওপর ঘোড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরিদ খাঁ। দু-হাতের বজ্রমুষ্ঠি দিয়ে ফরিদ চেপে ধরল শেরের গলা। তা চেপে ধরব বললেই কী শেরের গলা টিপে ধরে রাখা যায়। থাবা দিয়ে শের তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেষ্টা করল।

বেধে গেল তুমুল লড়াই। যাকে বলে বাঘে-মানুষে লড়াই। সেই বিশ্রী অসম লড়াই শুরু হয় গেল।

সুলতান বাইরে যে-ভাবে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই পড়ে থাকলেন। তিনি তখন চোখ বুজে।

পাছে বাঘটা এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই নড়াচড়ার চেষ্টা করলেন না।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে লড়াই চলল শেরের সঙ্গে। সুলতানের সঙ্গে যে দলবল এসেছিল শিকারে, তারা এদিক-ওদিক থেকে দৌড়ে এসে চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তারাও কিছু করতে ভরসা পেল না। বাঘকে আঘাত করতে গিয়ে পাছে ফরিদের গায়ে লাগে, সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

যাই হোক, আল্লাহের দোয়া, শের মুঘল। বেঁচে গেল ফরিদ খাঁ। তবে তার সারা শরীরে রক্ত। সে রক্তস্নাত।

ফরিদ খাঁয়ের ওই অভূত পরাক্রম দেখে সুলতান বাহারখান বাক্যহারা, অভিভূত। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ফরিদ যেভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে: তা সুলতান কোনও রকমেই যেন ভুলতে পারছেন না। তিনি বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকেন যুবাপুরুষ ফরিদ খাঁকে। আর সেই সঙ্গে তারিফ করতে থাকেন তার অপরাজেয় শক্তিকে।

'সাবাস, ব্যাটা সাবাস! তোর কথা আমি কখনও ভুলব না। জিন্দেগীতে না।'

ফরিদ খাঁ কোনও কথা বলতে পারল না। তবে সে অনুভব করল, তার ভেতর জমা রয়েছে এক অপরিমিত শক্তি। এই শক্তির কথা সে নিজেও জানত না। এই ঘটনার ভেতর দিয়ে সে নিজেকে যেন আবিষ্কার করল। আবিষ্কার করল তার ভেতর অপরিমেয় এক শক্তিকে।

কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সেই আঠারো ঘা সামলাতে ফরিদ খাঁর সময় লাগল দেড়মাস। হেকিমি চিকিৎসায় সে দেড়মাস পরে সুস্থ হল। এবং সুলতানের দরবারে এসে হাজির হল দেড়মাস পরে।

সুলতান বাহারখান তাকে প্রভূত ইনাম দিলেন এবং 'শের' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এরপর থেকে ফরিদ খাঁর নাম পরিবর্তিতহয়ে গেল, 'শের খাঁ'।

দরবারে সমাদর পাওয়ার কিছুদিন পরে বেগম মহলের এক খোজা এসে হাজির তার আস্তানায়। সে বিস্তর সেলাম করে এবং বিনীতভাবে বলল, 'জনাব শের খাঁ, বেগম সাহেবা আপনাকে তলব করেছেন। কিছু জরুর কথা আছে।'

'বেগম সাহেবা? কই তাঁকে আমি কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'আপনি দেখেননি শের সাহাব? কিন্তু বেগম দুদু আপনাকে দেখেছেন। আপনার কথা বিস্তর তিনি শুনেছেন?'

'বেগম দুদু? তিনি কে?'

'আঁজ্ঞে, তিনিই হলেন সুলতান বাহারখানের পহিলে বেগম! বেদম দেমাক! সহজে তিনি কারোকে কাছে ঘেঁষতে দেন না, সুলতান পর্যন্ত ওঁকে সমীহ করেন।'

তা বেগম দুদুর তলব পেয়ে যেতে হল শের খাঁ ওরফে ফরিদকে।

ইতিপূর্বে কোনও সম্ভ্রান্ত বেগমকে চোখে দেখেনি ফরিদ। দুদু বেগমকে দেখে সে বুঝল সম্ভ্রান্ত পরিবারের বেগম বলতে কী

বোঝায়! তার বাবা হাসান মিঞার চতুর্থ পক্ষের বিবি সুন্দরী ছিল বটে এবং নানারকমের প্রসাধনে অশেষ রূপচর্চা ছিল, কিন্তু বেগম দুদুকে দেখে হাসান বুঝল। এ রূপের কাছে ওসব রূপ একেবারেই আস্তাকুঁড়।

সোনার বরণ রং। মোমের মতো মসৃণ চেহারা। কুঞ্চি ত কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম। চোখদুটি যেন পটে আঁকা। কী সুন্দর দৃষ্টি। কোমল এবং স্নিগ্ধ। এবং গলায় স্বরচিত বীণানিন্দিত। কী মধুর!

ফরিদ খাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বেগম বললেন, 'তোমার নাম কী শের খাঁ?'

'জী।'

'তুমিই আমাদের সুলতানকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছ?'

ফরিদ ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

ফরিদের এই বিনীত ভাব দেখে খুশি হলেন বেগম সাহেবা। বললেন, 'তা দেখ শের খাঁ, কেবল সুলতানকে বাঁচালেই হবে না। দরকার হলে ঠিক ওইভাবে আমাদেরও তোমাকে বাঁচাতে হতে পারে। বিশেষত, সুলতান-জাদা জালাল-কে।'

'সুলতান-জাদাকে আমিতো কখনও দেখিনি বেগমসাহেবা!'

তা তিনি বসে থাকতে থাকতেই ডেকে পাঠালেন সুলতান-জাদা জালাল-কে। বেগমের আহ্বানে জালাল এসে দাঁড়াল। একটি কিশোর ছেলে। গোলগাল চেহারা। ধনী ঘরের ছেলেরা যেমন হয়, তেমনি। ভদ্র-নম্র-শান্ত। এবং সপ্রতিভ চাহনি। জালাল কোনও কথা বলার আগেই বেগম সাহেবা বললেন, 'এই ছেলেটিকে দেখভাল করবার দায়িত্ব আজ থেকে তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। এর জন্য যা ইনাম লাগে, তা তোমাকে দেওয়া হবে শের খাঁ। কয়েক বছর পরে এই জালালই সুলতানি তখ্‌তে বসবে। তাই একে সবরকম শিক্ষাই দিতে হবে। লেখাপড়া, রাজ্য পরিচালনা, যুদ্ধ বিদ্যা, কুটনীতি, সবই একে শেখাতে হবে। আমরা এখন কোনও রকমেই সুখে নেই, শান্তিতেও নেই, বিস্তর শের সর্দার আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ওঁৎপেতে বসে আছে। সেইসব শের সর্দারদের হাত থেকে জালাল-কে বাঁচাতে হবে। এই দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাই।'

ফরিদ খাঁ ঘাড় নীচু করে বলল, 'এমন ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ আমি কী পারব?'

'পারবে। নইলে এমন দায়িত্ব তোমাকে কেন আমি দেব?'

'সুলতান বাহারখান কী জানেন, আপনি যা বলছেন?'

'অবশ্যই। তাঁর সম্মতি বলেই, তোমাকে একথা বলা হচ্ছে। তুমি কাল থেকেই জালালের দায়িত্ব নিয়ে নাও।'

ফরিদ এখন শের খাঁ। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে যে জিতে

বসে আছে, তার কী পিছিয়ে আসা সাজে? না, পিছু হাঁটল না, শের খাঁ দায়িত্ব নিয়ে নিল সুলতান-জাদা জালালের অভিভাবকত্বের। অনেক বড় দায়িত্ব এবং ব্যাপারটি খুবই মর্যাদার। সানন্দে সে এ দায়িত্ব নিল।

আর এইদিন থেকেই ফরিদ খাঁয়ের নসিবের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল।

মানুষের জীবনে এইভাবেই হয়তো উন্নতির দরজা খুলে যায়।

একজন মহান লোকের আশ্রয় পেলে জীবনটা অনেক থিতু হয়। আর জীবনটা থিতু হলে নিজেকে নানাভাবে বিকশিত করা যায়, নিজের শাস্তির ওপর আস্থা জন্মায়। শের খাঁয়ের এখন তাই হল।

সুলতান বাহারখানের বয়স বাড়ছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতা কমছে। সব দিকে তাঁর নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ইদানীং তাঁর শরীর স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছে না। অকারণ আলস্য তাঁকে পেয়ে বসছে। তাঁর সুবিস্তৃত রাজ্যের কোথায় কী ঘটছে, সেসব খবর তাঁর কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছুচ্ছে না, খবরাখবর নিয়ে আসা যাদের কাজ, তারা তা ঠিকমতো করছে না। সকলে নিজের নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন পরগণা ঘুরে ঘুরে যথার্থ তদারকির খুব অভাব। কিছুদিন আগেও যে রাজস্ব আদায় হত, ইদানীং ধীরে ধীরে তা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ সুলতানির আয় কমছে।

তা আয় কমলেও খরচ কিন্তু কমছে না। সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়। তার জন্য খরচ হয় মেলা।

সুলতান বাহারখান বুঝতে পারছেন, তিনি অনেকখানি সংকটের ভেতর পড়েছেন।

এইরকম যখন পরিস্থিতি, তখন হঠাৎ একদিন বাহারখানের মনে হল তাঁর সুলতানি কাজে শের খাঁকে লাগাতে পারলে, তাঁর সংকটের খানিকটা সমাধান হতে পারে।

তাই বেগম দুদু যেমন শের খাঁর হাতে জালালের অভিভাবকত্ব দিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। বাহারখানও তেমনি তাঁর সুলতানি কাজে শের খাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিত আরাম খেতে চাইলেন।

শের খাঁকে ডেকে বললেন, 'কী শের খাঁ, পারবে না তুমি রাজ্যের শাসনভারটা দেখা শোনা করতে?'

'আঁজ্ঞে, হজরত যদি এই বান্দাকে এমন দায়িত্ব দেন, তা না-পারার কী আছে?'

'পারবে তুমি ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে?'

'পারব।'

'তোমাকে যদি সেনাবাহিনীর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়?'

'আঁজ্ঞে, তাও পারব।'

বাহারখান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন শের খাঁকে। তাঁর প্রিয় শের খাঁয়ের শারীরিক ভাষা কী বলে, তা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে তিনি দেখতে থাকলেন। শেরের উৎসাহ দেখে বাহারখান নিশ্চিন্ত হলেন।

এদিকে শের খাঁ, যে কিনা, হাসান মিঞার এক ত্যাজ্য সন্তান, সে হঠাৎ পেয়ে গেল অযাচিতভাবে ওপরে ওঠার এক সিঁড়ি। দখলে পেয়ে গেল বিশাল এক রাজ্যপাট দেখভালের। সুলতান বাহারখান বসে থাকেন তাঁর তখতে। আর বকলমে রাজ্য চালায় শের খাঁ। রাজ্য চালাতে শের খাঁয়ের মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই নিজেই যেন প্রকৃত সুলতান।

রাজ্য পরিচালনার সূত্রে নতুন নতুন জায়গার সঙ্গে পরিচয় হল। জানতে পারা যায়, দিল্লি মুলুক মুঘলদের খুব বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। তারা কেবল দিল্লি-আগ্রা নিয়েই সন্তুষ্ট নয়। তারা ছড়িয়ে পড়ছে হিন্দুস্থানের নানান দিকে। তবে তাদের ভেতরও এক অঘটন ঘটে গেছে। যে বাবরবাদশা ইব্রাহিম লোদীকে খতম করে দিল্লির সুলতানি প্রাসাদ দখল করে নিয়েছিলেন, তিনি আর নেই। তাঁর এন্তেকাল হয়েছে।

বাবরবাদশার চেহারাখানা আজও চোখের সামনে ভাসে শের খাঁয়ের। অমন জবর মানুষ শের খাঁ জিন্দেগীতে কখনও দেখে নি। তাই তাঁর মৃত্যু যে মুঘলদের কাছে বিরাট এক ধাক্কা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে ওই আঘাত ইদানীং হজম করে ফেলেছে মুঘলরা।

বাবরের ছেলে হুমায়ুন কম বড় যোদ্ধা নয়। সে এখন মুঘলদের শাহী তখ্‌তে। বাবর বাদশার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে হুমায়ুন এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হিন্দুস্থান থেকে পাঠান রাজত্বকে নির্মূল না করে সে ছাড়বে না।

শের খাঁ বুঝতে পারছে, এই হুমায়ুনের সঙ্গে তাকে একদিন লড়তে হবে।

আর তাদের লড়াই-ই ঠিক করে দেবে হিন্দুস্থানটা কাদের দখলে যাবে। পাঠানদের না মুঘলদের। কিন্তু সেটা কবে হবে? এবং কোথায়? পাঠনরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবং সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। তারা কখনও এক হয়ে পড়বে না। মোটকথা, হিন্দুস্থানের বুকে এক বিচিত্র খেলা চলছে। এই খেলার কবে যে ফয়সলা হবে, তা আল্লাহই জানেন। তবে খেলাটি অনেকদিন চলবে।

শের খাঁ বাহারখানের সুলতানি রাজত্বে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক জ্যোতিষীর পাল্লায় পড়ল।

যমুনার তীরে নির্জন এক জঙ্গলে তার আখড়া। হিন্দু জ্যোতিষী। ইয়া বড় বড় দাড়ি। দাড়ির জঙ্গলে হারিয়ে গেছে মুখ। মাথায় জটার দাগ। দু'জন সাগরেদ নিয়ে ইনি নির্জনে থাকেন। দেখে বোঝা গেল, লৌকিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। তাঁর যা কিছু আগ্রহ, তা হল জ্যোতিষী সম্পর্কে। তিনি সারাদিন ধরে ঘরের মেঝেতে আঁক কষেন। এবং দিনের শেষে সেসব আঁক মুছে গেছে। সন্ধ্যার পর যেন আকাশের দিকে

তাকিয়ে বসে থাকেন।

জ্যোতিষীর সাগরেদরা শের খাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে গিয়ে বসাল।

জ্যোতিষী কোনও কথা শুনলেন না। শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে থাকলেন শের খাঁ-কে।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর শের খাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'জিতা রহো ব্যাটা, জিতা রহো।'

এরপর হা-হা করে হেসে উঠলেন। সে হাসির তোড়ে তরঙ্গ খেলল জ্যোতিষীর দাড়িতে।

বললেন, 'এই হিন্দুস্থানে শিগ্‌গির যবন রাজ্য কায়েম হবে। বিস্তর খুন ঝরবে। তা তুই ব্যাটা টিকে থাকতে পারলে, হিন্দুস্থান তোর মুঠোয় চলে আসবে।'

'বলেন কী সাধুবাবা! হিন্দুস্থান আমার মুঠিতে চলে আসবে?'

'আসবে। তবে যদি টিকে থাকতে পারিস।' এবং বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'টিঁকে থাকলে তামাম হিন্দুস্থানের তুই মালিক হয়ে যাবি।'

জ্যোতিষীর এই কথাগুলিকে শেরখাঁয়ের কাছে নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হল। মনে হল, লোকটি পাগল। ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। নতুবা শয়তান।

কথাগুলিকে হেসেই তার উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু শের খাঁ তা পারল না। তার মনে হল, ব্যাপারটি যদি হয়। হলেও হতে পারে। সুলতান বাহাখানের যে সৈন্যবাহিনী আছে, তা দিয়ে একটি বড় লড়াই লড়া যেতে পারে। তবে সেপাই আরও বাড়াতে হবে। চাই কামান, বন্দুক।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। শের খাঁ একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছে গেলেন, 'চুনার দুর্গে'। দক্ষিণ বিহারের এটি একটি বিখ্যাত দুর্গ। মীর্জাপুর থেকে পুবদিকে ছত্রিশ ক্রোশ দূরে গঙ্গার ওপরে এই দুর্গের অবস্থিতি। কাশী থেকে বত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। বহু প্রাচীন দুর্গ এবং বেশ সুগঠিত। গঙ্গার ওপর এই দুর্গটি খুবই সুরক্ষিত। এবং শত্রুপক্ষের কাছে এটি অজেয়।

নদীর বুকে বজরা ভাসিয়ে দুর্গে গিয়ে পৌঁছুল শের খাঁ।

এই দুর্গের মালিক ছিলেন সুলতান ইব্রাহিম লোদী। তাজ খাঁ নামে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই দুর্গ দেখভাল করবার। সঙ্গে দিয়েছিলেন কিছু ফৌজ। আর দিয়েছিলেন দুজন বিশ্বস্ত অনুচর। তারা ছিল তুর্কি। দু ভাই। তা তারা দুর্গাধিপতিকে সবরকম সাহায্য করত। বাইরে থেকে সম্ভাব্য সবরকম বিপদের খবর এনে তাজ খাঁকে উপযুক্ত পরামর্শ দিত। তারা মাঝে মাঝে নৌকো ভাসিয়ে লোকালয়ে আসত। হাটেগঞ্জে ঘুরে বেড়াত। নানারকম কেনাকাটা করত এবং সেই ফাঁকে নানারকম খবর সংগ্রহ করত। এবং এই ভাবেই বইছিল তাদের জীবনযাত্রা।

অন্য অন্য দিন যেমন হাটেগঞ্জে আসে, সেদিনে এই দুই ভাই এসেছিল গঞ্জের ভেতর। এসে যা শুনল, তাতে তাদের চিত্তির চরক গাছ। শুনল, মুঘলদের হাতে ইব্রাহিম লোদী মারা গেছে এবং রাজধানী দিল্লি এবং সেই সঙ্গে আগ্রা পারে চলে গেছে মুঘলদের হাতে। ইব্রাহিমের সুলতানি প্রাসাদে বাদশা হিসেবে কায়েম হয়েছে এক মুঘল বাদশা।

এই রকম ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শুনে তারা দৌড়ে ফিরে এল চুনার দুর্গে। এবং দুর্গাধিপতি তাজ খাঁকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসল। তাজ খাঁ ছিলেন সরল মানুষ। যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর সেনা কলাকৌশল জানা ছিল, কিন্তু তেমন রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল না। ইব্রাহিম খানের মৃত্যু সংবাদ শুনে বেচারি এতই ভেঙে পড়ল যে, তার মগজে কোনও বুদ্ধিই কাজ করল না। তাই যা কিছু করবার, তা এই দুই তুর্কি ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দিল।

এই দুই তুর্কি ভাই দক্ষিণ বিহারের সুলতান বাহারখানের কাছে তাদের সুরক্ষা চাইল।

এবং সুরক্ষা চাওয়া মাত্রই সুলতান বাহারখান তা মঞ্জুর করল। এবং সেই থেকে চুনার দুর্গ রয়ে গেল তাঁর অধীনে। এখন ওই দুর্গের হাল দেখার জন্য শের খাঁ এসে হাজির হল।

তা দুর্গে এসে ভালোই অভ্যর্থনা পেল শের খাঁ। পেল আতিথেয়তা। এবং বেজায় খাতির। যেন সে সুলতান বাহারখান।

তাজখাঁয়ের কথা ইতিপূর্বে অনেক শুনেছে শের খাঁ। এখন তাকে প্রত্যক্ষ দেখা গেল। দেখে খুশি হল।

তাজ খাঁ-এর চেহারাখানি বিশাল। সাধারণ মানুষদের থেকে তাঁর উচ্চতা যেন আধহাত বেশি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, তিনি একজন বলশালী ব্যক্তি। তবে এখন তিনি তাঁর যৌবনকালের মতন নেই। বেশ কিছুটা বয়স হয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু তার অর্ধেক পাকা। চোখের কোণে কালি জমেছে। চামড়া লোল। গৌরবর্ণ রং এখন কিন্তু তামাটে। হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবার মতন। তবে থাবার ওপরে নীল নীল শিরা। তাজ খাঁয়ের এখন বয়স হয়েছে। বয়সটি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

তুর্কি দুই ভাই শের খাঁয়ের সঙ্গে তাজ খাঁয়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর বলল, 'আমাদের হুজুরকে কেমন লাগছে খাঁ সাহেব?'

'চমৎকার! পাঠান ছাড়া এসব চেহারা আর কোথায় পাওয়া যাবে। খাঁ সাহেবকে দেখলে মাথা সহজেই নীচু হয়ে আসে। তবে মানুষটা কিন্তু বড় গম্ভীর।'

শের খাঁয়ের কথা শুনে মৃদু হাসলেন তাজ খাঁ। এবং মৃদু গলাতেই বললেন, 'আমি তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তেমন ভাবে হুকুম করতে পারি না। সুলতানের হুকুম তালিম করতেই আমি অভ্যস্ত।'

তখন শরৎকাল। মেঘমুক্ত আকাশ। গঙ্গার জল দুপুরের রোদে ঝিকমিক করছে। ছোট ছোট ডিঙি নৌকো ইতিউতি মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। এক ঝাঁক কবুতর আশমানে পাক খেয়ে দুর্গের গম্বুজে এসে বসল।

খানিকক্ষণ আলাপ করার পর তাজ খাঁ চলে গেলেন তাঁর ঘরের ভেতর।

তুর্কি দুইভাই বলল, 'ইদানীং হুজুরের মন মেজাজ ভালো নেই। উনি নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করেন।'

'বিপন্ন বোধ করেন কেন? '

'বিপন্ন বোধ করার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হল, সুলতান ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু। সুলতানের মৃত্যু ওঁকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। এক অজানা আতঙ্কে উনি ভুগছেন। নিজেকে সর্বদা অসহায় মনে করছেন।'

'হুম্, এটাতো হল প্রথম কারণটা। তা দ্বিতীয় কারণটা কী?'

'আঁজ্ঞে, সেটি হল পারিবারিক। খাঁ সাহেবের অনেকগুলি বিবাহ। প্রথমদিকে যেসব শাদি করেছিলেন, তাদের দরুণ সেসব ছেলেপুলে জন্মেছে তারা সকলেই এখন সাবালক। লায়েক। এদিকে পরে অর্থাৎ কয়েক বছর আগে খাঁ সাহেব শাদি করে যে বেগমকে ঘরে নিয়ে এসেছেন, সেই বেগম যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, এঁর নাম লাছমালিকা। খাঁ সাহেব এখন এই বেগমের সম্পূর্ণ বশীভূত। এই দুর্গের অধিকার এখন তাই বেগম সাহেবার হাতের মুঠোয়। তিনি যা বলছেন, সেই সেই ভাবে সব কিছু চলছে। খাঁ সাহেব একেবারে কাঠের পুতুল। খাঁ সাহেবের এই হ্যাদানো ভাবটা ছেলেরা পছন্দ করছে না। তারা হররোজ হুজুরের সঙ্গে কলহ করছে। এবং এই নিয়ে চলছে এখন ঘোর আপত্তি। এবং এই অশান্তি, এমন চরমে উঠছে যে, খাঁ সাহেব মনে করছেন যে তিনি এবং তাঁর নতুন বেগম যে কোনও মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারেন।'

দুই ভায়ের মুখে এই বিবরণ শুনে শের খাঁয়ের মনে পড়ে গেল নিজের বাপ হাসান মিঞার কথা। সেই একই জিনিস।

বাপ হাসান মিঞার ঠিক এই ভাবেই মোহিনী ছোট বিবির পাল্লায় পড়ে কী না নাকানি চোবানি খেয়েছেন, তা এটা ঠিক সেইরকমই। হায়, দুনিয়াটা এই একই রকম।

শের খাঁ গম্ভীরভাবে ভাইদুটিকে বলল, 'ব্যাপারটা খুবই জটিল বটে, এ সমস্যার সমাধান সহজে হবে বলে মনে হয় না, তা একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এই লাছমালিকার কোনও ছেলেপুলে আছে না কি?'

'আজ্ঞে না। ওঁর ছেলেপুলে হয়নি। আর হবে বলেও মনে হয় না। তা ছেলেপুলে না হোক, উনি কিন্তু আমাদের নিজের ছেলের মতনই স্নেহ করেন। কাজেকর্মে তেজস্বিতা থাকলেও, উনি ভারি নরম প্রকৃতির বেগম। আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলেই বুঝতে পারবেন উনি কেমন মহিলা!'

'বটে! তা আমার সঙ্গে দেখা হবে কেন?' শের খাঁ একটু বিস্মিত হল, 'অন্তঃপুরের বেগমদের বাইরে বেরিয়ে এসে পরপুরুষদের সঙ্গে দেখা করার তো কথা নয়।'

'আঁজ্ঞে, তা ঠিক। তবে উনি পর্দা বা বোরখা কোনওটাই মানেন না। আপনাকে আজ তিনি নিজে হাতে না খাইয়ে ছাড়বেন না।'

দুই ভাইয়ের অনুরোধে বেগমের আতিথ্য নিতে রাজি হল শের খাঁ।

দেখা হল বেগমের সঙ্গে। বেগম লাছমালিকা। বেগমের রূপ দেখে শের খাঁ অভিভূত। এমন রূপ শের খাঁ জীবনে কখনও দেখেনি। চাঁপার কলির মতো গায়ের রং। মাথায় ঘন কুঞ্চি ত কেশদাম। চোখদুটি কাজল কালো। ভ্রূযুগল যেন উড়ন্ত পাখির ডানা। কপোল, কপাল, চিবুক, অধরোষ্ঠ যেন কোনও দক্ষ শিল্পীর তৈরি। বেগমের বয়স যে ঠিক কত, তা ঠাহর করা শক্ত। তবে বয়স যতই হোক না কেন, শরীরের গঠনে তিনি যে কোনও মোহিনীকে হার মানায়।

গায়ে খুব বেশি অলঙ্কার নেই। কিন্তু গলায় যে হারটি রয়েছে, তাতে ঝিলিক দিচ্ছে বিশাল একখণ্ড হীরে।

'কী হল, অমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আপনি বসুন। সামান্য যে খাবার আয়োজন করেছি, তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ছি না, আপনাকে অভুক্ত ছেড়ে দিলে খাঁ সাহেব রাগ করবেন।'

গলার স্বরটি সুরেলা। যাকে বলে বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর। কেবল রূপে নয়, গলার স্বরেও মোহিনী মায়া। ইনি যে কথাই বলুন না কেন, সে কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাজ খাঁ কেন যে এঁর বশীভূত, তা বুঝতে অসুবিধা হল না শের খাঁর।

'আমাদের এই চুনার দুর্গ আপনার কেমন লাগছে?'

'ভালো। খুব ভালো। নদীতে নৌকো নিয়ে ভাসতে ভাসতে অনেকদিন এই দুর্গের কোণ দিয়ে চলে গিয়েছি। ভেতরে ঢোকা হয়নি। আজ এই প্রথম ঢুকলাম।'

বেগম সাহেবা বললেন, 'নৌকো নিয়ে আপনি যখন দুর্গের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন আমি আপনাকে কোনও কোনও দিন দেখেছি। আপনার নৌকোয় সুলতানি পতাকা উড়ত, তাই না?'

'হ্যাঁ,' থতমত খেতে হল শের খাঁকে। 'তা আমিই যে যেতাম, তা বুঝেছেন কেমন করে?'

বেগম নাছমালিকা হাসলেন। সেতারের তারে যেন মৃদু ঝংকার উঠল।

'শের খাঁকে চেনে না, এমন লোক এ রাজ্যে নেই, আছে নাকি!' আবার হাসলেন বেগম লাছমালিকা। 'একটা হিংস্র শেরের সঙ্গে লড়াই করে যে মানুষ শেরকে মেরে ফেলে, তাকে না চিনে কী থাকতে পারি? আপনি নৌকোয় ভেসে চলেছেন, সে দৃশ্য আমি অনেকদিন দেখেছি।'

একটা বড়ো মেঠাই মুখে পুরে দিয়ে, শের খাঁ বলল, 'তা হলে আমিও আপনাকে দেখেছি।'

'আমাকেও আপনি দেখেছেন, কী করে?'

'অনেকদিন সূর্যাস্ত বেলায় দেখেছি এক সুন্দরী মহিলা দুর্গ প্রাকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। দেখে মনে হত, তিনি এক রূপসী বেগম। ব্যস্, এই পর্যন্ত। তা তিনিই যে আপনি, আজ

বুঝতে পারছি।'

বেগম সাহেবা হাসলেন। আলোচনার প্রসঙ্গ বদলালেন। বললেন, 'আজ আপনাকে এতখানি খাতির করছি, কেন জানেন?'

'না।'

'আপনার অপরিসীম বীরত্বের জন্য। আপনার দুর্বার সাহসের জন্য। শেরের হাত থেকে আপনি সুলতান বাহারখানকে যেভাবে বাঁচিয়ে ছিলেন, তার জন্য। তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।'

শের খাঁ হাসল। 'এ দিয়ে কী প্রমাণ হল বেগম সাহেবা?'

'প্রমাণ হয়, আপনি ওই ভাবেই একদিন হয়ত সাহস ভরে এগিয়ে এসে আমাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবেন। একথা ভেবেই আপনাকে এত খাতির করছি খাঁ সাহেব! কী পারবেন না আপনি আমাদের বাঁচাতে?'

'পারব। পারতে চেষ্টা করব।'

'ব্যস্, তা হলেই হবে।'

'যদি মুঘলরা এসে হানা দেয়, তখনও পারবেন তো?'

'পারব। পারতে চেষ্টা করব।'

নৌকোয় চড়ে জলপথ দিয়ে শের খাঁ গিয়েছিল দুর্গে। এবং সেই ভাবেই ফিরে এল।

নদীপথে আসতে আসতে তার মনে হল, বেগম নাছ-মালিকাকে সে যে কথা দিয়ে এল, তা কী সে আদৌ রাখতে পারবে? মুঘলরা যদি এসে এই চুনার দুর্গে হানা দেয়, সেই মুঘলদের মোকাবিলা কী ভাবে করবে সে? সুলতান বাহারখানের যে সেনাবাহিনী আছে, তার শক্তি তেমন জোরালো নয়। মুঘলদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হলে দরকার আরও বহু সংখ্যক সেনার। দরকার অশ্বারোহী এবং গজারোহী সৈন্যের। দরকার কামান এবং গোলাবারুদের। এবং সব থেকে বেশি যা দরকার, তা হল সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ পাওয়া বিরাট এক সৈন্যবাহিনীকে। সুলতান বাহারখান যদি রাজি থাকেন, তা হলে তেমন সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে শের খাঁ।

এইসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে গঙ্গার বুকে নৌকো ভাসিয়ে চলেছিল শের খাঁ।

ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছিল চুনার দুর্গ। খরস্রোতা নদী, অবিরাম তরঙ্গ-ভঙ্গ। অপরাহ্নের সূর্য ঢলে পরেছে পশ্চিমে। মাঝদরিয়ায় এখনও অনেক নৌকো ভাসছে।

হঠাৎ মানস-পটে ঝিলিক দিয়ে উঠল বেগমের আশ্চর্য সুন্দর দেহশ্রী। সঙ্গে সঙ্গে মনটা উতলা হয়ে উঠল শের খাঁর। টনটন করে উঠল বুকের ভেতরটা। মনে হল, এই বেগম লাছমালিকার সঙ্গে যদি শাদি হত, তা হলে তার জীবনটা হয়তো অন্যরকম হয়ে উঠত। নদীর বুকে যেমন নৌকো ভাসছে, ঠিক এইভাবেই ভালোবাসার স্রোতে সে ভাসতে পারত। উৎসাহ ও উদ্দীপনার যেন শেষ থাকত না।

শের খাঁ বিবাহিত। বেগমরা রয়েছে কুঠিতে। তারা দেখতে কিছু খারাপ নয়। শের খাঁর দুই ছেলে আদিল এবং জালাল। জালালকে আদর করে কখনও 'ইসলাম', আবার কখনও 'সালিম' বলে ডাকে শের খাঁ। সে স্নেহময় বাবা।

সুখী পরিবার। শান্তির পরিবার। এই সুখ এবং শান্তির মধ্যে থেকেও বেগম লাছমালিকার জন্য মনটা উচাটন হয়ে উঠল। আবার কবে দেখা হবে? এবার দেখা হলে, সে দেখা যেন অনেকটা সময় জুড়ে হয়!

দিন কয়েক পরে শের খাঁ বাহারখানের কাছে প্রস্তাব রাখল, 'সেনার সংখ্যা বাড়াতে হবে। নতুন করে তৈরি করতে হবে অশ্বারোহী সৈন্যদল। কিনতে হবে গোলাবারুদ, কামান-বন্দুক।'

'হঠাৎ এমন প্রস্তাব কেন?'

'মুঘলদের ঠেকাতে হলে সৈন্যবাহিনীকে তৈরি রাখা জরুরি।'

সুলতান বাহারখান লম্বা একটা হাই তুলে বললেন, 'তোমার কথা ঠিক শের খাঁ। কিন্তু এর জন্য যে অনেক টাকার দরকার। আমার সুলতানিতে অতটাকা কোথায়?'

আমরা তাহলে কী শেষপর্যন্ত মুঘলদের দাস হয়ে থাকব?'

'না, দাস হবো না। লড়াই করব। লড়াই করে মরব।'

'সুলতানি রাজ্য যে তা হলে চৌপাট হয়ে যাবে।'

'তা যাবে।' আবার লম্বা হাই তুললেন সুলতান, 'সুলতান ইব্রাহিম যাদের ঠেকাতে পারলেন না, আমরা কী তাদের ঠেকাতে পারব।'

শের খাঁ স্বস্তি বোধ করল না বাহারখানের কথায়। মনে হল, সুলতান বৃদ্ধ হয়েছেন। যৌবনের তেজ তাঁর ভেতর আর নেই। লড়াই করে টিকে থাকতে তিনি চান না। তাঁর ভেতর না আছে উৎসাহ, না সাহস। সবকিছুই তিনি ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

তা এই সৈন্যসজ্জার কথাটা একদিন বেগম দুদুর কাছেও উপস্থাপিত করল শের খাঁ। তা তিনি যদি সাড়া দেন।

বেগমের থেকেও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি বললেন, 'জালাল-কে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আশা করি, তুমি তাকে দেখবে। তোমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আজও ঘামাতে চাই না।'

এই রকম গা-ছাড়া এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গেল কয়েকমাস। এবং প্রায় এক বছর।

এরপর হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হল। কয়েকদিন জ্বরের পর হঠাৎ এন্তেকাল হল সুলতান বাহারখানের।

সুলতানের মৃত্যু! ফাঁকা হয়ে গেল তখ্ত। কথায় আছে, প্রকৃতি কোথাও কোনও জায়গা ফাঁকা থাকতে দেয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে তা ভরাট হয়ে যায়। সুলতানি বিষয়ও প্রায় অনুরূপ। তবে সুলতানি তখ্ত ভরাট করতে বিস্তর জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই তখ্তের দাবিদার হিসেবে অনেক মানুষ এগিয়ে আসেন। এগিয়ে আসেন বিস্তর আপনজন। এই তখ্ত আমার। বাধে হানাহানি।

শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনানি। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না।

বাহারখানের মৃত্যু সেইরকম এক উত্তেজক পরিবেশের ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করল।

তবে এই পরিস্থিতি অতিদ্রুত সামাল দিল শের খাঁ। সহযোগিতা পাওয়া গেল বেগম দুদুর। বেগমের মাধ্যমে ঘোষণা করা হল, বাহারখানের সুলতানি তখ্‌তে বসবেন তাঁর নাবালক ছেলে জালাল। এবং এই নাবালকের হয়ে রাজ্য পরিচালনা করবে শের খাঁ। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে পাকেচক্রে শের খাঁই হয়ে গেল দক্ষিণ বিহারের সুলতান।

তার ভাগ্য যে এইভাবে বদলে যাবে, তা জিন্দেগীতে ভাবতে পারেনি শের খাঁ নিজে। কিন্তু আল্লাহের কৃপায় সবই হয়। এখানেও তাই হল।

শের খাঁয়ের এখন দুটি ভূমিকা। একটি ভূমিকা হল, জালাল-কে মানুষ করে, বড় করে, তার বাবার তখ্‌ত ফিরিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয় ভূমিকা হল সুলতান তখতটিকে অটুট রাখা। মুঘলরা যে ভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসছে, তাতে দিনে দিনে আশঙ্কা বাড়ছিল, কী ভাবে তখ্‌ত জীইয়ে রাখা যাবে। আক্রমণকে আটকাতে হলে প্রয়োজন হয় প্রতি আক্রমণের। কিন্তু প্রতি আক্রমণ করতে হলে দরকার ট্যাঁকের রেস্তর। কিন্তু সে রেস্ত শের খাঁ জোগাড় করবে কোথা থেকে। ইচ্ছে থাকলেও, উপায় নেই।

তা হঠাৎ একদিন সে পথও খুলে গেল।

অপ্রত্যাশিত ভাবেই একদিন চুনার দুর্গ থেকে এসে উপস্থিত হল বেগম লাছমালিকার সেই তুর্কি পাহারাদার দুটি।

'কী ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ আমার কাছে? হঠাৎ কী হল!'

'আঁজ্ঞে, আমাদের বড় বিপদ হয়ে গেছে। আমাদের মালিক হজরত তাজ খাঁ খুন হয়ে গেছেন।'

'খুন হয়েছেন? মুঘলরা এসে দুর্গ আক্রমণ করেছে না কী?'

'না জনাব। হজরত তাজ খাঁ খুন হয়েছেন নিজের ছেলেদের হাতে। তা কেবল হজরাত তাজ খাঁ কেন, বেগম লাছমালিকাকেও ওরা খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি, বেগম সাহেবার অনুরোধে দুর্গের সেপাইরা তাঁকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। আপনাকে এখনই যেতে হবে। বেগম সাহেবার এ একান্ত অনুরোধ।'

যে বেগম সাহেবাকে দেখা তক্‌ শের খাঁ তাঁর মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন, তাঁর অনুরোধ দূরে সরিয়ে রাখা কঠিন। এই বেগমের বিপদে সে পাশে দাঁড়াবে না তো কার পাশে দাঁড়াবে? কয়েকজন বাছাই করা সেনা সঙ্গে নিয়ে শের খাঁ দৌড়ুল চুনার দুর্গে।

তাজ খাঁয়ের ছেলেদের হাত থেকে শেষমেশ বাঁচানো গেল বেগমকে।

'এরা কী চায়?'

'আমাকেও খুন করতে চায়। খুন করে দখল নিতে চায় দুর্গের। আপনি আমাকে বাঁচান শের খাঁ।'

যুবতী বেগমের চোখমুখে আতঙ্ক। জলের ধারা নেমে আসছে দুচোখ বেয়ে। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে।

'এই তো আমি আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। ভয় কী!'

'ভয়?' চন্দ্রালোকের মতো মৃদু হাসলেন বেগম। 'ভয় এখন আমার বুকে জাঁকিয়ে বাসা বেঁধেছে শের। আমাকে যদি সত্যিই তুমি বাঁচাতে চাও, তা হলে আজ রাতেই আমাকে শাদি করো। তুমি যদি আমাকে শাদি করো, তা হলেই আমি ভয় থেকে মুক্ত হব।'

বেগমের এই অভাবিত বিবাহের প্রস্তাবে শের খাঁর সারা শরীরে আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল। বারবার তার শরীর শিহরিত ও রোমঞ্চিত হল। এবং সেইরাতেই বেগম লাছমালিকার সঙ্গে শের খাঁর শাদি হয়ে গেল। আল্লাহ হয়তো এরকমই চেয়েছিলেন।

শেরের মনে হল, এর থেকে চমকপ্রদ ঘটনা তার জীবনে আর কী হতে পারে?

কিন্তু এর থেকেও যে চমক কিছু থাকতে পারে, তা সে গভীর রাতে জানতে পারল। বেগম লাছমালিকা তাকে হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে শাদি করার জন্য আমি কেবল তোমাকে যৌবন ও ভালোবাসাই দিচ্ছি না, এক বিশাল ধন ভাণ্ডার তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। এমন ধনভাণ্ডার, যা তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না।'

দুর্গের এক গোপন কুঠুরিতে শের খাঁকে নিয়ে গেল বেগম লাছ।

তারপর নববিবাহিত ভালোবাসার লোকটির হাতে তুলে দিল একে একে পঞ্চাশটি মহার্ঘ্য হীরকখণ্ড, সাত মন ওজন হতে পারে, এমন রাশি রাশি মুক্তো, একশো পঞ্চাশ মন সোনা এবং অজস্র রত্নখচিত অলঙ্কার। যেন কুবেরের ধনভাণ্ডার।

মশালের আলোয় ছোট্ট কুটুরিতে এই বিপুল সোনা, রত্নখচিত অলঙ্কার, দুর্লভ হীরক এবং রাশি রাশি মুক্তোয় ঝনঝন করতে থাকল।

'হ্যাঁ, এখন থেকে এ সবই তোমার। এ সবই তোমাকে আমার শাদির উপহার।'

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি যখন ঘটল, তখন আশমান জুড়েও ছিল হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। বিশাল নক্ষত্রমালা সারা আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে কিছু কথা বলতে চাইছিল। কিম্বা বলছিল। তাদের অব্যক্ত ভাষার পাঠ উদ্ধার করা যাচ্ছিল না।

জঙ্গলমহলের মহাদুর্গের চত্বরে বসে অনন্তদেব ভাষা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। হরশঙ্কর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল হাঁ করে। আর ভবশঙ্করের চোখ জুড়ে নামছিল নিবিড় একখানা ঘুম। তার চোখের পাতা বুজে আসছিল। তবু সে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করছিল। আকাশ যেমন ছিল, ঠিক তেমনই সে দেখছে।

তা সেইসময় হঠাৎ এক বিশাল বিদ্যুৎঝলকা গোটা

আকাশটা বিদীর্ণ করে পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেল।

তিনজনেই শিহরিত। হরশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ একী হল গুরুদেব? বিনামেঘে বজ্রপাত?'

গুরুদেব অনন্তদেব মিশ্র হাসলেন। বললেন, 'আমাদের এই ভারতের বুকে নতুন এক যবনশক্তির উদয় হল।'

'প্রভু, এর দ্বারা আমাদের কী কোনও উপকার হবে?'

অনন্তদেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'না। আমাদের কোনও উপকার নেই। উপকার হচ্ছে যবনশক্তির।'

।। তিন ।।

কথায় আছে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

তা যে সময়ের কথা এখানে লেখা হচ্ছে, তখন এই ভারতবর্ষে উলুখাগড়াদের নিয়ে কারও কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। যা কিছু মাথাব্যথা, তা ছিল এই হিন্দু রাজা-রাজড়াদের নিয়ে। তবে এই হিন্দুরাজাদের নিজেদেরই জন্য মাথাব্যথা করত। অন্যরা নন।

রাজা-রাজড়ারা তাঁদের ধর্মসম্পদ, তাঁদের জীবন এবং বিশেষভাবে তাঁদের রাজত্ব অটুট রাখত নিজের নিজের এলাকায়। প্রভূত খরচ-পত্র করে বানিয়ে তুলতেন এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। - এই দুর্গ কেবল এক-একটা নয়, প্রয়োজনে একাধিক নির্মিত হত। - হঠাৎ যাতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে বিপক্ষীয় কেউ তাঁদের জীবন বিপন্ন করতে না পারে, তার জন্যই ছিল এইসব দুর্ভেদ্য দুর্গ। - হানাদারেরা আটকে যেত এই দুর্গে। আটকে যেত যবনরা।

ওইসব দুর্গ এমন সব জায়গায় তৈরি হত, যেখানে শত্রুপক্ষের লোকেরা চট করে না পৌঁছতে পারে।

দুর্গ দৈরি হত দুর্গম পাহাড়ের ওপর, নদীর বাঁকে এবং কখনও কখনও সু-উচ্চ পাহাড়ি শিরদাঁড়ায়।

দুর্গকে ঘিরে নদী থাকলে তো কথাই নেই, তবে যেখানে নদী থাকত না, সেখানে নদীর মতো করে দুর্গের চারদিকে পরিখা খনন করা হত। এইসব পরিখা টপ্‌কে দুর্গের প্রাকারের কাছে পৌঁছনো ছিল বীরদের আয়াস সাধ্য ব্যাপার। দুর্গের চারদিক ঘিরে যে প্রাকার থাকত, তার উচ্চতা হত আকাশছোঁয়া। প্রাকারের গঠন এতই চওড়া হত যে, তার ওপর অনায়াসে বাঙ্কার বসানো যেত। দুর্গের রক্ষীবাহিনী তার ওপর কুচকাওয়াজ করতে পারত এবং সেখান থেকে আক্রমণকারীদের ওপর হাজার হাজার তীর বর্ষণ করতে পারত। মোট কথা, আক্রমণকারী শত্রুদের পক্ষে দুর্গ দখল করা আদৌ কোনও সহজ কাজ ছিল না।

এ তো হল দুর্গের বাইরের কথা। দুর্গের ভেতর যা থাকত, তাও ছিল রীতিমত চমকপ্রদ।

দুর্গের ভেতর থাকত ছোট-বড় এক-একটা নগর। এর ভেতর থাকত রাজ-রাজরাদের বিশাল প্রাসাদ। থাকত মহলের পর মহল। খেলার মাঠ। উদ্যান। দীঘি। ফসল তৈরির ক্ষেত। শস্য সঞ্চয় করে রাখা যায়, এমন বৃহৎ-বৃহৎ শস্যাগার। থাকত বিশাল বিশাল সেনা নিবাস। যেখানে থাকত হাজার হাজার যোদ্ধা, যারা সহজেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত। আর থাকত কিছু জঙ্গল।

এ ছাড়া থাকত অশ্বশালা, অস্ত্রশালা এবং কামান-বন্দুক সহ আরও কত কী! এমনকী দোকান-পাটও থাকত।

মোটকথা, এক-একটা দুর্গ ছিল এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটখাটো নগর বিশেষ। এবং নগর কেন, এগুলিকে রাজ্য বললেও অত্যুক্তি হত না, তখনকার ভারতবর্ষে ছিল অসংখ্য রাজা, অসংখ্য দুর্গ এবং প্রতিটি দুর্গও ছিল বিশেষভাবে সুরক্ষিত।

আগে এই দুর্গগুলি ছিল হিন্দুরাজা ও রাজপুতদের। আফগান-পাঠানরা ভারতবর্ষে আসার পর থেকে এই অধিকারের বদল হতে থাকে। হিন্দুরাজারা যুদ্ধে একে একে হারতে থাকল। এবং তাদের দুর্গগুলি একে একে বেদখল হতে থাকল। আফগান-পাঠানরা দুর্গ জয়ের পর দুর্গের ভেতরে যা কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকত, তা লুঠপাঠ করে নিয়ে নিজেদের বিশ্বস্ত লোককে বসিয়ে দিত। তারা দখলকারী প্রভুর স্বার্থ দেখত। এই রকমই কেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবার কোনও দুর্গে দুর্গাধিপতিরা দখলকারীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলে, তাঁরাই নিজের নিজের পদে বহাল থাকতেন এবং দখলকারী প্রভুর স্বার্থও দেখতেন।

এইরকম ভাবেই সেখানে দুর্গ-শাসন ব্যবস্থা চলছিল।

যেকালে বাংলা মুলুকে 'সুরজগড়' দুর্গ একটা বিখ্যাত দুর্গ। এই দুর্গ থেকেই বাংলার সুলতান বাংলা মুলুক শাসন করতেন। শের খাঁ তাঁর প্রথম উত্থানের সময় এটি আচানক দখল করে নিয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। সাসারামের হাসান মিঞার ছেলে এক লাফে অনেকখানি সেবার উঠে পড়ে। দুর্গটি জয় করে অনেক সঞ্চিত ঐশ্বর্য যেমন সে পেয়েছিল, তেমনি পেয়েছিল অনেক হাতী। আর তার থেকে যা পেয়েছিলেন তা হল যুদ্ধের জন্য রাখা প্রভূত গোলাবারুদ।

রোটাসগড় দুর্গের ইতিহাসও এই একই রকম। এই দুর্গে হিন্দু রাজা ছিলেন মানিক। তাঁকে কী কৌশলে শের খাঁ পরাভূত করেছিলেন, তা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যেতে পারে।

'চুনার দুর্গ' কীভাবে এবং কতখানি শের খাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল, তার সব কিছুই দেখা গেল।

মধ্যভারতে বিখ্যাত যে দুর্গটি ছিল, তার অবস্থান অনুসারেই নাম ছিল 'রাইসিন'। এখানে সে সময় বক নামে দুর্গাধিপতি ছিলেন। চৌহান রাজপুত রাই শিনহাজির পুত্র পুরানমল। পুরানমল ছিলেন এক জবর রাজপুত শাসক। তিনি চান্দেরি রাজ্য

জয় করে বহু মুসলমানকে তাঁর শাসনে এনেছিলেন। মুসলমানরা তাঁর ভয়ে তখন কাঁপত।

তা 'কালিঞ্জর' দুর্গও ছিল ওই ধরণের রাজপুত শাসিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন কিরাত সিংহ। ইনি ছিলেন যেমন সাহসী, তেমনি শক্তিশালী। ইনি চান্দেনায় বাহোবা-রও রাজা ছিলেন।

যে-কোনও কারণেই হোক, সুলতানি আমলের হানাহানি এবং কাটাকাটির আঁচ তেমনভাবে এই কিরাত সিংহকে স্পর্শ করতে পারেনি। চারদিকে রণবাদ্য এবং কামানের গর্জন শোনা গেলেও সেখানের বুন্দেলখণ্ডের শ্রী বাহোবা রাজ্য এবং গড় কালিঞ্জরে এক শান্তির আবহ তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিজেও তিনি সুখে এবং শান্তিতে ছিলেন। তবে একটি ব্যাপারে তাঁর ছিল বেজায় আক্ষেপ, এবং সে আক্ষেপ হল তাঁর কোনও ছেলে ছিল না, তাঁর ছিল দুটি কন্যা। দুর্গাবতী ও কমলাবতী। ছেলে থাকলে কিরাত তাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতেন। দুর্গা ছিল বড় এবং কমলা ছিল ছোট।

পিঠোপিঠি নয়, দুই বোনের বয়সের ব্যবধান ছিল অনেক। তা আট-নয় বছর তো বটেই।

কমলার জন্মের আগে পর্যন্ত দুর্গা একা একাই বড় হয়ে উঠছিল। তবে বাপের প্রতি ছিল তার অদ্ভুত এক টান। আঁকড়ে থাকত সে বাপকেই।

রাজপুত শিশু-কন্যারা পুতুল খেলতে খুব ভালোবাসে। এ তাদের স্বভাবগত। পুতুলকে সাজিয়ে, সুসজ্জিত করে, তার বিয়ে দেওয়া, কিম্বা তাকে কোলে নিয়ে শিশুর মতো ঘুম পাড়ানো। এসব নিয়েই তো পুতুল খেলা। এই ধরনের খেলাতে দুর্গার ছিল ঘোরতর অপছন্দ। দুর্গা তার পুতুলকে সাজাতো যোদ্ধার বেশে, বাবা কিরাত যেমন সাজেন, সেই বেশে। তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠাত যুদ্ধ করতে। এবং খেলত যুদ্ধের খেলা। পুতুলের সঙ্গে থাকত কাঠের ঘোড়া, কাঠের হাতী, ছোট ছোট লোহার কামান, আরও কত কী! এইসব নিয়ে চলত শিশু দুর্গার যুদ্ধু-যুদ্ধু খেলা। ফায়ার দাগা হত, ঘোড়া দৌড়ুত, পড়ত হাততালি!

কিরাত সিংসের স্ত্রী যুধাবাঈ বলতেন, 'দেখেছ মেয়ের কাণ্ড! মেয়েদের খেলা নয়, রাজপুত ছেলেরা যেসব খেলা খেলে, সেইসব খেলা উনি খেলছেন। মেয়ে তো নয়, ধিঙ্গি। মদ্দা মেয়ে।'

যুধাবাঈয়ের কথায় হাসতেন কিরাত সিংহ। তাঁর রাজপুতানি যোদ্ধা গোঁফে মৃদু-মৃদু চারা দিয়ে বলতেন, 'ভুলে যেও না রানী, ও হল রাজপুত ঘরের মেয়ে। এর রক্তে লড়াইয়ের ঝাঁঝ আছে। তাই সে এই রকম খেলা খেলছে।'

'জানি না বাপু! দেখেছি রাজপুত মেয়েরা 'জহর' খেয়ে দলে দলে পুড়ে মরে, তাদের লড়াই করার কথা কখনও জীবনে শুনিনি।'

'এ মেয়েটা আর পাঁচটা মেয়ের মতে হবে না। এর চরিত্র কত অন্তরায়।'

তা মেয়ে দুর্গার চরিত্র যে অন্যরকম হতে চলেছে, তা আরও দু-এক বছর গাড়িয়ে যেতেই টের পাওয়া গেল। সে এক্কা-দোক্কা না খেলে, বাপের সঙ্গে ঘোড়ায় উঠে বসতে চায়। বাপের মতন ঘোড়ায় চেপে দৌড়তে চায়। আশ্চর্য বায়না!

বাবা কিরাত সিংহ তাকে সস্নেহে তুলে নেন ঘোড়ার ওপর। সামনে বসান যত্ন করে। ঘোড়া ছোটান।

সেই ঘোড়া ছোটে দুর্গ ছাড়িয়ে বুন্দেলখণ্ডের এবড়ো খেবড়ো অসমতল পাহাড়ি তল ধরে। ঘোড়া লাফায়, এবং সেই সঙ্গে উল্লাসে বাপের কোলে মেয়েও লাফিয়ে ওঠে। ছোট ছোট হাতে তালি বাজায়। কী উৎসাহ!

কিরাত সিংহ একদিন জঙ্গলে চলেছে শিকার করতে। সঙ্গে দলবল। এমন শিকারে তিনি হামেশাই যান।

মেয়ে সেদিন বায়না ধরল, 'আমিও যাব।'

কিরাত বললেন, 'জঙ্গলে বাঘ আছে। বড় বিপদ।'

'বাঘ যদি লাফিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কী হবে?'

'হুঁ! পড়লেই হল? তাক বরশা ছুঁড়ে আমি মেরে ফেলব।'

'বটে!' হাসেন কিরাত সিংহ, 'তুই পারবি কেঁদো বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে?'

'পারব।'

মেয়েটার বুকে সত্যিই কোনও ভয়ডর নেই। কী হাসে! কিরাত সিংহ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। এবং মনে মনে আক্ষেপ করেন, এই মেয়েটি যদি ছেলে হত, তা হলে কী ভালোই না হত! বংশের মর্যাদা বাড়ত এবং কিরাত সিংহের নাম তার ছেলের মতো সুখ্যাতিতে ভরে উঠত। কিন্তু যা হয়নি, তার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা! বরং যা হয়েছে, তাকে নিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিরাত সিংহ তাই মেয়েটিকে ছেলের মতো করে মানুষ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তাকে ছেলে বানানো হতে থাকল।

কিরাত তাঁর মেয়েকে নিয়ে শিকারে যেতে থাকলেন। তাঁর সমতলভূমির যে রাজ্য, সেখানে দেখভাল করতে গেলে মেয়ে দুর্গাকে সঙ্গে নিতেন। মারাঠা প্রজাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা বাপের কাছ থেকেই শেখে মেয়েটি। ধীরে ধীরে সে প্রজাদের ভাষাও বুঝতে শেখে। তাদের অভাব অভিযোগ কেমন, তাও সে যেন ঠাহর করতে পারে।

কেল্লার ভেতরে কিরাত সিংহের বিশাল ঘোড়াশালা। সেই ঘোড়াগুলিকে আসন্ন কোনও যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়। বিশ-পঞ্চাশ জন অশ্বরক্ষক তাদের পরিচর্যা করে। মাঝে মাঝে তাদের দৌড়ের মহড়া দেওয়া হয়। এই দৌড়ের ফাঁকে ব্যবহার করা হয় কেল্লার সংলগ্ন বিখ্যাত মাঠটিকে। সেখান যখন ঘোড়াগুলি দৌড়াদৌড়ি করে তা কেল্লার বুরুজে দাঁড়িয়ে দেখেন কিরাত সিংহ। কিরাতের সঙ্গে তাঁর মেয়ে দুর্গা যেমন থাকে,

তেমনি থাকেন রানী এবং তাঁর সহচরীরা। ঘোড়দৌড় দেখবার সময়ে মাঝে মাঝে আপনাদের ঘোড়া দেখেন মহারানী। এবং ঘোড়দৌড়ের চেয়ে আকাশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খুব তারিফ করেন তিনি। আশমানে সারি সারি বকের ঝাঁক। চলন্ত মেঘ দেখে দেখে ওঁরা খুশিতে আপ্লুত হন।

রাজপুত কন্যা দুর্গা কিন্তু এইসব সৌন্দর্যে আদৌ মনঃসংযোগ করে না। তার চোখ অন্যদিকে।

তার স্থির লক্ষ্য ওই ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ঘোড়াশালায় গিয়ে গিয়ে রাজকুমারী দুর্গা ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্বকে। কোনওটির নাম 'পবন'। কোনওটির নাম 'তুফান'। একটি কালো ঘোড়ার নাম দিয়েছে সে 'মেঘ'। এই মেঘটি হল কিরাত সিংহের ভারি পছন্দ। তাঁর প্রিয় অশ্ব। আর বাবার যেহেতু পছন্দ, সেই কারণে রাজকন্যা দুর্গারও মেঘ ঘোড়াটি বড় প্রিয়। কেবল রং কালো বলেই সে মেঘ নয়, তার চেহারাখানা বর্ষার নবীন মেঘের মতো ঢলঢল এবং তার ডাকও ওই নবজলধরের মতো গম্ভীর।

তা বাপের কাছে গিয়ে মেয়ে একদিন বলল, 'বাবা, আমার জন্য একটা আলাদা ঘোড়া চাই। একেবারে আমার নিজস্ব।'

'ওমা, তুই ঘোড়া নিয়ে কি করবি---চাপ্‌তে পারবি?'

'পারব।'

'তা কেমন করে হবে? এই বয়সে ঘোড়ায় তুই চড়বি কী করে?'

'সে তুমি দেখে নিও না, কেমন করে চড়ি!'

মেয়ের জেদ। সে অবুঝ। কিছুতেই মেয়েকে বোঝানো যায় না। তা বাধ্য হয়েই কিরাত সিংহ আপোস করলেন। তিনি ছোট একটি টাট্টু ঘোড়া আনিয়ে দিলেন। তার পিঠে লাগানো হল জিন। লাগল বলগা। ঘোড়ায় ওঠবার জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হল রেকাব। তা ঘোড়াটি ছোট হলে কী হয়, বেশ তরবড়ে। রাজকন্যার মন পাওয়া গেল। বাবা কিরাত সিংহের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তড়াক করে ঘোড়ার ওপর উঠে বসল দুর্গা। তারপর সে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

না, কোনও সাহায্যের দরকার হল না। দরকার হল না সাহসের। আর কী আশ্চর্য, ঘোড়াটিও কোনওরকম দুষ্টুমি করল না। মনে হল ঘোড়াটি যে তার প্রিয় সওয়ারকে খুঁজে পেয়েছে। ঘোড়াটিকে নিয়ে রাজকুমারী দুর্গা বেশ কয়েক দিন মেতে রইল। সে দুর্গের বাইরের মাঠ ছাড়িয়ে দূর পর্যন্ত পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকল।

মেয়ের কাণ্ড দেখে রানী বলতে লাগলেন, ' মেয়েকে এইভাবে নাচিয়ে তুললে কী চলবে? দু-চার বছর পরে তাকে বিয়ে দিতে হবে। তাকে ঘর-কন্নার কাজও শেখাতে হবে।'

'হবে, কিন্তু শেখাবে কাকে?' হাসতে থাকেন কিরাত সিংহ। তাঁর রাজপুতানি গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলেন, 'এ মেয়ে তোমাদের ঘর-কন্নার কাজকে তুচ্ছ মনে করে। রোটি আর সবজি তোমরা কী তাকে দিয়ে বানাতে পারবে? পারবে না। এ মেয়ে নয় সে মেয়ে। ঘোড়ায় চড়ে নবাবী করবে।'

কিরাত সিংহ হাসতে হাসতে কথাগুলি বললেন বটে, কিন্তু যতদিন যায়, ততই দেখতে থাকেন, মেয়েটি সত্যি সত্যি মদ্দা হয়ে উঠছে, তার চেহারায় মেয়েলি লাবণ্য রয়েছে বটে, কিন্তু মনটা পুরুষের মতো। রাজপুত যোদ্ধাদের মতো। কিরাত সিংহ নিজের শৈশবের কথা ভাবেন, ফিরে যায় তাঁর শৈশবের দিকে এবং তাঁর সেই সেদিনের ছবি আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হতে দেখে মেয়ে দুর্গার মতো।

কিরাত সিংহকে মাঝে মাঝে দুর্গের অস্ত্রাগারে আসতে হয়। তাঁর দক্ষ সৈনিকের জন্য বহু ধরণের অস্ত্র মজুত রাখতে হয়েছে। রাখতে হয়েছে তরবারি, বরশা, মুষল বা গদা, রাশি রাশি লাঠি। এছাড়া রয়েছে অজস্র তীর ও ধনুক। দূরের শত্রুকে খতম করতে হলে তীরই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। কিরাত সিংহের সৈন্যবাহিনীতে তীরন্দাজদেরই সব থেকে দরকার।

দ্রুত ঘোড়া চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুড়ে শত্রু নিধনই হল সেরা যুদ্ধ কৌশল।

তবে ইদানীং বারুদের ব্যবহার খুবই চালু হয়েছে। মুঘলরা বারুদের গোলা ছুড়ে পাণিপথের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিমের লাখ লাখ সৈন্যকে খতম করে ছেড়েছে। কামানের সাহায্যে বারুদের গোলাবর্ষণ ইদানীং কালে যুদ্ধের সেরা কৌশল। ওই কৌশলের কথা হিন্দুস্তানের সর্বত্র প্রচারিত।

কালিঞ্জর দুর্গের অধিপতি কিরাত সিংহকে তাই বেশ কয়েকটি কামান এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ সঞ্চয় করে রাখতে হয়েছে। বারুদ যাতে মিইয়ে না যায়, তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ঝড়বৃষ্টির থেকে রাখতে হয় আড়াল করে। আর মাঝে মাঝে রেখে দিতে হয় রোদ্দুরে।

দুর্গাধিপতি মাঝে মাঝে তাঁর অস্ত্রাগার পরিদর্শন করেন এবং বিধিমত ব্যবস্থা নেন। তাঁর নজর এতই কড়া, পান থেকে চুন খসবার জো নেই।

তা কন্যা দুর্গাবতী একদিন চুপিসারে বাবার পিছু পিছু এসে হাজির হয়ে গেল অস্ত্রাগারে।

'তা তুই এখানে কেন মা, এখানে তো তোর ঘোড়া নেই।'

'আমি অস্ত্র চালানো শিখতে চাই।'

বাবা কিরাত সিংহ অবাক। এই বালিকা মেয়েটি বলে কী? হ্যাঁ, ততদিনে দুর্গাবতী বালিকাই হয়ে উঠেছে। তার কথার বাঁধন হয়েছে। চোখের দৃষ্টি বেশ খানিকটা তীক্ষ্ণ হয়েছে। একান্ত শিশুটি নেই।

বাবা কিরাত সিংহ বললেন, 'অস্ত্র চালনা সহজ ব্যাপার নয় রে মা! ভারি কঠিন ব্যাপার। বয়েস না হলে হয় না, হাতে বল চাই। শরীরে তাকত চাই। মনঃসংযোগ চাই। তা সে সব কী তোর আছে?

'আছে। আমি তরোয়াল খেলা শিখব। শিখব বরশা ছোঁড়া।

আর'—

'আর কী শিখবি?'

'তীর ছোঁড়া। আমি একজন তীরন্দাজ হতে চাই।'

বাবা কিরাত সিংহ ধৈর্য ধরে কিছুটা শুনলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, এসব শেখা সহজ নয়। এসব শিক্ষা চলবে না।'

মেয়ে জেদ ধরল, 'না বাবা, আমি তোমার হুকুম মানব না, আমিও অস্ত্র চালনা শিখবই।'

কিরাত সিংহও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তোর অনেক আবদার আমি রেখেছি। আর না। তোর মাথার গোলমাল আছে।'

এরপর কিছুদিন ধরে চলল বাপ আর মেয়ের জবর জেদের লড়াই। জেদী মেয়ে কেঁদে ভাসাতে থাকল। বন্ধ করল খাওয়া-দাওয়া। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকল তার পোশাক। থালা-বাটি ভাঙতে থাকল আছাড় দিয়ে। মেয়ের এই কাণ্ড দেখে রানী স্থির থাকতে পারলেন না। রাজার কাছে এসে বলল, ' মেয়েটার দিকে যে আর তাকানো যায় না। একটা কিছু বিহিত করো।'

রাজা কিরাত বললেন, 'বিহিত করার কিছু নেই। সে যা চাইছে, তা বাপ হয়ে করা শক্ত।'

'তা মেয়েকে তো বাপু লাই দিয়ে তুমিই মাথায় তুলেছ, এখন মাথা থেকে সে নামবে কেন?'

'তা ঠিক। এর জন্য আমিই দায়ী।'

তবে লড়াই বেশি দিন চালালেন না কিরাত সিংহ। তিনি নিজেই একটা পথ বের করে ফেললেন। দুর্গের ভেতর তাঁর একজন বিশ্বস্ত পুরোনো সেনাপতি ছিল। তার নাম জগৎ সিংহ। নববইয়ের কাছাকাছি বয়স। চুল, দাড়ি, গোঁফ সবই পাকা। শুভ্রবর্ণ। দেহের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। কিন্তু মাথা আর নজর এখনও ঠিক আছে। বিকল হয়নি। খাড়া হয়ে হাঁটেন।

কিরাত সিংহ তাকে ডেকে বলেন, 'জগৎ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। কাজটা কিন্তু বড় কঠিন।'

পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে জগৎ বলল, 'মহারাজ, আমার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু আমি রাজপুত। আমার কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়। আপনি আমাকে খুলে বলুন, আমাকে কী করতে হবে! আমি তৈয়ার।'

'আমার মেয়ে রাজকুমারী দুর্গা। তাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে হবে। তা গোড়াতেই বলে রাখি, মেয়েটা কিন্তু এখনও দশে পৌঁছয়নি। সে নিতান্ত বালিকামাত্র।'

জগৎ সিংহ বলল,'কুছ পরোয়া নেই মহারাজ। এই বয়সের অনেক রাজপুত বালককে আমি অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। তা বালকরা যখন পারে, এবং পেরেছে, তখন রাজকন্যা পারবে না কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ছয় বছরের ভেতর আমি রাজকুমারীকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে তৈরি করে ফেলব।'

কিরাত সিংহ নিশ্চিন্ত হলেন। স্বস্তি পেলেন রাজকুমারীর দায় জগৎ সিংহের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে।

ইতিমধ্যে বেশ কতকগুলি জটিল কাজে জড়িয়ে পড়লেন তিনি।

কালিঞ্জর দুর্গ খুবই দুর্ভেদ্য দুর্গ হলেও, নিশ্চিন্তে তাঁর বসে থাকা চলে না। তখন হিন্দুস্থান জুড়ে পাঠান ও মুঘলদের যে লড়াই চলেছে, তার খুঁটিনাটি খবর না হলেও, মোটামুটি খবর তাঁকে রাখতে হয়। কিছুদিন আগে সুলতান ইব্রাহিম খাঁয়ের কাছে আনুগত্য জানালে, আর কারও থেকে তেমন ভয়ের কারণ ছিল না। ইব্রাহিম খাঁ দিল্লির তখতে বসে থাকলেও, তাঁর নজর ছিল গোটা হিন্দুস্থানের ওপর। গঙ্গা ও যুমনার তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা মোটামুটি শান্তিতেই ছিল। জায়গীরদারেরা নিজের নিজের এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কালিঞ্জর দুর্গেই নিরাপদ পরিবেশ। কিন্তু গোলমাল বাধল সেইদিন থেকে, যেদিন মুঘল বাদশা বাবর এসে তাঁকে পাণিপথের লড়াইয়ে হারিয়ে বসে পড়ল দিল্লির তখ্‌তে। ইব্রাহিমের বিশাল সুলতানি প্রাসাদ দখলে চলে গেল বাবর মুঘলের হাতে।

তা ইব্রাহিম খাঁ দিল্লির থেকে উচ্ছেদ হলেন বটে, কিন্তু আফগান-পাঠানরা দিল্লি-আগ্রার বাইরে বসে গেল সর্বত্র। তাদের তাড়িয়ে ভারতবর্ষে নিজের সাম্রাজ্য তৈরির দিকে মন দিলেন বাবর। কিন্তু চট্ করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না।

হঠাৎ তাঁর এন্তেকাল হল। তাঁর ছেলে হুমায়ুনের ওপর দায়িত্ব এসে গেল বাপের সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের ওপর।

এবং সেই কাজ করে চলেছেন। করে চলেছেন আফগান-পাঠানদের সঙ্গে সঙ্গেই। এবং এ লড়াই হয়ে চলেছে যেন সাপ-লুডো খেলার মতো। কখনও মনে হয় হুমায়ুন জিতছেন, আর পরক্ষণেই মনে হয় তিনি তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচবেন। লুডোর মই তাঁকে তুলে দেয়, কিন্তু সাপের মুখে পড়লে একেবারে তখন তলায় নেমে আসেন।

কালিঞ্জর দুর্গে বসে এই সাপ-লুডো খেলার খবর নিয়মিত রাখতে হল কিরাত সিংহকে। খবর না রাখলে আলটপকা মার খাওয়ার সম্ভবনা---কে কখন এসে তাঁর দুর্গে চড়াও হয়, তা বলা কঠিন।

পাঁচ রকম খবর রাখার জন্য যোগাযোগ রাখতে হয় এক দুর্গের সঙ্গে আরেক দুর্গের। যেতে হয় বন্ধু দুর্গাধিপতিদের কাছে। এবং তারাও আসেন। এবং এসব কাজ করতে হয় মুঘল-পাঠানদের অগোচরে।

তা সেদিন হঠাৎ রোটাসগড় থেকে এসে হাজির দুর্গাধিপতি রাজামশাই। বয়স হয়েছে রাজা মশাইয়ের। কিন্তু বয়স হলে কী হয়, তাঁর চেহারায় রয়েছে সেই রাজকীয় আধিপত্য। যৌবনে তাঁর গায়ের রং ছিল চন্দনের মতো। মাথায় ছিল ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মুখখানি ছিল যেন পটে আঁকা ছবির মতো। এবং রাজারা যেমন হয়, ঠিক তেমনি। তাঁর মুখে হালকা মৃদু হাসি সর্বদাই লেগে থাকত। তিনি সর্বদাই সাদা পোশাক পরতেন। পায়ের পাদুকা থেকে মাথার পাগড়ি, সবই ছিল শুভ্রবর্ণ।

বয়স হওয়ার জন্য দুর্গাধিপতি রাজা কিরাতের চেহারায় শ্লথ ভাব এসেছে, চামড়া ঢিলে হয়েছে, ঝাঁকরা কালো চুল এখন কাশফুলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিংবদন্তী আছে, রোটাসগড় নাকি হরিশচন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের তৈরি। তখন নাম ছিল, 'রোহিতাশ্বের গড়'। এখন উচ্চারণের বিকৃতিতে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'রোটাসগড়'। এবং বর্তমান রাজা নাকি সেই পৌরাণিক বংশেরই বংশধর। এই বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এবং এটি কিরাত সিংহেরও অজানা নয়।

রাজা মশাই একা আসেননি। কালিঞ্জর দুর্গে তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চুরামণিও।

রাজা দেখতে যতখানি সুন্দর, চুরামণি ঠিক ততখানিই কুৎসিত দেখতে। গায়ের রং মিশকালো। মাথায় বিরল কেশ। চোখ দুটি ছোট ছোট এবং লালচে। থুতনির কাছে একটুখানি ফুরফুরে দাড়ি আছে। চুরামণির দৃষ্টি তেমন সাজে নয়, কেমন যেন চোরা চোরা ভাব। তাই তাঁকে চুরামণির বদলে সকলে 'চোরামন' বলে ডাকে এবং 'চোরামন' নামেতেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। রাজা মশাইও তাঁকে চোরামন বলেই সম্বোধন করেন।

'বলো চোরামন, কী জন্যে কেন আমার এখানে এই কিরাত সিংহের কাছে এসেছ?'

'আজ্ঞে, আসন্ন বিপদের কথা বলতে।'

'বিপদ!' কিরাত সিংহ হেসে উঠলেন, 'বিপদ নিয়ে আর নতুন কথা কী বলছো। আমাদের বিপদ এখন চারদিকে।'

'তা ঠিকই বলেছ কিরাত, কিন্তু আবার বিপদ যে ঘরের কাছে নেমে এসেছে?'

রাজা মশায়ের কথাটি ধরে নিয়ে চোরামন বলেন, 'আপনি নিশ্চয় জায়গীরদার হাসান মিঞার ছেলে শের খাঁয়ের নাম শুনেছেন।'

'তা শুনেছি, হিন্দুস্থানের তখ্‌ত দখল করতে সে এখন মরিয়া।'

' সেই শের খাঁ কিছুদিন আগে কেল্লাদার তাজ খাঁয়ের বিধবা বিবিকে শাদি করে কৌশলে চুনার দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। তাদের বিবিকেই সে শুধু দখল করেনি, দখল পেয়েছিল মন মন সোনা, হীরে-মুক্তো-মাণিক্য এবং আরও কত কী। এই সব সোনা থেকে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী তৈরি করে দিল্লির দিকে এগোচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, এখবরও আমি পেয়েছি।'

'ব্যস্, তা হলেও আপনি সব খবরই রাখেন দেখছি। বিস্তারিতভাবে আপনাকে আর কিছু বলবার দরকার নেই। তবে শেষ খবরটা বলি।'

'বলুন।'

'বেচারি শের খাঁয়ের পা হড়কেছে। পা হড়কে পপাত ধরনীতলে। চুনার দুর্গটি শের খাঁয়ের এখন হাতছাড়া। কেল্লাটি হুমায়ুনের হাতে। অর্থাৎ তার দখলে। শেরখাঁর এখন কোনও থাকবার জায়গা নেই। নিজের বিবি আর ছেলেরা তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে তাজ খাঁয়ের বেগম, আর বিশাল ধন সম্পদ। এইসব নিয়ে বেচারি শের এখন শেয়ালের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে। মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই।

কিরাত সিংহ এই খবরে খুব খুশি হলেন, বললেন, 'একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি। না ব্যাটা শের খাঁ তাহলে ভালোই জব্দ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। বড় বিপাকে পড়েছে। এইভাবে বিপাকে পরে সে আমাদের সাহায্য চাইছে। রাজামশাইকে খুব ধরেছে তার বিবি বাচ্চাদের জন্য তাঁর কেল্লায় একটু আশ্রয় দিতে হবে।'

'আশ্রয়!' কিরাত সিংহের ভ্রূযুগল ঈষৎ কিঞ্চিৎ হয়ে উঠল, 'আপনাদের 'রোটাসগড়' দুর্গে বিবি-বাচ্চাদের গচ্ছিত রেখে সে কোথায় থাকে? সে কী জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে?'

চোরামন তার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ঠিক ধরেছেন রাজা মশাই! শের খাঁ ঠিক সেই কথাই বলেছে। বেচারা খুব কাকুতি-মিনতি করছে।'

চোরামনের কথা শেষ হতে-না-হতেই রাজা মশাই বলে উঠল, 'আমার কাছে এটাই এখন সমস্য, কিরাত ভাই! কী যে করব, তা ভেবে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি না। শের খাঁয়ের বিবি-বাচ্চাদের আমাদের কেল্লায় আশ্রয় দিয়ে নতুন কোনও বিপদ ডেকে আনব না ত? দুজনের লড়াই থেকে দূরে থাকব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু শের খাঁকে সুযোগ দিলে, মুঘল হুমায়ুন কী আমাকে ছেড়ে দেবে! সেও এগিয়ে আসবে আমাকে প্রতিপক্ষ ভেবে। তখন কী সমূহ বিপদ হবে বলো তো!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তখন খুবই জটিল হয়ে যাবে।' মাথা চুলকে কিরাত বললেন, 'দুজনের বিবাদে অকারণে জড়িয়ে পড়তে হয়।'

এইভাবে যখন কিরাত সিংহের সঙ্গে রাজামশাই এবং চোরামন মন্ত্রীর কথা হচ্ছিল তখন হঠাৎ একটি কাণ্ড ঘটল।

কেল্লার মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা পাখি তীরবিদ্ধ হয়ে ঝটপট করতে করতে, তাদের সামনে এসে পড়ল। কে পাখির দিকে তীর ছুঁড়ল এবং কেনইবা তা করল, তা বুঝতে না পেরে রাজা কিরাত সিংহ রীতিমতো হতভম্ব। হাঁ হয়ে ইতিউতি তাকাতে থাকলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হল না।

তাঁর সামনে ধনুক এবং কয়েকটি তীর নিয়ে এসে দৌড়ে এল রাজকুমারী দুর্গা'।

'হ্যাঁ, আকাশের উড়ন্ত পাখিকে এইভাবে তীর মেরে নামানো যায় কী না, তা দেখছিলাম।'

দুর্গাবতীর এই তীরন্দাজীতে খুশি হলেন রাজা কিরাত সিংহ। বলে উঠলেন, 'সাবাস্!'

এদিকে দুর্গাবতীকে দেখে কৌতূহলী হলেন রাজামশাই। তিনি এই তীরন্দাজীকে উচ্ছ্বসিত ভাবে 'সাবাস' জানালেন।

তারপর রাজা কিরাত সিংহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বালক সন্তানটি কি আপনার?'

কিরাত সিংহ হেসে বলল, 'এটি আমারই সন্তান। তবে এটি বালক নয়, বালিকা। বালকের বেশ পরে আছে যা।'

'তাই নাকি? একটা মেয়ের এতখানি তীরন্দাজী বিদ্যা।' মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন রাজামশাই। সস্নেহে বলল, 'তুমি মা, এই সব যুদ্ধ বিদ্যা শিখছ কী জন্য?'

দুর্গা প্রথমে বলল, 'এই বিদ্যা শিখতে আমার ভালো লাগে, তাই শিখছি।' পরে সংশোধন করে বলল, 'আমি লড়াই করব বলে শিখছি।'

'লড়াই! তা তুমি কার সঙ্গে লড়াই করবে?'

কোনওরকম ইতস্তত না করে এবং কোনও ভাবের চিন্তা না করে দুর্গা বলল, 'আমি যবনদের সঙ্গে লড়াই করব।'

'বটে! তা যবনদের ওপর বুঝি তোমার খুব রাগ?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ তাদের ওপর রাগ কেন?'

'তারা আমাদের মুলুকে হানাহানি করতে ঢুকেছে। তারা কেড়ে নিচ্ছে আমাদের রাজত্ব, আমাদের ধর্ম, আর আমাদের মান-সম্ভ্রম।'

রাজামশাই দুর্গার বক্তব্য শুনে রীতিমত চমৎকৃত হলেন। সবিস্ময়ে তাকালেন তিনি রাজা কিরাত সিংহের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব আশ্চর্য কথাগুলি কী আপনি মেয়েকে শিখিয়েছেন?'

'না। আমার মেয়েকে তৈরি করবার দায়িত্ব দিয়েছি আমারই এক প্রাচীন সেনাপতি জগৎ সিংহকে। এসব যা কিছু দেখছেন, তা সবই তার শিক্ষা।'

রোটাসগড়ের রাজামশাইয়ের কাছে দুর্গা যেন এক বিস্ময় বালিকা।

তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'তুমি তরোয়াল খেলতে পার?'

'পারি। আমাকে জগৎ দাদু আমার মতো করে কামারশালা থেকে অনেক তরোয়াল বানিয়ে দিয়েছেন। তাই দিয়ে আমি তরোয়াল খেলি।'

'তুমি কী ঘোড়ায় চড়তে পার?'

'পারি।' দুর্গা হাসল, 'অনেকদিন আগেই আমার বাবা ছোট একটি ঘোড়া আমাকে দিয়ে দিয়েছে। সেই ঘোড়াতে চড়ে আমি ঘুরে বেড়াই। কাছের জঙ্গলে গিয়ে শিকার করি।'

'শিকার করো?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে যায় রাজামশাইয়ের, 'তা তুমি কী বরশা ছুঁড়তে পারো নাকি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও পারি। জগৎ দাদু আমাকে সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন।'

নাহ্, আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না রোটাসগড়ের রাজামশাই। তিনি কিরাত সিংহকে বললেন, 'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ কিরাত। তুমি ভাগ্যবান। এই বয়স এই সন্তানের বাবা হওয়া, অনেক ভাগ্য না থাকলে হয় না।'

এবং তিনি যে জন্য কালিঞ্জর দুর্গে এসেছিলেন, সেই কারণটা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। যে পরামর্শ করতে এসেছিলেন, সেই পরামর্শ রয়ে গেল অসমাপ্ত। মন্ত্রী চোরামন বিস্মিত, হতবাক। কেবল একবার অস্ফুট স্বরে বলল, 'এ যা মেয়ে, ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় যোদ্ধার কান কাটবে।

এইভাবে দেখতে দেখতে এবং মুঘল-পাঠানদের নিয়ে আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করতে করতে গড়িয়ে গেল আরও প্রায় বছর দুই...কন্যা দুর্গা এখন স্বাধীন। তার শরীর জুড়ে নামছে মেয়েদের লাবণ্য। কিন্তু কোনওভাবেই তার মনে 'মেয়েভাব' আসছে না। সে নিজের যুদ্ধ শিক্ষা নিয়েই মেতে আছে। তার মনে জন্ম হচ্ছে এক যোদ্ধার। দুর্গা জানে, তাকে লড়াই করতে হবে। এবং লড়াই করতে হবে যবন শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু কোথায় যে লড়াই হবে তা জানে না এবং প্রতিপক্ষ যবনটি যে কে, তাও জানে না।

কালিঞ্জর দুর্গে এখন অনেক লোকেরই যাতায়াত।

যেভাবে রোটাসগড়ের রাজামশাই এসেছিলেন, একদিন ঠিক সেইভাবেই এসে উপস্থিত হলেন চৌহান রাজপুত পুরানমল। ইনি রাইসিন দুর্গের অধিপতি। রাজা পিনহাজির যোগ্য পুত্র। ইনি কিছুদিন আগে জয় করেছেন 'চান্দেরী' রাজ্য। জয় করে সেখানকার মুসলমানদের দাপাদাপি নিভিয়ে দিয়েছেন।

পুরানমলের চেহারায় আত্মশক্তি এবং আত্মবিশ্বাস যেন ঝনঝন করছে। তাঁর কথাবার্তা এবং চালচলন দেখে মনে হয়, তিনি একাই পারেন মুঘল এবং আফগান শক্তির মোকাবিলা করতে। তবে সকলের সহযোগিতা দরকার। সেই সহযোগিতার কথা বলতেই তিনি দৌড়ে এসেছেন আরেক দুর্গাধিপতি রাজপুত কিরাত সিংহের কাছে।

রাজা পুরানমল বললেন, আমাকে নিয়ে আমি তেমন ভাবি না। আমার ভাবনা তোমাদের সকলকে নিয়ে।'

'কেন, আপনাকে নিয়ে আপনার কোনও ভাবনা নেই? আপনার সঙ্গে শের খাঁ বা হুমায়ুনের কী বোঝাপড়া কিছু হয়েছে?' পুরানমলের কাছে বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন রাখলেন কিরাত সিংহ।

'বোঝা পড়া। এই যবনদের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া কী সম্ভব? চান্দেরী রাজ্য জয় করে আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, এই রাজপুত কারও কাছে মাথা নত করার পাত্র নয়। এই রাজপুত লড়াই করতে প্রস্তুত।'

কিরাত সিংহ বললেন, 'হ্যাঁ, যা কিছু নিষ্পত্তি, তা লড়াই করেই করতে হবে।'

কিরাত সিংহের কথা শুনে পুরানমল বললেন, 'এই লড়াই এখন আর দূরবর্তী নয়। পাঁচ দশ কিংবা আরও দু-এক বছরের ভেতরেই করতে হবে। এবং এজন্য আমাদের একটা মিলিত ঐক্য দরকার।'

'হ্যাঁ, এ প্রস্তাবও খুবই ভালো প্রস্তাব। আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

এইভাবে রোটাসগড়ের অধিপতি পুরানমলের সঙ্গে আরও কথা হল। তা কেবল পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্যের কথা নয়। কথা হল পরস্পরের সামরিক শক্তি নিয়ে। সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র কার কত আছে তা নিয়ে তাদের কথা হল। হিসেব হল গোলা-বারুদের সঞ্চ য় নিয়েও। অশ্বারোহী সৈনিক যুদ্ধে অপরিহার্য ঠিকই, কিন্তু এই সঙ্গে গজারোহী সেনাদের কতখানি প্রয়োজন, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হল। পদাতিক বাহিনী, তীরন্দাজ বাহিনী এবং তার সঙ্গে সামরিক কৌশল কেমন হওয়া দরকার, সে সব বিষয়ও অনালোচিত থাকল না। 'চান্দেরী' রাজ্য জয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা কিরাত সিংহকে শোনালেন রাজা পুরানমল।

এইসব আলোচনা হল নিভৃতে। প্রাসাদ সংলগ্ন এক নির্জন উদ্যানে।

তা এই উদ্যানের এক আকস্মিক চমক সৃষ্টি করে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল রাজকুমারী দুর্গাবতীকে।

ঘোড়া এসে থামল প্রায় তাঁদের সামনে। এইবেশে সজ্জিতা দুর্গা। হাতে একটি খোলা তরবারি। ভাবখানা এমন, যে সে এখনই বেরিয়ে পড়েছে লড়াই করতে।

রাজা পুরানমল স্তম্ভিত।

'কিরাত, এই ছেলেটি কে? তোমার ছেলে বুঝি? বাহ্, ভারি তেজী ছেলেতো?'

রোটাসগড়ের রাজা মশাইকে রাজা কিরাত হাসতে হাসতে বলেন, 'এই ভুলটা অনেকেই করে থাকেন। আপনিও করেছেন। এই সন্তানটি আমারই বটে, তবে ছেলে নয়, মেয়ে। আমার এই মেয়ের নাম দুর্গাবতী।'

'বটে! তা আমিতো ভারি বোকা বনে গেলাম হে! রাজপুত মেয়েরা 'জহর' করে, পুড়ে মরে, কখনও লড়াই করে না, করতে জানে না। সে তোমার মেয়ে, একটা ইতিহাস করবে।'

এরপরই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে রাজামশাই বললেন, 'তো তোমার এই মেয়ের বয়স কত হল?'

'বারো। দ্বাদশী।'

'হুম্', গম্ভীর হয়ে গেলেন রাজামশাই। 'তা বারো বয়স বছরটা মেয়েদের কাছে কম নয় হে, কিরাত সিং। কন্যার বিবাহের দরকার। এবং এখনই দিতে পারলে ভালো হয়। নইলে রাজপুত সমাজে তোমার অখ্যাতি হবে।'

'তা আমিও বুঝছি। কিন্তু কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না।'

'পাত্র আছে। খুবই ভালো পাত্র। তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। বাহোবার রাজা তুমি। তোমাকে অনেকে রাজা শালিবাহনও বলে থাকে। তা শালিবাহনের কন্যার উপযুক্ত পাত্রই হবে গড়মণ্ডলের রাজকুমার দলপৎ সিংহ। হ্যাঁ, তার মতন খুব বড় রাজা। অনেকে তাকে গাণ্ডোয়ানাও বলে থাকে। এমন পাত্রকে হাতছাড়া করা যায় না।'

'আমার এই যোদ্ধা মেয়েটিকে তারা কী গ্রহণ করবে?'

'অবশ্যই করবে। লুফে নেবে।'

এরপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত।

সামরিক উর্দি ছাড়িয়ে তেজস্বী বালিকাটির বিবাহ হয়ে গেল গড়মণ্ডলের রাজকুমার দলপৎ সিংহের সঙ্গে।

এই বিবাহ উপলক্ষে বাহোবা রাজ্যজুড়ে প্রভূত জাঁকজমক হল। কালিঞ্জর দুর্গে অনেক আতসবাজি ফুটল। ঘনঘন তোপ পড়ল বিবাহলগ্নে। রাজপুত রীতি মেনে দলপৎ সিংহ বিবাহে এল ঘোড়ায় চড়ে। তা রাজকুমারী দুর্গারও খুব ইচ্ছা ছিল, সে ঘোড়ায় চড়ে বিবাহের মালা বদল করে। কিন্তু তার কথা শোনা হল না।

রাজপুত বিবাহসংস্কার ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে তার বিবাহ হল।

রাজকুমারী দুর্গাকে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে সাজানো হল। হীরের মালা ঝুলল তার গলায়। বাজুবন্ধ, কঙ্কণ, সিঁথিতে হীরকখণ্ডের ঝলকানি। দ্বাদশী রাজকুমারীকে বারানসি শাড়ি। শাড়িতেও হীরের চুমকি।

তাকে নিয়ে যে এত সব কাণ্ড হতে পারে, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি রাজকুমারী দুর্গা। সে খুবই মজা পাচ্ছিল। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার স্বস্তি সামরিক পোশাকে। কিন্তু কে তাকে সে পোশাক দেবে?

গড়মণ্ডলের রাজধানী হল 'চৌরাগড়।'

বিবাহের পর চৌরাগড়ে পাড়ি দিতে হল। বাহোবা এবং কালিঞ্জর কেল্লা থেকে চৌরাগড় ছিল অনেক দূরের পথ। দলপৎ সিংহ বিবাহ করতে এসেছিলেন শ'দুয়েক অশ্বারোহী সৈনিকের পাহারা নিয়ে। তারা বিবাহ শেষে ফিরে চলল নিজেদের গড়ে। নববিবাহিত রাজদম্পতি চলল হাতীর পিঠে চন্দন কাঠের হাওদায় চড়ে।

রাজকুমারী দুর্গার সঙ্গে চলল কয়েকজন পরিচারিকা এবং সহোদরা কমলাবতী। কমলাবতী নিতান্তই এক বালিকা। তার উচিত ছিল মা-বাবার কাছে থাকা। কিন্তু সে কিছুতেই দিদির সঙ্গ ছাড়ল না। সেও দিদির সঙ্গে চলল হাতীর পিঠে হাওদায় চড়ে। রাজকুমারী দুর্গার সঙ্গে ছোট একটি পেটিকাও চলল। সে পেটিকায় রয়েছে রাজকুমারীর নিজস্ব গোপন সম্পত্তি। এই সম্পত্তি ঠিক কী ধরনের, তা রাজকুমারী নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

হাতীতো নয়, গজরাজ। পাহাড়ের মতো চেহারা। শুঁড় নাড়তে নাড়তে এবং হেলতে দুলতে সেই প্রাণীটি চলল ধীর গতিতে। রাজকুমারী দুর্গা এই ধরনের হাতীর পিঠে চড়ে কোথাও আগে যায়নি। তাই ব্যাপারটি তার খারাপ লাগল না বরং এই যাত্রা তার ভালোই লাগতে থাকল।

জঙ্গলভরা রাস্তা। গাছের পর গাছ। এবং কতরকমের যে গাছ, তা দেখলে অবাক হতে হয়। কোনও গাছটি বড়, কোনটি ছোট। কোনও কোনওটি ঘন পাতায় ছাওয়া। সবুজে সবুজ। আবার কোনও কোনওটি নিষ্পত্র। কোনও কোনও গাছে ফুলের বাহার। এবং ওই সব ফুলের কত না বৈচিত্র্য। রাজকুমারী অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এবং মুগ্ধ হয়।

তা শুধু কী গাছপালা, শুধু কী ফুল, দূরে দূরে যে পাহাড় দেখা যায়, সেগুলিও কী কম মুগ্ধ করা?

চলতি পথেও নানান বৈচিত্র্য। খানাখন্দে ভরা রাস্তা। কোথাও কোথাও জলভরা ছোট্ট নদী। তবে এসব নদী অগভীর। হেঁটেই পার হওয়া যায়। কোথাও উঁচু পাথুরে ঢিবি। তা ডিঙিয়ে চলতে হয়। পথ চলতে চলতে নানারকম বন্যপ্রাণীও চোখে পড়তে থাকে। হঠাৎ একটি নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল হাতীর পিঠের ওপর। কিন্তু তা সে পারল না। বরং সেটি হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা পড়ল।

রাজকুমার দলপৎ তার নববিবাহিত বধুকে বলল, 'কী ভয় করছে না কী?'

'না, ভয় কাকে বলে তা আমার জানা নেই। আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।'

।।চার।।

কয়েকমাস পরের কথা---তা এক বছরের পরের হতে পারে।

চৌরাগড়ের রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে ঢলে পড়েছে চাঁদ। চারদিক নিঝুম।

যে রাজকুমারী দুর্গা একদিন চৌরাগড়ের রাজপ্রাসাদে এসে ঢুকেছিল, সেই রাজকুমারীর এখন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এক লাফে তার বয়স যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ সিংকে ঘিরে তার ভেতর এক আশ্চর্য ভালোবাসার জন্ম হয়েছে। রাজা দলপৎ সিংয়ের বয়সও তেমন কিছু বেশি নয়। উনিশ বছর পেরিয়ে সবে দলপৎ কুড়িতে পড়েছে। তার হৃদয়েও এখন নতুন প্রেম। রাতের পর রাত তাদের কাটে মধুর ভালোবাসার গল্পে।

তাদের ভালোবাসার কথা যেন ফুরোতে চায় না। কত না কথা, কত না গল্প?

তা সে রাতে রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে যখন চাঁদ ঢলে

পড়েছে, তখন দীর্ঘরাত গল্প করার পর দুজনেই গভীর ঘুমে মগ্ন।

সেইসময় নিযুতরাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে হঠাৎ শোনা গেল বাঘের গর্জন। এমন গর্জন যে তাতে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সে গর্জনে রাজবধূ দুর্গার ঘুম ভাঙলেও, দলপৎ সিংহ দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন।

রাজবধূ বিছানায় উঠে বসল। গর্জন ঠিক কোথা থেকে আসছে, তা স্থির করতে এগিয়ে এল ঝরোকার দিকে। এই ঝরোকা দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শয়নঘরের মাঝখানে। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্না দেখে মনে হল, সত্যিসত্যিই একটি বাঘ তো তাদের ঘরের মেঝেয় এসে থাবা গেড়ে বসে আছে। পরে ভ্রম ভাঙল। কিন্তু বাঘের গর্জন থামল না।

রাজবধূ দুর্গা এগিয়ে এসে জাগিয়ে তুলল দলপৎকে।

'কী হল, এভাবে জাগালে কেন, এখনও অনেক রাত আছে।'

তা আছে। কিন্তু বাঘ ডাকছে যে!'

'ডাকুক। আমাদের এই জঙ্গলে হামেশাই এমন বাঘের ডাক শোনা যায়।'

'কিন্তু ডাক শুনে মনে হচ্ছে, এই বাঘ দুর্গের পরিখা পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকে পড়েছে।'

তরুণ দলপৎ চোখ বুজেই বলল, 'অমন মনে হয়। বাঘেরা কখনও পরিখা পার হতে পারে না। তা ছাড়া পরিখা যদি বা পার হয়, সে কেল্লার ভেতর ঢুকতে পারবে না। চারদিকে পাহারাদারেরা আছে, তাদের হাতেই বেচারি খতম হয়ে যাবে।' এই কথাটুকু বলেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল দলপৎ।

রাজবধূ দুর্গার কিন্তু দলপতের কথায় স্বস্তি হল না। সে রাজপ্রাসাদের ঝরোকা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। শুনতে থাকল বাঘের গর্জন। তা পরিশেষে বাঘের ডাক থামলেও, রাজবধূ দুর্গার ঘুম এল না।

রাজবধূ দুর্গা বুঝল, তার শ্বশুর বাড়ির এই দুর্গটি সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হলেও, তাদের কালিঞ্জর দুর্গের মতন নয়। এবং এই দুর্গটি কেন এমন নয়, তা জানতে ইচ্ছে হল। জঙ্গলমহলের এই রাজত্বটা ঠিক কেমন, তা তাকে কে জানাবে? কে জানাবে, এখানকার রাজপ্রাসাদের কাছে গভীর রাতে কেন বাঘের গর্জন শোনা যায়!

রাজবধূ দুর্গার এইসব জিজ্ঞাসার জবাব যিনি দিতে পারতেন, তিনি হলেন বাবা সম্ভুৎ সিংহ। তিনি হলেন বধূ দুর্গার শ্বশুর। তা তিনি দশবছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। রানী স্বর্ণকুমারী দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগছেন। তিনি শয়নকক্ষের বাইরে তেমন ভাবে আসতে পারেন না। তা ছাড়া তিনি এই রাজ্যপাটের খবর তেমনভাবে জানেন বলে মনে হয় না। এই দুর্গ, এই রাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হলে, দুর্গা কার কাছ থেকে জানতে পারে?

চৌরাগড়ে সে এসে দেখেছে, দলপৎ সিংহ প্রায়ই যার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ করে, সে হল এক মাঝবয়সী মানুষ। মানুষটি খুব কম কথা বলেন। ধীর স্থির। মাথায় সাদা পাগড়ি। সাদা পোশাক পরে থাকেন। প্রায় প্রতি সকালেই তিনি আসেন চৌরাগড়ের সেরেস্তায়। মানুষটিকে বিশ্বস্ত বলেই মনে হয়---তার নাম নাকি, অধর কায়স্থ।

পরের দিন সকালে এই অধর কায়স্থকেই অন্দরমহলে ডেকে পাঠাল। মানুষটি এল, নমস্কার জানিয়ে দাঁড়াল।

'আপনাকে আমি কী বলে সম্বোধন করব, তা জানি না। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু বিষয় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

অধর কায়স্থ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'বউরানী, আমার নাম অধর কায়স্থ। সম্বোধনে কোনও সমস্যা নেই। আপনি আমাকে 'কায়স্থজী' বলে ডাকলেই হবে। তা আপনি কী জানতে চান, বলুন। আমার জানা থাকলে, আপনাকে এখনই তা জানিয়ে দিচ্ছি।'

'রাত্রিতে আমাদের প্রাসাদের কাছে বাঘ ডাকে কেন?'

'বাঘ?' হাসলেন কায়স্থজী। 'আজ্ঞে, বাঘ আছে বলেই তারা ডাকে।'

'তারা আমাদের প্রাসাদের কাছে এসে ডাকছে যে!'

'এটা বাঘেদের ঘোরতর অন্যায়।' কায়স্থজী আবার হাসলেন। 'তাদের বোঝা উচিত ছিল রাজপ্রাসাদের কাছে তারা এসে গেছে।'

রাজবধূ দুর্গা পরিহাস বা রসিকতা বোঝে, কিন্তু বাঘ নিয়ে কায়স্থজীর এ রসিকতা তার ভালো লাগে না।

'না-না, আপনি বাঘের ব্যাপারটি এমন হালকা ভাবে নেবেন না। বাঘেদের এই বাড়বাড়ন্ত সহ্য করা ঠিক নয়। এখনই আমাদের শিকারে বেরিয়ে বাঘ মারতে হবে।'

রাজবধূ দুর্গার কথার এবং চোখদ্বয়ের দৃঢ়তা দেখে কায়স্থজী এবার গম্ভীর এবং আন্তরিক হলেন।

'দেখুন বউরানী, আপনি যে রাজ্যের রানী হয়ে এখানে এসেছেন, এটি হল 'গাণ্ডোয়ানা' রাজ্য। এই রাজ্যটিকে জঙ্গল মহলও বলা যেতে পারে। এই রাজ্যের যারা অধিবাসী, তারা হল গোঁদ। এরা চাষবাস জানে না। তাই কোনও কৃষিকর্ম করে না। বনে বনে শিকার করে বেড়ায়। বনের কাঠ কাটে। খালে-বিলে মাছ ধরে। এরা কোনও সভ্যতার ধার ধারে না। কোনও রাজা-রাজরার খবর রাখে না। এ রাজ্যের আকার বিশাল। কতখানি বিশাল, তা ভাবতে পারবেন না।'

দুর্গা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল,তা কতখানি বিশাল শুনি? গঙ্গার ওপারে যে উত্তরের দেশ রয়েছে, তার থেকে কতখানি বড়ো? বিহার মুলুকের থেকেও বড়?'

'আজ্ঞে, ওইসব রাজ্য বা মুলুক সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে আমাদের এই মুলুকটা যে খুব বড়, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। হাজার হাজার যোজন জুড়ে ওই রাজ্য। ক্রোশের হিসেবে এর আয়তন পঁচিশ হাজার ক্রোশ তো বটেই। তবে এই রাজ্যের বেশিরভাগ হল জঙ্গল। এর সীমার

দক্ষিণে উৎকল, পুবে মালব দেশ। এদিকে প্রায় গঙ্গানদীর কোণ। আগেই বলেছি, এ রাজ্যে মেলা জঙ্গল, আর মেলা জঙ্গলের প্রাণী। এখানে হিংস্র বন্যজন্তুর অভাব নেই। তুলনায় মানুষের সংখ্যা কম।'

'মানুষের সংখ্যা কম, তার মানে এ রাজ্যে তেমন প্রজা নেই?'

'প্রজা আছে বই কি! তবে তা কখনও এক কোটির বেশি নয়। এ রাজ্যে নগর আর জনপদের সংখ্যা আঙুলে গুণে বলা যায়। আছে সত্তর হাজার গ্রাম। আমাদের এই চৌরাগড় আর গড়কাটঙ্গি হল দুটি দুর্গ। এই সব নিয়েই আমাদের রাজ্য বউরানী।'

অধর কায়স্থজীর সব কথা শুনে বধূ দুর্গার মনে 'গান্ডোয়ানা' রাজ্যের একটি ছবি ফুটে উঠল বটে, কিছু তেমন স্পষ্ট ধারণা হল না, গোটা রাজ্যটি তার কাছে এক রহস্যময় রাজ্য বলে মনে হল। বাঘের ডাকের মূল ধরে এত কথা যে জানা যাবে, তা দুর্গা আশা করতে পারে নি। তবে কায়স্থজীর কথা শুনে তার মনে ধীরে ধীরে এই গান্ডোয়ানা রাজ্য সম্পর্কে আরও জানবার ক্ষিদে জেগে উঠল। কিন্তু সেদিন অধর কায়স্থর সঙ্গে আলোচনা ওই পর্যন্তই রইল।

সেদিন রাত্তিরে আর বাঘ ডাকল না।

তা বাঘ না ডাকুক, দুর্গা কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখল রাজকুমার দলপৎকে, যা জাগাবার কারণ ভিন্ন।

জিজ্ঞাসা করল, 'সিংহ মশায়, তুমি তো এই রাজ্যের রাজা, তাই না?'

'হ্যাঁ, এবিষয়ে তোমার কিছু সন্দেহ আছে না কি?'

'না, সেরকম কোনও সন্দেহ আমার মনে নেই।' তবে সন্দেহ রয়েছে, তুমি নিজের রাজ্য সম্পর্কে আদৌ কিছু জানো কি না! তুমি কী জানো, তোমার রাজ্যে কত প্রজা আছে? জানো কী, এ রাজ্যের কতখানি জঙ্গল, আর কতখানি বসত?'

'না, এ সব জানি না। সত্যিকথা বলতে কী, আমার জানবার আগ্রহই নেই। যা জানবার তা এই আমাদের মন্ত্রী অধর কায়স্থই জানে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানা যাবে। আমি খাতায় কলমে রাজা, কিন্তু রাজ্য চালান অধর কায়স্থ।'

রাজকুমার দলপৎ সিংহের এ ধরনের কথা আদৌ পছন্দ হল না দুর্গার। 'গান্ডোয়ানা' রাজ্যের সব কিছু জানবার জন্য সে গভীরভাবে আগ্রহী। তাই সে জানবার পথ ধরল। তবে সে প্রথমেই ঘরের বাইরে কিন্তু পা ফেলল না। 'চৌরাগড়'-এ জানার জন্য সে প্রথম পদক্ষেপ নিল গড়কে নিয়ে। গড়ের ভেতরেই রাজপ্রাসাদ, গড়ের ভেতরেই কাছারি সেরেস্তা এবং গড়ের ভেতরেই খাজাঞ্চিখানা, এবং সেই গড়েই অস্ত্রশালা এবং ঘোড়াশালা। গড়ের ভেতরেই সেনা-শিবির। হিন্দুস্থানে যেসব আরও পাঁচটা গড় আছে, ঠিক সেইরকম। এমন কী গড় কালিঞ্জরের সঙ্গেও এটিকে তেমন পৃথক করা যায় না। তবে কালিঞ্জর যেন অনেক বড়। অনেক।

বিশাল রাজপ্রাসাদ। বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থিতি।

রাজপ্রাসাদের ভেতরেও অনেক বৈচিত্র্য। অনেক মহল। রাজা, রানী, এমনকী রাজবধূর জন্যও আলাদা আলাদা মহল। সব কটি মহলই প্রশস্ত এবং মর্মর নির্মিত। কক্ষে কক্ষে মহার্ঘ্য আসবাব। পাহারাদার, দাসদাসী, কিছুরই অভাব নেই। রাজকুমার দলপৎ সিংহ যে প্রাসাদে থাকেন, বধূ দুর্গার মহল তার সন্নিহিত হলেও, রাজকুমার মহল একটু দূরে আলাদা। রাজমাতা এখনও জীবিত। তবে তিনি তেমন সুস্থ নন। তিনি বৃদ্ধা। তিনি তাঁর নিজের মহলে থাকেন।

নিজের মহলে থাকেন, তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে মন্দিরে যান। পুজো করেন। এবং সেখান থেকে পুজো করা পুষ্প নিয়ে এসে ছেলে দলপৎ এবং রাজবধূর কপাল ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে যান। এরপর সেই যে প্রাসাদে ঢোকেন, তারপর আর নিজের মহল থেকে বের হন না।

রাজবধূ দুর্গা যখন 'চৌরাগড়' দুর্গের ভেতরের সামগ্রী সব জানবার জন্য ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাজমহিষী ও রাজমাতার মহল থেকে একটা তলব এল।

তিনি দুর্গাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যে চৌরাগড় কেল্লার মহলে মহলে ঘুরছ, সে সংবাদ পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। তোমার মতো একজন দায়িত্বশীল বধূই আমি চেয়েছিলাম। তা তুমি ঘুরতে ঘুরতে আমার মহলে এলে না কেন? এখানে আসাও তোমার উচিত ছিল।'

দুর্গা বিনম্র ভাবে বলল, 'এই মহলের চাবি-কাঠি আপনার হাতে। আপনি সব জানেন এবং আপনিই কর্ত্রী, এখানে এসে আমার তদারকি করার কী আছে? না করা উচিত?'

' তোমার দিক থেকে কথাটি হয়তো ঠিক। কিন্তু দ্যাখো, আমারও একটা দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব হল আমার মহলের কিছু খবর তোমাকে জানানো। আমার বয়স হয়েছে। বয়স বাড়ছে, কবে যে ওপারে চলে যাব, তার ঠিক নেই। সেই গোপন খবর জানাতে চাই।'

' গোপন খবর? আপনার আবার কী গোপন খবর আছে মা?'

'আছে। এ খবর আমি ছাড়া আর কেউ এ রাজ্যে জানে না। রাজকুমারও না। এমন কী তোমাদের এই অধর কায়স্থও না।'

'তা কী খবর মা?'

'এই গাণ্ডোয়ানা রাজ্যের যে বিপুল রাজকোষ, তা আমার মহলের এক কক্ষে রাখা আছে। তিন-চারপুরুষ ধরে এখানে জমা রয়েছে রাশি রাশি সোনা। শুনেছি আলাউদ্দিন খিলজি এক সময় কোনও এক রাজ্যে হানা দিতে গিয়ে কলসি কলসি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিল। সেই সব সোনার কলসি চালান হয়ে গিয়েছিল দিল্লিতে। সেই সোনার জোরে যুদ্ধের রসদ আর সৈন্যবাহিনী তৈরি করে নিজের বাবাকে মেরে হিন্দুস্থানের সুলতান হয়েছিল আলাউদ্দিন। আমাদের 'গান্ডোয়ানা'র পূর্ব পুরুষ মহারাজা রঞ্জিৎ

সিংহ এইভাবে বিশাল এক ধনভান্ডার পেয়েছিলেন। এখানকার জঙ্গলের হাতীর চলাফেরা, এসব ধন ভাণ্ডার কোন রাজার ছিল, কে জানে? এই ধনভাণ্ডারে কী না আছে? বাজারে এদের অর্থমূল্য কয়েক কোটি সুবর্ণ আশরফি।'

রাজবধূ দুর্গা সবিস্ময়ে বলল, 'এক সুবর্ণ আশরফি? রাশি রাশি সোনা? কোথায় রাখা আছে মা?'

'এস, আজ তোমাকে ওই গোপন কক্ষটি দেখাব। আর কক্ষের চাবি তুলে দেবো তোমার হাতে।'

এরপর কক্ষের ভেতর দিয়ে দিয়ে এবং শেষে গোপন এক সুরঙ্গ পথে ধীরে ধীরে রাজমাতা দুর্গাকে নিয়ে গেলেন একটি কুঠরীতে। কক্ষটি অন্ধকার। চকমকি ঠুকে রাজমাতা একটি বাতি জ্বালালেন। দেখালেন সেই বিশাল ধন ভাণ্ডার। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা। রূপোর কলসিতে রাখা। তা কলসিতে সে সব ধরে না। সেগুলি ঘরের মেঝেতে ঢালা। বাতির আলোয় সেগুলি চিকচিক্ করতে লাগল।

শুধু কী স্বর্ণ মুদ্রা বা আশরফি, কুঠরির ভেতর দেখা গেল পেটিকা ভর্তি হীরে-জহরত এবং মহার্ঘ্য মণি-মাণিক্য। এছাড়া স্তুপীকৃত করে রাখা আছে রুপোর সোনার থালাবাসন। এদের সঙ্গে কয়েকটি রত্নখচিত সুবর্ণ মূর্তিও দেখা গেল।

বধূ দুর্গা হল রাজপরিবারের মেয়ে। সোনারূপা এবং হীরে জহরৎ তার না দেখা নয়। কিন্তু ধনভাণ্ডারের কুঠুরিতে সে যা দেখল, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারল না।

'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করো না।'

এই বিশাল ধনভাণ্ডার হাতে থাকলে, এবং এই ঐশ্বর্য কাজে লাগালে অনেক কাজ করা যায়। জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন নগর তৈরি করা যায়। চাষের জন্য বিস্তর জমি তৈরি করা যায়। হরেক রকমের ব্যবসা করা যায়। বড় বড় রাস্তা তৈরি করা যায়। মজবুত এক রাজ্য এবং মজবুত এক সৈন্যবাহিনী তৈরি করে দিল্লির সুলতানের সঙ্গেও পাল্লা দেওয়া যায়। তাই না!'

'তা হয়তো যায় বৌমা! কিন্তু করবে কে? গাণ্ডোয়ানার রাজা যারা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন অলস। রাজকোষে অনেক টাকা এসেছে বটে, কিন্তু তা কোনও কাজে লাগানো যায় নি। আমাদের উদ্যোগের বড় অভাব। এই রাজবংশের রাজারা কেবল শিকার করতে বেরিয়েছেন আর তাস পাশা খেলে সময় কাটিয়েছেন।

'আপনার ছেলে? উনি কী বলেন?'

রাজাবধূর কথায় মৃদু মৃদু হাসলেন রাজমাতা।

'দলপৎ-এর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে কী হবে মা! তুমি তাকে কোনওভাবে উদ্যোগী করতে পার কী না দ্যাখো।'

বয়সের হিসেবে রাজবধূ দুর্গার বয়স খুবই কম। রাজকাজ চালানোর অভিজ্ঞতা তার আদৌ নেই। কিন্তু ওই রাজ ঐশ্বর্য দেখার পর তার বয়সটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। তার ভেতর যেন এক রাজমহিষীর জন্ম হল।

রাজ্যটিকে জানার জন্য তার ভেতর যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল , তা যেন একদণ্ডেই বেড়ে গেল।

রাজবধূ দুর্গা অধর কায়স্থকে সঙ্গে করে একে একে দেখতে থাকল সেনা শিবিরের অস্ত্রাগার, শস্যাগার, তোপখানা, এমনকী হাতীশালা ও ঘোড়াশালা পর্যন্ত। দুর্গার মুখে অনন্ত জিজ্ঞাসা, সেই সব জিজ্ঞাসার জবাব অধর কায়স্থ দিতেও পারে না। কোনও কোনওটা দেন এবং কোনও ব্যাপারে একেবারে চুপ। চুপ করে থেকে বলেন, 'এসব ব্যাপারে আপনাকে নিজেই জেনে নিতে হবে।'

এদিকে স্বামী দলপৎ সিংহ কিন্তু উদ্যোগহীন নিশ্চেষ্টই পুরুষমাত্র।

মাঝে মাঝে শিকারে যান, আর বাকি সময়টা ঘুমিয়ে কাটান।

না, কোনও বদনেশা নেই। নেই মদিরাসেবন বা বিবি-বাইজীদের নিয়ে আসর বসানো, না মেয়ে মানুষের দিকে কোনও ঝোঁক নেই।

বিশাল ভালো মানুষ। ভালো রাজপুত্তুর। কিন্তু বড় উদ্যোগহীন এবং অলস। ঝোঁক কেবল শিকারে।

তা রাজকুমার দলপৎকে খুশি করতে কুলবধূ দুর্গা একদিন তাঁর সঙ্গী হল শিকারে। বাঘের ডাক বন্ধ করতে এই রাতে শিকারে যাওয়াটা কিছুদিন ধরেই তার মনের ভেতর চাগিয়ে উঠছিল। তাই একদিন কেন, পরপর কয়েক দিন দলপৎ-এর সঙ্গে সঙ্গী হন দুর্গা।

শিকার করতে করতে গভীর জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে হল। এই শিকারে অনেক গোঁদ প্রজাও তাঁদের সঙ্গী হতে থাকল।

দেখা গেল, অরণ্যবাসী গোঁদেরা তাঁদের থেকে শিকারে দক্ষ। অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য। এবং তীরধনুক এবং বরশা আর খোঁজক্ দিয়ে তারা বড়ো বড়ো জন্তু জানোয়ারকে ঘায়েল করে।

সে বছর শীতের প্রথমে দলপৎ-এর সঙ্গে অধরকে সঙ্গী করে রাজ্যের সীমানা দেখতে বের হল দুর্গা।

রাজবধূ ও রাজমহিষীরা সাধারণত পালকি করে পরিভ্রমণ করে থাকেন, দুর্গা কিন্তু তা করল না। তবে অশ্বারোহণে শিকারীর বেশেও সে বের হল না। রাজবধূ দুর্গা বসল হাতীর পিঠে চড়ে! সঙ্গে দলপৎ সিং। সুদৃশ্য হাওদায় চেপে তারা একটির পর একটি জঙ্গল পার হয়ে এবং বেশ কয়েকটা জনপদ পেরিয়ে এসে পৌঁছল কাটঙ্গি দুর্গে।

লোকে বলে, গড় কাটঙ্গি।

পথে আসতে আসতে জঙ্গলের মানুষজন রাজা দলপৎ এবং নববধূ দুর্গাকে প্রচুর অভ্যর্থনা জানাল। রাশি রাশি ভেট দিল। এদের দেওয়া ভেটগুলি তেমন মহার্ঘ নয়, তবে খুব আন্তরিক। কেউ দিল রাশি রাশি ফুল, ফুলের মালা। কেউ দিল লাল ধরনের ফল। গোয়ালারা এসে দিয়ে গেল ক্ষীর, দই এবং উৎকৃষ্ট ছানার মেঠাই। শিকারী গোঁদরা রাজার রাজস্ব রাজার পায়ের তলায় নামিয়ে দিল মেলা তীর-ধনুক। এক শিকারী উপহার দিল তার জঙ্গ

লে ধরা একটা হরিণশাবক। অর্থের মূল্যে এদের পরীক্ষা করতে চাওয়া বৃথা। কিন্তু ভারি আন্তরিক।

কাটনি দুর্গেও সকলে রাজা দলপৎ এবং নববধূ দুর্গাকে পেয়ে ভারি খুশি। তারা শাঁখ বাজিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাল।

দুর্গা কাটঙ্গি দুর্গ পর্যবেক্ষণ করে দেখল, দুর্গটি আকারে কিছুটা ছোট হলেও, ভারি শক্তপোক্ত। পাথর দিয়ে গড়া। চারদিকে পরিখা। শত্রুদের হঠাৎ আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা আছে।

তবে সব কিছু থাকলেও, কেমন যেন নিষ্প্রভ।

কাটঙ্গি দুর্গে বসেই রাজবধূ দুর্গা অধর কায়স্থকে বলল, 'রাজ্য গান্ডোয়ানার দেখছি সব কিছু আছে। কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও নিষ্প্রভ। কেমন যেন মরে আছে।'

'আজ্ঞে, তা হয়তো আছে। কিন্তু আপনি কী করতে চান?'

'আমি নিষ্প্রভ রাজ্যটিকে প্রাণ দিতে চাই। রাজ্যটাকে জাগিয়ে তুলতে চাই।'

'কী করে?'

'এ রাজ্যের নগর-বাজার বাড়াতে চাই। জঙ্গল থেকে চাষের জমি করতে চাই। শিকারি গোঁদদের জঙ্গলে জঙ্গলে আর ঘুরতে হবে না। তাদের চাষ করতে হবে। ব্যবসা করা শেখাতে হবে। আর তাদের নিয়ে আমি একটা বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চাই।'

'আজ্ঞে, আগের কথাগুলি যা বললেন, তা ঠিক আছে। বুঝতে পারা গেল। কিন্তু গাদা গাদা সৈন্য দিয়ে, কী করব আমরা! কী আমাদের কাজ হবে? আমরা কী যুদ্ধ করতে যাব নাকি। তা ছাড়া বউ রানী, এতসব যে করবেন, তার জন্য বিস্তর টাকাপয়সা দরকার। সে সব টাকাপয়সা কোথায় পাব? কে যোগাবে বিশাল খরচ?'

অধর কায়স্থর কথায় মৃদু হেসে রাজবধূ দুর্গা বলল, 'টাকাপয়সার জন্য চাষবাষ দরকার নেই। মন্ত্রীমশাই, টাকাপয়সা পাওয়া যাবে। আর সেনাবাহিনীর কথা কেন বললাম জান? কালিঞ্জর দুর্গে থাকবার সময় শুনেছি, যবন রাজারা খুব তাড়াতাড়ি এই হিন্দুস্থানে নিজেদের দখল নিয়ে নেবে। তারা আমাদের নিয়ে খেলবে। আমরা জঙ্গলমহলে আছি বলে, আমাদের রেহাই দেবে না। তাদের আক্রমণের মোকাবিলা না করতে পারলে, আমরা তাদের পায়ের তলায় পিষে মরব। যবনের দাসত্ব করতে হবে।'

অধর কায়স্থ বাইরের জগতের কোনও খবর রাখেন না। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, 'তেমন কাণ্ড হতে পারে না কি!'

'হতে পারে নয়, হবেই।' হাসল দুর্গা, 'হচ্ছে। হতে চলেছে।'

বউরানীর এই কথাগুলি অধর কায়স্থর কানে ঢুকল বটে, কিন্তু মগজে ঢুকল না।

তিনি বললেন, 'বেশ, আপনি যা যা বলছেন, তা একবার যাচিয়ে নিতে হবে। জঙ্গলমহলের ভেতর এক মহাদুর্গার মন্দির আছে। সেখানে থাকেন এক ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী। তাঁর নাম, আচার্য অনন্তদেব মিশ্র। তিনি আমাদের রাজ্যের ভাগ্য গণনা করে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা জানতে যাওয়া হোক। তিনি যা বলেন, তা অব্যর্থ। তিনি কেবল আচার্য নন, আমাদের রাজ জোতিষী।

বধূ দুর্গা এ বিষয়ে তেমন কিছু জানেন না। জানেন না কাকে বলে জ্যোতিষ। অধর কায়স্থর কথা শুনে বললেন, 'মহাদুর্গার মন্দিরে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি নেই আচার্য অনন্তদেব মিশ্রের কাছে যেতেও। জ্যোতিষের ওপর সকল হিন্দুই বিশ্বাসী। আমারও বিশ্বাস আছে।'

বধূ দুর্গার সম্মতিতেই একটা শুভদিন দেখে যাওয়া হল জঙ্গলমহলের মহাদুর্গার মন্দিরে।

জঙ্গলের ভেতর যে এমন একটি সুদৃশ্য ও পবিত্র মন্দির থাকতে পারে, তা ভাবতেই পারেন নি বধূরূপী দুর্গা।

কেবল মন্দির নয়, বধূরানী দুর্গা মোহিত হলেন আচার্য অনন্তদেবকে দেখেও। ঠিক যেন প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত ঋষিদের মতন। তাঁকে দেখে শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল মাথা। কী প্রশান্ত মুখ, কী প্রশান্ত দৃষ্টি। তাঁকে প্রণাম করলেন রাজবধূ দুর্গা।

বধূদুর্গাকে দেখেন নি আগে। তবে বিবাহের আগে তার কোষ্ঠী বিচার করেছেন অনন্তদেব মিশ্র। মহারানী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজপ্রাসাদে। অনন্তদেব এই মন্দিরে থেকে কখনও কোথাও যান না। কিন্তু রানীর অনুরোধে যেতে হয়েছিল। সম্ভাব্য রাজবধূর কোষ্ঠী দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন অনন্তদেব। দলপৎ সিংহের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহের সম্মতি দিয়েছিলেন। মহারানীকে বলেছিলেন, এই কন্যা ঘরে এলে রাজ্যের প্রভূত উপকার হবে।

যার কোষ্ঠী দেখে অনন্তদেব মিশ্র চমৎকৃত হয়েছিলেন তাকে আজ চোখের সামনে দেখে অনন্তদেব অভিভূত হলেন।

মনে হল, মন্দিরের দুর্গা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

যে জন্য আসা তার বৃত্তান্ত খুলে বললেন অধর কায়স্থ। মন দিয়ে সব শুনে প্রতিটি প্রস্তাব অনুমোদন করলেন অনন্তদেব।

বললেন, 'রাজ্যের ভাগ্যে শুভ গ্রহের উদয় হচ্ছে। আগামী বিশ বছর এই গান্ডোয়ানা রাজ্যের প্রভূত উন্নতির যোগ। সবরকম অশুভশক্তি পরাভূত হবে। তবে রাজপরিবারে আকস্মিক কোনও বিপর্যয় হতে পারে। তবে এই বিপর্যয়ে রাজ্যের কোনও ক্ষতি হবে না। তবে বিশ বছর পরে কী হবে, তা এখনই বলা যাবে না--- যবনদের হাত থেকে জঙ্গলমহলকে তখন হয়তো বাঁচানো যাবে না।

'রাজকোষে তেমন টাকা নেই। এই সব কাণ্ড কারখানা করতে যে টাকা লাগবে, তার কী ভাবে জোগাড় হবে।'

অনন্তদেব হেসে বললেন, 'মন্দিরে আছেন মহাদুর্গা, আর রাজসংসারে রয়েছেন রাজবধূ দুর্গা, অর্থ আসবে তোমাদের আপনার থেকে। গ্রহতারা সুপ্রসন্ন। রাজ্যের উত্তরণের কাজে লেগে যান বউরানী।'

তা যা যা ভাবা গিয়েছিল, সেই ভাবেই গুছিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন রাজবধূ দুর্গা।

রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সেনাবাহিনীকেও উন্নীত করা হল। গোলা-বারুদ, তীর-বরশা ইত্যাদি যোগাড়ের সঙ্গে হাতী কেনা হল তিন হাজার, ঘোড়া দশ-বারো হাজার, রাশি রাশি কামান-বন্দুক। জঙ্গলের শিকারী জীবন ছাড়িয়ে গোঁদদের এগিয়ে দেওয়া হল সৈনিক হওয়ার কাজে। যারা সেনাবাহিনীতে আসতে পারল না, তাদের লাগানো হল চাষের কাজে।

এইসব কাজ যখন চলছে, তখন রাজবধূ দুর্গা রাজ-পরিবারকে উপহার দিলেন একটা পুত্র সন্তান। নবজাত রাজকুমারের নাম রাখা হল— 'বীর নারায়ণ'। রাজমাতা তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন ছোট্ট একটা রাজমুকুট দিয়ে।

রাজ্য মেতে উঠল প্রবল উৎসবে। এই উৎসব সবরকম অতীত উৎসবকে ছাড়িয়ে গেল।

কিন্তু উৎসবের শেষেই মহারানীর মৃত্যু হল। কিছুদিনের জন্য শোকের ছায়া নামল চৌরাগড়ের রাজপ্রাসাদে।

এই শোকপর্বের শেষে রাজবধূ দুর্গা হয়ে গেলেন রাজ্যের মহারানী দুর্গা। সংক্ষেপে দুর্গা। কারও কারও কাছে, মাতা দুর্গা।

মহারানী হওয়ায় দুর্গাবতী একদিন বাবা কিরাত সিংহকে নিয়ন্ত্রণ পাঠালে, 'বাবা, তুমি একদিন আমার রাজ্যে এসে ঘুরে যাও। দেখে যাও, আমি কেমন করে গান্ডোয়ানা রাজ্যকে নতুন করে গড়ে তুলেছি। দেখে যাও, আমি কেমন করে আমার সৈন্যবাহিনীকে যবন সৈন্যদের থেকেও উন্নত করে তৈরি করেছি। আমার এই গড়ে তোলার ভেতর কোথাও যদি গলদ থাকে, তা ভালো করে দেখে আমাকে উপদেশ দিয়ে যাও। তোমার আগমনের অপেক্ষায় রইলাম।'

রাজা কিরাত সিংহ কন্যার আমন্ত্রণ পেয়েও আসতে পারলেন না।

তিনি চিঠি লিখে জানালেন, 'তুই আমার শত সহস্র আশীর্বাদ জানবি। তুই যে এটা করবি, এবং বিরাট একটা কিছু হবি, তা তোর ছেলেবেলা দেখেই বুঝেছিলাম। তোর নানান কর্মকাণ্ড দেখার জন্য আমি খুবই আনন্দিত এবং যেতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু এখন আমি চারদিকের যখন সৈন্যদের নিয়ে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছি। এই অবস্থায় কালিঞ্জর দুর্গকে ছেড়ে যাওয়া সমীচীন বোধ করছি না। তা এখন না হোক, পরে যাওয়ার ইচ্ছে রইল।'

মহারানীর কর্মকাণ্ডে রাজ্যের সকলেই খুশি। সকলেই উৎসাহিত।

রাজা দলপৎ উৎসাহিত। তবে তার আনন্দ এবং কর্ম বিমুখতা তাঁকে সেভাবে সব জায়গায় সম্পৃক্ত করতে পারছিল না। তাঁর দীর্ঘ নিদ্রা যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল। তাস-পাশাও তিনি ছাড়তে পারলেন না। এবং শিকারে যেমন বের হচ্ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই নিয়মিত বের হতে থাকলেন।

গান্ডোয়ানা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির খবর কেবল জঙ্গল মহলেই আবদ্ধ থাকল না। তা জঙ্গল ছাড়িয়ে পাশের রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার দিকে ছিল আফগানরা। তাদের অনেকদিনের পরিকল্পনা ছিল জঙ্গলমহলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সীমানা বাড়ানো। এবং বেশ খানিকটা জঙ্গলমহল গায়েব করা।

আফগানদের সর্দার তাঁর অনুচরদের ডেকে বলল, 'আর হাতগুটিয়ে বসে থাকা চলে না। শক্তিকে বাড়তে দিলে, তা শেষে আমাদের বিরুদ্ধে লেগে যাবে।'

অনুচরেরা বলল, 'আপনি যে কী বলতে চাইছেন, তা বুঝতে পারছি না।'

'যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। 'গান্ডোয়ানা'র জঙ্গল মহলে আমাদের হানা দিতে হবে। আমাদের মুলুকের সীমানা বাড়াতে হবে।'

বলা বাহুল্য, জঙ্গলমহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে তারা সশস্ত্র আক্রমণ করল। সঙ্গে হাজার পাঁচেক সৈন্য।

অতর্কিত আক্রমণ, তাই প্রতিরোধে একটু দেরি হল। পাঁচ হাজার সৈনিকের বিরুদ্ধে দশ হাজার সেনা পাঠিয়ে রাজমাতা দুর্গা তার মোকাবিলা করলেন। আফগান সর্দার পালিয়ে বাঁচল।

তা শকুনের চোখ যখন রাজ্যের উপর পড়েছে, তখন সেই শকুনের দল চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। এক শকুন গিয়ে আরও শকুন আসে। ওই আরেক শকুনের খবর নিয়ে এলেন মন্ত্রী অধর কায়স্থ।

মহারানীর গোপন মন্ত্রণালয়ে একদিন এসে অধর জানালেন, 'বউরানী, সম্ভাব্য বিপদের খবর আছে।'

'সম্ভাব্য? সে আবার কী!'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই বুঝতে পারবেন।'

'তা খুলেই বলুন। শুনি কি খবর।'

অধর কায়স্থ যা বলে গেলেন, তা এই রকম : জঙ্গলমহলের পাশেই মালব রাজ্য। কিছুদিন আগে সেই মালব রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন শের খাঁ। তা এই শের খাঁর পরাক্রমের কথা নিশ্চয় শোনা আছে। লোকটা বেজায় জেদী, বেজায় সাহসী এবং তেমনি ক্ষমতা লোভী। প্রথম পরাক্রমে রাজ্যটি আক্রমণ করে শের খাঁ তার দখল নিয়ে নিল। দখল নিলেও সেখানকার তখ্‌তে উনি বসলেন না। মুজায়েত খাঁ নামে একজন পাঠানকে তখ্‌তে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন উত্তর রাজ্যের দিকে। তা বছর তিনেকের মাথায় মুজায়েত মরল এবং তেনার এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিন ছেলের ভেতর লেগে গেল কামড়াকামড়ি। এই তিন ছেলেই বাপের তখ্‌তে বসতে চায়।

এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলবার পর একটু থামলেন অধর কায়স্থ। কাঁধের পাট করা চাদর দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

'শেষপর্যন্ত দুই ভাইকে ল্যাং মেরে যিনি তখ্‌তে আসীন হলেন, তিনি হলেন মালিক 'বায়নিদ'।'

'বায়নিদ্?'

'জী।' অধর মৃদু হেসে বললেন, তবে এখন তিনি আর এই নাম ব্যবহার করেন না। তিনি এখন সুলতান রাজ বাহাদুর। নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেছেন। এরপর নিজেকে সত্যি সত্যিই স্বাধীন এবং সার্বভৌম সুলতান হিসেবে দেখাতে তিনি নিজের রাজ্য বিস্তারের জন্য মনোযোগ দিয়েছেন।'

'রাজ্য বিস্তার?' সেই বিস্তার কোন দিকে?'

'অবশ্যই আমাদের দিকে। সুলতান রাজাবাহাদুর নেমেছেন, এক দুর্বল রাজ্যকে আক্রমণ করা রাজ্য বিস্তারের সহজ উপায়। তাই খুব শিগগিরই সে এ রাজ্য আক্রমণ করবে।'

এই রকম একটি খবর পেয়ে সকলেই বিচলিত হয়। অধর কায়স্থ কেবল বিচলিত নন, তিনি রীতিমতো শঙ্কিত। এই গোপন খবরটা রানীকে বলবার সময় বারবার তার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

খবরটা বলবার শেষে অধর কায়স্থ হতাশ গলায় বলল, 'এখন আমাদের কী হবে, বউ রানী?'

মহারানী দুর্গাবতী দৃঢ়ভঙ্গিতে বললেন, 'হবে আবার কী? যুদ্ধ হবে। সুলতান রাজ বাহাদুরকে উচিৎ শিক্ষা দেব।'

মহারানীর হুকুমে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ প্রস্তুতি। প্রতিটি তীরকে সুরক্ষিত করা হল। তোপখানাকে নতুন করে সাজে সাজানো হল। অশ্বারোহী সৈনিকরা দুর্গের বাইরের প্রাঙ্গণে যুদ্ধের মহড়া দিতে থাকল। তোপখানাতে নতুন করে তৈরি হতে থাকল বরশা এবং রাশি রাশি তীর। প্রবল উৎসাহে গোঁদ সেনারা প্রতিদিন কুচকাওয়াজ করতে থাকল।

মাসখানেক পরে বোঝা গেল যুদ্ধ আসন্ন। রাজবাহাদুরের সেনারা যে কোনও সময়ে গান্ডোয়ানা আক্রমণ করতে পারে। এই রকম এক সংকটময় যুদ্ধতে এক সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক অঘটন ঘটে গেল। এবং এই অঘটন যিনি ঘটালেন, তিনি হলেন মহারাজ দলপৎ সিংহ।

দলপৎ কিঞ্চিৎ অলস এবং আরাম বিলাসী হলেও, যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু তাঁর চিরদিনের যে অভ্যাস, সে অভ্যাসও তিনি ত্যাগ করতে পারছিলেন না। জঙ্গলমহলের গভীরে রাজা দলপৎ মাঝে মাঝেই চলেছিলেন শিকারে। আগের তুলনায় তাঁর শিকারের দলবল কিছু কমে গিয়েছিল। তবে শিকারে যাওয়ার সময় তিনি যে নিঃসঙ্গ যেতেন, তাও নয়।

সেদিন প্রত্যুষেই তিনি শিকারে বের হয়েছিলেন। শরীর স্বাস্থ্য তাঁর ভালোই ছিল।

কিন্তু অপরাহ্নে তিনি যে ভাবে শিকার থেকে ফিরলেন, তা অতুলনীয়। তিনি ঘোড়ার ওপর বসে ফিরলেন না, তিনি ফিরলেন ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শায়িত অবস্থায়। দু'পাশে দুটি হাত ঝুলছে। মাথাটি লুটিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। কোথায় যে তিনি দুর্ঘটনা বাধিয়েছেন, তা বোঝা যায় না। ঘোড়াটি তার প্রভুকে নিয়ে জঙ্গল থেকে দৌড়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। একান্ত শিক্ষিত ঘোড়া, তাই আসতে পেরেছে। রাজ প্রাসাদের পথ তার একান্ত চেনা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মহারাজ দলপৎ সিংহের শিকার সঙ্গীরা কেউ সঙ্গে নেই। তাদের কারোকে ধারে কাছে দেখা গেল না। সকলের মনেই প্রশ্ন জাগল, তারা কোথায়?

দলপতের এই অবস্থা দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল রানী দুর্গাবতীর। জরুরি তলব গেল রাজবৈদ্যের কাছে।

রাজবৈদ্য এলেন হাঁফাত হাঁফাতে। এসে পরখ করে দেখলেন। দলপৎ সিংহ মৃত। তাঁর দেহটি পরখ করে দেখা গেল, তাঁর শরীরের সব জায়গাই ক্ষত-বিক্ষত। কোনও কোনও জায়গা দেখে মনে হল, তাঁর শরীরের ওপর পড়েছে শানিত ছুরির আঘাত। কোনও কোনও জায়গা খাবলান। এমন ধরনের আঘাত বন্যজন্তুদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে বলে মনে হল না।

তা হলে দলপৎ কী কোনও গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন?

না। কোনও জবাবই পাওয়া গেল না।

যাই হোক, এই ভয়ঙ্কর শোকের মধ্যেও রাজমাতা দুর্গাবতী তাঁর ইতিকর্তব্য ভুললেন না। কুমার বীর নারায়ণ, বয়সে তখন সবে চার। সেই চার বছরের শিশুকে সিংহাসনে বসিয়ে তার অভিষেক করানো হল। বীর নারায়ণ রাজা হলেন 'নাবালক' রাজা। আর এই নাবালক রাজার হয়ে রাজ্য পালন ও পরিচালনার ভার দুর্গাবতী তুলে নিলেন নিজের হাতে, নাবালক রাজার অভিভাবক হিসেবে।

তা এসব যা কিছু হল, তা সমস্ত হল চোখের জলের মধ্যে দিয়ে।

মন্ত্রী অধর কায়স্থ বললেন, 'আমি ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথা সহজভাবে নিতে পারছি না, মহারানী! এর ভেতর কোনও বিদেশি রাজ্যের ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে--আমাদের রাজ্যের ভেতর নিশ্চয় গুপ্তঘাতকের দল ঢুকে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

দুর্গাবতী বললেন, 'আপনার অনুমান যথার্থ বলেই মনে হচ্ছে। তবে এই ঘাতকদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত, স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এটি মনে হয়, আগাম যুদ্ধের একটা অংশ।'

শেষপর্যন্ত যুদ্ধ বাধল। মালব রাজ্যের সুলতান রাজবাহাদুর তাঁর বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে শীতের শেষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'গান্ডোয়ানা' রাজ্যের ওপর। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী পাহাড়ি পথ বেয়ে নেমে এল পাহাড়ি-নদীর মতো। সঙ্গে এল পদাতিক এবং তীরন্দাজ বাহিনী। সুলতান লড়তে এলেন হাতীর পিঠে চড়ে। সঙ্গে আরও হাতি-চড়া যোদ্ধা। তাদের কারও হাতে বরশা, কারও কারও হাতে তীর-ধনুক---সুলতানের গোলন্দাজ

বাহিনী গোলা দাগছে অরণ্য-প্রান্তর কাঁপিয়ে। মোটকথা, বেঁধে গেল এক ধুন্ধুমার যুদ্ধ।

যুদ্ধ বাঁধল বটে, কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হল না। কয়েকদিন যেতেই গোঁদ সৈন্যদের আক্রমণের কাছে প্রতিহত হয়ে পিছু হাঁটতে হল সুলতান রাজবাহাদুরকে। শেষে পুরোপুরি পশ্চাৎ অপসরণ। বহু রক্তপাত এবং সৈন্যক্ষয়ের পর চিরতরে যুদ্ধ পিপাসা মিটে গেল রাজবাহাদুরের।

গোঁদরা এর আগে কখনও এভাবে যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ জয়ের স্বাদ তাদের অজানা। এই ভয়ঙ্কর যবনদের হারিয়ে দিয়ে তারা পাগলের মতো মেতে উঠল বিজয় উৎসবে। অনেক কাড়া-নাকাড়া বাজল। পটকা ফাটাল। বাজী পুড়ল। বাজল শিঙ্গা। এবং এইসঙ্গে প্রভূত মদ্যপান করল। বিস্তর নাচ-গান হল।

চৌরাগড়ের রাজপ্রাসাদ সাজল আলোকমালায়। রাজপ্রাসাদের সকলে আবেগে এবং খুশিতে ভাসতে থাকল।

রানী দুর্গাবতী আজ খুশি। আনন্দিত। কিন্তু তার দু-চোখ বেয়ে নামতে থাকল অশ্রুধারা। সুখ কোথায়?

দিন সাত-আট পরে কালিঞ্জর দুর্গ থেকে এল রাজা কিরাত সিংহের দূত। হাতে চিঠি।

চিঠিতে কিরাত লিখেছেন, ‘ তোর সুখ-দুঃখের আমি কোনওভাবেই সাথী হতে পারলাম না রে। দলপতের মৃত্যু আমার বুকে শেল হয়েছে। এ দুঃখ কোনও দিন ভোলা যাবে না, তবে সুলতান রাজবাহাদুরকে হারিয়ে দিয়ে যে জয় তুই ছিনিয়ে নিয়েছিস, তার আনন্দও কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমি খুবই বিপর্যস্ত। মুঘল বাদশা হুমায়ুন আমার দুর্গকে ছয়মাস ধরে অবরোধ করে বসেছিল। শেষে বিশ লক্ষ টাকা নগদ হাতে তুলে দিয়ে এবং অধীনতার অঙ্গীকার করে খুশি হয়েছি। তবে এই মুক্তি কতক্ষণের জন্য তা জানি না। আমরা বড় দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি রে! এই ভাবে কতদিন টিকে থাকব জানি না। আশীর্বাদ নিও। ইতি বাবা।’

।। পাঁচ ।।

পাথরে পাঁচ কিল।

হ্যাঁ, কিলের পর কিল। তবু পাথর ভাঙে না। পাথর অটুট। পাথরের গতর অটুট সৌভাগ্যের পরিচয়বাহী বাখ্যাটি হল, পাথরে পাঁচ কিল। হাসান মিঞার ছেলে ফরিদ এইরকম এক ভাগ্য পেয়ে হয়ে গেল শের খাঁ। রাতারাতি ‘শাহী’ পদে অভিষেক নিয়ে শেরশাহ হতে তার দেরি হল না। এখন থেকে তাকে ‘শেরশা’ বলাই সঙ্গত।

শুধু ‘শা’ বলেই ছেড়ে দিলে হবে না। তাকে সম্মান দিয়ে ‘হুজুর’ বলাও দরকার। এবং ‘তাকে’ না বলে, বলতে হবে তাঁকে।

কথায় আছে, অমন অভাবিত সৌভাগ্যের অধিকারী হলে, ভাগ্যবান ব্যক্তিটি যখন ধুলো মুঠোয় ধরেন, তখন তা ‘সোনা মুঠো’ হয়ে যায়। শেরশাহের জীবন এই সব প্রবাদ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাজ খাঁয়ের বিধবা পত্নী সুন্দরী লাছমালিকাকে বিবি হিসেবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শের খাঁ কেবল চুনার দুর্গেরই মালিক হননি, মালিক হয়েছিলেন প্রভূত ঐশ্বর্যের, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। হঠাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর, এই বিবি বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন শের খাঁ-কে এবং বিবাহও হয়ে গেল। এই বিবিই তাঁর কাছে রক্ষিত এবং সঞ্চিত তিনশো মন সোনা তুলে দিলেন তাঁর নব-পরিণীত স্বামীকে।

ইতিহাসে মিঞা মহম্মদ কালা পাহাড় ফরয়ুনির নাম বিশেষ শোনা যায় না। তবে তাঁর মেয়ের নাম শোনা যায়। তাঁর মেয়ের নাম ছিল, বিবি ফাৎ মালিকা। ফাৎ ছিলেন প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারিণী। বুন্দেলখণ্ডের রেওয়া অঞ্চলে ছিল তাঁর এক জায়গীর। এবং সে জায়গীর ছিল খুবই সমৃদ্ধ। তার থেকে প্রচুর অর্থ আমদানি হল। দীর্ঘ দিন বিবি ফাৎ তাঁর জায়গীরের বাইরেই ছিলেন। মুঘলদের ভয়ে তিনি স্বামী ও দেওরের সঙ্গে নগরে এসে থাকলেও নিজেকে সর্বদা ভারি অরক্ষিত এবং অসহায় মনে করতেন। তা স্বামীর এবং পরে দেওরের মৃত্যুর পরে বেচারি বিবি ফাৎ ভীষণ ভাবে ভেঙে পরলেন। ভয় তাঁকে তাড়া করে বেড়াতে থাকল। এবং ইনিও শেষমেশ পড়লেন গিয়ে শেরশাহের খপ্পরে। শেষে তিনশো মণ সোনা শের শাহের হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিয়ে নিজের সুরক্ষা কিনলেন। বোঝা গেল, শেরশাহর নসিব।

হ্যাঁ, একেই বলে নসিব। শেরশা যে হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়ার মতন ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর এইসব অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য প্রাপ্তি এবং অবশ্যই তাঁর দুর্লভ নসিব।

ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা মানুষকে মহৎ করে। ক্ষমতাবান করে। এবং লোভীও করে। আরও পাওয়ার লালসা তার মনে জাগায়। এবং আরও পাওয়ার লোভ তাকে দিকভ্রষ্ট করে। নিষ্ঠুরও করে তোলে। শেরশাহ জীবনে এইসব গুণ এবং দোষ পরে পরে প্রচুর পরিমাণে দেখা যেতে থাকল। হাসান মিঞার ছেলে একদিন যে আগ্রা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, একথা আমাদের অজানা নয়। সেখানে তার প্রতিষ্ঠা ছিল প্রায় হিন্দুস্থানের বাদশার মতন। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হয়নি। ফসকে গিয়েছিল হয়তো। হুমায়ুনের তারা খেয়ে বেচারিকে তখন দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। তাঁর দখল করা দুর্গগুলি কখন যে বেদখল হয়ে যেত, তার স্থিরতা ছিল না। নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে যেত অনিশ্চিত।

এরই মধ্যে বেচারিকে মাঝে মাঝে কাবু করে রাখত তাঁর

অনুচরদের বেয়াকুবি, বিশ্বাসঘাতকরা এবং কখনও কখনও বাংলা মুলুকের ম্যালেরিয়া। একবার ম্যালেরিয়ায় এমন কাবু হয়েছিলেন যে তিনি চলৎশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। হয়তো মারাই যেতে পারতেন। কপাল ফেরে বেঁচে গিয়েছিলেন।

তা এই রকম যখন শেরশাহের ভাব, তখন একদিন তিনি হঠাৎ খবর পেলেন, তাঁর প্রিয় চুনার দুর্গটি মুঘল হুমায়ুনের অতর্কিত আক্রমণে একেবারে বেদখল হয়ে গেছে। তাঁর পায়ের তলা থেকে অনেকখানি মাটি সরে গেছে। তিনি নিরাশ্রয়।

তবে মন্দের ভালো। আত্মীয় পরিজনেরা কোনওরকমে নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে। আর রক্ষিত ধন সম্পদ বে-হাত হয়ে যায় নি। মোটকথা, মাথার ওপর থেকে ছাদ উবে গেছে, নিজের লোকেরা সকলে নিরাশ্রয়। তবে সম্পদ অটুট।

সুতরাং জরুরি একটা আশ্রয় দরকার। দরকার সম্পদগুলিকে নিশ্চিত আশ্রয়ে রাখা।

আর আশ্রয় বাদে দরকার একটি দুর্গের। দুর্গ ছাড়া সেখানে রাজা-রাজড়াদের কে সুরক্ষা দেবে? এরকম আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য দরকার একটি দুর্গের। দরকার চুনার দুর্গের মতনই এক দুর্গের।

শোন নদীর বুকে বজরা ভাসিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল রোটাসগড়। নদীর কুলে যেন একটা বিশাল পাহাড়।

এই দুর্গটি তাঁর খুবই পরিচিত। পরিচিত এর মালিকও। তিনি নাকি পৌরাণিক রাজা রোহিতাশ্বের বংশধর। সবাই তাঁকে রাজামশাই বলে ডাকে। সকলে শ্রদ্ধা করে। রাজামশাই নামের আড়ালে তাঁর প্রকৃত নাম হারিয়ে গেছে। শেরশাহ তাঁকে 'রাজামশাই' বলে ডাকেন। তাঁর সঙ্গে এক সময় কিছু কিছু দোস্তি হয়েছিল। ভারি খাসা মানুষ 'রাজামশাই'।

তা হঠাৎ শেরশাহের মনে হল, এই রোটাসগড়ে তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে এসে উঠল কেমন হয়!

রাজাকে যদি অনুরোধ করা যায়, তিনি কী আশ্রয় দেবেন না? নদীতে বজরা ভাসিয়ে যেতে যেতে শেরশা এক সময় মনস্থির করে নিলেন, হ্যাঁ, এই রোটাসগড়েই তাঁকে আশ্রয় নিতে হবে। মুঘল হুমায়ুনের হাতে থেকে বাঁচতে হলে এটাই এখন সেরা ব্যবস্থা। শেরশা তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ানকে পরের দিনই পাঠিয়ে দিলেন রোটাসগড়ে। তিনি বসে রইলেন বজরায়। সঙ্গে তাঁর পরিবার -পরিজন।

শেরশাহর দেওয়ান এসে পরের দিন সকালে হাজির হয়ে গেল দুর্গদ্বারে।

সেনারা কুচকাওয়াচ করছে, আর তিনি চিৎকার করে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

শেরশাহর দেওয়ানের ধারণা হল, লোকটি নির্ঘাৎ রাজা। কেল্লাদার। তাই ঘোড়া থেকে নেমে তাকেই সেলাম জানালো সে। বলল, 'মহারাজ, আমি আপনার কাছে বিশেষ একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। যদি অনুমতি করেন—

তেরছা চোখে তাকিয়ে সেই মিশমিশে কালো লোকটি বলল, 'কী বার্তা? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'আঁজ্ঞে, ব্যাপারটা অতি গোপনীয়। যদি একটু নিভৃতস্থানে যান, তাহলে বার্তাটি যে কী তা বিশদভাবে বলতে পারি, লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল, 'কোন্য নিভৃত স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন দেখছি না। এই দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়েই আপনি আপনার বার্তাটি বলতে পারেন।'

শেরশাহর দেওয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'অ্যাঁজ্ঞে, আমি আমাদের হজরত শেরশাহের কাছ থেকে আসছি। তিনি একজন 'শাহ' হলেন, আপনাদের মঙ্গলকামী বন্ধু। শুনেছি একসময় আপনাদের ভেতর কিছুটা দোস্তি ছিল।'

'হ্যাঁ, তা ছিল। তা এখন তাঁর কাছ থেকে কী বার্তা এনেছেন শুনি।'

'আঁজ্ঞে, আমাদের শাহ এখন একটু বিপদে পড়েছেন। সেই আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

'সাহায্যপ্রার্থী? বটে?' অশ্বারোহী মানুষটি হাসলেন। কালো মুখে সাদা দাঁতের পাটি দেখা গেল। 'তা কী ধরনের সাহায্য শুনি!'

শেরশাহ দেওয়ান বিনীত ভঙ্গিতে এবং দুঃখ দুঃখ করে বলল, 'হুজুর শেরশাহের পরিবার পরিজন এবং ফৌজ নিয়ে হিন্দুস্থানের নানা রাজ্য জয় করে বেড়াচ্ছিলেন। কোথাও কোনও গোলমাল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুঘল হুমায়ুন সব হিসেব গোলমাল করে দিল। ঘুর পথে হঠাৎ ওই বেদবিদ্ধ নদী ধরে এসে চুনারগড় আক্রমণ করে বসল। সে আক্রমণ রুখে দেওয়ার ক্ষমতা চুনারগড়ের সেপাইদের ছিল না। তাই চুনারগড় বিলক্ষণ দখলে চলে গেল এই হুমায়ুন বেদবিদ্ধ টার। তবে খুব রক্ষে, হজরতের বেগম এবং পরিবারের আর সকলে গোপনপথে পালিয়ে এসে জান আর ইজ্জত দুই-ই বাঁচিয়েছে? কিন্তু জান বাঁচালে কী হবে, তারা সবাই নিরাশ্রয়। আপনাদের নীচে নৌকো আর বাজরায় দিন কাটাচ্ছে।'

'বটে!' শেরশাহর দেওয়ানের কথা শুনে সেই কুচ্‌কুচে কালো লোকটি হাসল, 'শুনেছি, চুনার দুর্গে রাশি রাশি হীরে, সোনা ছিল, সেগুলোর কী হল? সেগুলো কী হুমায়ুন মুঘলের দখলে চলে গেল নাকি? কী সর্বনাশ!'

মাথা চুলকিয়ে শেরশাহর দেওয়ান বলল, 'আজ্ঞে, ওই সোনা আর হীরের খবর ঠিক ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয়, সে সব খোয়া যায়নি। সম্ভবত সেগুলো বাঁচানো গেছে।'

মিশমিশে কালো লোকটি নিঃশব্দে খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর বললেন, 'তা হলেও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে শেরশাহের ওই বিশাল ধনসম্পদকে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে, তাই না?'

'আজ্ঞে, তাও দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারটা হজরতের কাছ থেকে না জেনে বলতে পারব না।'

'বেশ, জেনে আসুন। আপনাদের হজরতকে হয়ত একবার আসতে হবে আমাদের কাছে। তারপর পাকা কথা হবে।' এরপর মিশমিশে কালো লোকটা বললেন, 'আমি রোটাসগড়ের রাজা নই। তা রাজা না হলেও কাজকর্ম আমিই দেখি। আমার পরামর্শ ছাড়া রাজা কোনও কাজ-কর্ম করে না।'

'রাজা নয়,' তা হলে আপনি কে?'

'আমি হলাম গে রাজার মন্ত্রী। খাঁটি ব্রাহ্মণ। আমার নাম চুড়ামণি। তবে লোক আমাকে 'চোরামন' বলে ডাকে' এখন আপনি আসুন। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে। ইতিমধ্যে আপনাদের কথা রাজাকে আমি জানিয়ে রাখছি।'

শেরশা তখন বজরায় চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। খরস্রোতা নদীর যতই তাঁর মনের ভাবসাব উথাল-পাথাল।

দেওয়ান এসে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চোরামনের কথা তাঁর কাছে নিবেদন করল।

'চোরামন!' চোরামনের নাম শুনে লাফিয়ে উঠলেন শেরশা। তাঁর মুখের বিষণ্ণ ভাবটি মুহূর্তে কেটে গেল। বলল, 'চোরমনকে আমি চিনি। ভারি লোভী লোক। বাইরেটা কতখানি হতকুচ্ছিৎ, ভেতরটাও ঠিক ততখানি সেই। একে টাকা কবুল করে সব কাজই করানো যায়। তুমি একে অনায়াসে সোনা দিয়ে কিনতে পার। দরকার হলে কিছু সোনা দিয়েই একে কিনে নেওয়া যাবে। কেনা হয়ে গেলে ওই আমাদের দুর্গে ঠাঁই করে দেবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে একে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করো। সরাসরি যুদ্ধ করে যা পাওয়া যায় না, কৌশল জানলে তা অনায়াসে অধিকার করা যায়। রোটাসগড়ে গিয়ে আমাকে কৌশলের খেলা খেলতে হবে। ওকে জানিয়ে এসো। আমার বেগম মহলকেই ওরা আশ্রয় দিক। ওর আবার বেগম, তাঁর পরিচারিকা এবং বাঁদীদের ধরে সংখ্যার হিসেবে হাজার তিনেক হবে।'

'আজ্ঞে, চোরামন মন্ত্রীকে তা হলে সে কথাই বলব।'

'হ্যাঁ, কেবল বেগম মহল নয়, ওঁকে জানিয়ে দেবে বেগমদের সঙ্গে একশো মন সোনাও ওই দুর্গে রাখা হবে।'

দিন তিনেক বাদে সাহাজান নামে এক খাঁ সাহেব গিয়ে হাজির হল রোটাসগড়-দুর্গদ্বারে।

এবং যে বর্ণনা সে শুনেছিল, তাতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চোরামনকে চিনতে অসুবিধা হল না সাহাদুল খাঁয়ের— সে সেলাম বাজিয়ে বলল, 'হুজুর, আমি হজরত শেরশাহের কাছ থেকে আসছি।'

ছোট্ট, ছোট্ট, লাল চোখ বুলিয়ে নবাগতকে দেখে নিয়ে চোরামন বলল, 'নতুন লোক দেখছি। তা সেই লোকটা কোথায় গেল?'

'আজ্ঞে, সে লোকটা বিলকুল বেকুব। গুণীজনকে মান দিতে জানে না, একেবারে আহাম্মক। তাই তাকে ছুটি করে দিয়ে হজরত শেরশাহ আমাকে পাঠালেন।' কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী সাহাদুল চোরাপথে পায়ে নামিয়ে দিল ছোট্ট থলিতে ভরা খান কয়েক সুবর্ণ মুদ্রা।'

'এসব আবার কী?'

'আজ্ঞে, নজরানা। হুজুরদের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে নজরানা দিতে হয়, তা ওই বেল্লিক জানত না। কিন্তু আমি যে জানি। তাই এই থলিটা নিয়ে এসেছি। এবার হুজুরের কথা শোনাবার অপেক্ষা?'

মন্ত্রী চোরামন খরখরে গলায় বললেন, 'দেখুন ভেইয়া, আপনাদের হজরত শেরশাহ যা চেয়েছেন, তা সম্ভব নয়। এবং একথা আমার নয়। রাজার। রাজা শান্তিতে থাকতে চান। অকারণ বিবাদে জড়াতে চান না।'

'বিবাদ কিসের? হঠাৎ বিবাদের কথা আসে কোথা থেকে?'

মিশমিশে কালো মুখে হাসি দেখা গেল। 'বিবাদ আসে বই কি! ঘোরতর বিবাদ। আপনার হজরতের পরিবারকে যদি এই রোটাসগড়ে আশ্রয় দেওয়া হয়, তা হলে মুঘল হুমায়ুন আমাদের শত্রু বলে মনে করে যদি দুর্গ আক্রমণ করে, তখন কে বাঁচাবে শুনি? দেখুন, এই যুক্তি আমার নয়। রাজা মশাইয়ের।'

'তা রাজা মশাইকে আপনি বোঝাতে পারলেন না।'

'কী বোঝাব?'

'আমাদের কাজটা হবে একটু গোপনে। হুমায়ুন মুঘল জানবে কেমন করে!'

'জানবে না? খুব জানবে। চারদিকে গুপ্তচর। এ খবর গুপ্তচরেরা ঠিক গোপনে গোপনে পৌঁছে দেবে। আর তার পরেই রে রে করে হুমায়ুন মুঘল এসে আমাদের ওপর হামলা চালাবে। তখন ভারি হাঙ্গামার ভেতর পরে যাব আমরা। অকারণে আমরা জড়িয়ে যাব যুদ্ধে, তাই রাজামশাই কিছুতেই তোমাদের হজরতের অনুরোধ রাখতে পারবেন না।'

'তা হলে আমরা কী জলে জলে ভেসে বেড়াব? গোটা বেগম মহল এখন খোলা আশমানের নীচে নদীর জলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার ওপর আমাদের সঙ্গে রয়েছে রাশি রাশি হীরে-মুক্তো এবং মণ মণ সোনা। এসব হীরে-মুক্ত সোনা কী দস্যুদের হাতে চলে যাবে? দয়া করে একটু ভাবুন। আপনি ভাবলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে আমরা এক দুই মণ সোনা নজরানা দিতে রাজি আছি।'

'এক মণ সোনা দেবে?'

'জী। দয়া করে আপনি আমাদের দিকে একটু তাকান।'

সাহাদুলের গলায় আকুতি প্রকাশ পেল। গলা কাঁদো কাঁদো।

সাহাদুলের করুণ আকুতিতে মন ভিজল হয়তো। কিংবা সোনার প্রলোভনে মন্ত্রী চোরামন তাঁর যুক্তি-তর্ক পাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ভাবছি। রাজাকে বুঝিয়ে রাজি করতে চেষ্টা করছি। তবে আমাকে যে নজরানা তোমরা দেবে, তা ওই এক মণ হলে হবে না, পরিমাণ বাড়াতে হবে।'

'আজ্ঞে, তা বাড়ানো যাবে। হজরতের কাছে অনেক সোনা আছে। তা আপনার কত চাই বলুন।'

মাথায় বার কয়েক টোকা মেরে এবং ফুরফুরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে চোরামন বললেন, 'জী, এক মণে হবে না, আরও পাঁচ লাগবে।'

'মোট ছয় মণ?'

'হ্যাঁ।'

'হুজুর, আপনাকে আমরা ওই ছয় মণ সোনাই দেব। তাহলে বেগমদের কখন নিয়ে আসব বলুন।'

'আগামী কালই আসা হোক, কোনও অসুবিধা হবে না।'

সাহাদুল বলল, 'আমাদের বেগম মহলে বিবিদের সংখ্যা অনেক। তা প্রায় দু হাজার বা তিন হাজার হবে। আর সঙ্গে করে আনব বড় বড় পেটিকা। সব সোনা ভরা। ঠিক-ঠাক জায়গা হবে তো?'

'হবে। কোনও অসুবিধা হবে না তবে আমার হিস্যাটা আগে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

সাহাদুল মাথা চুলকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'সে আর বলতে?'

শেরশাহ যা পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ঠিক ঠিক ভাবে হয়ে গেল। যুদ্ধ জয়ের থেকেও এটি হল আরও বেশি সফলতম জয়। এবং এই জয়ের জন্য একটি বরশা বা একটি সোনাও খরচ করতে হল না।

পরের দিন রোটাস দুর্গে নদী পথে তিন হাজার বিবিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এর ভেতর কে বেগম এবং কে কে তাঁদের পরিচারিকা তা বোঝা গেল না। রং মহলের বিবিরাও বোধহয় ঢুকে গেল। সকলেই কালো বোরখা পরিহিত।

বোরখা পরা বিবি-বেগমদের সঙ্গে বড় বড় পেটিকাও ঢুকল। পেটিকাগুলির ভেতর কী আছে, তা বোঝা খুবই দুঃসাধ্য। কেবল, কতগুলিই মোটা কাঠ দিয়ে সাঁটা। চোরামন মন্ত্রীর মনে হল, এর ভেতর নিশ্চয় সোনাদানা আছে, তাই এই ভাবে সুরক্ষিত।

তবে এই সব কিছু ঢোকাবার আগে, চোরামন নিজের প্রাপ্যটি বুঝে নিলেন। এবং সেই সোনা নিজের মুলুকে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজাকে বোঝানো হল, সব কিছুই নির্বিঘ্নে মিটে গেছে।

রাজামশাই বললেন, 'ভালো। খুব ভালো। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া হল বিশেষ এক রাজধর্ম।'

কিন্তু রাজধর্ম পালন করতে গিয়ে কী ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে, তা পরের দিন মাঝরাতেই বোঝা গেল। দুর্গের ভেতর হঠাৎ জ্বলে উঠল কয়েক হাজার মশাল। বোরখার খোলস বের হয়ে এল কয়েক হাজার সৈনিক। এবং সবই খাঁ সেনা। ফাটতে থাকল তোপ। রোটাস দুর্গে যে সব পাহারাদার রাত পাহারায় ছিল তারা সকলেই খুন হল। ওদিকে দুর্গের ভেতর রাজার যেসব সৈন্য ছিল, তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই খতম হয়ে গেল। বেদখল হয়ে গেল রোটাসের অস্ত্রাগার, তোপখানা এবং সেই সঙ্গে হাতীশালা এবং অশ্বশালা পর্যন্ত।

শান্তির রোটাসগড় ভেসে গেল রক্তে। শেরশা কৌশল করে এবং কুটবুদ্ধি খাটিয়ে রোটাসগড়ের মতো বড় একটি দুর্গ আর মহল দখল করে ফেললেন। এবং দুর্গ দখলের পর যা যা হয়ে থাকে তাই তাই হতে থাকল বিনা বাধায়।

কচুকাটা করা হল দুর্গের রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে রাজার পরিচারকদের। রাজাকে অবশ্য খুন করা হল না। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিবিড় এক জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হল। রাজপুত রমণীদের ধরে নিয়ে গিয়ে শাহী হারেমে আটক করা হল। দুর্গের ভেতর রাজার যে বিশাল ধনভাণ্ডার ছিল, তা দখল করে নেওয়া হল। কিন্তু মজার ব্যাপার, মন্ত্রী চোরামনের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না তাঁর ছয় মণ সোনার খোঁজও। বিপদের আশঙ্কা করে তিনি আগেই চম্পট দিয়েছেন। এবং চম্পট দেওয়ার সময় নিতে ভোলেন নি ওই ছয় মণ সোনা।

শেরশাহর এইভাবে রোটাসগড় দখলের খবর চারদিকে বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি কী ভাবে এবং কতখানি বিশ্বাসঘাকতা করে থাকেন, তা আটখানা হয়ে প্রচারিত হতে থাকল। এই প্রচারে তাঁর অখ্যাতি যেমন বাড়তে থাকল এবং দিনে দিনে ছড়াতে থাকল আতঙ্ক। কেল্লাদার রাজপুতরা বুঝে গেলেন শেরশাহের ওপর আর কোনও রকমে আস্থা রাখা যাবে না। রাখা যাবে না ভরসা। ভরসা রাখলে ঠকতে হবে, মরতে হবে।

শেরশাহের এই বিশ্বাসঘাতকতার খবর যথা সময়ে এসে পৌঁছে গেল মহারানী দুর্গাবতীর কাছে। রানী শুনলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। অধর কায়স্থ চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। তিনি দৌড়লেন মহাদুর্গার মন্দিরে। জঙ্গলগড়ে। আচার্য অনন্তদেবের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। অনন্তদেব জানালেন, 'যা যা হচ্ছে, তা ভয়ের ব্যাপারই বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভয়ের কোনও কারণই নেই। এক ভয়ঙ্কর অশুভ যোগাযোগে শেরশাহর শেষপর্যন্ত মৃত্যু নিশ্চিত।'

'কিন্তু তা কবে? আমাদের শেষ হয়ে যাওয়ার পর?'

আচার্য অনন্তদেব হাসলেন। 'এখনই কিছু দেখছি না, যাতে শেষ হয়ে যাবে সব কিছু। আপনি গড়ে ফিরে যান।'

রানী দুর্গাবতী নিঃশব্দে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে নেমে পড়লেন। তিনি অকুতোভয়।

রানী দুর্গাবতীর মতন আরেক রাজপুত রাজা এই রকম ভাবে আতঙ্কিত না হয়ে নিজের বাহুবলে নিজেকে সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি হলেন রাজপুত রাজা প্রতাপ শাহ। রাজা ভূপৎ-এর পুত্র। প্রতাপ ছিলেন বয়সে তরুণ। তবে তরুণ হলেও তিনি ছিলেন খুবই সাহসী এবং তেজস্বী। এই তরুণ রাজার অভিভাবক ছিলেন পুরানমল। রাইসিস দুর্গ এবং সংলগ্ন রাজ্যের দখল এক সময় ছিল রাজার। কিন্তু আফগানদের অত্যাচারে এক সময় তার অনেকটাই বেদখল হয়ে যায়। এই বেদখল জায়গা

পুরানমল উদ্ধার করে রাজপুত আভিজাত্য এবং আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এই উদ্ধার কার্যটি পুরানমল করেন নিজের বাহুবলে। এরপর থেকে অনেকেই তাঁকে রাজার মতো সম্মান করতে লাগলেন। এই বেদখল জায়গা উদ্ধার করে রাজপুত আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই উদ্ধার কার্যটির জন্য পুরানমলকে সকলে তাই 'রাজা' বলেই সম্বোধন করত। চৌহান রাজপুত হিসাবে তাঁর শৌর্য ও খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তা এক সময় ইতিউতি শেরশা এসে হাজির হলেন মালব রাজ্যে। মালবের সুলতান সুজায়াত খাঁ তখন স্বাধীন সুলতানের মতো তখ্‌তে অধিষ্ঠিত। সুজায়াতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজাদের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। পুরানমলের সঙ্গেও ছিল অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাঠান-আফগান ঘাতকদের হারিয়ে পুরানমল যখন রাইসিস সংলগ্ন চান্দেরী জয় করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করলেন তখন সুলতান সুজায়াত তাতে কোনও বাধা দেন নি। বরং প্রসন্ন সম্মতি দিয়েছিলেন। তাই দু'দলের দোস্তি ছিল অটুট।

শেরশা মালব রাজ্যে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান সুজায়াত কোনও বিবাদ না বাধিয়ে তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে নামলেন না। সুখ ও শান্তির জন্য মেনে নিলেন শেরশাহের অধীনতা। বলাবাহুল্য শেরশাহ তাতে খুশিই হলেন। এবং তিনি চাইলেন তাঁর আধিপত্য ও আনুগত্যের ছায়ার তলায় এই রকম আরও সব ছোট ছোট রাজ্যগুলি নিজের নিজের ছোট ছোট স্বাধীনতা বজায় নিয়ে থাকুক, তাদের তিনি কোনও ভাবেই বিরক্ত করবেন না।

এই যুক্তিতে একদিন শেরশাহ তাঁর নতুন মিত্র সুলতান সুজায়াতের কাছে রাইসিস দুর্গ এবং চান্দেরী রাজ্যের রাজাকে তলব পাঠাতে চাইলেন। 'হ্যাঁ, আমি সকলের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক নিয়ে থাকতে চাই। সেই হিসাবে রাইসিসের 'রাজা'কে ডাকা হোক। জানিনা, কে এখানকার রাজা।'

সুজায়াত জানালেন, 'এখানে একজন রাজা আছেন বটে। কিন্তু সেই রাজার বকলমে রাজ্য চালান পুরানমল। তিনিই রাজা। ওঁকে ডেকে পাঠালেই আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে।'

শেরশাহর কাছেই ছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা রাজপুত রাজারাম। তাঁকে হুকুম করা হল, 'ভাইয়া পুরানমলের কাছে আপনি যান। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

তা শেরশাহর হুকুমে রাজপুত রাজারাম গেলেন রাইসিস দুর্গে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন একা একা।

'কী হল, একা কেন? পুরানমল এলেন না?'

'আজ্ঞে, তিনি আসতে ইচ্ছুক। তবে আমার ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। তিনি সুলতান সুজায়াতের সঙ্গে এখানে আসতে চাইছেন।'

রাজার এই কথায় মৃদু মৃদু হাসতে থাকলেন শেরশা। বললেন, 'যান সুলতান সুজায়াত সাহেব, আপনার ওপর পুরানমলের অগাধ বিশ্বাস। আপনিই তাঁকে সঙ্গে করে আনুন।

বলবেন, ভয়ের কিছু নেই। ফরিদ খাঁ বাঘ মেরে 'শের' হয়েছে। আসলে এই শের কিন্তু নরখাদক বাঘ নয়। এ বাঘ নরপালক। সকলের সঙ্গে দোস্তি চায়। শান্তি চায়।'

শেরশাহের অনুরোধে রাইসিস দুর্গে এসে হাজির হলেন সুলতান সুজায়াত। শেরশাহের কী প্রস্তাব জানিয়ে পুরানমলকে তিনি শেরশাহর সেনা ছাউনিতে আনতে চাইলেন। কিন্তু শেরশাহর নামে যে আতঙ্ক, সে আতঙ্কে পুরানমলের স্ত্রী রানী রত্নাবতী পথ আগলে দাঁড়িয়ে স্বামীকে জানালেন, 'আপনার যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'ওই পাঠান দস্যুকে আমি বিশ্বাস করিনা।'

'শেরশাহ এখন দস্যু নয়, তিনি এক সুলতান।'

'হতে পারেন সুলতান। কিন্তু তিনি যা বলেন, তাতে ভরসা রাখা যায় না। তিনি আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যে খুন করবেন না, এ ভরসা কে দেবে?'

পুরানমল হেসে বললেন, এখনই ভয়ের কিছু দেখছি না মহারানী। আমি শেরশাহর সঙ্গে দেখা করে এখনই ফিরে আসব।

'ঠিক বলছ, তমি এখনই ফিরে আসবে?'

'হ্যাঁ, এখনই ফিরে আসব, কথা দিচ্ছি।'

রানী বললেন, 'বেশ, তোমার অপেক্ষায় আমি বসে রইলাম। তুমি এলে আমি আহার গ্রহণ করব। না এলে আমি সারাদিন না খেয়ে থাকব।'

'ঠিক আছে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি, ফিরে আসছি। সঙ্গে করে আবার ভাই চর্তুভুজকে নিয়ে চলেছি। আর সঙ্গে করে গোপনে নিয়ে যাচ্ছি একটি ছুরি। কোমরে বাঁধা ছুরিটিকে পরানমল দেখালেন রানী রত্নাবতীকে।

পুরানমল বাইরে সাহসের কথা বললেন, ভেতরে ভেতরে তিনি গভীর শঙ্কা নিয়ে, এসে পৌঁছুলেন সেনা ছাউনিতে। কিন্তু সেনা ছাউনিতে আসার পর তাঁর সব আশঙ্কা মুহূর্তে উবে গেল। শেরশাহের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তিনি অভিভূত না হয়ে পারলেন না।

পুরানমলকে আবেগ ভরে শেরশা জড়িয়ে ধরলেন বুকে। জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনারা যেমন স্বাধীনভাবে আছেন, ঠিক সেই ভাবেই থাকুন। কোনও বিবাদ বিসংবাদ নয়। আমি আপনাদের দোস্তি চাই। আমার শত্রুতা আপনাদের সঙ্গে নয়। মুঘল হুমায়ুনই হল আমার পহেলা দুশমন। এই দুশমনকে খতম করতে পারলেই, হিন্দুস্থানের তখ্‌ত আমার হবে। আমি এখন এই দুশমনের মোকাবিলা করতেই ব্যস্ত। আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।'

হিন্দুস্থানের হবু সুলতানের মুখে এসব কথা শুনে কে না অভিভূত হয়?

পুরানমল অভিভূত হলেন।

তা কেবল কথা নয়, শেরশাহ এরপর সম্মানিত করলেন পুরানমলকে দোস্ত হিসেবে। তিনি একপ্রস্থ পরিচ্ছদ উপহার দিলেন। আর দিলেন একটি আরবি ঘোড়া। এমন তেজী ঘোড়া হিন্দুস্থানে তখন দুর্লভ।

'এবার আপনি আসতে পারেন।' শেরশাহ হাসি হাসি মুখে বিদায় জানালেন, 'আমাদের এ দোস্তি চিরকাল টিকে থাকুক এটাই অগ্রজের কাছে প্রার্থনা। তবে আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রার্থনা আছে।'

'আমার কাছে?' পুরানমল শেরশাহের এই ভাষা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'আপনি আমার কাছে ঠিক কী চাইছেন, তা বুঝতে পারছি না।'

শেরশাহ হেসে বললেন, 'আপনার ভেইয়া চতুর্ভুজকে যদি আমার কাছে রাখি, তা হলে কী আপনার কোনও অসুবিধা হবে।'

পুরানমল হেসে জবাব দিলেন, 'তা চতুর্ভুজ যদি সুলতান শেরশাহের সঙ্গ পছন্দ করে, তা হলে আমার আপত্তি থাকবে কেন? আপনি তাকে যুদ্ধ বিদ্যা বা রাজ্যশাসন ইত্যাদি শেখান, তাতে আমি ভারি খুশি হবো।'

এই ঘটনার পর ভয়ের মেঘটা কেটে গেল। কয়েকদিনের জন্য ঝকঝকে রোদ্দুর দেখা গেল রাইসিসের দুর্গ শিখরে। রাইসিসের অদূরে যে বিশাল সেনা ছাউনি ফেলেছিলেন শেরশাহ, তা গুটিয়ে নিয়ে আগ্রার পথে পাড়ি দিলেন তিনি। তিনি প্রসন্নমনেই ফিরছিলেন। কিন্তু গোল বাঁধল তাঁর পথের ওপরে।

কয়েক ক্রোশ পরেই একটি জনপদ। সেই জনপদ থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন আফগান পাঠান তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। অবিরাম চিৎকার করতে করতে তারা নালিশ জানাতে থাকল।

ওরা যে ঠিক কী বলতে চায়, তা প্রথমে ঠাহর করতে পারলেন না শেরশাহ।

তাদের কলরবের ওপর গলা চড়িয়ে শেরশাহ বললেন, 'কী চাও তোমরা? কেন এভাবে পথ আটকে দাঁড়াচ্ছ?'

'হজরত। আমাদের ফরিয়াদ আছে।'

'ফরিয়াদ? মানে অভিযোগ। নালিশ? বিচার চাই?'

'জী, বিচার চাই।'

'কোন অপরাধের বিচার? কে অপরাধী?'

'আপনি যাঁর সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে এলেন, ওই পুরানমলের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ।'

'অভিযোগ? কিসের অভিযোগ?'

'ওই কাফের আমাদের ইজ্জৎ নিয়ে নিয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের টাকাকড়ি। আমাদের সুন্দরী বিবিদের ধরে নিয়ে গিয়ে রাইসিস গড়ের হারেমে ঢুকিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে অপমান করেছে। হেনস্থা করেছে। ওই কাফেরের চরম শাস্তি চাই।'

পুরানমলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি শুনে বিচলিত হলেন শেরশাহ।

'প্রমাণ আছে?'

'আছে জনাব। বোরখা খুলে এসে আমাদের বিবিরাই এর প্রমাণ দেখিয়ে যাবে।'

এরপর দলবেঁধে এলেন বিবিরা। তাঁরা জানালেন কী ভাবে তাঁরা লজ্জিত হয়েছেন। জানালেন 'তাঁদের পরিবারের সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে রাইসিস ঘরের মজলিশে কীভাবে 'নাচনী' করা হয়েছে। তারা এখন বাইজীর জীবন যাপন করছে।' এবং তাদেরও মূল বক্তব্য হল, কেল্লাদার পুরানমলের শাস্তি চাই। শাস্তির দাবি করে তারা আচ্ছন্ন হয়ে কাঁদতে থাকে।

এ ধরনের অভিযোগ শুনে কোন মুসলমানের না রক্ত গরম হয়? বিবিদের কান্না এবং চোখের জল শেরশাহের মনে চাগিয়ে তুলল মুসলমানি অভিমান এবং তার থেকেও বড় হয়ে দেখা দিল নিজের আধিপত্য বিস্তারের লোভ। দুর্গ জয়ের খিদে। তিনি ভুলে গেলেন, সবে তিনি দোস্তি পাতিয়ে এসেছেন কেল্লাদার পুরানমলের সঙ্গে।

সেনাদের নিয়ে পিছু ফিরলেন শেরশাহ। এবং তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন রাইসিস দুর্গ। তার পর চলল কামান দাগা।

শেরশাহের এই আচরণে রাজপুত পুরানমল বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না। ইতিপূর্বে তিনি যা করলেন, তাতে তাঁকে কোনও সময়েই বিশ্বাসযোগ্য বলে ঘর করা যায় না। সুতরাং আগে থাকতে তৈরি হয়েছিলেন তিনি। দুর্গটিকে তিনি দুর্ভেদ্য করেই রেখেছিলেন।

ওই দুর্ভেদ্য দুর্গকে বাগে আনতে শেরশাহের বেশ কষ্ট হতে থাকল। দিনের পর দিন গড়িয়ে গেল। গড়িয়ে গেল মাসের পর মাস।

এইভাবে দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় ছয়মাস। দিনের পর দিন তিনি রাইসিস কেল্লার পাথরের প্রাচীরে ফাটল ধরাবার চেষ্টা চালিয়ে যান।

তা কেবল বাইরের যুদ্ধ নয়, গুপ্তচর পাঠিয়ে ভেতরের শত্রুদের কাহিল করতে লেগে গেলেন শেরশাহ। এবং এ ব্যাপারে তিনি দুর্গাধিপতি রাজপুত রাজার এক ভাইপোকে পেয়ে গেলেন। ভেতরে ভেতরে এবং গোপনে গোপনে একটি চুক্তি হয়ে গেল।

রাজার ভাইপো জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই দুর্গ যদি আপনার হাতে তুলে দেওয়া হয়, তা হলে আমি কী পাব?'

'নগদ একলাখ সোনার টাকা আপনাকে দেওয়া হবে। আর আপনাকে এই জয় করা দুর্গের মালিক করে দেওয়া হবে।'

'এই চুক্তির কোনও খেলাপ হবে না তো?'

'না।'

এদিকে নিরন্তর কামানের গোলাদাগার পরে দুর্গ প্রাকারে একটু একটু ফাটল দেখা গেল। এবং তা ছয়মাস অবরোধের পরে।'

পুরানমলকে রাজার ভাইপোটি ভয় দেখায়, 'এবার দুর্গের প্রাকার ভেঙে পড়বে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

রাজার ভাইপো গম্ভীর গলায় বলল, 'আমাদের কিন্তু মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান শেরশাহের সঙ্গে একটা আপোস করা দরকার।'

কয়েকদিন ধরে কথা কাটাকাটি এবং আবেগ বিতর্কের পর পুরানমল বাধ্য হলেন 'আপোসে'র বার্তা পাঠানোয়।

শেরশাহ জানালেন, 'আপোস হতে কোনও বাধা নেই, তবে শর্ত আছে। শর্ত মানলে আপোস হবে।'

দুর্গ থেকে জিজ্ঞাসা করে পাঠানো হল, 'কী সে শর্ত?'

'চান্দেরী রাজ্য বিজয়ের সময় যেসব মুসলমান বিবি এবং মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে আটক রাখা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সেনাপতিরা দুর্গের ভেতরে গিয়ে পরখ করবে। কোনও বাধা দেওয়া চলবে না। এবং এই কাজ করার সময় পুরানমলকে পরিবার পরিজন সকলকে নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসে সুলতানের ছাউনিতে থাকতে হবে। মুসলমানদের এইভাবে হেনস্থা করার জন্য কেল্লাদার পুরানমলকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

দুর্গ থেকে জানানো হল, সুলতান শর্ত দিয়েছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। কিন্তু সুলতানের সেনা ছাউনিতে পুরানমল এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনকে যে কোনও ক্ষতি হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?'

'এই নিরাপত্তা স্বয়ং সুলতানই দিচ্ছেন।' শেরশাহ সে কথা স্পষ্টভাবে জানালেন। এবং পুরানমলের দূতের সামনে কোরাণ ছুঁয়ে শেরশাহ জানালেন, 'এটা হল মুসলমানি কসম। এর কোনও অন্যথা মুসলমানরা করে না।'

এই সব কথা চালাচালির পর দুজনের ভেতর আর কোনও সংশয় বা সন্দেহ রইল না।

পুরানমল খুশি হয়ে সুলতানকে চল্লিশ লাখ টাকা নগদ উপঢৌকন পাঠালেন। পাঠালেন তিনটি হাতী।

পরের দিন সপরিবারে এবং ছেলেপুলেদের সঙ্গে নিয়ে রাজা প্রতাপ শাহ এবং পুরানমল যে উঠলেন শেরশাহের ছাউনিতে। বাহ্যিক অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি রইল না।

কিন্তু আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেল।

শেরশাহের অনুচর ছিলেন হেইবাত খাঁ। তার সঙ্গে চোখে চোখে সুলতানের কী রকম যেন ইশারা হয়ে গেল।

হেইবাত খাঁ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজা প্রতাপশাহ এবং পুরানমলের ওপর। ঝকঝক করে উঠল শানিত তরবারি। পুরানমল চেষ্টা করলেন প্রতিহত করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করা গেল না। সকলকেই মরতে হল।

কোরাণ শরিফ ছোঁয়া প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল নদীতে। ভেসে গেল রাজার ভাইপোকে রাজা করার প্রস্তাবটিও।

পুরানমলের এক কন্যা এবং তাঁর দাদার তিন ছেলে কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেল।

তা প্রাণে বেঁচে গেলেও অবক্ষয়ের হাত থেকে কেউই রেহাই পেল না। ওই জীবিত তিন ছেলেকে খোঁজ করা হল এবং ওই তিনজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হল।

রাজপুত পুরানমলের জীবিত কন্যাটিকে বাঈজী করা হল। একেবারে বাজারে 'বাঈজী'। তার ওপর হুকুম করা হল, সে যেন বাজারে বাজারে ঘুরে নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। আর এই তিন ছেলেকে খোজা করা হল কেন? সুলতান জানালেন, 'তারা যেন বংশ বিস্তার করতে না পারে, তার জন্যই খোজা করা? পুরানমলের বংশধর যাতে কোনওভাবেই দুনিয়াতে না থাকে, সেইজন্য এই কঠোর ব্যবস্থা।

এইসব কাণ্ড করবার পর শেরশাহ আগ্রার পথে পাড়ি দিলেন।

তা শেরশাহ বিজয়গর্বে গর্বিত হয়ে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর কুকর্মের নিন্দায় মুলুক ভরে গেল। এবং রাজপুত রাজারা, যে যেখানে ছিলেন তারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

।। ছয় ।।

কালিঞ্জর দুর্গের প্রাকারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলেন কেল্লাধিপতি কিরাত সিংহ।

পশ্চিম দিগন্তে অনেকখানি ঢলে পড়েছে সূর্য। আকাশে খণ্ড ছিন্ন মেঘ। সেই মেঘের ওপর অস্তগামী সূর্যের আলো গিয়ে পড়েছে। চোখের ওপর এক সোনালি আভা। সেই আভা ধীরে ধীরে লালচে হয়ে উঠল। আরও পরে রং রাঙা।

পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে পুরো ডুবে যাওয়ার আগে আকাশের মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ল রক্ত আর রক্ত। কী ভয়ানকই না দেখতে হয়ে গেল আকাশ। কী করুণ। অপরাহ্নের আকাশে যে সব পাখিরা উড়ছিল, তারা আকাশের ওই চেহারা দেখে অতিদ্রুত তাদের বাসায় ফিরতে থাকল। দুর্গ প্রাকারের নীচে যেসব গাছ-গাছালি ছিল, তাদের ওপর নেমে এল অন্ধকারের যবনিকা। কিছুদূরে যে পাহাড়টা দেখা যায়, সেই পাহাড়টিও কালো বোরখা পরে আত্মগোপন করল।

কিরাত সিংহ দুর্বল মানুষ নয়। ভীতু নন। মহলে তাঁর মন টানে না। এই ধরনের সূর্যাস্ত এর আগে বহু বার দেখেছেন। কিন্তু আজ তাঁর সারা শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। তাঁর মেয়ের জন্য মনটা কেমন যেন উতলা হয়ে উঠল। আকাশটি পুরোপুরি অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার পর নিজের কক্ষে ধীর পদে ফিরে এলেন কিরাত সিংহ।

একটু আগেই তাঁর কক্ষে চেরাগ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে নফর দিলদার।

শয্যার পাশে রাখা রয়েছে কয়েকটা তুলট কাগজ। মস্যাধার। এবং একটি খাগের কলম।

চেরাগের আলোয় হঠাৎ কিরাত সিংহ একটি তুলট কাগজ টেনে নিয়ে এবং মস্যাধারে খাগের কলম ডুবিয়ে একটি পত্র লিখতে বসে গেলেন কন্যা দুর্গাবতীকে। হ্যাঁ, কন্যা দুর্গাবতীর জন্য তাঁর মন উতলা।

'হঠাৎ আজ তোর কথা মনে পড়ছে। খুব বেশি মনে পড়ছে। কেন যে তোর জন্য মনটা এভাবে কাতর হচ্ছে, তা জানি না। আজ প্রাকারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। দেখলাম, গোটা আকাশটাকে রক্তে রাঙিয়ে এবং আমাদের এই পৃথিবীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য হুস করে আকাশের গর্ভেই হারিয়ে গেল। আমার মনে হতে থাকল, আমাদের গৌরব সূর্য এই ভাবেই গোটা হিন্দুস্থানকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ডুবতে চলেছে। হিন্দুস্থানে এখন যবনদেরই জয় জয়কার। যবনরা নিষ্ঠুর, আচার ভ্রষ্ট। তারা ন্যায়-নীতির পরোয়া করে না। তারা হিন্দুস্থানের সকল মানুষকেই কাফের বলে মনে করে। তাদের না আছে আভিজাত্য, না বংশ মর্যাদা। জায়গীরদার হাসান মিঞার ছেলে রাতারাতি হতে চলেছে হিন্দুস্থানের সুলতান। হিন্দুস্থানের কপালে অশেষ দুর্গতি, নইলে এমন হয়! এই যবনরা নিজেদের ধর্মশাস্ত্র 'কোরাণ'কেও মানে না। এতদূর তারা নীচ। কোরাণ ছুঁয়ে শপথ নেয়, কিন্তু সে শপথ তারা রক্ষা করে না।

তা রোটাসগড় এবং রাইসিস দুর্গ কীভাবে দখল করেছে ওই ফরিদ খাঁ শের খাঁ, তার বিবরণ তুই নিশ্চয় পেয়ে গেছিস। কেবল দুর্গ দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি ওই শের খাঁ, সে এই কেল্লাদারদের কী নির্মম ভাবে হত্যা করেছে, তা ভাবতে গেলে আমাদের রাজপুত রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই গরম হওয়াই সার, আমাদের করার কিছু নেই। আমরা অসহায় কাপুরুষে পরিণত হয়েছি। আমাদের ভেতর কোনও ঐক্য নেই। সহানুভূতি নেই।

এবার হয়তো আমার পালা। কালিঞ্জর দুর্গের ওপর অনেকদিন ধরেই যবনদের নজর রয়েছে। তা মুঘল হুমায়ুনকে মণ মণ সোনা কবুল করে ঠেকানো গেছে বটে, কিন্তু ওই হাসান মিঞার বেতমিজ ছেলেটাকে এখন ঠেকাই কী করে? তবে আমি ঠিক করেছি, ওই শয়তানটার ছলনায় আমি ভুলছি না। আমি যুদ্ধ করব। আমি রাজপুত। যুদ্ধকে ভয় পাই না। এবং সম্ভব হলে আমি মরবার আগে তাকে খতম করে মরব। রাজপুত রক্তের মর্যাদা আমি রক্ষা করতে চাই।

যা, তুই হয়তো ভাবছিস, আমি অমূলক চিন্তা করছি। শের খাঁর নজর এখন দিল্লি-আগ্রার দিকে। সে হঠাৎ এদিকে আসতে যাবে কেন? আর এলেই, কালিঞ্জরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, একথা ভাবছি কেন?

এই ধরনের যুক্তি আমার মনে কদিন আগে ছিল। কিন্তু ক'দিন ধরে দেখছি, ওই যুক্তি আর খাটছে না।

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। ইদানীং দুটি ছলের সূত্র ওই শের খাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। তার কাছে ছল বা অজুহাত হতে

পারে, এমন দুটি ঘটনা তোকে জানাই।

কিছুদিন আগে উদয়পুরের দুর্জয় সিংহের কন্যা আমার এই দুর্গে পাশের রাজ্য থেকে আসছিল। কন্যাটি অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু বিবাহিতা। তার শরীরে যেন যৌবন উপচে পড়ছে। উপচে পড়ছে যৌবনশ্রীও। তার সঙ্গে তার একটি ভগিনীও ছিল। একদল প্রহরী ও রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ওরা আসছিল একটি তাঞ্জামে চড়ে। নিজেদের লুকোবার জন্য ওরা পরেছিল কালো বোরখা। এই দুর্গে আসার কারণ হল, দুর্জয় সিংহের মেয়েরা আগ্রা থেকে আগে পালিয়ে এসে আমার কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল। পাশের রাজ্য থেকে আমার এই দুর্গ খুব একটা দূর নয়। কিন্তু এদিকে আসবার পথটি দুর্গম। কোথাও জঙ্গল। কোথাও রুক্ষ প্রান্তর। পথের মাঝে কোথাও কোনও জনবসতি নেই। তাই পথটি নিরাপদ। তবে এই নির্জনতা আবার ভয়েরও কারণ। শেষপর্যন্ত ভয়টাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্জয় সিংহের কন্যাদের তাঞ্জামে। একদল ডাকাত হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঘিরে ফেলল তাঞ্জাম। তাঞ্জাম বাহক কাহারদের তারা মেরে তাড়াল এবং পাহারাদের রক্ষীদের ভেতর কয়েকজনকে খুন করে বসল। কন্যাদের গায়ে যেসব গহনা ছিল, তা মুহূর্তে লুঠ হয়ে গেল। শেষে এই ডাকাত দল কন্যাগুলিকেও লুঠ করতে উদ্যোগী হল। কিন্তু গায়ে বোরখা থাকায় তারা মুসলমান মেয়ে ভেবে শেষমেশ পিছিয়ে গেল। তারা ওই নির্জন প্রান্তরে মেয়ে দুটিকে ফেলে রেখে চম্পট দিল।

মেয়ে দুটি যখন নির্জন প্রান্তরে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইছে, তখন হঠাৎ শের খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল তার সেনাদের নিয়ে। আজমেঢ়, যোধপুর, আবুপাহাড় এবং চিতোর জয় করে এই পথ দিয়ে শের খাঁ তখন চলেছিল বাংলা মুলুকে। পথে বোরখা পরা দুটি মেয়েকে অসহায় অবস্থায় দেখে তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হল। দুর্জয় সিংহের কন্যারা বুদ্ধিমতী। শের খাঁর কাছে তারা তাদের যথার্থ পরিচয় না দিয়ে, পরিচয় দিল কালিঞ্জর কেল্লার পরিচারিকা বলে। ত পরিচারিকা বলে নিজেদের পরিচয় গোপন করলেও, শের খাঁর চোখকে তারা পুরোপুরি কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না। শের খাঁ তাদের নিরাপদে কালিঞ্জরের কেল্লায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন, কিন্তু রাজপুত যুবতীদের রূপের মোহ তাঁর মগজের ভেতর চেপে বসে গেল। দুর্জয় সিংহের কন্যার জন্য শেরশাহ নাকি এখন পাগল। অন্তরঙ্গ মহলে এখন বলে বেড়াচ্ছে, ওই কন্যাকে তাঁর চাই-ই চাই। ওই কন্যাকে পাওয়ার জন্য যদি কালিঞ্জর কেল্লা আক্রমণ করতে হয়, তাও তিনি করবেন। দুর্জনের যে ছলের অভাব হয় না, এটি তার পহেলা দৃষ্টান্ত।

এ ছাড়া দ্বিতীয় একটা অজুহাতও খাঁ সাহেবের কাছে রয়েছে।

খাঁ সাহেব গোটা রাজস্থানকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তাঁবে এনেছেন বটে, কিন্তু রেওয়ার রাজা বীরভান বা খেলাকে অনেক চেষ্টা করেও পাকড়াও করতে পারেননি। বীরভান হলেন একজন সাহসী রাজপুত। শের খাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিনি কচুকাটা করেছেন। তা হাজার কয়েক সৈন্যকে তিনি হত্যা করে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন খাঁ সাহেবকে। রেওয়া রাজ্য খাঁ সাহেবের হস্তগত হলেও, বীরভান বাঘেলার কেশাগ্র তিনি আজও স্পর্শ করতে পারেন নি। এই বীরভান এখন আমার কেল্লায়। তাঁকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। বলা বাহুল্য, বীরভানকে আশ্রয় দেওয়ার বিলক্ষণ চটে গেছেন শের খাঁ। এই অজুহাতে খাঁ সাহেব কালিঞ্জর কেল্লা আক্রমণ করবেন বলে পছন্দ করেছেন। এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

আমিও এখন সেই ভয়ঙ্কর সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছি। কী জানি, কখন কী ঘটে।

ইতিমধ্যে আমি কিছু কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই কিছু ব্যবস্থার ভেতর একটি হল, দুর্জয় সিংহের অবিবাহিত কন্যাটিকে তোর কাছে, তোর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়া। এবং দু-চার দিনের ভেতরেই সে তোর কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। আগেই বলেছি, দুর্জয় সিংহের প্রথমা কন্যা অসাধারণ সুন্দরী। এই কনিষ্ঠাটিও তার থেকে কোনও অংশে কম নয়। আমার ইচ্ছা, এই কন্যাটিকে তোর ছেলে বীরকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। এটিকে তোর কাছে তোর ছেলের 'বাগদত্তা' হিসেবে রাখ।

আমাদের অনেক কথা তোকে লিখে জানাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে রাত বাড়ছে। চিঠিখানি তো বেশ বড় হয়ে গেল। যে চেরাগের আলোতে লিখছি, তা পুড়ে পুড়ে অর্ধেক হয়ে গেল। আজ অপরাহ্ন বেলায়, সূর্যাস্তের সময় যে রক্ত মেঘের সমারোহ দেখলাম, তা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

বুঝতে পারছি, রক্ত দিয়েই হিন্দুস্থানের গৌরব বাঁচাতে হবে। তোর 'গান্ডোয়ানা' রাজ্যের সামনে এখনই কোনও ভয় দেখছি না। শের খাঁর নজর এখন ওদিকে নেই।

আমার দিন বোধহয় ফুরিয়ে আসছে। এটিই সম্ভবত তোর কাছে শেষ চিঠি।

তোরা সুখে থাক। তোরা দীর্ঘজীবী হ। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন। ইতি আশীর্বাদক বাবা।'

গোপন পথ দিয়ে এই চিঠি এবং কমলাবতী সহ দুর্জয় সিংহের কনিষ্ঠা কন্যাকে চৌরাগড় দুর্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল কিরাত সিংহের অনুচরেরা। দুর্জয় সিংহের মেয়েটির বয়স বেশি নয়। তবে রাজকুমারী, তাই তাকে তার প্রকৃত বয়সের তুলনায় একটু বড় লাগত। এবং মেয়েটি যে দেখতে অসাধারণ সুন্দরী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বাবার চিঠিখানি দীর্ঘ হলেও এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন মহারানী দুর্গাবতী।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে কখনও তাঁর ওষ্ঠাধর স্ফীত হল। কখনও কখনও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল এবং কখনও আবার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। বাবা কিরাত সিংহের সাহসিক যন্ত্রণাটি

মহারানীর মনে সংক্রামিত হতে থাকল।

চিঠিটি শেষ করার পর মনে হল, কেবল কালিঞ্জর দুর্গ বা বুন্দেলখণ্ড নয়, তার অগোচরে গন্ডোয়ানা রাজ্যটিও বিপদের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই বৃত্ত থেকে বের হওয়ার যেন কোনও উপায় নেই।

মনের এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে মহারানী দুর্গাবতীও কয়েকদিন পরে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

'বাবা, তোমার চিঠি পড়তে পড়তে মনে হল, আমরা কেউই এখন নিরাপদে নেই। বিপদের বৃত্তের ভেতর আমিও ঢুকে গেছি। ইদানীং আমার রাজ্যে অনেক গুপ্তচর ঢুকে গেছে। এসব গুপ্তচর মুঘল কী পাঠান, তা আমি জানি না। নানারকম কৌশল করে তারা সিঁদ কেটে রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

সেদিন আমার চোখের সামনেই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। তুমি জান, আমাদের মন্ত্রী অধর কায়স্থ আমাদের খুবই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের রাজ্যের কী ভাবে উন্নতি হয়, কী ভাবে সকলে ভালো থাকে, তাই নিয়ে সর্বদা চিন্তিত। তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন। তিনি মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে আমাদের মঙ্গল কামনায় পুজো দিয়ে বেড়ান। মন্ত্রী অধর কায়স্থ জ্যোতিষ গণনাতেও বিশ্বাস করেন। এবং কোনও জ্যোতিষীর সন্ধান পেলে তাদের কাছে গিয়ে ভাগ্য গণনায় বসে যান। এসব ব্যাপারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তা সেদিন তিনি হঠাৎ একজন তরুণ ছোকরাকে নিয়ে আমাদের মহলে এসে হাজির। তার কাঁধে ঝুলি। কী ব্যাপার? এই লোকটিকে হঠাৎ এখানে এনে হাজির করেছেন কেন? অধর কায়স্থ বললেন, 'ইনি একজন বড় জ্যোতিষীর চেলা। বড় জ্যোতিষী থাকেন হিমালয় পাহাড়ে। তার কাছে এঁর জ্যোতিষ শেখা। ভালো করকোষ্ঠী গণনা করেন। মা, দয়া করে আপনি আপনার হাত-পা এঁকে একবারটি দেখান। আপনার শুভযোগ থাকলেই আমাদের মুলুকে শুভযোগ।'

'তা এই ছোকরাকে পেলেন কোথায়?'

'আমাদের রাজবাড়ির মন্দিরে। দিন তিনেক হল সে এখানে এসে বসে আছে। পুরোহিতের সঙ্গে ভারি ভাব। সাধন ভজন করে।'

'আগেও কখনও একে দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'না, আগে কখনও সে এ মুলুকে আসেনি।'

অধর কায়স্থ একান্ত অনুরোধে আমার ডান হাত তার কাছে মেলে দিতে হল। ছোকরা অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

কেবল আমার হাত নয়, বোন কমলাবতী তখন সবে এসেছে, তার হাতও দেখল। দেখল কুমার বীর নারায়ণের হাতও। শেষে সে বলল, যা দেখা যাচ্ছে, তা সবই ভালো। কোনওরকম ভয়ের করার নেই। তবে এই হাত যাতে আরও ভালো করে দেখা যায়, তার মতো সে তিনজনের হাতের ছাপ নিল। বলল, সে হিমালয়ে পৌঁছে তার গুরুদেবকে দেখাবে। তখন খাঁটি বিচার পাওয়া যাবে।

ছোকরাকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল। আমরা তাকে খুবই সরলভাবে বিশ্বাস করেছিলাম।

হাতের ছাপের কাগজগুলি নিয়ে ছোকরা চলে গেল। কিন্তু একটুখানি পরেই ঘরের মেঝেতে পাওয়া গেল এক টুকরো কাগজ। বোঝা গেল তার ঝুলি থেকে এটি পড়ে গেছে। ছোকরাটির খোঁজে পাঠানো হল এক নফরকে। সে ফিরে এল একা একা। তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। আশ্চর্যভাবে সে গায়েব হয়ে গেল। আর যে কাগজের টুকরোটি পাওয়া গেল, তাতে দেখা গেল তুর্কি ভাষায় কিছু লেখা। বিকেল বেলায় ডেকে পাঠানো হল কোটালকে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কী বলেন?'

নগর কোটাল জানাল, 'এরকম আরও দু-এক জায়গায় ঘটেছে বলে শুনছি। এসব কাজে অচেনা লোকেরা এসেছে দেখা যাচ্ছে।'

'অচেনা লোক? ওরা কারা?'

কোটাল বলল, 'সম্ভবত গুপ্তচর। বাইরের লোক। মুঘল-পাঠান।'

এখন বুঝতে পারছি, যবন দস্যুদের নজর এখন আমার ওপর পড়েছে। বাবা, তুমি যে বলেছ, আমি নিরাপদে রয়েছি, তা কিন্তু ঠিক নয়। যবনদস্যুরা গুপ্তচর পাঠিয়ে আমার রাজ্যের ভেতরের খবর জোগাড় করতে নেমে পড়েছে। তা এই খবর নেওয়ার সঙ্গে হাতের ছাপ নেওয়ার কী সম্পর্ক তা বুঝতে পারছি না। এটি একটি গভীর রহস্য। এই রহস্যের ভেতর তুর্কি ভাষার ব্যাপারটি আরও রহস্যময়। তুর্কিভাষী গুপ্তচর কী তোমাদের শেরশাহের গুপ্তচর? মন্ত্রী অধর কায়স্থ খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন, মুঘলরা না কী তুর্কি ভাষী। এই লোকটি কাদের।'

যাই হোক, আমি এখন তৈরি আছি। তৈরি হচ্ছি। আমিও রাজপুত ঘরের মেয়ে। রাজপুত বধূ। বিনা যুদ্ধে আমি এক বিঘৎ ভূমিও ছাড়ছি না, লড়াই হবে।

এখন তোমার জন্যই আমার বেশি উৎকণ্ঠা। ঈশ্বরের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি। জঙ্গলগড়ের 'মহাদুর্গা' তোমাকে রক্ষা করুন। প্রণাম জানবে। ইতি—'

কন্যা দুর্গাবতীর চিঠি যথা সময়ে এসে পৌঁছে গেল। এবং সেদিন কালিঞ্জর দুর্গাধিপতি কন্যার ওই চিঠি হাতে পেলেন, সেদিন থেকেই যেন আসন্ন যুদ্ধের ছায়া পড়ল কেল্লার ওপর। রক্তমেঘের ছায়া।

দলে দলে আফগান-পাঠান সৈন্যরা এসে ঘিরে ফেলতে থাকল কালিঞ্জর কেল্লা। এবং তা শনৈঃ শনৈঃ। যে পরিখার ব্যবধান ছিল, সে ব্যবধান আর রইল না। দুর্গের বাইরে যে রক্ষীরা ছিল, তাদের পিছিয়ে আসতে হল। শেরশাহের সৈন্যরা আগুয়ান।

দুর্গের উতুঙ্গ প্রাকারের কাছে গিয়ে সেনাপতিকে নিয়ে কিরাত সিংহ যা দেখলেন, তাতে তাঁর চোখ উঠল কপালে। প্রাকার লক্ষ্য করে রাশি রাশি কামান সাজানো। কিরাত সিংহ বুঝলেন,

প্রাকারের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর আর সূর্যাস্ত দেখা হবে না।

প্রাকারের ওপর যেসব সুগঠিত ফোকর রাখা ছিল, কিরাত সিংহের হুকুমে সেই সেই জায়গায় তোপ বসানো হল শত্রুদের দিকে তাক করে। বসিয়ে দেওয়া হল সুদক্ষ তীরন্দাজদের । এবং এই সব ফোকর দিয়ে শত্রুদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হল।

এখন অপেক্ষা শুধু হুকুমের। হুকুম পেলেই তীর এবং গোলা দুই ছুটবে।

কিরাত সিংহের কাছে এই ধরনের পরিস্থিতি নতুন নয়। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে এ ভাবে লড়াই তিনি বহুবার করেছেন। এই সেদিন মুঘল হুমায়ুনের সঙ্গে এইভাবে লড়াই হয়েছে। তবে এবারের শত্রু প্রবল বলশালী। এবার লড়াই শের খাঁয়ের সঙ্গে। মুঘল হুমায়ুন সোনা নিয়ে চলে গেছে। শেরশাহ শুধু সোনা নয়, ইনি ইজ্জৎ নেবেন।

কিন্তু শের খাঁ ঠিক কী চান, তা ঠারেঠোর বুঝলেন, চাওয়ায় ব্যাপারটা এখনও সূক্ষ্ম করে জানালেন না তিনি।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। যতদিন যায়, ততই বাড়ে উদ্‌বেগ। বাড়ে উত্তেজনা।

প্রায় মাসখানেক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর শেরশাহের দাবিটা পরিষ্কার জানা গেল। সেদিন দুপুরে প্রাকারের নীচে ডেকে এক ঝাঁক তীর এসে পড়ল দুর্গের ভেতরে। প্রতিটি তীরে একটা করে চিরকূট গাঁথা। এবং সব চিরকুটে একটিই বয়ান।

'দুর্গাধিপতি কিরাত সিংহ, এই এক টুকরো কাগজের মধ্য দিয়ে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। বার্তাটি হল, রেওয়ার রাজা বীরভান বাঘেলা আমার কাছে একজন যুদ্ধ পরাধী। সেই অপরাধী দেখছি তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এই বীরভানকে আমার হাতে তুলে দেওয়া হোক। তার বিচার হবে। আমার দ্বিতীয় দাবি হল, আমার একজন সুন্দরী ক্রীতদাসী তোমার কাছে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেই সুন্দরীকেও আমার হাতে তুলে দিতে হবে। এই দুটি দাবি না মেটা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। তোমার কালিঞ্জর দুর্গ আমি দখল করে নেব— সুলতান শেরশাহ।'

একই বয়ানে লেখা তীরের ডগায় চিরকূটগুলি পাওয়ার পর, বীরভান বাঘেলা এবং অপরাপর সেনাপতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন রাজা কিরাত সিংহ।

বীরভান বাঘেলা বললেন, 'আমাকে আপনি ছেড়ে দিন রাজা, আমি চলে যাই। শেরশা আমায় দণ্ড দিক। আমার জন্য আপনি শুধু শুধু বিপদ ডেকে আনবেন কেন?'

'বটে!' হাসলেন কিরাত সিংহ, 'বীরভান বাঘেলাকে পেলেই কী শেরশা সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে? এটা একটা অজুহাত। দুর্জনের কখনও ছলের অভাব হয় না। এ ছাড়া দুর্জয় সিংহের সুন্দরী কন্যাটির কী হবে? তাকেও কী এই শয়তানটার হাতে তুলে দেব।'

'না, তা হয়না।'

'তা হলে তোমাকেও ছাড়া যাবে না। কখনও না।'

পরের দিন তীরের ডগাতেই কিরাত সিংহের জবাব গিয়ে পৌঁছুল শেরশাহের সেনা শিবিরে। জবাব খুবই সংক্ষিপ্ত। 'রাজপুতরা কখনও কোনও আশ্রিতকে ছেড়ে দেয় না। এই যুক্তিতে সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করা গেল না। দুঃখিত।'

রাজা কিরাত সিংহের এই জবাবে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল শেরশাহ। ঠিক করলেন, এই কালিঞ্জর দুর্গটি জয় না করে তিনি কোথাও আর যাবেন না, এক পাও নয়।

দুর্গ জয়ের জন্য এরপর পাকাপাকি ভাবে রয়ে গেলেন সুলতান শেরশাহ। পড়ে রইল আগ্রা ও দিল্লি অভিযান। যাওয়া হল না বাংলা মুলুক। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হল এইখানে। কিন্তু মাসখানেক কালিঞ্জর দুর্গটি অবরোধ করার পর বোঝা গেল এই দুর্গ জয় করা সহজ নয়। পাথরের প্রাকার নির্মিত দুর্গটিতে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। কামানের পর কামান দাগা হয়। কিন্তু দুর্গ প্রাকার ভাঙে না। এই ভাবে মাসের পর মাস কেটে যায়। অতিবাহিত হয় ঋতুর পর ঋতু।

শেষে এক নতুন এক মতলব তাঁর মাথায় এল। তিনি দুর্গপ্রাকারের পাশে সুউচ্চ এক সারি পাথরের এক স্তূপ বানাতে থাকলেন। এমন সুউচ্চ স্তূপ, যা দুর্গ প্রাকারের সমান সমান হয়। সেইভাবে মাথার উচ্চতার স্তূপ হলে দুর্গের ভেতরে কামান দিয়ে আঘাত করা যাবে।

পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়ণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু প্রায় এক বছরের চেষ্টায় এবং বহু সৈন্যের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তা করা যেত।

এদিকে কিরাত সিংহ বুঝতে পারেন নি এমন কাণ্ড ঘটবে! তিনি বারবার কামান দেগে চেষ্টা করতে থাকলেন ওই শেরশার নির্মিত স্তূপাটি ভেঙে দিতে। কিন্তু তিনি তা পারলেন না।

কিরাত সিংহের গুপ্তচরেরা এসে খবর দিল, 'মহারাজ, এবার আমাদের দুর্গের দেওয়ালে 'হুক্কা' দাগা হবে। হুক্কার পর হুক্কা।'

'হুক্কা! সে আবার কী?'

'আজ্ঞে, বারুদে ঠাসা এক ধরনের ভয়ঙ্কর তোপ। রাশি রাশি তোপ এসে জড়ো করা হয়েছে উঁচু স্তূপের ওপর।'

দেখা গেল গুপ্তচরের কথা মিথ্যা নয়। স্তূপের ওপর দেখা গেল স্বয়ং সুলতান শেরশাহকে। আর তাঁর পাশে রাশি রাশি বারুদে ঠাসা হুক্কা। অর্থাৎ ভারি ভারি তোপ। কালান্তক যমের মতো শেরশাহ নিজে হাতে সেই 'হুক্কা' দাগতে থাকলেন।

এই ভয়ঙ্কর 'হুক্কার' আঘাতে দুর্গের ওপর দিকের পাথর প্রাচীরে ধীরে ধীরে ফাটল ধরল। এবং একটা অংশ ধবসে পড়ল। দুর্গে ঢোকা যায়, এমন পথ তৈরি হল।

এই অভাবিত সাফল্যে নাচতে থাকলেন সুলতান শেরশাহ। দুর্গের ঢোকার পথ আরও প্রশস্ত করতে আরও 'হুক্কা' দাগতে থাকলেন। এবং এই সময় হঠাৎ অঘটন ঘটল। কয়েকটি 'হুক্কা' দুর্গপ্রাচীরে আঘাত করে ফিরে এসে সংরক্ষিত 'হুক্কা' গুলির ওপর

পড়ে ফাটতে থাকল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগলে যা হয়, তাই হল। সেই আগুন থেকে পালাবার কোনও পথ পেলেন না শেরশাহ। তাঁর শরীরটাও আগুনে জ্বলে উঠল। চারদিকে 'হায় হায়' পড়ে গেল।

তা কেবল শেরশাহ কেন, বারুদের লেলিহান আগুনে তাঁর কয়েকজন দক্ষ মহাযোদ্ধা বিশ্রীভাবে পুড়ে গেল। মারাও গেল কেউ কেউ।

তবে শেরশাহ তখনই মারা গেলেন না। অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে টেনে নামানো হল। কথা বলবার মতো তাঁর শক্তি নেই। তিনি অনেক করেই কয়েকটি শব্দ বললেন, 'কী, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, এখনই কেল্লাটি দখল করে নাও।'

সুলতান শেরশাহের হুকুমে দখল হল কেল্লা। পঙ্গপালের মতো রাশি রাশি সেনা ঢুকে পড়ল কেল্লার ভেতর।

দুর্গাধিপতি কিরাত সিংহ শেরশাহের সৈন্যদের হাতে সত্তরজন অনুচরকে নিয়ে জীবিত অবস্থায় বন্দী হলো।

বন্দী হওয়ার সময় কিরাত সিংহ একজন সেনার কাছে জানাতে চাইলেন, 'সুলতান কেমন আছেন, তিনি আর জীবিত, না মৃত?'

সেনাটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাতে তোমার কী? তিনি এখনও জীবিত। তবে মরতে দেরি নেই।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দুনিয়া থেকে একটি শয়তান বিদায় হল।'

সেনাটি বলল, 'ভয় নেই, ওই সুলতানের সঙ্গে তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় দেওয়া হবে।'

কিরাত সিংহ হাসলেন, 'রাজপুতরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। তবে মৃত্যুর আগে তার শত্রু খতম হয়েছে শুনলে সে মৃত্যু ভারি সুখের যে।'

তখন গরম কাল। অপরাহ্ন বেলা। দুর্গের প্রাকারে দাঁড়িয়ে আরও একবার সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ মিলল কিরাত সিংহের। তিনি দেখলেন, আকাশের প্রান্তসীমায় সূর্য। বিস্তর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। সারা আকাশ জুড়ে রঙের ছড়াছড়ি।

✪ ✪ ✪

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। শেরশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের পালাবদল হল। বিশাল এক পালাবদল।

সময়ের সঙ্গে নদীর প্রবাহের যে কেন তুলনা করা হয়, তার প্রমাণ যেন হাতে হাতে এবং প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়ে দিল ইতিহাস। সুলতান শেরশাহের রাজ্যবিস্তারের ধারা তাঁর ছেলেরা বজায় রাখতে পারল না বরং তা অতিদ্রুত ক্ষীণকায় হল। পক্ষান্তরে মুঘল হুমায়ুন বলশালী হয়ে প্রবল বিক্রমে মুঘলদের আধিপত্য বিস্তার করে হিন্দুস্থানের বুকে স্থায়ীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বনেদ পাকা করে ফেললেন। হুমায়ুন 'বাদশা' হয়ে দিল্লিতে বসলেন। এবং সুলতান শেরশাহের অনুপস্থিতিতে এই অসম্ভবকে সম্ভব করালেন তিনি।

কিন্তু খরস্রোতা সময় নদীর মতো বাঁক নিয়ে ওই বাদশা হুমায়ুনকে স্থায়ী হতে দিল না। তাঁকেও হঠে যেতে হল অতিদ্রুত।

বারুদের স্তূপের আগুন যেন ছিনিয়ে নিল শেরশাহকে, তেমনি কয়েক বছরের ব্যবধানে হুমায়ুনকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেল তুচ্ছ দুর্ঘটনা। দিল্লিতে 'শেরমহল' থেকে নেমে আসবার সময় সিঁড়িতে তাঁর পোশাক 'দর দামন-ই-পোস্তিন'তে পা জড়িয়ে হড়কে পড়ে গেলেন নীচে। পাথুরে সিঁড়ি। খাড়াই। পড়ে গেলেন মাথা গুঁজে। গুরুতর চোট লাগল মাথায়। শোনা যায়, সন্ধ্যায় মসজিদের আজান দেওয়ার ডাক শুনে দ্রুত নামতে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটল। এবং এই মাথার চোটেই বাদশা হুমায়ুনের এন্তেকাল হল।

বাদশা হুমায়ুনের এই অকাল প্রয়াণে সময়ের খরস্রোতা নদী ইতিহাসের নতুন এক চরে পৌঁছে দিল সুলতানদের।

নাবালক আকবর বসে গেলেন বাবার পরিত্যক্ত হিন্দুস্থানের তখ্‌তে। তখন তাঁর বয়স সবে তেরো।

সেই তেরো বছরের ছেলে যখন তেইশের যৌবনে এসে পৌঁছে গেল, তখন তিনি হয়ে উঠলেন এক সাম্রাজ্য শিকারী। যে ছাতার আড়ালে তিনি পালিত হচ্ছিলেন, মাথার ওপর সে ছাতাকে বিসর্জন দিলেন তিনি।

লেখাপড়ার বিদ্যেটা তাঁর ধাতে সয় নি। তাই নিরক্ষরতা হল তার বিধিলিপি।

কিন্তু শিকারে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর শর-সন্ধান। আর তিনি বিশেষভাবে যা বুঝতেন, তা হল যুদ্ধ। তরুণ যৌবনে তিনি যে রণহুঙ্কার দিতে থাকলেন, তা হিন্দুস্থানের রাজ্যে রাজ্যে পৌঁছে যেতে থাকল।

সেই সময় 'কারা' অঞ্চলের শাসনভারের দায়িত্বে ছিলেন আসফ খান। এই আসফ খানের ওপর তরুণ আকবরের খুব আস্থা ছিল। 'রেওয়া' রাজ্যটি ছিল কারার খুব কাছাকাছি। রেওয়ার রাজা তখন রায়চাঁদ বাঘেলা। বীরভান বাঘেলা কালিঞ্জর দুর্গে নিহত হওয়ার পর রায়চাঁদই তখন রেওয়ার রাজা। এবং যেহেতু তিনি রাজপুত, তাই বীরভানের মতোই তেজী। কিন্তু আকবর বাদশার হুকুমে আফস খান তাঁর তেজ প্রশমিত করে মুঘলদের আনুগত্য হারিয়েছে। তাই আকবরের দরবারে আসফ খানের বেজায় খাতির।

সেই আসফ খানের হঠাৎ ডাক পড়ল আকবরের মুঘল দরবারে।

আসফ খান এসে মুঘল আকবরকে তসলিম জানাল।

'হজরত, হঠাৎ আমাকে তলব কেন? হুজুরের কোনও দরকার আছে নাকি?'

'আছে। তুমি যেখানে শাসন করছ, তার গায়ে যে গান্ডোয়ানা রাজ্য রয়েছে, তার হাল হকিকৎ কী তোমার পুরো জানা আছে? আমি সে রাজ্যের পুরো খবর পেতে চাই।'

'আজ্ঞে, হুকুম যখন পেয়েছি, তখন এক পক্ষকালের ভেতর সব খবর আমি এসে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

।। সাত।।

পুরুষদের যৌবন কোন বয়সে আসে, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক এবং মতান্তর আছে। এবং তা আঠারোয়, না একুশে। বা উনিশ-কুড়িতে। এবং সে পুরুষ যদি মুঘল হয়, তার হিসেব কেমন?

তা বিতর্ক যেমনই থাক না কেন, মুঘল আকবরের যৌবন এসেছিল কিন্তু উনিশে।

এই উনিশ থেকেই তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন। ওই সময় থেকেই তিনি অনুভব করতে থাকেন, কাকে বলে যৌবনের মত্ততা, কাকে বলে বিচক্ষণতা, কাকে বলে প্রেম ও অনুরাগ। এবং এই একই সময়ে অনুভব করতে থাকেন তাঁর মানসিক হিংস্রতা কী তীব্র, কী তীব্র তাঁর খেয়াল-খুশি এবং কাকে বলে মানসিক বিষণ্ণতা।

এইসব অনুভব উনিশ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকল।

তাঁর যৌবনে বসন্তের মুগ্ধতা যেমন দেখা দিতে থাকল, তেমনি মেজাজে দেখা দিতে থাকল গ্রীষ্মের রুক্ষতা।

মুঘল আকবর নিজেই নিজের এই সময়ের চরিত্র বিচার করে বলেছেন, তিনি প্রবল এক ভেতরের জ্বালায় সারাক্ষণ পুড়ে যাচ্ছেন। ঐতিহাসিকরা তাঁদের ভাষায় এই জ্বালাকে 'ইনটারনাল বিটারনেস্' বলে অভিহিত করেছেন।

যাই হোক, এই জ্বালা-যন্ত্রণা এবং যৌবনের দুরন্ত আবেগ নিয়ে তরুণ মুঘল অদ্যাবধি ঠিক কী কী কর্ম করে চলেছেন, তার কিছু কিছু খবর নেওয়া যাক। বরাবরই শিকারে প্রবল আশক্তি ছিল আকবরের। এখন তা অনেকখানি বেড়ে গেল। হলেন দুরন্ত শিকারী।

রাজধানী আগ্রা থেকে মথুরার দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। আঠারো ক্রোশ। তবে হাঁটতে গেলে এটি অনেকখানি।

মথুরায় তখন ছিল শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য। নিবিড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলে হিংস্র বাঘের কোনও অভাব ছিল না।

যৌবনের বলশালীতায় তাঁকে ডাকত ওই জঙ্গল। ডাকত শিকারের জন্য। দলবল নিয়ে হইহই করে আকবর প্রায়শই ছুটতেন শিকারে। পথের ধারে ছাউনি পড়ত। সেই ছাউনি থেকে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতো, চলত সারাদিন শিকার।

পাহাড়ি ছাউনির পাশ দিয়ে পথ, সেই পথ ধরে চলেছে কিছু পুণ্যার্থী মথুরার মন্দিরে পুজো দিতে। এরা হিন্দু।

কথায় কথায় জানতে পারলেন, এই পুণ্যার্থীরা কেবল ঠাকুরের পুজোর জন্য খরচ করে না। তাদের ওই মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার জন্য শাহী চৌকিতে বেশ কিছু কর দিতে হয়। এবং তার নাম, 'তীর্থকর।'

'তীর্থকর? সে আবার কী?'

'আজ্ঞে, কে পায়, তা জানিনা, তবে বাদশাহের সেরেস্তায় এ টাকা জমা হয় বলে শুনেছি।'

'তার মানে এ টাকা বাদশা পাবে?'

'জী। সে রকমই আমাদের অনুমান।'

এইভাবে টাকা তোলা! বাদশার তরুণ যৌবন ভারি লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করল। আগ্রায় ফিরে এসে তিনি এই কর তুলে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। না, এখন কর নেওয়া যায় না।

খাজাঞ্চিখানার লোকেরা হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এল। তারা যুক্তি দিল, এরকম হুকুম করবেন না, জাঁহাপনা! এই কর বাবদে আমাদের লাখ লাখ টাকা আয়। এই তীর্থকর সুলতানি আমল থেকে হিঁদুদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এতে কোনও অন্যায় নেই। এ ছাড়া হিঁদুদের কাছ থেকে 'জিজিয়া'ও নেওয়া হয়। সেও মেলা টাকা। হুজুর, এসব কর তুলে দিলে আমাদের রাজস্বের আয় খুবই কমে যাবে।'

আকবর বাদশার তরুণ যৌবন হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'না, এভাবে অসহায়ের টাকা নেওয়া যাবে না। জিজিয়াও বন্ধ করে দাও। এভাবে টাকা নেওয়া ভারি লজ্জার।'

বাদশার হুকুম। কোনও নড়চড় হবে না। সেরেস্তাদার খাতা বদলে নিয়ে নিজের দপ্তরে ফিরে গেল। কতখানি রাজস্বের লোকসান, তা বোঝাবার জন্য হিসেবের খাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাদশার যা মেজাজ, খাতা খোলা গেল না।

শোনা গেল, বাদশা সেবার শিকারে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু ফেরবার সময় মথুরা থেকে আগ্রা ফিরে এসেছেন পায়ে হেঁটে। পাক্কা আঠারো ক্রোশ রাস্তা। এই হাঁটায় প্রথমে অনেকে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা পরাস্ত। আকবরের তরুণ যৌবনের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারেনি। কেন এমন হাঁটলেন বাদশা? এটা কী তীর্থযাত্রীদের দেখে?

ব্যাপারটি বোঝা গেল না। রহস্যময়।

রেওয়ার রাজা রাম চাঁদ বাঘেলা এসেছেন সেদিন দরবারে। পরনে দরবারি পোশাক। তবে তা রাজস্থানী।

দরবারে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল গান-বাজনা নিয়ে। বড় বড় ওস্তাদরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন বাদশাকে। ব্যাখ্যা চলছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী নিয়ে। খাঁ সাহেবরা ব্যাখ্যা করছিলেন সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

রেওয়ার রাজা রামচাঁদ বাঘেলা নিজেও একজন গানের সমঝদার। তিনি অনেকক্ষণ ধরে এই সব আলোচনা শুনে বলে

বসলেন, 'হজরত, খাবার না খেলে যেমন খাবারের যথার্থ স্বাদ বোঝা যায় না, তেমনি গান না শুনলে গান যে কী জিনিস, তা কখনও সমঝ করা সম্ভব নয়। তাই ওস্তাদদের কথা না শুনে প্রকৃত কোনও গায়কের গলায় গান শুনুন। চেনা যাবে প্রকৃত ওস্তাদকে!'

'প্রকৃত ওস্তাদ! তা সে রকম কোনও গায়কের খবর আপনার জানা আছে না কি, রাজামশাই।'

'আছে। হিন্দুস্থানের এক সেরা গায়ক আমার কাছে রয়েছে। তার গান শুনলে বুঝতে পারবেন গান কাকে বলে!'

'বটে!' হাসলেন তরুণ বাদশা। 'তা তাঁকে আনা হচ্ছে না কেন আমার দরবারে।'

'হজরত! তাকে দিল্লিতে আনা যাবে না। সে একজন গোঁড়া হিন্দু। এক পাঠান ইব্রাহিম তাকে একবার দিল্লিতে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আসে নি। সে বড় জেদী।'

এই জেদের কথা শুনে আকবর বাদশারও জেদ চেপে বসল। বললেন, 'আমি তাঁকে চাই। এবং তা যে ভাবেই হোক না কেন।'

তা শেষপর্যন্ত জেদ করেই আকবর সেই গায়ককে নিয়ে এলেন দিল্লিতে এবং তার গান শুনে দু'লাখ আশরফি ইনাম দিলেন। কেবল ইনাম নয়, এই হিন্দু গায়কটিকে পাকাপাকিভাবে দিল্লিতে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করলেন।

গোয়ালিয়রের গায়ক হয়ে গেলেন দরবারি গায়ক। পরে ইনি 'তানসেন' নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। নাম হয়ে গেল তার ভারত-জোড়া। আর হিন্দুস্থানের সেরা ওস্তাদ হিসেবে ইতিহাসে নাম ঢুকে গেল। সে নাম হয়ে গেল চিরন্তন। 'তানের' সঙ্গে তান মিলিয়ে হয়ে গেল 'তানসেন'। প্রচলিত রাগ-রাগিনীকে পরিবর্তিত করে তিনি রাগের সৃষ্টি করে মুঘল দরবারকে করলেন চমৎকৃত। তথাকথিত 'হিন্দোল' এবং 'মেঘমল্লার'কে তিনি নতুন রূপ দিলেন। ওস্তাদি মুসলমান রীতিকে নিয়ে নতুন এক 'ঘরানা' তৈরি করলেন।

তানসেনের সংগীত প্রতিভা হয়তো গোয়ালিয়রের গন্ডীতে আটকে থাকত। মুঘল আকবরের যৌবনের খেয়াল এই আঞ্চলিক প্রতিভাকে দরবারে টেনে এনে সম্মান দিল। একেই না বলে একুশ

বছরের মেধা।

বাদশা আকবরের মায়ের এক 'তুতো' ভাই ছিল। সেই ভাইয়ের নাম, আলি আকবর।

ওই আকবরের এক ছেলের নাম, 'খাজা হুমায়ুন।' এই 'খাজা' ছোকরাটি ছেলেবেলা থেকেই অপরাধ প্রবণ। যতই সে বড় হতে থাকে, ততই তার এই অপরাধ প্রবণতা বাড়াতে থাকেই। সব দিক থেকেই সে হয়ে ওঠে 'খাজা'। তার হাতে কত যে খুন-খারাপি হয়, তার যেন কোনও হিসেব পাওয়া যায়না। বেগম সাহেবা সঙ্গে থাকার জন্য সে সব ব্যাপারেই রেহাই পেয়ে যায়। খাজার কোনও শাস্তি হয় না।

বেগম মহলের এক অভিজাত বিবির মেয়েকে ওই খাজা শাদি করে ফেলেছিল বাদশাদের আত্মীয় বলে।

তা এই শাদিটাই বোধহয় তার জীবনের কাল হল। সে থাকত যমুনার ওপারে। চোখের আড়ালে।

বেগম মহলের অভিজাত বিবিটি একদিন তরুণ বাদশাকে এসে বলল, 'আমার মেয়ের বড় বিপদ। আপনাকে একটু দেখতে হবে।'

'বিপদ? কী রকম বিপদ?'

'শাদির পর থেকে আমার মেয়েটাকে একদিনের জন্যও সুখ দেয় নি ওই হারামজাদা খাজা। এখন শুনছি, তাকে খুন করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবে। কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আপনি আমাকে বাঁচান। খুনে খাজার খপ্পর থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিন।'

এহেন অভিযোগ শুনে কার মাথা ঠান্ডা থাকে? একুশ বছরের তরুণ আকবরের মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

হুঙ্কার দিয়ে তরুণ মুঘল বললেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন বিবি সাহেবা! এই বদমাশ খাজা তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে। এবং আজই। সে কিছুতেই আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

কুড়ি-বাইশ জন তরুণ সঙ্গী নিয়ে তখনই আকবর বেরিয়ে পড়লেন শিকারের ছলে। আকবর বাদশা আসছে শুনে যদি সে পালিয়ে যায়, তাই এই ছলের আশ্রয় নিতে হল। যমুনা নদী পার হয়ে 'খাজার' আস্তানায় পৌঁছুবার আগেই খাজা খবর পেয়ে গেল। একটু আগেই সে খুন করছে বিবিকে। বিবির রক্ত তখনও ঝরছে তার তরোয়াল খোলে। আকবর বাদশার ভয়ে সে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

তা শুধু কী খাজা? আকবরের হাতে ধরা পড়ে গেল তার কুখ্যাত অনুচরেরা।

তাদের সকলকে ধরে যমুনার জলে ডোবাতে থাকলেন বাদশা। যাতে নাকানি-চোবানি খেয়ে ওরা খতম হয়, তার জন্য এই শাস্তি। মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয় যেতে থাকলেও, শেষমেষ খাজা মরল না।

তখন খাজাকে সোজা পাঠানো হল গোয়ালিয়র দুর্গের অন্ধকার কয়েদ ঘরে। পরে সেখানেই সে মারা গেল।

একুশ বছরের মুঘল আকবর এই ভাবেই নিজেকে নানা দিকে প্রকাশ করতে থাকলেন। এবং যৌবন কী এই ভাবেই শুধু প্রকাশিত হবে? কোনও মোহিনী মায়ায় কী সে ধরা দেবে না?

তা একুশ বছরের যৌবনে আকবর সেবার বিশ্রী ভাবে এক মোহিনী মায়ায় গেঁথে গেলেন।

ঘটনাটি আকস্মিক। কিন্তু আকস্মিক হলেও, এর প্রতিক্রিয়া সমস্ত পরিস্থিতিকে গুলিয়ে তুলল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠলে যেমন হয়, তেমনি একুশ বছরের আকবরের মনে প্রেমের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে পর্যুদস্ত করে ছাড়ল।

আকবর বাদশা সেবার ফিরছিলেন যমুনার জঙ্গল থেকে বাঘ মেরে।

রাজধানীর রাজপথ ধরে ছুটছিল তাঁর ঘোড়া। রাজপথের ধারে ধারে ধনী পরিবারদের সারি সারি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। প্রাসাদে সারি সারি বাতায়ন। হঠাৎ একটি বাতায়নের ওপর চোখ পড়ে গেল তরুণ আকবরের। এবং চোখ পড়ামাত্রই আটকে গেল চোখ।

এক সুন্দরী তরুণী বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে। মৃদু হাওয়ায় তার আলগা চুলগুলি উড়ছে। অনিমেষ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রাজপথের যাত্রীদের, পথচারীদের। এবং বাদশাকে দেখা মাত্র তরুণীর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এই দৃষ্টিতে ছিল এমনই মোহিনী মায়া, যে সে দিকে তাকিয়ে একুশ বছরের বাদশা আর চোখ ফেরাতে পারলেন না।

এদিকে বাদশা ফিরে এলেন প্রাসাদে। শিকারের পর প্রাসাদে ফিরে এসে বাদশা সাধারণত শিকারের গল্প করতেই ভালোবাসেন। আজ তার ব্যতিক্রম হল। তিনি কোনও কথা বলতেই চান না---একেবারে চুপচাপ।

রাতে ঘুমোতে গেলেন বটে, কিন্তু তেমন ঘুম হল না---মন উচাটন। থেকে থেকে কেবল ওই সুন্দরী বিবির মুখটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। আর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। কেমন যেন এক দুঃসহ অস্থিরতা।

পরের দিনটিও এই ভাবে কাটল।

কিন্তু অস্থির মন নিয়ে মুখ বুজে কাটাবার পাত্র নয় একুশ বছরের বাদশা।

অত্যন্ত গোপনে তিনি বেগম মহলের এক বাঁদীকে কাজে লাগালেন এই সুন্দরীর সন্ধানে। চিনিয়ে দেওয়া হল তাকে রাজপথের ধারের প্রাসাদটি। এবং যেমন করেই হোক না কেন, এই সুন্দরী বিবির তরফের খবর চাই। সেই সুন্দরীকে না পেলে বাদশা আর বাঁচবে না।

বেগম মহলের বাঁদীটি ছিল বেশ চালাক চতুর। এবং পাকা কুট্টিনী।

সে খবর নিয়ে এল যথা সময়ে। বাদশাকে তসলিম জানিয়ে বলল, 'খোদাবন্দ, এই বাঁদী আপনার দেখা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করে খবর নিয়ে এসেছে।'

বাদশাহ খুশি হয়ে বললেন, 'এই সুন্দরী কী বিবাহিত।'

'জী। বিবাহিত। শেখ আবদুল ওয়াসিমের শাদি করা স্ত্রী।'

'বটে! তা আমি যদি তাকে শাদি করতে চাই, এই সুন্দরী কী আমাকে বিয়ে করবে?'

'আজ্ঞে, আপনাকে দেখা তক্ এই সুন্দরীও আপনাকে ভুলতে পারছে না। সে শয্যা নিয়েছে। বিরহ যন্ত্রণায় ভুগছে। নিজের মেয়েকে সে দু চক্ষে দেখতে পারছে না। আপনি যদি তাকে শাদি করে কাছে টেনে নেন, তা হলে সে হাতে স্বর্গ পায়।'

এই খবরে কে না উৎফুল্ল হয়? সুতরাং তরুণ বাদশাও উৎফুল্ল হল।

কিন্তু উৎফুল্ল হলে কী হয়, এক বিবাহিতা মুসলমানীকে চট্ করে শাদি করা যায় না। স্বামীর কাছ থেকে তাকে তালাক পেতে হবে। এবং এই স্বামী যদি তালাক না দেয়, তা হলে ওই বিবাহ কখনও সম্ভব নয়।

তাই উৎফুল্ল হলেও, দমে গেলেন আকবর।

'সুন্দরীর স্বামী শেখ আবদুল ওয়ানি কী করেন? উনি আমাদের অধীনে কোনও কাজ করেন?'

বাঁদী বলল, 'না, উনি হলেন ব্যবসাদার। দক্ষিণ মুলুকে বিদারে ওঁর ব্যবসা আছে।'

'উনি কী ওঁর বিবিকে তালাক দিতে রাজি হবেন?'

'আজ্ঞে, আপনি যদি হুকুম করেন, বাপ-বাপ করে রাজি হয়ে যাবেন।'

হুকুম? এই 'হুকুম' কথাটি শুনে ঝটিতি এক বুদ্ধি খেলে তরুণ বাদশার মগজে। চেঙ্গিস খানের একটি আইনের কথা মনে পড়ে গেল। সুলতান এবং বাদশাদের ইচ্ছাকে সান্ত্বনা দিয়ে চেঙ্গিস এক আইন জারি করেছিলেন। সেই আইনের বিশেষ একটি ধারাতে লেখা ছিল, যদি কোনও বাদশা বা সুলতান কোনও বিবাহিত সুন্দরীকে বিবাহের অভিলাষ করেন, তা হলে সেই বিবাহিতা সুন্দরীর স্বামী বাদশাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য থাকবেন।

চেঙ্গিসের এই আইনটি কাজে লাগালেন একুশ বছরের তরুণ বাদশা।

হুকুম গেল সুন্দরীর স্বামী শেখ আবদুল ওয়াজিমের কাছে।

তা ওয়াজিম কোনও বিবাদের ভেতর গেলেন না। তিনি বিনা প্রতিবাদে স্ত্রীকে বাদশার জন্য তালাক দিয়ে চলে গেলেন দিল্লি মুলুক ছেড়ে। চলে গেলেন দক্ষিণ দেশে। বিদারে। তরুণ বাদশা খুশি মনে সুন্দরীকে হারেমে গায়েব করে দিলেন।

দিন কয়েক ভারি আনন্দে এবং খুশিতে কাটল তরুণ বাদশার।

তবে এই দিন কতকই। পুরোনো হয়ে গেলে নতুনের আনন্দ পাওয়া যায় কী!

এদিকে রক্তের স্বাদ পেয়ে বাঘের যে হাল হয়, তাই হল তরুণ আকবরের। সুন্দরী মেয়েদের জন্য তিনি ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সুন্দরী মেয়েদের জন্য তাঁর ক্ষিদে বাড়ল। আরও সুন্দরী মেয়ে চাই। আরও।

কোথায় কোথায় সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায়, তার খোঁজ চলল। বেগম মহলের যে কুটনী ছিল, তাকে তো নিয়োগ করা হলই, তার সঙ্গে এবং হিজরেদেরও লাগিয়ে দেওয়া হল সুন্দরী মেয়ে এবং বিবি খোঁজার কাজে। তাদের কানে কানে বলে দেওয়া হল, সেরা সুন্দরী চাই।

নগরের বাড়িতে বাড়িতে এরা হানা দিতে থাকল। হানা দিতে থাকল গোপনে এবং ছদ্মবেশে। কিন্তু তারা এতই বাড়াবাড়ি করতে থাকল যে, শেষমেশ বাদশার গোপন অভিপ্রায়টি আর গোপন থাকল না।

পরিবারে পরিবারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। নগরের ঘরে ঘরে তরুণ বাদশার বদ অভিপ্রায়ের কথা প্রচারিত হতে থাকল।

বাদশা আকবরের নামে ছি-ছিক্কার পড়ে গেল।

তখন শীতকাল। শেখ নিজামুদ্দিনের দরগা থেকে ফিরে আসছিলেন দিল্লিতে। সেইসময় হঠাৎ একটি শাণিত তীর মাদ্রাসাগৃহের ছাদ থেকে উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বিধে গেল। সম্ভবত বাদশার মাথা তাক করে ছোঁড়া হয়েছিল। তবে আঘাত তেমন গুরুতর নয়। দিন দশেক পরে তিনি সেরে উঠলেন।

যে এই তীরটি ছুঁড়েছিল সেই তীরন্দাজ ধরা পড়ল এবং মুহূর্তে তার দেহটা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলা হল।

বাদশার এই প্রাণনাশের চেষ্টা কেন, তা নিয়ে নানা কথা প্রচারিত হতে থাকল। সে সব নানা কথায় বাদশা কান দিলেন না। তবে তিনি নিজে এর যে কারণটি দেখলেন, তা হল সুন্দরী মেয়েদের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি অভিজাত মহলের কাছে অপরাধ করে ফেলেছেন। এটা হল তাদেরই ষড়যন্ত্র।

নাহ্, ওই পথে হাঁটা যায় না। ওপথ হারামির পথ। ও পথে বাদশার হাঁটা মানায় না।

একুশ বছরের যৌবন ধিক্কার দিতে থাকল তরুণ বাদশাকে। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

তবে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র তিনি নন। নিজের যৌবনকে প্রকাশ করতে তিনি রাজ্য জয়ে মন দিয়ে ফেললেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম নজর গিয়ে পড়ল 'গান্ডোয়ানা' রাজ্যের ওপর।

কারারাজ্যের শাসনের দায়িত্ব যাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল, সেই আসফ খাঁ এই গন্ডোয়ানা রাজ্যের হাল হকিকৎ জেনে নিয়ে এসে বাদশার কাছে পেশ করল।

'হজরত, আপনি এই গান্ডোয়ানা রাজ্যের যেসব খবর জানতে বলেছিলেন, তা আমি জেনে এসেছি। তবে একটু দেরি হয়ে গেল। এক পক্ষকালের থেকে সাতদিন বেশি।'

'এই রাজ্যের রাজা এখন কে?' তিনি কী কোনও আফগান-পাঠান? না কী কোনও রাজপুত?'

'আজ্ঞে, এই রাজ্যের রাজা একজন আছেন বটে, কিন্তু তিনি রাজ্য চালান না। রাজ্য চালান তাঁর মা, মহারানী দুর্গাবতী। তিনি

আফগান বা পাঠান নন, তিনি হলেন এক রাজপুত বধূ। এখন মা।'

'আশ্চর্য! তা রাজ্যটা কেমন চলে?'

'আজ্ঞে, রাজ্যটা সুশাসিত। আমাদের থেকে কোনও অংশে কম ভালো নয়।'

'রাজ্যের অধিবাসী কারা? তারা হিন্দু না মুসলমান?'

'আজ্ঞে, তারা হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়। তারা পাহাড়ি জাতি গোঁদ।'

'ওদের জীবিকা কি?'

'আগে এই গোঁদরা পাহাড়ে পাহাড়ে শিকার করে বেড়াত। ভারি গরিব ছিল। কিন্তু রানী দুর্গাবতী তাদের চাষবাস শিখিয়ে মাঠে মাঠে ফসল ফলতে শিখিয়েছেন। আর তাদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী তৈরি করে রাজ্যকে সুরক্ষিত করেছেন। এখন গোঁদদের অবস্থা ভালো---এখন 'গান্ডোয়ানা' না বলে, রাজ্যটিকে 'গড়মণ্ডল' বলা হয়।

'তা গড়মণ্ডলের সৈন্যবাহিনী কেমন? তাদের গড়গুলিই বা কেমন?'

'আজ্ঞে, ছোট ছোট গড় বাদ দিলে, বড় গড় দুটি। গড়ঘাঁটি এবং চৌরাগড়। শেষেরটি হল রাজধানী। সৈন্যবাহিনী অনেক। তিরিশ হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক সেনা অজস্র। বিশ হাজার হাতী। পাঁচ হাজার তীরন্দাজ। এ ছাড়া বন্দুক-কামান এবং তোপখানাও আছে।'

'রাজ্যটির আকার কতটা?'

'তা আজ্ঞে, চবিবশ হাজার ক্রোশতো বটেই।'

এই সব বৃত্তান্ত শুনে ফেলার পর আকবর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন কিছু ভাবতে থাকলেন। এর পর শেষ প্রশ্নটি করলেন, 'এই রাজ্যটির জয় করার পর, কিছু মজুত সোনা-দানা কী পাওয়া যাবে?'

'যাবে না কেন? যাবে। শুনেছি দশপুরুষের জমা সোনাদানা চৌরাগড়ে রাখা আছে। রাশি রাশি মণি-মুক্তো। হীরে-পান্নাকুচি। আপনার আক্রমণের খরচ সহজেই উঠে আসবে। দেখুন না আক্রমণ করে!'

'মহারানীকে বাঁচাতে রাজপুত রাজারা এগিয়ে আসবে না তো?'

'আজ্ঞে না। কালিঞ্জর দুর্গে নিজের বাপ কিরাত সিংহ, তিনি অনেকদিন মারা গেছে। রাইসিসের পুরানমল এবং রোটাসগড়ে চোরামনও খতম। আসবার মতো কেউ নেই। মহারানী এখন একা।'

।।আট।।

তখনও সূর্য মধ্যগগনে ওঠেনি।

গাছগাছালির ছায়া তখনও নামেনি মন্দির প্রাঙ্গণে। মহাদুর্গার প্রাতঃকালীন পুজো শেষ করে মন্দির চত্বরে বেরিয়ে এসেছেন আচার্য অনন্তদেব মিশ্র। তা সেই সময়ে ছোট্ট একটি ঘটনা নাটকের মতো তাঁর সামনে ঘটে গেল।

হরশঙ্কর একটি লোককে হিলহিল করে টানতে টানতে মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে এল হাট থেকে ফিরে।

লোকটির পোশাক যবনদের মতো----মাথায় ঝাঁকড়া চুল। হরশঙ্করের হাতে পড়ে তার চেহারা বিধবস্ত। হরশঙ্করের শাস্তির কাছে সে পরাভূত। তার চাউনি উদ্‌ভ্রান্ত। এলোমেলো চুল। চোর ধরা পড়লে যেমন হয়। সেইরকম চেহারা।

'কে রে ওই লোকটা? চোর নাকি?'

'আঁজ্ঞে না প্রভু। লোকটি চোর নয়, ডাকাত। যবনদের গুপ্তচর। ওই সেই 'জব্‌জব্ জামসেদ'। গঞ্জেতে স্যাঁকরার দোকানে বসে নকল 'পাঞ্জা' বানিয়ে নিচ্ছিল। রানী দুর্গাবতীর হাতের 'পাঞ্জা'। এই পাঞ্জা দেখিয়ে ব্যাটা চৌরাগড় দুর্গে পাহারাদার সেজে প্রায়ই ঢোকে---সেখানে ঢুকে সেনা গোলমাল পাকায়। গোপনে অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র সরায়। আসল অস্ত্র সরিয়ে মেকি অস্ত্র ঢুকিয়ে রাখে। এদের এক বিরাট চক্র আছে। সেই চক্রের ভেতর এটি একটি চাঁই।'

'বটে! তা এতকথা তুই জানলি কী করে?'

'আজ্ঞে, এ নিজেই এসব কবুল করেছে। মারের চোটে আরও নানান কথা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।'

আচার্য অনন্তদেব মিশ্র লোকটির দিকে তাকিয়ে ভেবে পেলেন না, এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে কী করা উচিৎ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, লোকটি সহজ লোক নয়। তার অপকর্মের ফিরিস্তিটা একটু বিশদভাবে জেনে নেওয়া দরকার। তারপরে লোকটির সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে। প্রয়োজন বুঝলে চৌরাগড়ের রোটাসের কাছে চালান করে দেওয়া হবে।'

অনন্তদেব লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের হরশঙ্কর তোমার সম্পর্কে যা যা বলছে, তা কী সত্যি?'

লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কোনও কথা বলল না।

হরশঙ্কর একটি লগুড় নিয়ে এসে লোকটির পিঠে মারল। 'কী কী দুঃকর্ম করেছিস, তা কবুল কর। নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

অনন্তদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী? তুমি কী 'জম্‌জম্ জামসেদ?'

লোকটা অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'আঁজ্ঞে, আমার নাম ইউসুফ। আমাদের দলের নাম জম জম জামসেদ।'

'তুমি তা হলে একাই এই সব কুকর্ম করছ না! সঙ্গে তোমার

একটা দলও আছে।'

'জী।'

'তোমাদের দলে কতজন লোক আছে? অনেক?'

'আজ্ঞে, পঞ্চাশ জন।'

'তোমরা সবাই গুপ্তচর?'

'কেবল গুপ্তচর নই। আমরা অনেক নাশকতার কাজও করে থাকি।'

'নাশকতার কাজ? সে আবার কী ধরনের শুনি।'

এই পর্যন্ত বলে লোকটি আবার চুপ করে গেল। তার চুপ করা দেখে হরশঙ্কর আবার তার ওপর লগুড় চালাল। এবং এমনভাবে আঘাত করতে থাকল, যাতে লোকটি অজ্ঞান না হয়ে যায়। এবং প্রহারের চোটে যাতে মুখ খুলতে থাকে।

তা এই ভাবে মার খেতে খেতে লোকটি যা বলে গেল, তা এক ভয়ানক ব্যাপার। গত দেড়-দু বছর ধরে, কিংবা তার আগে থাকতে মুঘল শাসনকর্তা আসফ খানের হুকুমে তারা গুপ্তচর বৃত্তি এবং নানারকম নাশকতার কাজ করে চলেছে। এই গুপ্তচরেরা তাদের কাজ অতিশয় গোপনে সর্বত্র ছড়িয়ে ফেলেছে। রানী দুর্গাবতী এবং তাঁর ছেলে বীর নারায়ণের হাতের ছাপ জোগাড় করে চৌরাগড় প্রাসাদে তাদের গতিবিধি এখন অবাধ। রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা এতই অবাধ এবং আন্তরিক যে রাজপ্রাসাদের কোনও খবরই তাদের অজানা নয়। রানীর বিশ্বস্ত অনুচরেরাও তাদের কাছে আরও বিশ্বস্ত। চৌরাগড়ের কোথায় কোথায় যে দুর্বল জায়গা রয়েছে, তা তারা জেনে ফেলেছে। চৌরাগড়ে ঢোকবার এবং বের হওয়ার গোপন পথও তারা জেনে ফেলেছে।

'সর্বনাশ! আসফ খানের গুপ্তচরেরা তা হলে দুর্গের নকশাও জেনে গেছে!'

'আঁজ্ঞে, সে নকশা গত এক বছর ধরে আসফ খানের জেবের মধ্যেই রয়েছে।'

'গড় কাটিঙ্গা! তার কী খবর?'

'আঁজ্ঞে, গড়ের নামটা আপনি ভুল বললেন 'জনাব! এর প্রকৃত নাম, 'কাটাঙ্গি'। আমাদের শাহী খাতায় 'কাটাঙ্গি' বলে লেখা আছে।'

'চমৎকার। তা তার কী অবস্থা?'

'আঁজ্ঞে, তার হালও আমরা নড়বড়ে করে দিয়েছি।'

'সর্বনাশ!' আর্তনাদ করে উঠলেন আচার্য অনন্তদেব। 'তা কী রকম নড়বড়ে করে দিয়েছ, তা তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।'

লোকটির মুখে এবার খই ফুটতে থাকল। কোনও কথা আর যেন সে গোপন রাখতে চাইছে না। হরশঙ্করের লগুড় ব্যবহারের আর যেন সে সুযোগ দিতে চাইছে না। 'কী রকম নড়বড়ে করে দিয়েছি আমরা, তা শুনে জনাব, আপনার পিলে চমকে যাবে। আপনার মগজে রক্ত চড়ে যাবে। এই বদখত হরশঙ্কর হয়ত আমাকে লাঠিপেটা করে ছাড়বে। তাই বলি যদি অভয় দেন, তা হলে সব কথা খোলসা করে বলে পেট হালকা করি।'

আচার্য অনন্তদেব বললেন, 'অভয় দিলাম। তুমি বলে যাও।'

'জনাব, আপনাদের অস্ত্রশালায় আমরা আসল অস্ত্র সরিয়ে বহু নকল অস্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন যা আছে, তা হল কাঁচা লোহার মাল। এগুলি ভঙ্গুর। সহজেই ভেঙে যাবে তুবড়ে যাবে।'

'আমাদের তোপখানা, কামান-বন্দুক, তাদের কী কোনও ক্ষতি করেছ না কী!'

'আঁজ্ঞে, ক্ষতি বলে ক্ষতি! এমনভাবে মশলা মেশানো আছে, তার বারুদে আগুন ধরবে না। তোপ ফুটবে না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আচার্যদেব বললেন, 'তোমরা এক-একটি শয়তান বিশেষ। দোজখেও তোমাদের ঠাঁই হবে না। এবং তোমাদের চেয়ে আরও বেশি শয়তান, যিনি তোমাদের এই কাজে নিয়োগ করেছেন।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে, তা হতে পারে। এই আসফ খাঁ হলেন ইতলিশের বাচ্ছা। যে তঙ্কা কবুল করে আমাদের কাজে লাগানো হয়েছিল, তার সিকি পরিমাণও আমাদের দেয়নি। তবে আমরা কিন্তু আমাদের কাজ ঠিক ঠিক করে গেছি।'

'তোমরা আর কী কী দুষ্কর্ম করেছ!'

'আঁজ্ঞে, আমাদের কাজ কথায় বলে শেষ করা যাবে না।' মুঘল বাদশার সঙ্গে লড়াই লাগলে বুঝতে পারব, কী কী করিছি।'

আচার্য অনন্তদেব বললেন, 'আমাদের সৈনিকরা সাহসী। অকুতোভয়। সকলেই বীর সৈনিক। মাণ্ডুর রাজা রাজবাহাদুরকে তারা যেভাবে পরাজিত করেছে, তোমাদেরও সেইভাবে হারিয়ে দিয়ে মুলুক ছাড়া করবে।'

আচার্যদেবের এই কথা শুনে লোকটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এবং বিশ্রী একটি হাসি হেসে বলল, 'আঁজ্ঞে, আপনাদের এই সৈনিকদের আগে যে বল, তাকৎ ছিল, এখন আর তা নেই। তাদের চণ্ডুর নেশা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা নেশাখোরেরা কী কখনও লড়াই করতে পারে! পারে না। আপনাদের সৈনিকরা এখন আর সৈনিক নেই, তারা এখন কাকতাড়ুয়া। একবার লড়াইয়ে নামলেই তাদের অবস্থা টের পাবেন।'

'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমাদের মহারানী হলেন এক বীর্যবতী মহিলা। তিনি কী এসব কাজের খবর রাখেন না?'

'আঁজ্ঞে না। তিনি এখন পুজো-আচ্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এই সব ব্যাপারে তাঁর খুব একটা মন নেই। ইদানীং আবার অন্য এক কাজে ব্যস্ত।'

'অন্য কাজ? মহারানীর আবার অন্য কাজ কী থাকতে পারে।'

'আঁজ্ঞে, রাজকুমার বীরনারায়ণের বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি জাঁক করে উৎসবের আয়োজন করছেন।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলা যেত। কিন্তু আচার্য অনন্তদেবের

মনে হল, লোকটি বাচাল। বিস্তর কথা বলা তার অভ্যাস। আর যে মানুষ, বিস্তর কথা বলে, সে 'মিথ্যুক' না হয়ে যায় না। সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর। প্রহারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এইভাবে কথা বলে চলেছে। আচার্য অনন্তদেব হরশঙ্করকে বললেন, 'এই লোকটাকে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ। আগামী কাল ভবশঙ্করকে দিয়ে এই লোকটাকে কোটালের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবি।'

লোকটাকে বেঁধে রাখা হল। এবং আচার্যের সিদ্ধান্ত মতো পরের দিন চৌরাগড়ে পৌঁছে দেওয়া হল।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটির পর প্রায় একপক্ষকাল কেটে গেল। কিন্তু আচার্যদেবের সঙ্গে তারা কেউ যোগাযোগ করল না। এই বিলম্ব দেখে মনে হল, লোকটি একটা প্রতারক। নানারকম মিথ্যাকথা বলে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া তার অভ্যাস। তাদের সকলকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যই সে এসেছিল। কোটালের কাছে তার বাচলতা ধরা পড়ে গেছে, তাই তিনি কোনও সংবাদ দেন নি।

পরে মনে হল, তবু একটা সংবাদ দেওয়া কোটালের উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি এই উচিৎ কাজটি করলেন না কেন? কোটাল মশাই বোধহয় সুবিচারের মানুষ নন।

আরও একপক্ষকাল কেটে গেল। কোটাল নয়, হঠাৎ মন্ত্রী অধর কায়স্থ একদিন অপরাহ্ন বেলায় মন্দিরে এসে হাজির।

তিনি এসে কোনওভাবে বসে পড়লেন মন্দিরের সিঁড়ির ওপর। তাঁর চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখ দুটি ঘোর রক্তবর্ণ। বোঝা যায়, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণের ফলে তাঁর এই অবস্থা।

'কী হল মন্ত্রী মশাই, আপনার এই অবস্থা কেন? আপনি কী অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ। আমরা সকলে মৃত্যুপথযাত্রী।'

'হঠাৎ এমন করে কথা বলছেন কেন? কী হয়েছে, তা খুলে বলুন।'

কথা বলবার আগে ইশারায় তিনি একটু পানীয় জল চাইলেন। হরশঙ্কর এবং ভবশঙ্কর দৌড়ে গিয়ে পানীয় জল এনে দিল। মন্ত্রী অধর কায়স্থ এক চুমুকে জলটি পান করে বললেন, 'আমাদের রাজ্য গড়মণ্ডলকে বোধহয় আর রক্ষা করা গেল না। আমাদের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হতে চলেছে। কিছুদিনের ভেতরই আমরা মুঘলদের আক্রমণের শিকার হতে চলেছি।'

'তা এত ভয় কিসের? আমাদের রানী-মা কী যুদ্ধ করতে পারবে না?'

'পারবে। কিন্তু এই বিরাট মুঘলবাহিনীর সঙ্গে আমাদের কী এঁটে ওঠা সম্ভব!'

আচার্য অনন্তদেব গম্ভীরভাবে বলল, 'তা যুদ্ধে যদি এঁটে ওঠা না যায়, তখন লোকক্ষয়, ধনক্ষয় না করে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেই তো হত? মুঘল বাদশার সঙ্গে সন্ধি করে শান্তিতে থাকলেই হত!'

'আঁজ্ঞে, তা হত। আমি শান্তির কথা বলতে সোজা দিল্লিতে চলে গিয়েছিলাম। দেখা করেছিলাম একুশ বছরের তরুণ আকবর বাদশার সঙ্গে। আমাদের শান্তির প্রস্তাব শুনে তিনি মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।'

'শুধুই হাসতে থাকলেন? কিছু কথা বললেন না? সাড়া দিলেন না?'

'আঁজ্ঞে, তিনি সাড়া দিয়ে যা বললেন, তা তেমন সুবিধার নয়। তিনি বললেন, 'তাঁর অধীনস্থ করদ রাজ্য হয়ে থাকতে হবে। করদ রাজ্য হয়ে থাকলেই শান্তি। নইলে যুদ্ধ।'

মন্ত্রী অধর কায়স্থর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন আচার্যদেব। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকবার পর বললেন, 'তা আকবর বাদশার প্রস্তাব শুনে মহারানী দুর্গাবতী কী বললেন?'

'মহারানী হাসতে থাকলেন। তিনি হাসতে হাসতে যা বললেন, তা হল,---যবনদের কাছে অধীন হয়ে থাকলে দুর্গতির শেষ থাকবে না। ধীরে ধীরে তাদের দাসত্ব মেনে নিতে হবে। মেনে নিতে হবে যবন-ধর্ম, যবন আচরণ। মন্দিরের জায়গায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের ঘরের সুন্দরী মেয়েদের তুলে দিতে হবে ওনাদের হাতে। এই ধরনের অধীনতা কী মানা যায়।' মহারানীর এই কথা শুনে আবার মুখ দিয়ে কোনও বাক্য সরল না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন মন্ত্রী অধর কায়স্থ।

'তা হলে দেখছি, যুদ্ধ অনিবার্য? তাই না?' আচার্য অনন্তদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, এখন যা পরিস্থিতি, তাতে যুদ্ধ অনিবার্য। নইলে যবনদের হাতে তামাক খেতে হবে।'

'কিন্তু যুদ্ধ করলে কী জেতা যাবে?'

'সংশয় আছে।'

'কেন সংশয়?'

'কেন সংশয় তা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। চারদিকের হাল দেখে মনে হচ্ছে, সকলে কেমন যেন মনমরা। নিষ্প্রাণ। এমনকী আমাদের মহারানী ঠিক আগেকার মতন নেই। তিনি দিনের অনেকটা সময় মন্দিরে কাটান। সেই তেজ, সেই উদ্দীপনা তাঁর ভেতর আর দেখছি না। তবে এখনও তিনি সংকল্পে দৃঢ়। তিনি এখন প্রায়ই বলছেন, আমি রাজপুত। রাজপুত কুলের বধূ। এবং রাজপুত রানী, আমি পুরানমলের মতো প্রতারিত হতে চাই না। দরকার হলে, অর্থাৎ আমার বাবা কিরাত সিংহের মতো মৃত্যুবরণ করব। তবে তিনি এই কপটচারী শেরশাহ মৃত্যু সংবাদ শুনে মারা গিয়েছিলেন। আমার কপালে কী আছে, তা কে জানে?'

আচার্য অনন্তদেব আগের কথায় ফিরে এসে বললেন, 'যুদ্ধে জেতবার সংশয়টি কেন, তা কিন্তু ঠিক ঠিক বললেন না। আমি কিন্তু সংশয়ের গোটা ব্যাপারটি জানি। জানি ভেতরের খবর পর্যন্ত!'

'তাই!' অধর কায়স্থ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি যা-যা জানেন, তা দয়া করে একটু খুলে বলুন।'

আচার্য অনন্তদেব বললেন। সেই গুপ্তচর ইউসুফের মুখ থেকে যা যা শুনেছিলেন, তা বিস্তারিত করে বললেন। ইঁদুরে যেমন শস্যের সন্ধানে গোটামাঠ গর্ত করে ফেলে, সেইভাবে রাজ্যটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে যে মুঘল গুপ্তচরেরা এবং নাশকতা তা অধর কায়স্থকে বোঝানো হল। এই যদি রাজ্যের হাল হয়, তাহলে তার জেতা নিয়েও সংশয় থাকবেই।

এসব কথা শুনে অধর কায়স্থ আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন, 'তা হলে আমরা কী বাঁচব? কোনও পথ নেই বাঁচবার?'

আচার্য অনন্তদেব বললেন, 'এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় দৈব ছাড়া কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

'দৈব?' এই শব্দটি বারকয়েক উচ্চারণ করে মন্ত্রী অধর কায়স্থ প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন। 'প্রভু আচার্যদেব, এই দৈবের সাধনা একমাত্র আপনিই করতে পারেন, আর কেউ না? আপনিই পারেন হোম-যজ্ঞ ইত্যাদি করে দেবী মহাদুর্গার কাছ থেকে আমাদের এই রাজ্যের জন্য 'দৈবকৃপা' আদায় করে দিতে। প্রভু, আপনাকে এই কাজ করে দিতেই হবে।'

আচার্য অনন্তদেব গম্ভীর হয়ে গেলেন অধর কায়স্থর এই কাকুতি শুনে।

অনেকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'আমি মহাদুর্গার কাছে মহাযজ্ঞ করতে পারি, কিন্তু এই যজ্ঞের যে অভীষ্টফল, তা পাব কি না, বলতে পারছি না। কয়েকদিন পরেই অমাবস্যা আসছে, এই অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত প্রায় দুই পক্ষকাল আমি সহায়তা করব। দেখা যাক, কী করতে পরি।'

আচার্য অনন্তদেব অমাবস্যা আসতেই দ্বাররুদ্ধ করে দিলেন। তিথি- নক্ষত্র মিলিয়ে তিনি মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

দুই চেলা হরশঙ্কর ও ভবশঙ্কর মন্দিরের বাইরে বসে রইল। যাতে যজ্ঞের কোনও বাধা-বিঘ্ন না হয়।

✪ ✪ ✪

এখন ইতিহাসের কথায় আসা যাক।

গড়মণ্ডল রাজ্যের জঙ্গলমহলের ভেতর 'মহাদুর্গা' মন্দিরের কথা ইতিহাসে সেভাবে কোথাও লেখা নেই।

লেখা নেই আচার্য অনন্তদেব মিশ্রের কথাও। তিনি যে মহাদুর্গার যজ্ঞ ফল রাজ্যের জন্য 'দৈবকল্যাণ'কে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, সে কথাও ইতিহাসে অনুক্ত। এসব ইতিবৃত্ত মহাকালের আবর্তনে কোথায় যে হারিয়ে গেছে, তা গবেষকরাও জানেন না।

তবে ইতিহাসে যা আছে, তা হল পরাভবের কথা। মহরানী দুর্গাবতী কী ভাবে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক লড়াই করেছিলেন তা সংক্ষেপে ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। আর লেখা রয়েছে একুশ বছরের এক মুঘল বাদশা রাজ্যটি লুঠ করে কী কী পেয়েছিলেন তার খতিয়ান। রয়েছে আসফ খানের কথাও। রয়েছে রানী দুর্গাবতীর পরাজয়ের কথা।

ইতিহাস লিখে গেছেঃ রানী দুর্গাবতী গান্ডোয়ানা রাজ্যটি শাসন করতেন। আকবরের সাম্রাজ্যের যে-কোনও অংশের থেকে 'গান্ডোয়ানা' ছিল সুশাসিত। কোনও কারণ ছাড়াই এই রাজ্যটি মুঘল আকবর আক্রমণ করেন। আবুল ফজল রানী দুর্গাবতীর প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি এটাই ছিল নাকি তাঁর দোষ। আর তাঁর কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না। একথাই আবুল ফজল লিখে গেছেন।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রভূত লড়াই করার পর রাজকুমার বীর নারায়ণ সিংহ আহত হল। আহত রাজকুমারকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সৈন্যব্যূহ দিয়ে অপসারিত করা হল। এদিকে হাতীর পিঠে চড়ে লৌহবর্মে দেহ সুরক্ষিত করে মুঘলদের বিরুদ্ধে রানী দুর্গাবতী প্রবল লড়াই করতে থাকেন। কিন্তু অতর্কিত একটি তীর এসে লৌহবর্ম ভেদ করে তাঁর বুকে বেঁধে। তিনি আহত হন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। সেইসময় তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে না গিয়ে নিজের বুকে নিজের ছোরা দিয়ে আত্মহনন করেন।

এদিকে আহত বীর নারায়ণ চৌরাগড় দুর্গে ফিরে গিয়ে এবং বিশ্রাম নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। তিনি মুঘল অধীনতাকে স্বীকার করেন নি। প্রকৃত রাজপুতের মতো তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন।

আরও যে ইতিহাসের খবর, তা হল বীর নারায়ণ মারা যাওয়ার পর অন্তঃপুরের রমণীরা জহর ব্রত অনুষ্ঠান করে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। তাঁরা অপমানের হাত থেকে এইভাবে নিজেদের বাঁচান।

এরপর জিজ্ঞাসা থেকে যায়, মুঘলবীর আসফ খাঁ 'চৌরাগড়' দুর্গে ঢুকে কী কী পেলেন!

আসফ খাঁ দুর্গে ঢুকে দেখলেন, সবই শেষ। তবে প্রকাণ্ড একটি কাষ্ঠ কেষ্টবীর আড়ালে পেয়ে গেলেন দুজন আত্মগোপন করে থাকা রমণীকে। এই রমণী দুজন হলেন রানী দুর্গাবতীর বোন কমলাবতী এবং রাজকুমার বীর নারায়ণের বাগদত্তা এক সুন্দরী তরুণী। এদের পাওয়া মাত্র আসফ খাঁ পাঠিয়ে দিলেন তাদের তরুণ বাদশা আকবরের হারেমে।

এরপর চৌরাগড় থেকে যে ধনরত্ন পাওয়া গেল, তা প্রায় অপরিসীম।

পাওয়া গেল আলাউদ্দিন খলজির তখনকার একশটি কলসি-ভরা সোনার আশরফি। সোনা-রুপোর রাশি রাশি বাসন-কোশন, আর মহার্ঘ্য মণি-মুক্তোর সঙ্গে রত্নখচিত কয়েকটি মূর্তি।

হাতী পাওয়া গেল দু হাজার। এর ভেতর দুশটি আকবর বাদশাকে পাঠিয়ে দিয়ে, বাকি হাতীগুলি আসফ খাঁ নিজেই আত্মসাৎ করলেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। গোটা রাজ্যটিকে কী ভাবে লুঠ করা হয়েছিল, তার কথা ইতিহাসে লেখা নেই। লেখা নেই রাজ্যবাসীদের চিরদাসত্বের কথা।

Swastika
21 September - 2009, Durgapuja Spl.
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09